নীললোহিত — সমগ্র

নীললোহিত-সমগ্র

প্রথম খণ্ড

নীললোহিত-সমগ্র

প্রথম খণ্ড

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০ ০৭৩

NILLOHIT-SAMAGRAH (Volume I)
Collected prose writings of Sunil Gangopadhyay
Published by Sudhangshu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Calcutta 700 073
Rs. 130.00
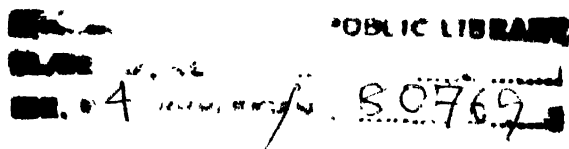
দাম : একশো তিরিশ টাকা

ISBN-81-7612-061-8

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

শব্দগ্রন্থক : অরিজিৎ কুমার, লেজার ইম্প্রেশনস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৪

মুদ্রক : স্বপনকুমার দে, দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

আমি কি লেখক? লেখকরা তো হন অতি দূরদর্শী, অসাধারণ পর্যবেক্ষণ শক্তিসম্পন্ন, অথবা মহাপণ্ডিত। লেখকরা ইচ্ছে মতন কত নারী-পুরুষের চরিত্র সৃষ্টি করেন, তাদের জীবন-মৃত্যু লেখকের কলমের ডগায় কাঁপে। লেখকরা খুব সাধারণ ব্যাপারকেও অসাধারণ করে তুলতে পারেন। তাঁরা অতীতকে ফুটিয়ে তোলেন বর্তমানে, আর বর্তমানকে পাঠিয়ে দেন ভবিষ্যতে। আমার সেরকম কোনো ক্ষমতাই নেই। আমি নিছক ঘুরে ঘুরে বেড়াই, কলকাতা শহরে মাঝে মাঝে আমার দম আটকে যায়, এখানে বড় রকমের কোনো সমস্যা দেখলেই পালিয়ে যাই জঙ্গলে-পাহাড়ে, ট্রেন থেকে নেমে পড়ি কোনো অখ্যাত স্টেশনে। কখনো লুকিয়ে থাকি দিকশূন্যপুরে।

না, আমি লেখক নই, পাঠক! কত লেখকের রচনা পড়তে পড়তে ভেবেছি, ইস, এঁরা কী করে শুধু কালি-কলম দিয়ে জীবনের স্রোত সৃষ্টি করেন! সৈয়দ মুজতবা আলী আমার খুব প্রিয় লেখক, তাঁর বই পড়ে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছি, ইনি যেন সুরসিক, তেমনই বিদ্বান, আর ভাষাতে যেন জাদু রয়েছে, লেখক হতে হয় তো এমনই! আমরা কোনোদিন ওঁর ধারে-কাছে পৌঁছোতে পারবো না!

লেখক নই, তবু কিছু কিছু লিখি, পাঠকদের জন্য নয়, নিজের জন্য! দু'একজন প্রকাশক তা ছাপিয়ে দেন, আমার খুব লজ্জা করে। বাংলা ভাষার বড় বড় লেখকদের পাশে, আমি কে? চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্রদের পাশে এক জোনাকি! প্রখ্যাত অধ্যাপক ও গবেষক স্বপন মজুমদার মহাশয় এই অকিঞ্চিৎকর লেখাগুলিই আবার যত্ন করে সাজিয়ে গুজিয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ অবশ্যই, তবু পাঠকদের কাছে লজ্জিত। তবে আমার একটা সুবিধে আছে, এই লেখাগুলো পড়ে বিরক্ত হয়ে বা রেগে গিয়ে কোনো কোনো পাঠক যদি লেখককে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মারতে চান, তা হলে আমাকে খুঁজে পাবেন না। আমি কখন কোথায় যে থাকবো, তা নিজেও জানি না।

নিবেদন ইতি

নীললোহিত

সূচি

বিশেষ দ্রষ্টব্য

তারাপদ রায়কে.

১

'আমি আপনার চোখ চাইনা। কিন্তু, আপনার সঙ্গে একবার চোখাচোখি দেখা করার সুযোগ পেতে পারি কি ?' এই চিঠিটা লিখেছিলাম একটি বিজ্ঞাপনের উত্তরে। ইংরেজি দৈনিকে একজন বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর একটি চোখ দান করতে চান। যার দরকার সে বিজ্ঞাপনদাতার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছিল বক্স নাম্বারে, উত্তর পেলাম একজন বাঙালির কাছ থেকে। শনিবার সন্ধেবেলা আমাকে দেখা করতে বলেছেন।

দক্ষিণ কলকাতার নব্য-ধনী এলাকার একটি চারতলা বাড়ির একেবারে চারতলার ঘরে তিনি আমার সঙ্গে দেখা করলেন। দীর্ঘ সুঠাম চেহারা, বয়স পঞ্চাশের বেশি নয়, দেখলেই লোকটিকে বেশ রাশভারী মনে হয়। ঘরে একটি শ্বেতপাথরের টেবিল, একটি চেয়ার ও খাট ছাড়া কোন আসবাব নেই। সবকিছুই সাদা। সাদা বিছানার চাদর, সাদা জানালার পর্দা, ধপধপে সাদা দেয়ালে একটি ছবি বা ক্যালেন্ডারও নেই। অত সাদা রং চোখকে পীড়া দেয়। ঘরটা দেখেই আমার অপ্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ল, কবি ইয়েটস নাকি সবসময় কালো রং ব্যবহার করতেন, কালো পোশাক, কালো পর্দা — এমনকি চা খেতেন কালো কাপ-ডিশে, পাশে একটি কালো বিড়াল নিয়ে।

এই লোকটির সঙ্গে আমি কেন দেখা করতে এসেছি জানিনা। ঝোঁকের মাথায় চিঠি লিখেছিলাম। এখন, লোকটিকে একঝলক দেখেই মনে হল — আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এখন চলে গেলেই হয়। কিন্তু কী বলে চলে যাব, হঠাৎ ? আমি চুপ করে বসে রইলাম নাম ও পরিচয় বিনিময়ের পর। চাকর এসে চা দিয়ে গেল, তবু অস্বস্তিকর নীরবতা। বিষম অনুতাপ হতে লাগল আমার, কোন হঠকারিতায় এসেছি এখানে। এ মানুষের মুখ থেকে আমার কিছুই জানার নেই। এই লোকটি কেন তাঁর চোখ দান করে যেতে চান — তা জেনে আমার কী দরকার ? আমি চোখ নিচু করে টেবিলে আঙুল দিয়ে অদৃশ্য ছবি আঁকতে-আঁকতে প্রতীক্ষা করতে লাগলাম, লোকটিই আমাকে প্রশ্ন করবেন। একবার মুখ তুলে দেখি, ভদ্রলোক আমার দিকে তীব্র চোখে তাকিয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই আমার মাথায় একটি প্রশ্ন খেলা করে গেল। কোন্ চোখটা ? ডানদিকের না বাঁদিকের — কোন চোখটা তিনি দান করতে চান ? বেশ টানাটানা সুন্দর চোখ ভদ্রলোকের। যুগ্ম ভ্রূ।

— আপনি কি বেঁচে থাকতেই চোখটা দিয়ে যেতে চান? ·

— হ্যাঁ।

— এত অল্পবয়সে? আপনার তো মৃত্যুর সময় হয়নি। এর মধ্যেই একটা চোখ হারাতে আপনার কষ্ট হবেনা?

— আমার লাং ক্যান্সার আছে। আমি দু-এক বছরের বেশি বাঁচবনা, জানি।

— আপনার পরিবারের কেউ আপত্তি করছেননা?

— আমার পরিবারে কেউ নেই।

খুব কাটাকাটা উত্তর ভদ্রলোকের। সবসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে কথা বলছেন। যারা চোখেব দিকে তাকিয়ে কথা বলে — সেইসব লোক সাধারণত সত্যবাদী হয়, সেই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসী। লোকটি তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে ক্রমশ আমার ওপর প্রভাব বিস্তার করছিলেন। সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য আমি ওঁর আত্মবিশ্বাসে আঘাত করতে চাইলাম। জিজ্ঞেস করলাম, মানুষের উপকার করার হঠাৎ এরকম ইচ্ছে হল কেন আপনার?

— মানুষেব উপকার?

— এই চোখ দিয়ে যাওয়া। সব লোকই তো দুটি চোখ সমেত মারা যায়।

— আমাব একটি ছেলে জন্মেছিল। জন্মান্ধ। সে মারা যাবার পব এই কথাটা আমার মাথায় আসে।

— দুটো চোখই তাহলে দিয়ে যাচ্ছেননা কেন?

— একটা রেখে দিচ্ছি, বাকি যে কটা দিন বাঁচব — সে কটা দিন কাজ চালাবাব জন্য। তাছাড়া, মৃত্যুর পর কী আছে জানিনা। যদি তখন কাজে লাগে, মৃত্যুব পর স্বর্গ বা নরকে যদি কিছু দেখার দরকার হয়, তাই একটা বেখে দেওযা ভালো।

— কোনটা?

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। তারপর এই প্রথম মুখটা ফেরালেন। আমি খেলাচ্ছলে ওঁর মুখের সামনে হাতটা নিয়ে গিয়ে বললাম, কোন চোখটাকে আপনি বেশিদিন বাচিয়ে রাখতে চান?

তিনি কোন উত্তর দিলেননা। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম একটু নিষ্ঠুরের মতো, ডানদিকেরটা না বাঁদিকেরটা, কোন চোখটাকে আপনি বেশি ভালোবাসেন?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি অলৌকিকে বিশ্বাস কবেন?

অবাক হয়ে আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এল, অলৌকিক?

— হ্যাঁ, আপনার তো বয়েস অল্প। কিন্তু তবু, কোনরকম অলৌকিকে বিশ্বাস করেন?

— অলৌকিক বলতে ঠিক কী বলতে চাইছেন? যদি ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার হয়, এখনও নির্ভয়ে বলতে পারি, না, করিনা। কিন্তু, রাত্রের দিকে খানিকটা ভূতটুতে বিশ্বাস করি এখনো।

এই প্রথম ভদ্রলোক মৃদুভাবে হাসলেন। বললেন, না, তা নয়। মাসখানেক আগে ঠিক করেছিলাম, বাঁ চোখটা দান করব। মনঃস্থির করে ফেললাম। তারপরের কয়েকটা দিন হঠাৎ বাঁ চোখটায় ব্যথা করতে লাগল। জল ঝরতে লাগল অনবরত। তখন ভাবলাম, এ চোখটা বোধহয় খারাপ হয়ে যাচ্ছে, অসুখ হয়েছে কোন। ডাক্তার দেখাবার আগেই ঠিক করলাম, ঐ খুঁতধরা চোখটা তাহলে আব দেবনা, ডান চোখটাই দেব। আমার বাকি কটা দিন ঐ খারাপ চোখটাতেই চলে যাবে। তাবপর ... ভদ্রলোক আমার দিকে আবার তীব্র চোখে তাকালেন। বুঝতে পাবলাম, তিনি সত্যি কথা বলেছেন।

তারপর, আমার বাঁ চোখটা হঠাৎ সেরে গেল। কিন্তু, এবার ডান চোখটা ব্যথা কবে জল ঝবতে লাগল। মনে হল, ঐ চোখটা একা-একা কাঁদছে সবসময়। রাত্তিরে শুয়ে মনে হত, ঐ চোখটা অনবরত কেঁদে-কেঁদে আমাকে কিছু বলতে চাইছে। যেন মিনতি করছে করুণভাবে। — আমাকে নয়, আমাকে নয়, আমি কী দোষ করেছি যে আমাকে আপনি বিদায় করে দেবেন। শরীরের প্রত্যেকটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কি আলাদাভাবে প্রাণ আছে? ওদেব আলাদা ইচ্ছে-অনিচ্ছে আছে? নইলে, যখনই যে চোখটাকে দান করব ভাবি, তখনই সেটা থেকে জল পড়ে কেন? একে আপনি অলৌকিক বলবেননা? যাই হোক, তখন ঠিক করলাম, আগে থেকে আব ভাববনা। অপারেশনের ঠিক আগের মুহূর্তে বেছে নেব। এখন দুটো চোখই ভালো আছে।

— আপনার চোখদুটি ভারি সুন্দব।

— আমার দৃষ্টিশক্তিও খুব উজ্জ্বল। জানালা দিয়ে দেখুন, লেকেব দক্ষিণ পাড়ের ঐ দোকানটার সাইনবোর্ড এখান থেকে পড়তে পারেন? আমি এই বযেসেও পারি। ঐ যে দেখুন-না, কমলা স্টোর্স, নিচে ছোট হরফে লেখা সর্বপ্রকার স্টেশনারি ...

আমি মনে-মনে একটু হাসলাম। বুঝতে পারলাম, লোকটি ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন। খসে যাচ্ছে গাম্ভীর্য। নইলে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে এমন ছেলেমানুষী গর্ব করতেননা। সরকারি বনবিভাগের এই প্রাক্তন কর্মচারীটি, অরবিন্দ বায়চৌধুরী, একা বসে পেশেন্স খেলা যার একমাত্র ব্যসন, পনেরো বছর আগে স্ত্রীবিয়োগ হবার পর যিনি আর দারপরিগ্রহ করেননি — এতক্ষণ তাঁকে একটা কঠিন, অবাস্তব মানুষ বলে মনে হচ্ছিল — এবার আমি তাঁর শরীরের শিরা ও স্নায়ু দেখতে পেলাম।

এমনকি বুকের মধ্যে ক্যান্সারের ঘা পর্যন্ত। চোখ দান করা নিয়ে কোন অহংকার করছেননা, কিন্তু এত নিরাসক্ত হবার মতো অহংকার তিনি কোথায় পেলেন? বললাম, আপনি অপারেশন করে চোখ তুলে দেবার এক মাস পরেই যদি ক্যান্সারের ওষুধ বেরিয়ে যায়? তাহলে আপনি বাকি জীবন এক চোখে বাঁচবেন?

— আপনি বেশি আশাবাদী।

— যে কোন মুহূর্তেই তো বেরুতে পারে।

— তা হোক। একটা চোখই আমার যথেষ্ট।

— আপনি যাকে চোখ দেবেন, তাকে নিজে দেখে যেতে চান?

— হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। না-হলে তো আমি 'আই ব্যাঙ্কে' দান করতে পারতুম। আমি একটি বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে যেতে চাই।

— কেন?

— এমন একজন স্বাস্থ্যবান শিশুকে দিতে চাই — যে বহুদিন বাঁচবে। কারণ —

ভদ্রলোক একটু লাজুকভাবে হাসলেন। আমি এমনভাবে ওঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম — যার একমাত্র মানে হয়, বলুন-না!

— এ জীবনটা কেটে গেল, কিন্তু কী দেখলাম? রাস্তায় বেরুলে এখন কী দেখি? জানেন, যখন জঙ্গলে থাকতাম, আমি গুলি খেয়ে হরিণকে ছটফট করে মরতে দেখেছি, নেকড়ে বাঘের মুখে খরগোশের বাচ্চাকে মরতে দেখেছি — কিন্তু তার কিছুর সঙ্গেই তুলনা হয়না — এখন পথে বেরুলেই যে লক্ষ-লক্ষ না-মরা, অর্ধজীবন্ত মানুষ দেখি। কীরকম নিরাশ কালিমাময় মুখ! উঃ! মানুষের মুখ এরকম হয়? আগে মফঃস্বলে থাকতাম, পালিয়ে এসে শহরের চারতলায় আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু এ শহরেই বা কী দৃশ্য! এত অসংখ্য মানুষ, এদের মুখ দেখলে শিউরে উঠতে হয়। কোন আশা নেই, উৎসাহ নেই, দাবিও নেই। কোনরকমে বেঁচে আছে। এর নাম জীবন? আমি মরে যাচ্ছি, কিন্তু আমার চোখটা এমন একজনকে দিয়ে যাব — যে অনেকদিন বাঁচবে, ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী দেখে যাবে।

ভদ্রলোক যে শেষপর্যন্ত অতি সাধারণ মানুষের মতোই কথা বললেন তাতে নিশ্চিন্ত হলাম। একটা তাহলে স্পর্শসহ যুক্তি আছে। সেইটাই আমার জানার দরকার ছিল — কেন একটা লোক হঠাৎ চোখ দিতে চায়। নেহাৎ মানুষের উপকার করবার জন্যই নয় তাহলে! নিজের একটা শখ মেটাবার জন্য মৃত্যুর আগে সকলেই ভবিষ্যতের কথা ভাবে — ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীর কথা। একশো বা দুশো বছর আগে যারা মারা গেছে, তারাও ভেবেছিল। ভেবেছিল যে তাদের মৃত্যুর দু-দশ বছর পরই পৃথিবী সুন্দর হয়ে যাবে। শুধু তারাই দেখে যেতে

পারলনা। আমার ঠাকুরদা এ কথা ভেবেছিলেন, আমার বাবাও হয়তো ভেবেছেন মরার আগে। সকলেই ভেবেছেন, ইস্, একটুর জন্য ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবীটা দেখে যেতে পারলামনা! এরকমই চলবে!

আমি এখন বাঁচব বেশকিছুদিন, এরকম আশা আছে, তাই ভবিষ্যতের সুন্দর পৃথিবী-টৃথিবীর কথা আমার একবার ভুলেও মনে পড়েনা।

ওঠার আগে আমি আরেকবার ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকালাম। হঠাৎ মনে হল, ওঁর চোখদুটির আলাদাভাবে, স্বাধীনভাবে অন্যকিছু বলার আছে হয়তো। হয়তো, আমার চোখদুটি ওদের স্বজাতির ভাষা বুঝেছে। কিন্তু আমি পারিনি।

২

আমি রাস্তার এপারে, রাস্তার ওপারে একজন অল্পচেনা লোককে দেখতে পেলাম। যথোপযুক্ত ভঙ্গিতে অল্প হেসে জিজ্ঞেস করি, ভালো আছেন? তারপর আবার চলতে শুরু করেছিলাম, লোকটি ওপার থেকে কী যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। ঠিক লক্ষ করিনি, ভদ্রলোক আবার বেশ চেঁচিয়ে বললেন, না, ভালো নেই।

দাঁড়াতেই হল। লোকটি রাস্তা পেরিয়ে কাছে এসে হাসি-হাসি মুখে বললেন, না, ভালো নেই! বুঝতে পারলেন, আমি ভালো নেই?

এবার আমি কী বলব, বুঝতে না-পেরে চুপ করে ছিলাম। তাছাড়া যাঁরা ভালো থাকেননা, তাঁরা নিজেরাই নিজেদের ভালো না-থাকার কথা শতমুখে বলবেন জানি। লোকটি কিন্তু একটু সামান্য হেসে বললেন, বিশেষ কিছুনা, 'ভালো আছি' শুনলেই তো চলে যেতেন, তাই 'ভালো নেই' বললাম। তবু একটু দাঁড়ালেন।

এবার আমিই হাসলাম। কিন্তু মুশকিল এই, লোকটির নাম আমার মনে পড়ছেনা, কোথায় আলাপ কিছুই মনে পড়ছেনা, মুখখানা সামান্য চেনা-চেনা। এরকম চেনা লোক পথেঘাটে অসংখ্য থাকে। পরিচয়ের গাঢ়তা অনুযায়ী সম্ভাষণ হয়। যেমন প্রাথমিক স্তরে ভ্রূ-নৃত্য। এই স্তরের লোকদের সাধারণত দূর থেকে দেখতে পেলে অন্যমনস্ক হবার ভঙ্গি করতে হয়, অত্যন্ত উদাসীনের মতো পথের পোস্টার পড়তে-পড়তে দুজনে দুজনকে অতিক্রম করে যাই। দৈবাৎ চোখাচোখি হয়ে গেলে ভুরুদুটো একবার নাচানো। এরপরের স্তরের সঙ্গে দেখা হলে ভ্রূদ্বয়ের ছুটি। সেখানে চোখ ও মুখে মোনালিসা ধরনের সুপ্ত হাসি এঁকে একবার তাকানো, বড়োজোর অস্ফুটভাবে বলা, ভালো! — এর উত্তর শোনার জন্য থামতে হয়না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উত্তর আসেনা।

তৃতীয় স্তরের সম্ভাষণই সবচেয়ে বিপদজনক। সেখানে এক মিনিট দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করতে হয়, কী খবর? — এই চলে যাচ্ছে আর কী! সত্যি, যা গরম পড়েছে! ও তাই নাকি! আচ্ছা, চলি! — এসব লোকের সঙ্গে দেখা হলে প্রায়ই মনে পড়েনা, লোকটির সঙ্গে আগে 'তুমি' কিংবা 'আপনি' কোনটা বলতাম। তখন ভাববাচ্যের আশ্রয় নিতে হয়। — কী করা হয় আজকাল? কোথায় যাওয়া হচ্ছে? কলকাতার বাইরে থাকা হয় বুঝি? কথা বলার সময়েই মনে-মনে হিসেব করতে হয়, যথেষ্ট ভদ্রতাসূচক সময় ব্যয় করা হয়েছে কিনা এর সঙ্গে!

এরপর যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে কোন-না-কোন সূত্রে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকার কথা, অথচ মনে-মনে নেই, মুখেও বিশেষ কিছু বলার নেই। আত্মীয় বা বন্ধুর বন্ধু বা প্রেমিকার অন্য প্রেমিক। এঁদের সঙ্গে দেখা হলে যথেষ্ট উল্লাসের ভঙ্গিতে বলতে হয়, আরে কী খবর! দেখাই নেই যে! চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে দেখছি! — তারপর, অমুক কেমন আছে? ওখানে আর গিয়েছিলেন? — এইসব কথা বলার সময় এমন ভাব করতে হয় যেন ওঁকে দেখে আমি সমস্ত বিশ্বসংসার বিস্মৃত হয়েছি। তারপর সূক্ষ্মকোণী চোখে হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে অকস্মাৎ সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়ে বলে উঠি, আরেঃ তিনটে বেজে গেছে! ইস, একটা বিশেষ কাজ আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। চলি। আবার দেখা হবে। অ্যাঁ? — এরপর অত্যন্ত দ্রুতভাবে কিছু দূর গিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়তে পারলে সবচেয়ে ভালো হয়।

টাকা ধার করিনি, চুরি করিনি, ঝগড়া করিনি, কোনরূপ অন্যায় করিনি, তবু অনেক লোককে দূর থেকে দেখেই রাস্তার ছায়ার ফুটপাথ ছেড়ে রোদ্দুরের ফুটপাথে চলে যেতে হয়। এই এড়িয়ে যাবার কারণ আরকিছুই-না, অকারণে বাক্যব্যয় বা ভুরু নাচানোর অনিচ্ছা। একেক সময় হয়তো আমার মেজাজ খারাপ বা মন বিষণ্ন, তবু হঠাৎ কারুকে দেখে জোর করে মুখে হাসি ফোটাতে গা রি-রি করে।

অবশ্য এর উল্টোটাও আছে। কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি বা উচ্চপদস্থ লোক আমাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে পথের শোভা নিরীক্ষণ করছেন বা সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়েও না-চেনার ভান করছেন, তখন নিজেকেই এগিয়ে যেতে হয়, নমস্কার ঠুকে বিগলিত হাস্যে বলতে হয়, আমাকে চিনতে পারছেন? তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে হয় অতি আন্তরিকভাবে, শব্দ নির্বাচন করতে হয় অতি সাবধানে, যাতে প্রতিটি বাক্যই হয় প্রচ্ছন্ন স্তুতি। আর, অন্তরীক্ষসঙ্গীতের মতো সর্বক্ষণ তো বিগলিত হাস্য আছেই। পুরো দৃশ্যটির এককথায় সারমর্ম এই: সময়কালে যেন আপনার কৃপার ছিটেফোঁটা পাই!

সবচেয়ে অস্বস্তিকর লাগে যদি পনেরো-কুড়ি বছর পর হঠাৎ কারুর সঙ্গে

দেখা হয়ে যায়। হয়তো স্কুলে ক্লাস সিক্স-সেভেনে সে ছিল আমার প্রাণের সুহৃদ, সে আমাকে টিফিনের সময় অসুখের ভান করে ছুটি নেওয়া শিখিয়েছিল, সে আমার জন্য সিনেমায় ছ-আনার লাইনে জায়গা রাখত। তার সঙ্গে বদলাবদলি করে যত রাজ্যের রগরগে গোয়েন্দা গল্প, পরে অশ্লীল বই পড়তে শুরু করি, আমার ঘুড়ির সুতোয় মাঞ্জা দেবার সময় সে টিপ্‌নি ধরত। তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে, কেউ কারুর খবর রাখিনা, পরস্পরের জীবন এখন কোথায় বেঁকে গেছে কেউ কিছু জানিনা। গলার আওয়াজ বদলে গেছে, চেহারা বদলে গেছে। দেখা হলে কথা বলার কিছুই থাকেনা। দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে সেই ইজের ও গেঞ্জি-পরা খালিপায়ের বাল্যকাল, পরস্পরের সেই চেহারা আমরা দেখি নিঃশব্দে। যদিও আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি দুজন ভদ্র সভ্য, পুরো-প্রস্থ পোশাকপরা পুরুষ, কী কথা বলব জানিনা, দেখা হলেই তো আর বাল্যের কথা শুরু করা যায়না; সেই ঘুড়ির মাঞ্জা কিংবা শেষপাতা-ছেঁড়া গোয়েন্দা গল্পের কথা। আমরা চুপ্‌ করে থাকি, দু-একটা মামুলি কথা বলে বিদায় নিই। অমন একদা-প্রাণের-বন্ধুর সঙ্গে গলা জড়িয়ে একটাও কথা বলা হলনা দেখে ভিতরটা হাহাকার করে।

অবশ্য বহুদিন-পর-দেখা সব ছেলেবেলার বন্ধুই অমন বাল্যে ফিরে যায়না। অনেকে ঘোরতর সংসারী হয়ে গেছে, ওসব কিছুই মনে নেই হয়তো, পান চিবুতে-চিবুতে যাচ্ছেতাই সব প্রশ্ন করে। বিশেষ করে একটি প্রশ্নের জন্য আমি সবসময় শঙ্কিত থাকি। শুনলেই রাগ হয়, বিশেষত সে প্রশ্নের উত্তর জানিনা বলেই বহুদিন পর ক্ষণিকের জন্য দেখা, আবার বহুদিন দেখা হবেনা, তবু ঐটুকু সময়ের মধ্যেই আমাকে অত্যাচার না-করলে যেন ওদের আশা মেটেনা। যেমন, এ কথা সে কথার পর ওরা জিজ্ঞেস করবেই, এখন কী করছিস?

উত্তরে আমি বলি, এখন? এখন একটু মানিকতলায় যাব।

— না, না, কোথায় আছিস?

— দমদম।

এতেও ওরা একটুও দমিত হয়না। তাকায়না আমার নিষেধ-আঁকা চোখে। এরপরেও জিজ্ঞেস করে, কোথায় গেলে তোর সঙ্গে দেখা হবে? আমি বলি, একদিন দমদম আমার বাড়িতে আয়-না।

কিন্তু এসব শুনে তৃপ্তি হয়না ওদের। ওদের যেন জীবনমরণ নির্ভর করে একটা বিশেষ কথা জানার ওপর। এরপর বলে, কী কাজ করছিস?

তখনও এড়িয়ে যাবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমি উদাস ভঙ্গিতে বলি, জীবনের সত্যিকারের কাজ এখনও কিছুই শুরু করিনি ভাই! কিন্তু ঐ নিরেটের দল তখন

প্রায় ক্ষেপে উঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় চাকরি করছিস বল-না!

'বেকার' শব্দটা আমি মোটেই পছন্দ করিনা। কোথা থেকে ঐ অবাঙালি শব্দটা বাংলাভাষায় জুড়ে বসল কে জানে। অথচ এর আর কোন প্রতিশব্দও নেই। 'চাকরি করিনা', বলব? উঁহু, এতেও কাজ হয়না, বলে দেখেছি। তাতেও ঐ থান-ইঁট-দিয়ে-তৈরি-করা মাথারা জিজ্ঞেস করে, অ, বিজনেস করছিস বুঝি?

এরপর অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সঙ্গে-সঙ্গে বিদায় নিয়ে চলে যাই।

মেয়েদের সঙ্গে দেখা হলে এসব ঝঞ্ঝাট নেই। অধিকাংশ মেয়েই পথে দেখা হলে চিনতে পারেনা। মেয়েদের একটা বিচিত্র সীমাজ্ঞান আছে। যে মেয়ের সঙ্গে তার বাড়িতে আলাপ, অথবা কোন-না-কোন ফাংশানে, সে শুধু তার বাড়িতে বা ঐধরনের কোন ফাংশনেই চিনতে পারবে, অন্য কোথাও নয়। এছাড়া, বিয়ের আগে যার সঙ্গে পরিচয়, বিয়ে হয়ে যাবার পর তাকে তো আর চিনতে পারার রীতিই নেই। আরেকধরনের মেয়ে আছে যারা মুখোমুখি পথে দেখা হলে চোখ নামিয়ে নেবে সঙ্গে-সঙ্গে, তারপর একটু পরে আরেকবার তাকাবে স্থিরভাবে কয়েক সেকেন্ড, তারপর আবার চোখ নামিয়ে হাঁটতে শুরু করবে। ভাবখানা এই, আমি যদি আগে কথা বলি, তাহলেই তিনি দয়া করে আমাকে চিনতে পারবেন। এসব ক্ষেত্রে আমি কথা বলিনা। না, আগে লক্ষ করি, মেয়েটির মুখে চেনা-হাসি আছে কিনা।

আরেকদল মেয়ে পথে সামনাসামনি দেখা হলে একদম চিনতে পারেনা, কিন্তু চলন্ত গাড়ি, বাস বা ট্যাক্সি থেকে দেখলে চেনামুখে হাসে, অনেকসময় হাত নাড়ায়। কিন্তু কখনো থামেনা। তারা দ্রুত চলে যাবে বলেই এক মুহূর্ত চেনাব ভান করে। জীবনে একবারমাত্র একটি মেয়ে আমার সামনে জিপ গাড়ি থামিয়ে বলেছিল, একী আপনি এখানে? আসুন আমার সঙ্গে।

যে মেয়েরা দেখা হলেই হাসিমুখে চিনতে পারে, তাদের সঙ্গে কথা খোঁজার কোন সমস্যাই নেই। তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে কথা বলা যায়, অথবা চায়ের দোকানে, অথবা বাড়ি পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত। দুজন পুরুষবন্ধুতে দেখা হলে আড্ডা হয়না, খোঁজ পড়ে তৃতীয়ের বা চতুর্থের; কিন্তু একটি মেয়ের সঙ্গে একটি ছেলে কথা বলতে পারে দীর্ঘক্ষণ, প্রেম না-করেও, কী কথা কে জানে।

এই সমস্ত অলিখিত নিয়ম আছে সম্ভাষণের; এই কলকাতা শহরে। প্রত্যেকটি চেনা লোক বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা। এদের জন্যে কোন লিস্ট বানাতে হয়না, দেখা হলেই মনে-মনে তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে যায় — শুধু ভ্রূ-নৃত্য, না হাসি, না এক মিনিট, না চায়ের দোকান পর্যন্ত। প্রতিদিন একরকম, কোন নড়চড় নেই। যার

সঙ্গে শুধু 'কী খবর' বলেই চলে যেতে হয়, কোনদিন তার সত্যিকারের খবর শোনার আগ্রহ হয়না।

আজ আমার শুকনো 'ভালো আছেন?' — প্রশ্নের উত্তরে লোকটির রাস্তা পেরিয়ে আসা এবং এসে বলা, 'না ভালো নেই', শুনে আমার অবাক না-হলে চলেনা। কী আশ্চর্য, লোকটি কি সভ্যসমাজের লোক নয়? জানেনা যে, লোকটি সত্যিই ভালো আছে কিনা সে সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র কৌতূহল নেই, খারাপ থাকা বিষয়ে তো নয়ই।

আমি ঠোঁটে হাসি এঁকে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনে দাঁড়িয়ে থাকি। লোকটি বলে, জানেন, রমলা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। না, না, আসলে, আমিই রমলাকে ছেড়ে চলে এসেছি! ভালো থাকব কী করে বলুন।

লোকটির নাম আমার কিছুতেই মনে পড়েনা। তাছাড়া, রমলা বিষয়ে তো আমি কিছুই জানিনা। কে রমলা? কোথাকার রমলা? কে তাকে ছাড়ল, কেনই-বা...। না, রমলা নামের কারুকে আমি চিনিনা। এই লোকটাকেই-বা কীভাবে চিনি? মনের প্রতিটি কোণে আমি তখন ওয়ারেন্ট নিয়ে জোর তল্লাস চালাচ্ছি — হঠাৎ মনে পড়ল, লোকটি একটি ওষুধ কোম্পানির সেলসম্যান, বছরতিনেক আগে চিনতাম — কথার মধ্যে-মধ্যে চশমার ব্রিজটা হাত দিয়ে টিপে ধরার অভ্যেস দেখে লোকটির পরিচয় আমার মনে পড়ল, লোকটির ব্যক্তিগত জীবন তো আমার জানার কথা নয়।

লোকটি আমার কাছাকাছি সরে এসে বলল, খুব খারাপ আছি, বুঝলেন! আপনি পুলিশে চাকরি করেননা তো?

আমি বিস্মিতভাবে 'না' বলি।

— যাক! আমাকে পুলিশে খুঁজছে। সবসময় স্পাই ঘুরছে আমার পেছনে। জীবনটা অতিষ্ঠ করে দিলে।

— কেন? হঠাৎ —

— আর বলবেন-না! ওদের ধারণা, আমি রমলাকে পাচার করে দিয়েছি। হেঃ! আমি রমলার কে মশাই? আমি তো তাকে ছেড়ে চলে এসেছি। দেখুন-না, মটরগাড়িও চড়িনা আজকাল। মাছ-মাংস খাইনা। রাত্তিরে আসে যদিও। রোজ রাত্তিরে বিরক্ত করতে আসে। গায়ে সেই কালোরঙের কটকী শাড়ি, পায়ে আবার বাঈজীদের মতো নূপুর, সারারাত ধরে ঝমঝম ঝমঝম, ঝমঝম ঝমঝম ঝম —

যাক। লোকটা পাগল হয়ে গেছে! আমি ভেবেছিলাম, কী না কী। সভ্যসমাজ বুঝি বদলে গেল। 'ভালো আছেন?'-এর উত্তরে 'ভালো নেই' বলা শুরু হল

বুঝি। তা নয়, সভ্যসমাজ ঠিকই আছে, ভ্রূ-নৃত্য আর স-দাঁত হাসি। এ লোকটাই শুধু আলাদা, নেহাৎ একটা পাগল।

৩

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমনসময় শুনতে পেলাম দূরের একটা বাড়িতে যেন একসঙ্গে অসংখ্য কাঁসার বাসন ভাঙা হচ্ছে — সেই ঝনঝন শব্দ। একটু মনোযোগ দিতেই বুঝতে পারা গেল, কাঁসার বাসন নয়, অনেকগুলি স্ত্রী-কণ্ঠের চিৎকার। ক্রমাগত, একটানা সেই স্বর কিছুক্ষণ চলল। কান্নার না আনন্দের, দূর থেকে মেয়েদের কণ্ঠ শুনে আমি কোনদিন বুঝতে পারিনা।

কিন্তু ধ্বনি বেশ প্রবল, আশেপাশের বাড়ি থেকে একসঙ্গে বহুলোক ছুটে গেল সেদিকে। বেলা আন্দাজ এগারোটা, সুতরাং ভিড় তেমন উপযুক্ত হলনা — অধিকাংশই বৃদ্ধ ও অপর মেয়েরা, বাচ্চার দল, কয়েকটি বেকার ছোঁড়া। প্রথমে গণ্ডগোল কিছুই বোঝা গেলনা, আমার বারান্দা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, কিন্তু ঠিক শ্রবণ-দূরত্বে নয়। আমি খুব কৌতূহলী ছিলামনা। কিছুটা অলস চোখেই তাকিয়ে ছিলাম, এ সমস্ত লোকাল কোলাহল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খুব লঘু কারণে হয়।

একটু পরেই একটা কালো পাৎলুন-পরা ছোকরা এগিয়ে এসে, তার তিনতলা বাড়ির রান্নাঘরে কড়াই চাপানো উনুনেব কাছ থেকে সরে-আসতে-না-পারা উদগ্র ব্যগ্রতাময়ী বউদির উদ্দেশে চেঁচিয়ে জানাল যে, ও বাড়ির একতলার ভাড়াটে বউটি আত্মহত্যা করেছে। খবরটা আমিও ওর মুখ থেকেই জানতে পারলাম, এবং জেনে চমকে উঠতেই হল।

আত্মহত্যা ? বেলা এগারোটায় ? ব্যাপারটার মধ্যে বিশেষত্ব আছে সন্দেহ নেই। প্রথমটায় আমি বিশ্বাস করিনি। আত্মহত্যা তো রাত্তিরের কারবার, চিরকাল সেইরকমই হয়ে আসছে। কিন্তু এই কাঁচা দুপুরে ? সুতরাং আমার মনে হল, হয়তো উনুন থেকে হঠাৎ কাপড়ে আগুন লেগে ভদ্রমহিলা অজ্ঞান হয়ে গেছেন।

কিন্তু, না। জনতার উচ্চগ্রাম থেকে জানা গেল ভদ্রমহিলা বিষ খেয়েছেন, পাশেই 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় !'

কয়েকজন সশব্দে ছুটে গেল থানা ও অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে।

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই তৎক্ষণাৎ ভেবে দেখলাম, ভদ্রমহিলাকে আমি কখনও দেখেছি কিনা। হয়তো না, দেখলেও ওঁর মুখ আমার মনে নেই, কিংবা

ঠিক কোন ভাড়াটে বউটি, তা আমি জানতে পারিনি। আমি তখনও বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

মাসছয়েক আগের ঘটনা। আমি তৎক্ষণাৎ যে বারান্দা থেকে নেমে ছুটে যাইনি জনতার মধ্যে, তার কারণ ছিল খুবই সামান্য। আমার চটিজোড়া একেবারে ছেঁড়া ছিল — আমি পা-জামা পরে দাঁড়িয়ে ছিলাম খালি পায়ে। একজোড়া শু সম্বল। পাজামার সঙ্গে তো আর শু পরে রাস্তায় বেরুতে পারিনা। অথবা, একজন ভদ্রমহিলা মারা গেছেন শুনে — সেই মুহূর্তে আমি পোশাক বদলে প্যান্ট-শার্ট পরে সেজেগুজে তবে পথে বেরুব, এটা কেমন দৃষ্টিকটু লাগল। অথবা খালিপায়েই দ্রুত ছুটে — কিন্তু কলকাতা শহরে খালি পায়ে? অসম্ভব, জামাকাপড় পরে খালিপায়ে — ঐ ভদ্রমহিলার জন্য আমার অশৌচ শুরু করার কোন কারণই নেই। আমি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলাম।

হয়তো, ছুটে না-যাবার আরেকটু গুপ্ত কারণ আমার ছিল। আমি কোন মরা-মেয়ের মুখ দেখতে চাইনা। একবার দৈবাৎ দেখে ফেলেছিলাম, একটি অচেনা যুবতীর মরা-মুখ, একঝলক, কিন্তু সেই থেকে সে মুখ আমার মনে গেঁথে আছে, কিছুতেই তাড়াতে পারিনা। আমি আমার বান্ধবীদের মুখ অনেকসময় ভুলে যাই, কিন্তু কখনও ভুলতে পারিনি সেই মৃত মেয়েটির মুখ। আমি আরেকটি ওরকম মুখ বাড়াতে চাইনা। আমার বুকের মধ্যে কয়েকটি মরা মেয়ের মুখের প্রদর্শনী থাক, আমি চাইনা।

তাছাড়া, অলস ভঙ্গিতে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম, সেই ভঙ্গি বদলে ব্যস্ত হবার আমার কীই-বা প্রয়োজন। রেডিওতে বিবিধ ভারতীর কু-সঙ্গীত হচ্ছে, ওরা তো এই মৃত মহিলার সম্মানে গান বন্ধ করেনি, এমনকি অনেক বাড়িতে রেডিও পর্যন্ত বন্ধ হয়নি — দূরে ট্রাম ও বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি — কেউ থামেনি, একটি মহিলার মৃত্যুতে কোথাও কিছু বদল হয়নি — সবই একরকম চলছে, শুধু এই গলিটুকুতে ছাড়া।

ততক্ষণ এই গলিপথ ভর্তি হয়ে গেছে মানুষে, কী করে এত মানুষ এত দ্রুত খবর পায় জানিনা। মানুষ মরার গন্ধে শকুন আসেনা, মানুষই আসে। আমি সেই জনতাকেই লক্ষ করছিলাম।

সেইদিনই আমি আবিষ্কার করেছিলাম, জনপ্রিয় লেখকদের জনপ্রিয়তার রহস্য। তাঁরা জীবন বা মৃত্যুর সমগ্রতার সম্পর্কে কিছু লেখেননা, একটি লাইনও না, কারণ, কেউ তা শুনতে চায়না। ওঁরা শুধু লেখেন জীবন ও মৃত্যুর গল্প। মাত্র গল্পটুকু। দুঃখ, বেদনা, মমতা — বিশেষ করে মমতা এড়িয়ে যেতে হয় অতি সন্তর্পণে, মমতা শব্দের অর্থ 'আমারও যদি এরকম হয়' এই বোধের বেদনা। কেউ

তা চায়না, নিজের কথা মিলিয়ে নিতে চায়না। আমি সেদিন দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে প্রতিটি মানুষের মুখে, চোখে, ভুরুতে, চশমার কাচে, আঙুলের ডগায়, ছাতার বাঁটে, জামার হাতায় — একটিমাত্র প্রশ্ন লেখা আছে — কেন, কেন, কেন, কেন ? অর্থাৎ গল্পটা কী ? গল্পটা ? গল্পটা ? জীবন ও মৃত্যু ঐ ভদ্রমহিলার জীবনে কতখানি খেলা খেলেছে কেউ জানতে চায়না, সবাই জানতে এসেছে শুধু সেই ক্রূর ঘটনাটুকুমাত্র — কেন মরল ? কেন ?

নির্লজ্জের মতো সরবে অনেকে অনেকরকম থিয়োরি দিচ্ছিল. অর্থাৎ প্রত্যেকের এক-একটি আলাদা গল্প — ব্যর্থ-প্রেম, মানসিক অসুখ, স্বামীর অবহেলা, ক্যান্সার, স্বামীই মেরে রেখে আত্মহত্যার মতো সাজিয়ে রেখে গেছে — এইসব। প্রত্যেকটা গল্পই কাঁচা, সবাই যেন অপেক্ষা করছিল একজন পাকা ঔপন্যাসিকের — যে এসে সবকিছু নিখুঁতভাবে জুড়ে দেবে। কেউ-কেউ বলছে, এই সরু গলিতে অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে ? — অর্থাৎ, তখন গল্পের নায়িকার চেহারাটা ভালো করে দেখা যাবে তো ? পুলিস আসতে এত দেরি করছে কেন ? — অর্থাৎ পুলিশ এসে যদি সেই মুহূর্তেই গল্পটা আবিষ্কার করে ফেলে !

ফ্ল্যাশব্যাকে ভদ্রমহিলার পূর্বপরিচয়ও আমি বারান্দায় দাঁড়িয়েই শুনতে পেলাম। সুন্দরী। চার বছর বিয়ে হয়েছে — কিন্তু এ পাড়ায় ভাড়াটে হয়েছেন দেড় বছর। স্বামী কাস্টমসে কাজ করেন। ভদ্রমহিলা বি. এ. পাশ. কিন্তু কী আশ্চর্য, ভালো সেলাইও জানেন। কুমারী মেয়েরা ওঁর কাছে প্রায়ই দুপুরবেলা ডিজাইন তোলা শিখতে যেত। সাবুর পায়েস রান্না উনিই এ পাড়ায় প্রবর্তন করেছেন। ওঁর স্বামী একবার পাড়ার স্পোর্টসের পুরস্কার-বিতরণীতে সভাপতি হয়েছিলেন মূল সভাপতির অনুপস্থিতিতে। প্রেম করে বিয়ে কিনা, তাই এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। স্বামী-স্ত্রীতে একসঙ্গে প্রায়ই সন্ধেবেলা সিনেমা দেখতে যেতেন। আত্মীয়স্বজন তো বেশি দেখা যায়নি, প্রায়ই আসতেন ভদ্রমহিলার মা, স্বামীর অফিসের বন্ধুরা ! আর আসত মাঝে-মাঝেই একজোড়া স্বামী-স্ত্রী, ওরা ভদ্রমহিলার বান্ধবী ও তার স্বামী, অথবা ভদ্রলোকের বন্ধু ও তার স্ত্রী — এ কথা জনতা ঠিক জানেনা। ঘটনার দিন স্বামী ঠিক নটার সময় চলে গেছেন অফিসে, পানের দোকানের সামনে জটলা-করা ছেলের দল ওঁকে সিগারেট কিনে ট্রামে উঠতে দেখেছে, ভদ্রমহিলাকেও নাকি তারপর ছাদে কাপড় শুকোতে দিতে দেখা গেছে।

এ তো সরল সাদামাটা সংসার। তবে, এই সকাল এগারোটায় আত্মহত্যা ? যদি নেহাৎ আত্মহত্যা করার দরকারই হয় তো রাত্রে করলেই তো হত। চুপি-চুপি। এইরকম দিনদুপুরে নাটকীয়ভাবে কেন ? এরকম উত্তেজক ঘটনার পুরো গল্পটা জানার জন্য জনতা প্রায় হিংস্র হয়ে উঠেছে। কোথাও কোন ফিসফাস,

আহা-উহু বা ইস্ নেই। নানান জটলায় এক ধ্বনি উঠছে, কেন, কেন, কেন, কেন, কেন, কেন ? গল্পটা ? গল্পটা ? গল্পটা ? স্বামীর অফিসে টেলিফোন করা হয়ে গেছে। তাঁর আসতে দেরি হচ্ছে বলেও লোকে অসহিষ্ণু। স্পষ্ট বোঝা যায়, লোকটিকে সমবেদনা জানাবার জন্য নয়, সকলেই দেখতে চায় তাঁকে স্বচক্ষে, স্বামীটি এ গল্পের নায়ক না খলনায়ক ! স্বামী এসে কান্নায় ভেঙে পড়বে, না গুম হয়ে থাকবে ? তার মুখ দেখে বোঝা যাবে কি — এ ঘটনা সে আগেই জানত, নাকি হঠাৎ জেনে আকাশ থেকে পড়ল ! এমনসময় অ্যাম্বুলেন্স আসতেই আমি বারান্দা থেকে সরে গেলাম। আমি ভদ্রমহিলার মুখ দেখতে চাইনা।

ভদ্রমহিলার আত্মহত্যার গল্পটা আমি জানিনা। শেষ পর্যন্ত জানা হয়নি। আমি গোয়েন্দা বা গল্পলেখক নেই। অন্যান্য সমস্ত জন্তু-জানোয়ারের থেকে মানুষ মাত্র দুটো ব্যাপারে আলাদা। মানুষই একমাত্র চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে পারে — বাঘ, ভাল্লুক এমনকি বাঁদরও তা বেশিক্ষণ পারেনা, মরার আগে। মানুষই একমাত্র মরার আগেও যতক্ষণ খুশি আকাশের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকতে পারে। মরার আগে মড়ার ভঙ্গি মানুষকেই মানায়। আর, মানুষই একমাত্র আত্মহত্যা করতে সক্ষম, মৃত্যুর আগে নিজেই নিজের জীবনকে শেষ করার ইচ্ছে একমাত্র মানুষেরই হয়। এ ব্যাপারে সে ঈশ্বরের চেয়েও বড়। ঈশ্বর অজর, অমর — তাই তাঁর আত্মহত্যা করার ক্ষমতা নেই। মানুষের আছে। আত্মহত্যার ইচ্ছে যে কোন মানুষের একান্ত, অতি ব্যক্তিগত, আমি কারণ জানতে চাইনা।

তবে, একটা কথা কানে এসেছিল। ভদ্রমহিলা শেষ পর্যন্ত মারা যাননি। হাসপাতালে স্টমাক পাম্প করে বিষ বার করে ফেলা হয়, কয়েকদিন ভুগে ভদ্রমহিলা আবার ফিরে এসেছিলেন। কেন আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন, তা যেমন আমার জানা হয়নি, অকস্মাৎ বেঁচে উঠে তিনি লজ্জিত বা অনুতপ্ত, আরও বেশি কাতর না বেশি আনন্দিত হয়েছেন, তাও জানিনা।

ছ-মাস আগে এই ঘটনা ঘটেছিল। আজ সকালে আবার সেই বাড়ি থেকে কান্নার রোল উঠল। তবে সেবারের মতো অত জোরে নয়। একটা ট্যাক্সি থেকে ভদ্রমহিলা, তাঁর মা ও স্বামীর সঙ্গে নামলেন এইমাত্র। বাড়িতে ঢুকেই দুজন নারীর কণ্ঠের কান্না। পাড়ায় দু-একটি বাড়ির জানলা খুলে গেল, দেখা গেল কয়েকটি উৎসুক মুখ৷ কিন্তু বাড়ির সামনে একটুও ভিড় হলনা, একজন লোকও এসে দাঁড়ালনা। পাড়ার লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আজ ছুটির দিনের সকালে অনেক লোক, কিন্তু কেউ ভুলেও বাড়ির সামনে দাঁড়াচ্ছেনা।

কারণ, এবারের গল্প সবারই জানা। কয়েকদিন আগে নার্সিং হোমে ভদ্রমহিলা

একটি মৃতসন্তান প্রসব করেছেন। দু-একদিন আগে সে খবর ছড়িয়ে গেছে এ পাড়ায়। তাই আজ সকালে আর কারুর কোন কৌতূহল নেই।

৪

হার্মাদ ! হার্মাদ ! দূর সমুদ্রে হয়তো দেখা গেছে কয়েকটি জাহাজের পাল, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কারুর চোখে পড়েছে কঙ্কালচিহ্ন আঁকা পতাকা, অমনি বাঙলা দেশের উপকূলবর্তী গ্রামে-গ্রামে রব ওঠে, হার্মাদ ! হার্মাদ ! পর্তুগীজ জলদস্যু আসছে বাঙলা দেশের গ্রাম জ্বালিয়ে দিতে ! লুঠতরাজ করতে, ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী নিয়ে যেতে। চোখের নিমেষে গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশুরা হাতের সামনে যা-কিছু সম্বল টপাটপ তুলে নিয়েই ছুট, উধাও। সহস্র কণ্ঠে ভয়ের চিৎকার, হার্মাদ ! হার্মাদ !

অথবা,

নর্দমায় ভন্‌ভন করছে অযুত সংখ্যক মশা। কালো জলের ওপর সরের মতো ভাসছে মশাদের শিশুসমাজ। বেশ শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, হঠাৎ কোন দুরন্ত বালকের হাত নর্দমায় একটা ঢিল ছুঁড়ল। অমনি পিনপিন শব্দে ছত্রভঙ্গ হয়ে উড়ে উঠল কয়েক নিযুত মশা। পিনপিন শব্দে ওরা কী বলে তা অবশ্য এখনও জানিনা।

অথবা,

আরেকটা দৃশ্য মনে পড়ল। চাইবাসার অসমতল মাঠে দেখেছিলাম একটা মরা কুক্কুরীর শরীর ছিঁড়ে খাচ্ছে বিশ-পঞ্চাশটা শকুন। অতগুলি বৃহৎ ও বিকট পক্ষী-জানোয়ারকে মাটির ওপর কাছাকাছি আগে দেখিনি কখনও। একটা টিলার আড়ালে দাঁড়িয়ে আমরা কয়েকজন দেখছিলাম, শকুন মানুষের চোখ ঠুকরে খায় — এরকম একটা ভয়ও ছিল। এমনসময় দেখলাম, আরেকটা অমিততেজা কুকুর। কুকুরটা খুব বড় নয়। ভয়ংকরও না, কিন্তু ওর ঐ দুঃসাহসী ভঙ্গিতে তীব্র গতিতে ছুটে আসা দেখে মনে হচ্ছিল কোন দীপ্ত অশ্বারোহী ছুটে আসছে পাহাড় থেকে, নারীকে উদ্ধার করার জন্য কোন মধ্যযুগের নাইট। প্রত্যেকটা শকুনের চেহারাই কুকুরটার চেয়ে বড়, কিন্তু তবু ওকে অমনভাবে ছুটে আসতে দেখে একসঙ্গে অতগুলো শকুন ক-র-র-র, ক-র-র-র শব্দ করতে-করতে উড়ে গেল। ঢালু জায়গা থেকে নেমে আসার জন্যেই বোধহয় কুকুরটার ছোটায় একটা মোমেন্টাম এসে গিয়েছিল, সহজে থামতে পারলনা, থামল বহু দূরে গিয়ে। ততক্ষণে

শকুনগুলো আবার নেমে আসছে। দূরে দাঁড়িয়ে কুকুরটা একটা চাপা গর্জন করে পিছনের দু-পা দিয়ে মাটি আঁচড়াল, তারপর সেইরকম ভীমবেগে আবার ছুটে এল, আবার উড়িয়ে দিল শকুনগুলোকে!

অসংলগ্ন এই দৃশ্যতিনটি মনে পড়ল কলকাতার সন্ধেবেলা খুব একটা পরিচিত দৃশ্য দেখে। সন্ধেবেলার আলোঝলমল নগরী, পথে-পথে অসংখ্য মনোহারী দ্রব্যের মেলা। ফিরিওয়ালাদের প্রত্যেকের কী সুন্দর সুরেলা গলা, প্রত্যেকের আলাদা ভঙ্গি, সেফটিপিন, বোতাম, কলম, রেডিমেড জামা, কাগজের কুমীর, চটিজুতো, ন্যাপথালিন, অদৃশ্যকালি — হঠাৎ রব উঠল, হাল্লা! হাল্লা! একনিমেষে লেগে গেল হুটোপুটি, যুদ্ধক্ষেত্রের মতো ব্যস্ততা — সেসব জিনিশ গুটিয়ে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল রাস্তা ফর্সা করে দিয়ে। কোথায় দেখা গেছে জাহাজের পালের মতো লাল পাগড়ির ঝিলিক, কিংবা নাকে এসেছে কালো গাড়ির পেট্রলের গন্ধ — অমনি চাপা গলায় চালাচালি হয়ে যাবে, হাল্লা! হাল্লা! কেউ-কেউ ছুটে যাবে পাশের অলিগলিতে, দু-একজন আবার উঠে দাঁড়াবে সামনের কোন বাড়ির রকে। রকে উঠে দাঁড়ালেও নিরাপদ, ফুটপাতটুকু ছাড়তে হবে শুধু। অর্থাৎ, সেই যে গল্প শুনেছিলাম — এক মাতালকে রাত্তিরবেলা পুলিশে তাড়া করেছে, ছুটতে-ছুটতে মাতাল হঠাৎ রাস্তায় একটা চাপাকল দেখতে পেয়ে — সেখানেই সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়ে জলে হাত রেখে বলেছিল, এখন আর তুমি আমাকে ধরতে পারছনা বাওয়া, এখন আমি জল-পুলিশের আন্ডারে। সেইরকম কোন ফুটপাতের ফেরিওলা একবার কোনক্রমে কোন বাড়ি বা দোকানের সিঁড়ির এক ধাপে বা রকে উঠে দাঁড়াতে পারলেই আর হাল্লা-জুজুকে ভয় নেই।

সাত দুগুণে চোদ্দর চার নামল, হাতে রইল পেন্সিল। আমার হাতে পেন্সিল রয়ে গেল। এক বান্ধবীর দুটি ছোট ভাইবোনকে খুশি করার জন্য দুটি ডটপেন্সিল কিনছিলাম। দাম চেয়েছিল একটাকা, অনেক কষাকষি করে চোদ্দ আনায় নামিয়েছি — এমনসময় হঠাৎ লোকটা ফুটপাতে বিছানো চাদরের চারটে খুঁট একসঙ্গে ধরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চোদ্দর চারও আমাকে নামাতে হলনা, দুটো পেন্সিল হাতে আমি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব বুঝতে পারলামনা। দাম না-দিয়ে চলে যাব? কিন্তু বিবেকে পিঁপড়ের কামড় অনুভব করলাম। আজকাল ধর্মবোধের সঙ্গে আমাদের বেশ ভালোরকম একটা কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে। এই পেন্সিলদুটোর দাম যদি একশো টাকা হত, তবে দাম না-দেবার সুযোগ পেলে বিনাদ্বিধায় তদদণ্ডেই টুক করে পাশের গলিতে সটকাতাম নিশ্চিত। কিন্তু মাত্র চোদ্দ আনা বলেই বিবেকবোধ পাদ্রীর মতো জেগে উঠেছে। তাছাড়া একটি মেয়েকে খুশি করার মতো শুভকাজের শুরুতেই অধর্ম করা উচিত নয় ভেবে

আমি দাম দেবার মহৎ বাসনায় দোকানদারটির উদ্দেশে এদিক-ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালন করলাম। দেখলাম, আমার মহাজনটি সেপাইয়ের হাতে ধরা পড়েছেন। আইনের প্রবল হাত তার কলার শক্ত করে চেপে ধরে আছে।

আমি আস্তে-আস্তে ওর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালাম। ওকে পেন্সিলদুটি ফেরত দেওয়া কিংবা দাম মিটিয়ে দেওয়া সেই অবস্থায় ওর কেসের আরও বিপক্ষে যাবে কিনা বুঝতে না-পেরে একটু ইতস্তত করতে হল। সেইসময় বেশ চিত্তাকর্ষক সংলাপ-বিনিময় শুনতে পাওয়া গেল।

— এ সেপাইজি, কী হচ্ছে মাইরি। তুমি কাল আমাকে ধরেছিলে, আবার আজ ধরছ কেন?

— চল-না, তোর সঙ্গে একটু গপসপ হবে।

—না, ওসব ইয়ার্কি ভালো লাগেনা! পরপর দুদিন ধরবে, চালাকি নাকি? আজ তো জগাকে ধরার কথা!

— তা, আমি অত আস্তে-আস্তে আসছিলাম, তুই পালালিনা কেন? আমি তো বহুৎ টাইম দিয়েছি।

— আমাকে তো আজ ধরার কথাই ছিলনা!

— জগাকে তো দেখতে পেলামনা!

— তা বলে জগার পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাবে?

— তোকে একবার ধরে ফেলেছি, আর ছাড়ি কী করে?

— কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নিলেই হয়!

—গাড়িতে ইন্সপেক্টার সাহেব বসে আছে।

— চলো তোমার ইন্সপেক্টারের কাছে, আমি মুকাবিলা করিয়ে দিচ্ছি।

সেপাই সমেত আমার ফিরিওলা গেল অদূরে প্রতীক্ষমাণ কালো গাড়ির সামনে। ড্রাইভারের পাশে বসে ইন্সপেক্টার সাহেব হাঁটু দোলাচ্ছিলেন। সকৌতুকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা আবার এসেছে!

ফিরিওলাটি বেশ চড়াগলায় ধমকের সুরে বলল, স্যার, এ কী অবিচার, আমাকে পরপর দুদিন ধরবে?

ইন্সপেক্টার মুচকি হেসে বললেন, তুমি ধরা পড়তে গেলে কেন?

— অন্যমনস্ক ছিলাম। তাছাড়া, আজ তো আমাকে ধরার কথাই ছিলনা!

— ধরা পড়েছই যখন, উঠে পড়ো, আর কী করবে!

— আমার মাসে পনেরো টাকা ফাইন দেবার কথা, এ মাসে আমার পনেরো টাকা হয়ে গেছে। আবার এ কী অন্যায়?

— আচ্ছা মুশকিল, তুই ধরা পড়লি তো আমি তার কী করব? এখন তো

উঠে পড়, পরে দেখা যাবে।

— না স্যার, তা হয়না, এ মাসে আমার পনেরো টাকা পুরিয়ে দিয়েছি। আর বেশি হলে অবিচার করা হবে, স্যার। আজ জগাকে ধরার কথা।

— জগা কোথায় ?

— ঐ ঘড়ির দোকানের রকে উঠেছে।

— হুঁ, জগা আজ ধরা দিলনা কেন ? ওর খুব বাড় বেড়েছে দেখছি। বড্ড বেশি চালাক হয়ে গেছে, না। আচ্ছা পরে ওকে মজা দেখাব। আজকে তুই-ই চল। আজ আমার দশটা কেস নিয়ে যাবার কথা।

— তা দশটা নেবেন, কলকাতায় কি ফিরিওলার অভাব ? পরপর দুদিন একজনকে কেন ! আপনারও তো স্যার দয়ামায়া আছে, পুলিশ হলেও তো স্যার, আপনিও তো মানুষ।

—আচ্ছা ঝঞ্ঝাট তোদের নিয়ে। আচ্ছা, ওর কাঁধটা ছেড়ে দে। শোন, তুই সেপাইয়ের হাত ছাড়িয়ে চোঁ-চা ছুট দিবি পাশের গলিতে। নিধিলাল তোর পেছুনে-পেছুনে ছুটবে তাড়া করে। তুই জোরে ছুটবি কিন্তু। ওর থেকে জোরে ছোটা চাই। নিধিলাল যদি তোকে আবার ধরে ফেলে — তা হলে কিন্তু তোর আজ আর ছাড়া নেই। যা দৌড়ো !

তারপর দৃশ্যটা বেশ সুন্দরভাবে অভিনীত হল। পোঁটলাটা কাঁধে নিয়েই ফেরিওলাটি বেশ জোরে সেপাইয়ের হাত ঝটকা দিয়ে ছাড়িয়ে ছুটল এঁকেবেঁকে। সেপাইটি পিছন-পিছন খানিকটা তাড়া করে গেল, তারপর অবিকল ভগ্নোৎসাহের ছাপ মুখে নিয়ে ফিরে এল। কালো গাড়িটা হুস করে ছেড়ে চলে গেল অন্য কোথাও হাল্লা করতে। দৃশ্যটি একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখে আমি যৎপরোনাস্তি সুখী হলাম। গত পনেরো বছর ধরেই দেখে আসছি বিকেলের দিকে ফুটপাতের হকার ফেরিওলাদের মধ্যে অকস্মাৎ পুলিশের আবির্ভাব। তক্ষুনি ছুটোছুটি, বেড়াল ইঁদুরছানা ধরার দু-একটি ছবি। কিন্তু এসব সত্ত্বেও পথের দোকানদারি একটুও কমেনি, বরং বেড়েই চলেছে। রং-বেরং-এর সওদায় রাস্তার শোভা বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে ক্রমশ। এখন কলকাতায় এমন শিকড়হীন দোকানীর সংখ্যা অন্তত পাঁচ হাজার এবং সস্তায় এদের কাছে থেকে ছোঁক-ছাঁক জিনিশপত্রের ক্রেতার সংখ্যা প্রতিদিন পঞ্চাশ হাজারের কম নয়। অর্থাৎ ফুটপাতের ফেরি কলকাতার অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান এখন। সুতরাং মাঝে-মাঝে আমার ভয় হত, ফুটপাত থেকে এদের যখন তোলাই যাচ্ছেনা, তখন পুলিশ হয়তো নিরুৎসাহ হয়ে এদের বিরক্ত করার আইনটাই তুলে নেবে। এরা সুরেলা গলায় নিজেদের জিনিশের গুণগান গাইবে নিঃশঙ্কভাবে। আমরা আর হল্লার অমন চমৎকার দৃশ্য মাঝে-মাঝে দেখতে পাবনা।

আজ বুঝতে পারলাম, সে ভয় নেই। আইন তোলা হবেনা। ও আইনটা রাখা উচিত পুলিশের রিক্রিয়েশনের জন্য। পুলিশের নীরস জীবনেও তো মাঝে-মাঝে খেলাধুলো, আমোদ-আহ্লাদের দরকার! হাল্লা গাড়ি নিয়ে এসে সেই আনন্দটুকু ওঁরা পান। পুলিশেরও তো মাঝে-মাঝে চোর-পুলিশ খেলতে ইচ্ছে হয়।

৫

এখানে মোক্ষদা কোথায় থাকে বলতে পারেন?

— কোন মোক্ষদা? নান্তির মা, না তকাইর দিদিমা? দুজন আছে এখানে। আপনি কোন জনকে চান?

মুশকিলে পড়লাম। বাড়ির ঝি বিনা নোটিসে চারদিন আসছেনা। একরাশ এঁটো বাসন ডাঁই হয়ে গেছে। বাড়ির তাড়নায় গ্রে স্ট্রিটের এক বস্তিতে ঝির খোঁজ করতে গিয়েছিলাম। ঝিকেই চিনি, তার সন্তান-সন্ততিদের ইতিহাস আমার জানাব কথা নয়। সুতরাং কোন মোক্ষদাকে চাই তা বলতে পারলামনা।

খাটিয়ায় বসে-থাকা-বুড়ো লোকটি বলল, একজন মোক্ষদা থাকে ঐ ডানদিকের নিমগাছের পাশের ঘরটায়। আরেকজন পেছনের সেই অয়েল মিলের কাছে।

নিমগাছের তলায় খাপরার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিলাম।

— কে?

— মোক্ষদা আছে?

— এখন হবেনা!

কী কথার কী উত্তর! কিন্তু ঐ দুর্বোধ্য উত্তরেও আমার কোন অসুবিধে হলনা। গলার আওয়াজেই বুঝতে পারলাম, উত্তরদাত্রী আমার উপলক্ষিত মোক্ষদা নয়। আরও বুঝতে পারলাম, ঐ কণ্ঠস্বরের অধিকারিণীর নিমগাছের তলায় বাস করা সার্থক!

দ্বিতীয় মোক্ষদার সন্ধানও একটু চেষ্টা করতেই পাওয়া গেল। বস্তির পিছনে পানের দোকানে খোঁজ করতেই দেখিয়ে দিল। শুনলাম, সেই মোক্ষদার মায়ের দয়া হয়েছে। সামনের মাঠকোঠার দোতলায় থাকে। আমার উদ্যমের ওখানেই ইতি হওয়া উচিত ছিল। মনে মনে ও-ঝিকে তখন আমি বরখাস্ত করে দিয়েছিলাম। অতএব, তারপর আর ঐ নোংরা বস্তিতে সময়ক্ষেপ করার কোন
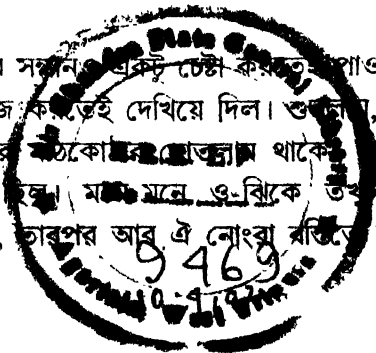
দরকার ছিলনা। তবু কীরকম কুমতি হল। অনেকসময় যেমন আমাদের ডানদিকে যাবার দরকার, তবু বাঁদিকের রাস্তায় হাঁটি, অথবা টুথপেস্ট কিনতে বেরিয়ে সেটা না-কিনে সেই পয়সাতেই এক দোয়াত কালি কিনে আনি, সেইরকমই কোন যুক্তিতে সম্ভবত ভাবলাম, মোক্ষদাকে একবার দেখে যাই।

পানওলা হাঁক দিয়ে বলল, 'ছেদীলাল, এ ছেদীলাল, বাবুকে উপরে মোকসদার কুঠিতে লিয়ে যা।'— একটা বারো কি তেরো বছরের ন্যাংচা ছেলে আমাকে বলল, আসুন!

জিজ্ঞেস করলাম, 'মায়ের দয়া কবে থেকে হয়েছে রে ওর।'

— দু-চারদিন। আপনি এখেনটায় জুতো খুলে আসুন। ওসব জায়গায় জুতো পরে যেতে নেই।

আমি বললাম, 'থাম থাম, তোকে আর উপদেশ দিতে হবেনা। আমার এটা রুবারের জুতো!'

নড়বড়ে হাতলহীন কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে চকিতে একটা কথা মনে পড়ল। অপ্রাসঙ্গিক যদিও। মনে পড়ল, দয়া আর কৃপা শব্দদুটির মানে প্রায় এক জানতাম, কিন্তু আসলে ও দুটো কত আলাদা। মা ষষ্ঠীর কৃপা আর মা শীতলার দয়া, এই দুই কথায় জমা-খরচের দুটো দিকই বুঝিয়ে দেয়।

দরজার কাছেই বসে ছিল, মুখ ফেরাতেই চিনতে পারলাম মোক্ষদাকে, মুখে খুব বেশি গোটা ওঠেনি। আমাকে দেখে তাড়াতাড়িতে বেরিয়ে আসতে যেতেই পাশের ঘর থেকে একজন বলল, 'ও কি মাসী, বেবিয়োনা, বেরিয়োনা, শেষে কি বাড়িসুদ্ধ সবাইকেই মারবে নাকি?' আমিও বললাম, 'থাক, থাক।'

দূর থেকেই উঁকি দিলাম ঘরের মধ্যে। দরজার কাছে মাথা রেখে আরেকটি যুবতী মেয়ে শুয়ে আছে, তার পাশে একটি আট-নবছরের বাচ্চা। মোক্ষদা প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, 'আমার কিছুই হয়নি। দাদাবাবু, আমার মেয়ে বগলারই হয়েছে বড্ড বেশি গো। আমার সোমত্থ রোজগেরে মেয়ে।'

বগলা একটু নড়ে-চড়ে উঠল। তারপর একেবারে উঠে বসে বলল, 'মা একটা বিড়ি দে তো।'

— না, এখন খেতে নেই।

— একটা দে।

— বলছি তো, কটা দিন বিড়ি খেতে নেই।

— দে-না, তক্ক করিস কেন?

একটা বিড়ি মুখে দিল, তারপর পরপর কটা কাঠি ভেঙে আগুন ধরাল। মেয়েটার সারা মুখ ফোস্কায় ভরে গেছে। গলার আওয়াজটা তবু অহংকারী। বস্তিতে

ঢুকেই একটু-একটু সন্দেহ করেছিলাম, এখন এই মেয়েটির চোখ, এলো চুল, কাপড় পরার ধরন দেখেই মনে হল, ও নিশ্চয়ই মায়ের মতো ঝি-গিরি করেনা। ওর পেশা ওকে অহংকারী করেছে।

মেয়েটার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই আমার বুকটা ধক্ করে উঠল। আমি ডাক্তার নই, কিছুই-না, কোন অলৌকিক ক্ষমতাও নেই, জ্যোতিষীও জানিনা, তবু, মেয়েটার মুখ দেখে একমুহূর্তে আমার মনে হল, ও আর বাঁচবেনা। মাত্র দু-একদিন। মৃত্যু ওর কপালে তারিখ লিখে গেছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'ডাক্তার দেখিয়েছ ?'

— না গো। আমাদের কি সে ক্ষমতা আছে। তাছাড়া, মায়ের দয়ায় ডাক্তার কী চিকিচ্ছে করবে ? বাবাঠাকুর এসে মায়ের চন্নমের্ত দিয়ে গেছে আর ঝেড়ে দিয়ে গেছে।

— টিকে নিয়েছিলে ?

— বাবাঠাকুরের দয়ায় ওসব আমাদের লাগেনা।

বস্তুত কোনরকম উপদেশ ঝাড়ার ইচ্ছে আমার ছিলনা। চলে আসবার আগে তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'ও বাচ্চাটারও কি হয়েছে নাকি ?'

— না, ওর হাম হয়েছে।

— কী করে বুঝলে ?

—আমাদের এখানে কোন বাচ্চা ছেলেমেয়ের কখনও মায়ের দয়া হয়নি। বাবাঠাকুর বলে গেছেন, ওর কোন ভয় নেই।

আমি বললাম, 'তা বটে। অনেক পুণ্য করলে মায়ের দয়া পাওয়া যায়। ও আর এমন কী করেছে যে, মা ওকে দয়া করবেন।'

বগলা বলল, 'মা, বাবুর কাছ থেকে পাঁচটা টাকা চেয়ে নে। তোর মাইনের আগাম। বাবাঠাকুরকে আবার পাঁচ সিকে দিতে হবে পুজোর জন্য।'

মোক্ষদা বলল, 'কোন মুখে চাইব ? এই তো এ মাসের মাইনে নেবার দুদিন পরেই জ্বরে পড়লাম। আমার কি আরকিছু পাওনা হয়েছে ?'

বগলা আমার উপস্থিতির একটুও সম্মান না-দিয়ে গলায় ঝংকাব তুলে বলল, 'তুই চা-না, বাবুদের কাছে দু-পাঁচ টাকার আবার দাম কী !'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল প্রায়, 'টাকা তো সঙ্গে আনিনি !' কেননা যে দুদিন পরেই মারা যাবে তার জন্য টাকা খরচ করে কী লাভ ? তবু পাঁচটা টাকা আমি পকেট থেকে বার করে চৌকাঠে ছুঁড়ে দিলাম; কারণ, একটা যুক্তি সেই মুহূর্তেই মাথায় এল। মনে পড়ল, কালীপুজোর সময় যখন বাজি পোড়াই — তখন তো জেনেশুনেই টাকাগুলো খরচ করি যে, একটু পরেই

বাজিগুলো আর থাকবেনা। এ-ও না-হয় একরকম বাজি পোড়ানো !

মোক্ষদা কুণ্ঠিতমুখে টাকাটা নিতে যাচ্ছিল, তার আগেই বগলা ছোঁ মেরে তুলে নিল। যেন, ও বুঝে নিয়েছে টাকাটা ওরই প্রাপ্য। আমি মৃত্যুর কথা ভেবেই দিয়েছি। কী জানি, আমি যে বুঝতে পেরেছি বগলা আর বাঁচবেনা — সেটা বগলাও বুঝতে পেরেছিল কিনা !

সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে আমি ছেদীলালের দুটি বাহুই ওর অলক্ষ্যে দেখে নিলাম। ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাহুতে যে গোল-গোল দাগগুলো আছে — ছেদীলালের তা নেই। যাক, একটা সমস্যা মিটল। আমার ধারণা ছিল, দুনিয়ার সব লোকেরই হাতে ঐ বিচ্ছিরি পেঁচার চোখের মতো দাগগুলো আছে।

এক প্যাকেট সিগারেট কিনে জানতে পারলাম, ঐ পানওলাই মাঠকোঠাটা এবং আদ্দেক বস্তির মালিক। জিজ্ঞেস করলাম, 'টিকে দেবার ব্যবস্থা করনি কেন ? বস্তি যে এবার তোমার উজাড় হয়ে যাবে ! টিকে তো বিনে পয়সায় দেয়।'

— খবর দিলেও আসেনা।

— গিয়ে তো নিয়ে আসতে পার ?

— কী হবে বাবু ! একবার এই বস্তিতে একজন ডাক্তার এসেছিল। তার পরদিনই রুগীটা মারা যায় ! ডাক্তার চার টাকা ফিস ভি নিল, রুগীও নিল। আর আমরা এখানে ডাক্তার বোলাইনা। আমার বউয়েরও তো মায়ের দয়া হয়েছে, বাবাঠাকুর দেখছেন।

— বাবাঠাকুরের চিকিৎসায় বুঝি কেউ মরেনা ?

— যার যখন নিয়তি টানে। কালকেই তো দুটো গেছে।

— বাবাঠাকুর থাকেন কোথায় ?

— ঐ তো খালপারে মন্দির। আর আধাঘণ্টা বাদেই বাবাঠাকুর এসে যাবেন। আজ সক্কলে আলাদা করে পুজো দেব।

আমার হাতে অনেক কাজ ছিল। আর ওখানে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয়না। বরং অন্য জায়গায় গিয়ে নতুন ঝি-ঠাকুরের খোঁজ নেওয়া উচিত। কিন্তু বাবাঠাকুরটির সঙ্গে একবার দেখা করার অদম্য ইচ্ছে হল। এদের দেখলাম কারুরই কোন ক্ষোভ নেই, বাবাঠাকুরের ওপর অসীম নির্ভরতা। সুতরাং একবার সেই মহাপ্রভুকে চাক্ষুষ না-দেখলে চলেনা। বললাম, 'আমি ঐ চায়ের দোকানে আছি, বাবাঠাকুর এলে ছেদীলালকে দিয়ে কষ্ট করে আমায় একবার ডেকে পাঠাবে ? আমি ওঁকে একবার প্রণাম করে যাব।'

বড় রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানে বসলাম। আমার টিকে নেওয়া আছে, সুতরাং আমার ভয় নেই, তাছাড়া চা তৈরি হয় গরম জলে। খবরের কাগজটা

টেনে নিয়ে আমি ভিয়েৎনাম এবং কঙ্গোর সমস্যায় খুবই বিচলিত এবং মগ্ন হয়ে পড়লাম।

খানিকটা বাদে ছেদীলালের সঙ্গে বাবাঠাকুর নিজেই এলেন। মাটির ভাঁড়ে চা খেতে তাঁর আপত্তি নেই, সুতরাং দুজনে দুভাঁড় চা নিয়ে বসলাম। লোকটির চেহারায় ব্যক্তিত্ব আছে। রং কালো কিন্তু বেশ লম্বা। গলার আওয়াজ কর্কশ, খুব গভীরভাবে তাকাতে জানেন। সারা কপালে চন্দনের ছাপ, বুকেপিঠেও আছে কিনা বুঝতে পারলামনা; কারণ শীতের জন্যই বোধহয়, ফুলহাতা সোয়েটার পরে তার ওপর নামাবলি জড়িয়েছেন। বললাম, 'আপনাকে ওরা সবাই খুব মানে দেখছি।'

— আমাকে মানেনা। ঠাকুর-দেবতাকে মানে।

— তা আপনি ওদের টিকে নিতে বারণ করেছেন কেন?

— দেখুন, একটা কথা বলি। টিকে নিলে কিংবা ডাক্তারি ওষুধ খেলেই যে সব লোক বাঁচবে এ জোর করে বলতে পারেন? আপনাদের ও চিকিৎসা করলেও অনেক লোক বাঁচে অনেক লোক মরে। চরণামৃত খেয়েও অনেক লোক মরে আবার অনেক লোক বেঁচেও যায়। সুতরাং কোনটা ঠিক আপনি তা কী করে বলবেন?

— তা ঠিক। তবে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে জানি, যেখানকার লোকেরা চরণামৃত একেবারেই খায়না, পায়না আরকি, বসন্ত রোগেও কেউ মরেনা।

— কথায়-কথায় পৃথিবীর কথা তুলবেননা। আর কোন দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের তুলনা চলে? কোথায় এমন —

— থাক, থাক। আপনি ঠিকই বলছেন। কিন্তু আমি বলছিলাম টিকের কথা। ওটা তো আর কোন ওষুধ নয়। ওটা হচ্ছে, মানে, কী বলে, অসুখটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা। ঠাণ্ডা না-লাগাবার জন্য যেমন আপনি গলায় মাফলার জড়ান। অসুখটা হবার পর তো চিকিৎসার কথা। তার আগে অসুখটা না-হবার ব্যবস্থা করাই কি উচিতনা?

— ন্যায্য কথা। আমি কি বারণ করেছি? আমি মশাই আপনাদের ওসব টিকে-ফিকে বিশ্বাস করিনা। কিন্তু ওরা যদি নিজেই নেয়, তবে আমি বারণ করবার কে? কিন্তু দেয় কে? আপনি কি ভেবেছেন কলকাতার সব বস্তিতে করপোরেশনের লোক এসে টিকে দিয়ে যায়? মোটেইনা। ওসব আপনাদের জন্য। এদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে টিকে দেবার গরজ কারুর নেই! টিকে দিলেও যে বাঁচবে তার অবশ্য কোন মানে নেই, অন্য অসুখে মরবে। কর্মফল যাবে কোথায়!

— মরতে তো আপনাকেও হবে। নাকি আপনার মরার ভয় নেই?

— কাজ ফুরোলেই মরব। তার আগেওনা, পরেওনা।

— আপনার মনের জোর আছে দেখছি। আপনি যে এসব পক্সের রুগীদের ঘাঁটাঘাঁটি করছেন, আপনার ভয় করেনা ?

— ভয় করলেই ভয়। কে কিসে মরবে তা তো কপালে লেখা হয়েই আছে !

— আপনি হাত দেখতে জানেন ?

— না। আমরা পূজারী ব্রাহ্মণ। সাতপুরুষ ধরে কলকাতা শহরে মা শীতলার পূজারী। ওসব হাত দেখার কাজ আমরা করিনা। কেন হঠাৎ ?

— আমি একটু-একটু জানি। দিন আপনার আয়ু বলে দিচ্ছি।

— আমি ভদ্রলোকের ডান হাতটা টেনে নিলাম। তারপর প্রায় জোর করেই পুরো হাত-ঢাকা সোয়েটারটা ঠেলে অনেকখানি ওপরে তুলে দিলাম। হাতে সদ্য টিকে নেবার দাগ। হয়তো গতকালই নিয়েছেন, একটু-একটু পেকে উঠেছে। আমি চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সত্যিই আপনি গুণী লোক, পায়ের ধুলো দিন।'

বিষম অপ্রস্তুতভাবে বাবাঠাকুর বললেন, 'কী করব বলুন। আমি নিজেও মরতে চাইনা, ওদেরও মারতে চাইনা। কিন্তু ওরা যে মরতেই চায়।'

৬

নববর্ষের রাত্রে আমরা কয়েকজন শ্মশানে ছিলাম। না, মড়া পোড়াতে যাইনি। কোন উদ্দেশ্য ছিলনা। এমনিই।

গত বৎসরটাকে শ্মশানে পুড়িয়ে এলাম — এমন ছেলেমানুষী ধারণাও ছিলনা আমাদের। সারা রাত ঘুরতে-ঘুরতে কখন শ্মশানে পৌঁছে গেছি জানিনা। কেউ কোন পরামর্শও করিনি। হয়তো, শ্মশানের পাশে ভোর দেখতে ভালো লাগে, এমন গোপন অন্তর্নিহিত ইচ্ছে ছিল।

সেইখানে, ঐ জীবন্ত মেয়েটিকে দেখতে পাই। আলো ফোটেনি, কিন্তু গরম জিলিপি ভাজা শুরু হয়ে গেছে। 'জয় হোক মহারাজ', বলে শিবপ্রতিম সাধু, ভিখারি হয়ে দাঁড়াল। পাশে ষণ্ড। শ্মশানবন্ধুরা গাঁজা খেয়ে চোখ লাল করে সিনেমার গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে। স্নান সেরে শীতে বাঁশপাতার মতো কাঁপতে-কাঁপতে ছুটে যাচ্ছে কয়েকজন। একজন চিৎকার করে গেয়ে উঠল 'যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে হয় আমার প্রাণ রে —'। বাঙলা দেশের ভোরবেলার একমাত্র গান।

অনেকক্ষণ থেকেই একটা দুর্বোধ্য শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। অন্ধকারে শব্দের

মানেও ভালো করে বোঝা যায়না। একটু আলো ফুটলে যেন মনে হল একটি কচি মেয়ের গলা, আর একটি বৃদ্ধের। দুটোই খুব অসহায় ! আশেপাশে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলামনা। নতুন বছরের প্রথম দিনের সূর্যটাও ভালো করে উঠতে পারলনা, এমন কুয়াশা।

জিলিপির পর চা। চিনির বদলে আখের গুড়ের তৈরি হলেও অমৃতের মতন স্বাদ। কেননা, ঐ ভাঁড়ের সোঁদা গন্ধ। কেননা অমন শীতে শুকনো-হয়ে-আসা ঠোঁটে আগুন-আগুন গরম তাপ। বিশ্ববিখ্যাত হোটেলগুলিতে সারারাতব্যাপী যে নববর্ষ উৎসব হল, তার চেয়ে আমাদের উপভোগ কম ছিলনা, ঐ শেষরাত্রির ভাঁড়ের চায়ে।

'আপনাদের মড়া পুড়েছে ?' একজন জিজ্ঞেস করল আমাদের।

— না, একটু বাকি আছে।

— কতক্ষণ ?

— ঠিক জানিনা। কখন মরবে তা তো বুঝতে পারছিনা।

লোকটি বুঝতে না-পেরে বিরক্ত মুখে চলে গেল।

সিগারেট কিনতে চায়ের দোকানের উত্তাপ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে সেই দৃশ্যটা দেখতে পেলাম। একটি আট-নবছরের মেয়ে। লোকটির সারা কপালে চন্দনের ছাপ, স্নান করার পর তখনও ভিজে কাপড়, অসম্ভব ভয়ার্ত মুখ। মেয়েটির দিকে হাত জোড় করে সে বলছে, 'হামাকে ছেড়ে দে, হামাকে ছেড়ে দে।' মেয়েটি খুঁ-খুঁ করে নিচু গলায় কাঁদছে।

দুষ্কৃতির গন্ধ পেয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। একটু ভারিক্কি গলায় আমরা প্রশ্ন করলম, 'কী ব্যাপার ?'

লোকটি ব্যাকুলভাবে আমাদের দিকে ফিরে বলল, 'বাবু হামাকে রকসা করুন। হামি বে-ঝঞ্ঝাট মানুষ।'

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে দেখলাম। কী অসাধারণ সুন্দর মেয়েটা। এমন রূপ, যার দিকে পাপী থেকে সাধু যে কেউ একবার তাকালে আর চোখ ফেরাতে পারেনা। যেন এইমাত্র ভোরবেলা একটি ফুল ফুটে উঠল। একমাথা ঝাঁকড়া চুল, ফেটে পড়ছে রং, ঝরনার জলের মতো টলটলে দুটো কালো চোখ। সামান্য একটা সুতির জামা পরে শীতে কাঁপছে, শীর্ণ হাতের মুঠিতে চেপে ধরেছে লোকটির কাপড়।

এমন দৃশ্য চট করে চোখে পড়েনা। আমরা ঘটনাটা জানবার জন্য তখুনি খুব ব্যগ্র হয়ে পড়লাম। অবাঙালি বৃদ্ধটি বলল যে, সে ভোর চারটের সময় রোজ গঙ্গাস্নান করতে আসে। আজও আসছিল, এমনসময় দেখতে পেল পাশে-পাশে ঐ মেয়েটি আসছে। সেই চিৎপুর থেকে সঙ্গে-সঙ্গে এল একটাও কথা না-বলে।

তারপর সে যখন কালী মাঈজির সেবার জন্য বাতাসা কিনতে দাঁড়িয়েছিল, মেয়েটিও তখন দাঁড়িয়েছে। অমন লছমির মতো সুন্দরী মেয়েটিকে দেখে তার মায়া হয়েছিল, সে খোঁকিকে নাম জিজ্ঞেস করেছিল। মেয়েটি কোন উত্তর দেয়নি, শুধু শীতে কেঁপেছে। সে তখন দুটো মেঠাই কিনে দিয়েছে ওকে। তারপর স্নান সেরে মন্দিরে এসে মাকে প্রণাম করে শিবের মাথায় জল দিয়ে এসে দেখে মেয়েটি তখনও দাঁড়িয়ে। ওকে দেখামাত্র মেয়েটা এসে ওর পাশে আবার চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। বৃদ্ধটি তখন মেয়েটার থুতনি ধরে একটু আদর করে বলেছে, 'খোঁকি আপনা বাবা-মার কাছে যাও, একেলা ঘুরসো কেন ?' মেয়েটি তখনও কোন উত্তর দেয়নি। তখন তার মনে হয়েছে, আ-হা, মেয়েটা বুঝি বাপ-মা হারা। নইলে কেউ শীতের রাতে ছেড়ে দেয়। সে তখন দয়া করে মেয়েটাকে একটা চৌয়ান্নি দিয়েছে। কিন্তু, তারপর থেকে মেয়েটা আর তার সঙ্গ ছাড়ছেনা। 'হামার কী বিপদ বাবু, হামি একে নিয়ে কোথায় যাব ?'

বৃদ্ধের কথা শুনতে-শুনতে ভয়ে আমার বুক কেঁপে উঠছিল। আমার মনে হচ্ছিল, তখুনি আমার ও জায়গা ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত। হারানো ছেলেমেয়েদের মুখ দেখতে আমার বিষম অস্বস্তি হয়। রাস্তায় দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে, একজিবিশনে — কোথাও কোন হারানো ছেলেমেয়ের কথা শুনলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। ঐ হারানো মুখ আমি দেখতে চাইনা। তাহলে, সারাদিন ঐ মুখ আমার মনে গেঁথে থাকে, কিছুতেই ভুলতে পারিনা। ঐসব হারানো ছেলেমেয়েরা বাড়িতে সত্যিই কখনো আবার পৌঁছয় কিনা জানিনা। অন্তত আমাদের সাধ্য নেই ওদের ফিরিয়ে দেবার। খবরের কাগজের হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশও কখনো পড়িনা আমি। কাগজে শুধু নিরুদ্দেশ-সংবাদই থাকে — কখনো ফিরে আসার খবর থাকেনা। মাকে মৃত্যুশয্যায় ফেলে বাবা কিংবা দিদিমার অন্নজল ত্যাগ করিয়ে ঐ যারা নিরুদ্দেশ হয়, তারা আবার সত্যিই কোনদিনই ফিরে আসে কিনা তা না-জানতে পেরে এমন তীব্র অস্বস্তি হয় আমার। তাব চেয়ে ওসব কথা না-জানাই ভালো।

কিন্তু এখানে আর উপায় নেই। এখানে মেয়েটির মুখ দেখে ফেলেছি। অমন এক-বিশ্বের মায়া-মাখানো মুখ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'খুকি, তোমার নাম কী ?'

মেয়েটি একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ আঁ-আঁ শব্দ করল। মেয়েটি কালা এবং বোবা। বিপন্নভাবে দৃঢ়মুষ্টিতে চেপে আছে লোকটার কাপড়। ভোরবেলার হাওয়ায়, আমাদের তখন খুবই শীতের কাঁপুনি লাগার কথা — কিন্তু মেয়েটার গায়ে শুধু একটা পাতলা জামা দেখে আমরা শীত অনুভব করতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের কারুর গায়ে আলোয়ান ছিলনা। মেয়েটির জন্য কিছু-একটা করা

দরকার। কিন্তু কী করব আমরা বুঝতে পারলামনা। ব্যাকুল চোখে তাকিয়ে মেয়েটি চাইছে একটা আশ্রয়, একটা ঘরের ভিতরের তাপ।

বৃদ্ধটি বলল, 'হামিকে বাঁচান বাবু। এ আমার কী বিপদ হল। আভি গিয়ে মালিকের দুকান না-খুললে মালিক খেঁচাখেঁচি করবে। লিকিন, একে জোর করে ছাড়িয়ে কী করে যাই সক্কালবেলা, একী মায়া ভগবানের।'

আমরা বললাম, 'এ তো তোমার সঙ্গেই যেতে চায়।'

'না, বাবু, হামি একলা মানুষ, দুকানঘরে মাথা গুঁজরে থাকি। একে কোথায় নিয়ে যাব?' লোকটার গলায় নিষ্ঠুরতা ছিলনা, ছিল অসহায়তা।

— যাও-না, মেয়ের মতো মানুষ করবে।

— এ বাঙালির মেয়েকে নিয়ে কোথা যাব।

— বোবা আবার বাঙালি কী?

— না বাবু, হামার উপায় নেই।

তারপর সে মেয়েটির দিকে ফিরে কাকুতিভরা গলায় বললে, 'হামাকে দয়া কর মা। ছেড়ে দে। এই-নে আর একটা চৌয়ান্নি। সক্কালবেলা হামাকে অধর্ম করাসনি।'

মেয়েটির জন্য আমরাও অনুভব করছিলাম। কিন্তু আমাদেরও ঔদার্য এত বেশি নয় যে, একে নিজের দায়িত্বে সঙ্গে নিতে পারি, বা নিজেদেব বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। রাস্তায় তখন কিছু লোক চলতে শুরু করেছে। কয়েকজন কৌতূহলী হয়ে উঁকি মেরে দেখে যেতে লাগল। 'আহা, এমন ফুটফুটে মেয়েটা কাদের গো, হারিয়ে গেছে বুঝি?'

আমরা জনে-জনে অনুনয় করতে লাগলাম, কেউ মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায় কিনা। কেউ রাজি নয়। মায়া সবারই আছে — কিন্তু আজকাল আর দয়ামায়ার আবেগে সামর্থ্যচিন্তা ছাড়িয়ে যায়না।

অত ভোরবেলা মেয়েটির জন্যে কী করা সম্ভব আমরা ভেবেই পেলামনা। বিশেষত যে মেয়ে কোন কথা বলতে পারেনা। বাবা-মার ঠিকানা খুঁজে বার করার উপায় নেই — চেহারা দেখলে মেয়েটিকে ভালো ঘরেরই মনে হয়। অব্যক্তভাবে আমরা সকলেই এ কথা ভাবলাম যে এবার আমাদেরও আস্তে-আস্তে সরে পড়তে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। মহত্ত্ব দেখাতে গিয়ে কি এই মেয়েটার বোঝা আমাদের ঘাড়ে চেপে যাবে? মেয়েটি কী বুঝলে জানিনা, সে বৃদ্ধটির কাপড় ছেড়ে হঠাৎ এসে আমার হাত চেপে ধরল। বোবা হলে কি মনের ভাষা বুঝতে পারা যায়? কী ঠাণ্ডা আর নরম হাত, ঐ হাত ছাড়িয়ে যাবার শক্তি পৃথিবীর কারুর নেই বোধহয়। বুঝতে পারলাম মাড়োয়ারিটি কেন এতক্ষণ এমন অসহায় বোধ করছিল।

আমার হাত ধরামাত্র তখুনি আমার মনে পড়ল পুলিশের কথা। পুলিশের হাতে তো হারানো ছেলেমেয়েদের সঁপে দেওয়া যায়। তাহলে তো মেয়েটিও বাঁচবে, বাঁচবে আমাদেরও বিবেক নামক গোলমেলে পদার্থটি।

মেয়েটিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললাম আমাদের সঙ্গে, ওর ভাষা তো জানিনা আমরা কেউ। মেয়েটা অনবরত গলা দিয়ে খুঁ-খুঁ করে কান্নার মতো আওয়াজ করছে। ওর চুলের মধ্যে হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'ভয় নেই, ভয় নেই।' কী বুঝল ও-ই জানে।

থানা পর্যন্ত যেতে হলনা। কাছেই একটি কনস্টেবলকে দেখতে পেলাম। হয়তো সে সারারাত এই শীতে জেগে পাহারা দিচ্ছে। সারা মুখে মাথায় ফেট্টি বাঁধা, কান জড়ানো, শুধু চোখদুটি আর নাকের আগাটুকু খোলা। আমরা সদলে এর সামনে দাঁড়ালাম। সারা রাত জেগে যারা একলা পাহারা দেয় — তারা সবসময় কী ভাবে, এ সম্বন্ধে আমার অনেক দিনেরই কৌতূহল। কী করে ওরা ঘুম তাড়ায়? কার যেন উপন্যাসে পড়েছিলাম, সম্ভবত দুমার, বাস্তিলের নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে কারাকক্ষে একজন কয়েদী পাগল হয়ে যাবার হাত থেকে নিজেকে কীভাবে রক্ষা করেছিল, কীভাবে সবসময় নিজেকে ব্যস্ত রাখত। সে ছটা আলপিন ছুঁড়ে দিয়েছিল সেই অন্ধকার ঘরে — তারপর, দিনের পর দিন ব্যগ্র হয়ে খুঁজত সেইগুলো অন্ধকারে, কয়েক মাস পর খুঁজে পেলে, সবকটা আলপিন আবার ছড়িয়ে দিত; আবার খোঁজা। কলকাতার একটি পুলিস কনস্টেবল একদিন মধ্যরাত্রে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, সেদিন কী তিথি। হয়তো সে প্রত্যেক রাত্রেই সেদিনের তিথি নিয়ে গণনা-গবেষণা, নিজের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে কাটাত। কিন্তু, আজ যে পুলিশটির দেখা পেলাম, এর মতো দার্শনিক পুলিশ আমি কখনো দেখিনি। সে অল্পক্ষণেই আমাদের চোখ খুলে দিল।

তার সামনে পুরো ঘটনাটি ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে বিবৃত করে আমরা তাকে অনুরোধ করলাম, মেয়েটিকে থানায় নিয়ে যেতে। পুলিসটি একটি কথাও বললনা। সোজা চোখ মেলে তাকিয়ে রইল। যেন একটি পাথরের মূর্তি। আমরা রেগে গেলাম। কড়া গলায় বললাম, 'কি, কথা কানে যাচ্ছেনা?' লোকটি ধীরে-সুস্থে কান থেকে তিন ফেট্টি মাফলার খুলে ফেলে বলল, 'আবার বলুন!' অর্থাৎ সত্যিই তার কানে কথা যায়নি। এবং সে বাঙালি। গোড়া থেকে আবার বলতে হল। পুলিশটি একটুও বিচলিত না-হয়ে ঠাণ্ডা গলায় যেন একটু ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'আপনারা তো যা করার করেছেন, এবার বাড়ি যান।'

— কেন? ওকে থানায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিনা আমরা দেখতে চাই।

— কোন লাভ নেই।

— তার মানে?

— কী দরকার থানায় নিয়ে গিয়ে?

— আপনাকে তা কে বিচার করতে বলেছে? নিয়ে চলুন।

লোকটি মাথা থেকে আরেকটা ফেট্টি খুলে ফেলল। তারপর আগের চেয়েও নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'কেন রাগ করছেন?'

আমরা লোকটির অদ্ভুত ব্যবহার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মেয়েটা শীতে কাঁপছে, সেদিকে ও ভ্রূক্ষেপও করছেনা। অন্তত থানায় গেলে ঘরের গরমটুকু পেত। আমরা বললাম, 'আপনি ওকে নিয়ে যাবেন কিনা?'

লোকটি এবার চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, 'কোন লাভ নেই। আমি সাতদিন ধরে ওকে দেখছি — ছুটে-ছুটে যে-কোন লোকের সঙ্গে যেতে চায়। কেউ নেয়না। ও হারিয়ে যায়নি। বাপ-মা নিশ্চয়ই ওকে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিয়েছে। ও আস্তে-আস্তে ভিখিরি হয়ে যাবে — বোবা বলে বরং ভিক্ষে বেশিই পাবে — তা ছাড়া দেখতেও সুন্দর। ওর চলে যাবে।'

তারপর আমাদের দিকে চোখ ফেলে আবার বলল, 'আপনারা ওকে দেখে এত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন কেন? ওর বয়সী ভিখিরি আগে দেখেননি? আজ হঠাৎ আপনাদের মায়া উথলে উঠল কেন? কিন্তু যাদের চোখে দেখতে পাননি দেশে তো এরকম হাজার-হাজার ভিখিরি আছে. ওকে আজ চোখে দেখলেন বলে, আর যারা...

আমি সঙ্গে-সঙ্গে এক ঝটকায় মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে নিলাম। আমরা বন্ধুরা চোখাচোখি করলাম। আজ হারায়নি, মেয়েটা তাহলে আগেই হারিয়ে গেছে! ভোরের মায়া কেটে যাচ্ছে, আমরা এবার দিনেরবেলার বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন কাজের মানুষ হয়ে পড়ি।

বোবারা মনের ভাষা ঠিকই বোঝে। মেয়েটি আমাদের বুঝতে পেরে ওর সেই দুর্বোধ্য গলায় কেঁদে উঠল। আমরা কেউ ঘড়ি দেখতে লাগলাম মনোযোগ দিয়ে, কেউ পকেটে হাত ঢুকিয়ে মন নিবিষ্ট করলাম — যেন মনটা ঢুকে গেছে পকেটে, কেউ তাকালাম আকাশের দিকে যাতে মেয়েটার সঙ্গে আমাদের আর চোখাচোখি না-হয়। মেয়েটা একটা পাগলা ইঞ্জিনের মতো কর্কশ চিৎকারে কাঁদতে-কাঁদতে ছুটে গেল হঠাৎ। আমরা ওকে দূরের কুয়াশায় মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চলে এলাম বড় রাস্তায়। শহর জেগে উঠেছে পুরোপুরি। এবার আমরা বন্ধুরা এক-একজন এক-একদিকে চলে যাব। কাল দিনেরবেলায় আমরা যেরকম মানুষ ছিলাম, আজও সেইরকমই রয়ে গেলাম। মাঝখানে এই শেষরাত্তিরের ঘটনাটুকু কেউ আর কখনও আলোচনা করবনা।

৭

মাস্টারমশাই ছাত্রীকে পড়াচ্ছিলেন, এমন সময় দপ করে আলো নিবে গেল। ছাত্রী খাতায় নোট লিখছিল, মাস্টারমশাই ডিক্টেট করছিলেন, আলো নিবতেই মাস্টারমশাই অকস্মাৎ চুপ করে গেলেন। ছাত্রী মুখ তুলে জানলার বাইরে দেখল, যতদূর দেখা যায় অন্ধকার, এমনকী আকাশের চন্দ্র-নক্ষত্রসমাজও বিদ্যুৎ-সংযম পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করছে। পরবর্তী ঘটনা বিবৃতির আগে, দু-একটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা যায়।

আলোটা দপ করে নিবে গেল। এই বাক্যটি দিয়েই অধিকাংশ সময় আলো নিবে যাবার বর্ণনা হয়। যদিও, যখন আলো নেবে, তখন দপ করে কেন, কোন-রকম শব্দই আমি কখনও শুনিনি। বৈদ্যুতিক আলো নেবে নিঃশব্দে, কোম্পানির কোন নোটিশও না-পেয়ে। কোন শব্দ হয়না, তবু বর্ণনার সময় 'দপ করে' শব্দটা ব্যবহার করতে হয়। অর্থাৎ বিদ্যুতে পুরো অভ্যস্ত হইনি এখনও, আমাদের মনে আছে আজও প্রদীপ-যুগের স্মৃতি। প্রদীপের শিখা হঠাৎ হাওয়া লেগে কয়েকবার কেঁপে, সত্যিই একটা শব্দ করে, দপ্ করে নিবে যেত। এখন, মাথার ওপর চড়া বালব, বিনা ঝড়-জলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে নিবে যায়, তবু আমরা দপ্ করে প্রদীপ নিবে যাওয়ার শব্দ পাই। বিজলির অভাবে সারা শহর অকালে অন্ধকার হয়ে গেল, কিন্তু খবরের কাগজে তার বর্ণনা 'শহর নিষ্প্রদীপ'। মনে-মনে হয়তো আমরা প্রদীপের যুগে ফিরে যেতে চাই, গেলে ভালো হত, জীবন হয়তো আরেকটু সুস্থ হত রহস্যময় আলো-আঁধারিসহ ; এখন হয় কর্কশ চড়া আলো, অথবা ছিদ্রহীন অন্ধকার। যাক।

মাস্টারমশাই যুবা-পুরুষ, সদ্য এম. এ. পাশ, ভদ্র, লাজুক। ছাত্রীকে তিনি মন দিয়ে পড়াতেই আসেন, নবেল-নাটকের গৃহশিক্ষকদের মতো ছাত্রীর হৃদয় নিয়ে টানাটানি করার বিন্দুমাত্র প্রচেষ্টা নেই। ছাত্রীটি বি. এ. পরীক্ষা দেবে, নম্র, সুন্দরী, অপ্রগলভা। পড়াশুনো ছাড়া মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে আর যে দু-চারটি কথা হয়, সেগুলি সরল কৌতুকের, কেউ কারুর সীমান্ত আক্রমণ করেনা। বাড়ি, বুঝতেই পারা যায়, ধনী পরিবারের, এবং যুবতী কন্যার জন্য যুবক শিক্ষক নিয়োগ করা থেকে অনুমান করা যায়, আধুনিক, উদার, রুচিমান।

অমন হঠাৎ আলো নিবে যেতেই কিছুক্ষণ দুজনে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। একটু পরেই মাস্টারমশাই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন, এখন তাঁর কী করা উচিত কিছুতেই ঠিক করতে পারলেননা। এখন কি তাঁর চলে যাওয়া উচিত ?

কিন্তু, যদি পাঁচ মিনিট পরেই আলো জ্বলে ওঠে? তিনি এসেছেনও মাত্র দশ মিনিট আগে। হয়তো একটু অপেক্ষা করে দেখা উচিত, আলো জ্বলে ওঠে কিনা। অথচ অন্ধকার ঘরে একটি যুবতীর সঙ্গে বসে থাকা শোভন কিনা, বুঝতে পারলেন-না। অন্ধকার আমাদের দেশে ট্যাবু, আলাদা ঘরে যুবতী ছাত্রীকে নির্জনে পড়ানো যায়, কিন্তু অন্ধকারে বসে থাকা? ওঁর কি উচিত উঠে গিয়ে জানলার পাশে দাঁড়ানো, অথবা বাইরে গিয়ে, অথবা মেয়েটিকে বলা, তুমি একটু বাইরে যাও! কিন্তু মেয়েটি চুপ করে বসে আছে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছেনা, একটুও টের পাওয়া যাচ্ছেনা তার চোখের ভাষা। যখন দুজনের মনেই কোন পাপ নেই, তখন, শুধু এই অন্ধকারের জন্যেই মেয়েটিকে বলা, 'তুমি একটু বাইরে যাও' — যদি খুব বিশ্রী শোনায়, যদি মনে হয় মাস্টারমশায়ের মনে পাপ ছিল বলেই এ কথা বললেন! যদি ওঁরা ভাবেন, লোকটা লেখাপড়া শিখেও বর্বর, সংস্কৃতিহীন, নইলে অমন ইঙ্গিত করে? শুধু বসে থাকায় কী দোষ? আমার তো কোন দোষ নেই, মাস্টারমশাই ভাবলেন, কিন্তু এরকম-ভাবে বসে থাকাটাই দোষের কিনা আমি কী করে জানব? দারুণ অস্বস্তিতে লাজুক মাস্টারমশাইয়ের মাথা ঝিনঝিন্ করতে লাগল। চেয়ারে বসে থাকা খারাপ, না উঠে যাওয়া খারাপ দেখাবে, না মেয়েটিকে উঠে যেতে বলা খারাপ — এই সংশয়ে তিনি পাথর হয়ে গেলেন।

মেয়েটি চুপ করে বসে ছিল। একবার তার চেয়ার সরাবার শব্দ হল। চেয়ারটা সামনে টেনে আনার না পিছনে সরিয়ে নেওয়ার, তা বোঝা গেলনা। মেয়েটি কী ভাবছে কেউ জানেনা। হয়তো সে কৌতুকে হাসছে মিটিমিটি অথবা অনার্সের যে প্রশ্নটির নোট লিখছিল, সেটাই ভেবে যাচ্ছে মগ্ন হয়ে। মুখ দেখলেও মেয়েদের মনেব কথা জানা যায়না, আর অন্ধকারে? তাছাড়া, সমুদ্র ও অন্ধকার — এই দুই বিরাটের সামনে মেয়েরা সম্পূর্ণ বদলে যায়। অত্যন্ত চেনা মেয়েও যখন সমুদ্রে স্নান করতে নামে, তখন আর তাকে চেনা যায়না, যেন শরীরে খেলে যায় অসংখ্য বিদ্যুৎ, অসীম রহস্যের সঙ্গে অসীমা হয়ে খেলা করে। পুরুষরা জলে নামলেও পুরুষ, কিন্তু যে কোন মেয়ে জলে নেমেই জলকন্যা। তেমনি অন্ধকার। অন্ধকারে মেয়েরা কী ভাবে কেউ জানেনা। সব মেয়েকেই সকালবেলা একরকম দেখতে, বিকেলবেলা আরেকরকম, কিন্তু অন্ধকারে মেয়েদের কীরকম দেখায়, আরও রূপসী না হঠাৎ খুব কুৎসিত — আজ পর্যন্ত কোন পুরুষ জানতে পারেনি। মেয়েটি একবার শুধু বলল, উঃ কতক্ষণে যে —। মাস্টারমশাই একটা অস্ফুট শব্দ করলেন। আবার দুজনে চুপ।

মেয়েটির মা রেফ্রিজারেটারে পুডিং জমেছে কিনা দেখছিলেন, এমনসময়

আলো নিবে যেতেই তিনি ভাবলেন, শুধু কি এ বাড়ি? তৎক্ষণাৎ শুনতে পেলেন সমস্ত পাড়া জুড়ে অন্ধকারের মধ্যে একটা সোরগোল। আজকাল যা হয়েছে, কথা নেই বার্তা নেই — এই ভেবে তিনি গাড়িবারান্দার ওপরে এসে দাঁড়ালেন। উনি এখনো ফেরেননি, এর মধ্যে এসে যাওয়ার কথা, কিন্তু গাড়ি নিয়ে যদি বেরিয়ে পড়ে থাকেন, তবে এই অন্ধকার রাস্তায় গাড়ি চালানো! কিন্তু একটু বাদেই তিনি বুঝতে পারলেন, ঠিক স্বামীর জন্য চিন্তা করছেননা তিনি। অন্য একটা কী বিষয়ে যেন তিনি উদ্বিগ্ন, কিন্তু, সেটা মনে পড়ছেনা। কিছুতেই মনে আসছেনা। ও-হো। হঠাৎ মনে পড়ল, রেবা মাস্টারমশাইয়ের কাছে পড়ছে। সঙ্গে-সঙ্গেই আরকিছু না-ভেবে চলে এলেন রেবার ঘরের দিকে। দরজার কাছে এসেই কিন্তু থমকে দাঁড়ালেন। রেবার ঘরের দরজা খোলা, কিন্তু ভারি পরদা ঝুলছে। ভিতরে অন্ধকার, কোন শব্দ নেই। এ সময় কি তাঁর ঘরে ঢোকা উচিত? ওদের পড়বার সময় তিনি কোনদিন ও ঘরে ঢোকেননা, আজ অন্ধকার হয়েছে বলেই তিনি ঢুকলে কি ওরা ভাববেনা যে একটা কুৎসিত সন্দেহ এসেছে ওঁর মনে। ছি ছি! নিজের মেয়ে রেবাকে তিনি চেনেন, সেদিক দিয়ে কোনরকম দুশ্চিন্তা নেই। আর, যে পড়াতে আসে, সেই শুভেন্দু, গরিবের ছেলে হলেও বেশ ভদ্র, কোনদিন মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলেনা। অন্ধকার হয়েছে বলেই ঘরে ঢুকে পড়াটা সত্যি খুব খারাপ হবে। তবু মন থেকে অস্বস্তি গেলনা। তিনি তো খারাপ ভাবছেননা একটুও। কিন্তু চাকরবাকর কিংবা পাড়া-প্রতিবেশী যদি অন্ধকার ঘরে মাস্টার আর ছাত্রী বসে আছে এই নিয়ে আড়ালে হাসি-ঠাট্টা করে। ভাবতেও তাঁর শরীর জ্বলে গেল। একবার ভাবলেন, মেয়েকে বাইরে থেকে ডাকবেন। কিন্তু সেটা আরও খারাপ দেখাবে, ওরা ঠিক বুঝতে পারবে, ওরা কি ভাববেনা যে তাঁর মনটা নোংরা? একটা উপায় ছিল, যদি একটা মোমবাতি নিয়ে ওদের ঘরে দিয়ে আসা যেত! সেটা খারাপ দেখাতনা। কিন্তু, পরপর ক'দিনই আলো নিবছে, রোজই মোমবাতি কেনার কথা ভাবছেন, অথচ, দিনেরবেলা মনেই পড়েনা। এজন্য নিজের ওপরই রাগ হল তাঁর। কী করবেন, না ভাবতে পেরে একটু সরে ওখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। খানিকটা পর মাস্টারমশাই বললেন, আরেকটু দেখি, যদি না-জ্বলে, আমি তাহলে চলে যাব। মেয়েটি কোন উত্তর দিলনা। মাস্টারমশাই আবার বললেন, আমি এখানে সিগারেট খেলে তোমার অসুবিধা হবে?

— কী আশ্চর্য, এতক্ষণ ধরাননি কেন? এই কথা বলে ছাত্রীটি খিলখিল করে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

ফস্ করে দেশলাই জ্বলে উঠল। কাঠিটা যতক্ষণ জ্বলে, ধরে রেখে, তারপর

সেটা ফেলে দিলেন চায়ের প্লেটে। তারপর সিগারেট টানতে গিয়ে মাস্টারমশাই সবিস্ময়ে লক্ষ করলেন, তাঁর হাত কাঁপছে। আশ্চর্য তো, কোন কারণ নেই, তবু। তারপরই তিনি ভাবলেন, রেবাকে এই সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করায় এতক্ষণ ধরে হাসছে কেন?

৮

আমাদের বাড়িতে একটা বিড়াল আছে। বিড়াল ঠিক নয় বিড়ালী। বছর বারো-চোদ্দ বয়েস হবে। এই ক'বছরে ওর বাচ্চা হয়েছে আশি থেকে একশোটা। এই বাচ্চাগুলো গেল কোথায়? আমাদের বাড়িতে একটাও নেই।

বিড়াল অনেকে ভালোবাসেন, আবার অনেকেই বিড়াল দেখলে চেয়ার-টেবিলে উঠে নৃত্য করেন। ঐ আত্মসুখসর্বস্ব জন্তুটাকে দেখলে আগে আমারও ঘৃণা হত। ছেলেবেলায় গুলতি দিয়ে টিপ্ করা কিংবা কালীপুজোর সময় ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দেওয়া ছিল আমার প্রিয় খেলা।

আমাদের বিড়ালটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল অদ্ভুতভাবে। রাত্তির বেলা হঠাৎ দেখি ঘরে ঢুকে আছে। তখন খুবই বাচ্চা — আমরা সকলে তাড়া করছি বার করে দেবার জন্য, একটা সাদা উলের বলের মতো বিড়ালটা ছুটোছুটি করছিল। হঠাৎ একসময় ঘরের মাঝখানে এসে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাত দুখানা তুলে এমন জুলজুল্ করে তাকাল যে আমরা তৎক্ষণাৎ হেসে ফেললাম। মা বললেন, 'থাক, থাক্, আজ আর তাড়াতে হবেনা।' আমার মা বিড়াল পছন্দ করতেননা কখনও, কিন্তু বাচ্চাটা তারপর দু-তিনদিন মায়ের পায়ে-পায়ে ঘুরে অবলীলাক্রমে মায়ের আদর কেড়ে নিলে। বাবা ছিলেন অত্যন্ত গম্ভীর এবং রাশভারী। আমরা সবাই ভয় করতাম। মাঝে-মাঝে বাবা জলদকণ্ঠে বাচ্চাটাকে ধমকে দিতেন। কিন্তু তবুও বাচ্চাটা যেদিন নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে বাবার ব্যক্তিত্বকে অবজ্ঞা করে বাবার থালা থেকেই ইলিশ মাছের মুড়ো তুলে নিল — সেদিন আমরা যথার্থই খুশি হয়েছিলাম। সেই থেকে বিড়ালটা আমাদের বাড়িতে রয়ে গেছে।

এক বিখ্যাত ফরাসি লেখকের উপন্যাসে পড়েছিলাম, মানুষ জন্তু-জানোয়ার পোষে নিজের অহংকারে সুড়সুড়ি দেবার জন্য। প্রত্যেক মানুষই অন্য কোন একজনের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। যাকে সে খাওয়াবে, আদর করবে এবং দরকার হলে পদাঘাত করবে। আগে ক্রীতদাসের উপর এরকম করা যেত।

ক্রীতদাস-প্রথা উঠে যাবার পর অনেকে তখন স্ত্রীর উপর এই বীরত্ব ফলাতেন। এখন স্ত্রীরাও স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা জেনে গেছেন। বরং এখন পুরুষদেরই ক্রীতদাস বানাবার চেষ্টা তাঁদের। সুতরাং এখন জন্তু-জানোয়ারের ওপরই এই ইচ্ছেটা মেটানো যায়। অনেকে মহা আহ্লাদে কুকুর বেড়াল পাখি পোষে। কুকুর পোষা তো প্রায় সামাজিক প্রথার মতো দাঁড়িয়েছে।

আমার এক বন্ধুর পোষা বিড়ালের নাম শ্বেতকরবী। নাম শুনেই ভালোবাসার বহর বোঝা যায়। কৃষ্ণকলি, দধিমুখী, সুন্দরী এমন নামও শুনেছি। এক অপুত্রক দম্পতির তিনটি মার্জার সন্তান দেখেছি — যারা আমাদের চেয়ে অনেক ভালোভাবে খেয়ে-শুয়ে আছে।

আমাদের বিড়ালটা ঠিক পোষা নয়, বাড়িতে আছে এই পর্যন্ত। ওর নাম 'কুচু' — কেন বা কে এই নাম দিয়েছিল, মনে নেই। নিতান্ত সাধারণ চেহারা, শরীরটা সাদা, ল্যাজ এবং কানের কাছে কালো-খয়েরি। আমাদের গয়লার সঙ্গে ভাব জমিয়ে রোজ খানিকটা ফ্রি দুধের বরাদ্দ জুটিয়েছে, তাছাড়া চেয়ে-চিন্তে চুরি-জোচ্চুরি করে খেয়ে-খেয়ে বেশ কেঁদো শরীর হয়েছে। এক-একদিন রাত্রে চার-পাঁচটা বিড়ালের সঙ্গে মহা হল্লা করে গুণ্ডামি করে — তখন মারধোর দিই। বড়-বড় ইঁদুর ধরে — কিন্তু ইঁদুর ধরা আমরা মোটেই পছন্দ করিনা। ইঁদুর মারলেই সেই বীরত্ব আমাদের দেখাবার জন্য রক্তমাখা থ্যাঁৎলানো ইঁদুর মুখে করে ঘরের মধ্যে, কখনও-বা বিছানায় নিয়ে আসে। তখন ধরে মার দিই, মাথা নিচু করে মার খায়। এ-সবকিছুর পরও যখন নিতান্ত অকারণে কোন-কোন সময় এসে পায়ে মাথা ঘষে, তখন মন্দ লাগেনা। কিন্তু আমি কুচুকে নিয়ে কিছু লিখতে বসিনি, ওর বাচ্চাগুলো সম্বন্ধে কিছু লিখতে চাই।

বছরে দু-তিনবার ওর বাচ্চা হয় এবং কোনবারই দু-তিনটের কম নয়। এতদিনে ওর শাবকসংখ্যার শতপূর্তি হয়েছে নিশ্চয়ই। বাচ্চাগুলো বাড়িতে রাখিনি — রাখলে বাড়ির অবস্থা কী হত কল্পনাও করা যায়না। আমরা কবে উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে এ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত হত সুদৃঢ় বিড়াল-সমাজ! বাচ্চাগুলো কোথায়? কয়েকটির কথা জানি, বাকিগুলোর কথা জানতেও চাইনা।

যখন বাচ্চা হয়, তখন বিড়ালীর ক্রুদ্ধ এবং কাতর চোখ সত্যিকারের দেখার মতো। গর্ভিণী এখানে-সেখানে ঘোরে, ছটফট করে, নিরালা খোঁজে। বাচ্চা হবার পর বাঘিনীর মতো আগলে থাকে — তখন চোখ দেখলে হঠাৎ মনে হয় ওরও বুঝি একটা হৃদয় আছে, যা দুঃখিত কিংবা প্রীত কিংবা কৃতজ্ঞ হতে জানে।

বাচ্চাগুলি একটু বড় হলেই মায়ের টান কমে আসে। তারপর মা-টাই একদিন খাবারের ভাগ নিয়ে বাচ্চাদের সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেয়। আমাদের কুচুর

খানিকটা আত্মসম্মান জ্ঞান আছে। ওরই মুখের গ্রাস যখন কোন সন্তান এসে কেড়ে নেয়, তখন ও মারামারি শুরু করেনা বটে, কিন্তু গরর শব্দে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করে। তখন আস্তে-আস্তে ওদের বিদায় করতে হয়। কখনো পুষবার জন্য নিয়ে যায় অনেকে — কেউ-কেউ সত্যিই পোষে -- কেউ-কেউ আবার ফিরিয়ে দিয়ে যায়। তুলোর মতো নরম গা, সব বিড়াল-বাচ্চাকেই প্রথমে সুন্দর দেখায়। অনেকে শখ করে বাড়িতে নিয়ে বেড়াল পোষা শুরু করতে চায়। তারা বলে, 'ইস্, এমন সুন্দর বাচ্চাগুলোকে রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে মেরে ফেলবে ? না, না, আমাকে দাও। আহা, অবলা জীব।'— কিন্তু প্রত্যেক সংসারেই দু-একজন থাকে যারা বিড়াল দুচোখে দেখতে পারেনা। তাছাড়া, বাচ্চারা লম্বা হয়ে, পুরুষ হলে — কদাকার ভারী মুখ নিয়ে যখন মাছ চুরি শুরু করে, তখন আর মায়া থাকেনা, তখন আবার আমাদের বাড়িতে ফেরৎ দিতে আসে অতিষ্ঠ হয়ে। সবগুলোকেই আমরা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসি। মেথর কিংবা ঝিকে পয়সা কবুল করে ওদের বলি দূরের কোন পাড়ায় গিয়ে ছেড়ে আসতে। কখনো আমাকেই বাধ্য হয়ে ও দায়িত্ব নিতে হয়। মা ভাইবোনেরা প্রতিবার আপত্তি করে — কিন্তু আপত্তি শুনলে চলেনা। আমাদের কুচুকে আমরা হাজার চেষ্টা করেও প্রেম করা বন্ধ করতে পারিনা। এবং তিন-চারমাস পরপর ওর বাচ্চা হবেই। ওদের জন্য কোন জায়গা নেই, কিন্তু নিজের বাড়িকেও কেউ মার্জারশালা করতে চায়না। একটা মাটির ভাঁড়ে কিছুটা দুধ, কয়েক টুকরো পাঁউরুটি এবং থলিতে বাচ্চাগুলি নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি, যাবার পথে ওদের নানারকম গল্প বলি : ভয় কী তোদের, তোদের এমন দেশে নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে কেউ দুধের কড়াইতে ঢাকা দেয়না, পথে-পথে সেখানে মাছ ছড়ানো। খুব ভালো থাকবি।

তারপর কোন মাঠের মধ্যে নামিয়ে — ভয় কী, কোন ভয় নেই, আমি আবার আসব — এইসব বলে বুঝিয়ে, পিছন ফিরে চোখ বুজে ছুটে পালিয়ে যাই। অনেকসময় এতদূরে নিয়ে যাই যে ফেরার সময় আমি নিজেই রাস্তা খুঁজে পাইনা।

আমার বন্ধু সত্যময় একটা সুন্দর দেখে বাচ্চা বাড়ি নিয়ে গেছে। এখন ওর নানান্ গুণপনা নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস দেখায়। কিন্তু ওর যে কত বড় ভবিষ্যতের ক্ষতি হল এ কথা ভেবে আমি মাঝে-মাঝে অত্যন্ত দুঃখিত বোধ করি। কারণ, ওরটাও মাদী বেড়াল !

যখন চোখ ফোটেনা, তখন বাচ্চাগুলিকে ভারি নিষ্পাপ দেখায়। যখন একটু বড় হয়ে সারা বাড়িতে খেলে বেড়ায়, নীল কালির ফোঁটার মতো চোখ তুলে তাকায়, পরস্পর দাঙ্গা করে, অকারণে দৌড়োয় — তখন যাতে ওদের প্রতি কোনক্রমে মায়া না-পড়ে যায় তার চেষ্টা করি। যে কোন শিশুই সুন্দর — কারণ

তারা যুক্তিহীন।

বাচ্চা হবার পর কয়েকদিন ওদের মা অনেক গম্ভীর হয়ে যায়, চুরি-জোচ্চুরি করেনা! গরর-গরর করে ওদের সহবৎ শেখায়, টুঁটি ধরে এখানে-সেখানে নিরাপদে নিয়ে যায়, সমস্ত শরীর পরিচ্ছন্ন করে। তারপর অল্প কিছুদিন পরই ওদের দূর করে দিয়ে আসতে হয় — যখন ওদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা যায়না। আমার কাকা অফিস যাবার জন্য পাটভাঙা জামাকাপড় পরে খেতে বসেছেন — এমনসময় উড়ন্ত কোন পোকা ধরবার জন্য ঝাঁপ দিয়ে একটা বাচ্চা সোজা এসে পড়ল মাছের ঝোলের বাটিতে। খাওয়া তো নষ্ট হলই, ঝোল ছিটকে জামাকাপড়ও গেল। এইরকম অসংখ্য। অথচ বাচ্চাটাকে মারলে, ও তার কারণই বুঝবেনা অসহায় সারল্যে তাকিয়ে থাকবে।

বিদায় করে দিলেও দু-একটা পথ চিনে ফিরে আসে। তখন আবার ফেলে আসতে হয়। আবার আসে, আবার ফেলতে হয়। সে এক অসহ্য অভিযান! ফিরে আসবার কী এক পরম দাবি ওরা বোধ করে — বুঝতে পারিনা। যেখানে ওদের ফেলে আসা হয় — কিছুদিন আমি সে-পথ দিয়ে হাঁটিনা — কোন দিন ভুল করে গিয়ে পড়লে মিঞাও-মিঞাও ডাক শুনে চমকে পালিয়ে যাই। কোন দিন আর দেখতে পাইনা — কোন বিড়ালহীন গৃহে দৈবাৎ ওরা স্থান পেয়েছে এই ভেবে খুশি হবার চেষ্টা করি। কোন দিন হয়তো দেখি বাচ্চা ছেলেরা ল্যাজে দড়ি বেঁধে টানাটানি করে খেলছে। আমি ধমকে ছাড়িয়ে দিই — তাও খুব নৈর্ব্যক্তিকভাবে। বুঝতে দিইনা, আমারই বাড়ির বাচ্চা। তাহলে যদি ফিরিয়ে দিতে আসে! ছেলেদের ধমক দেবার সময় গলায় জোর পাইনা, কারণ ছেলেদের হাত থেকে বাঁচিয়ে — ওদের কোন নিরাপদ জায়গায় রাখব তা তো জানিনা।

বাচ্চা হারাবার পর মা-বিড়ালী কয়েকদিন কী কাতরভাবে কেঁদে-কেঁদে ঘোরে — সেই কথা মনে পড়ে। কিন্তু কী করব, আমার কিছু করবার নেই।

এক-একদিন দেখি, রাস্তার মাঝখানে একটা বেড়ালবাচ্চা গাড়ি চাপা পড়ে চ্যাপ্টা হয়ে মরে পড়ে আছে। সেই সুন্দর কচি শরীরটা এখন কী ভয়ংকর। একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়াই। আমার ছোট বোন এই বাচ্চাটাকে কত ভালোবাসত, মনে পড়ে। রাত্তিরে আমার পায়ে কত খুনসুটি করেছে এই বাচ্চাটা, আমার মা এক-একদিন নিজে না-খেয়ে সম্পূর্ণ দুধের বাটিটা ঠেলে দিয়েছেন এদের দিকে। এ কথা ভেবে তৎক্ষণাৎ সরে পড়ি।

তারপর যে রাস্তায় যাই, শুনি মিউ-মিউ। তাকিয়ে দেখি, আমাদের বাচ্চা কিনা। না। অন্য কোথাও গেলেও সেই মিউ-মিউ। কলকাতার গলিতে-গলিতে। আমাদের বাড়ির বাচ্চা কিংবা তার বাচ্চার বাচ্চা কিংবা কয়েক হাজার অন্য বাচ্চা। হয় ট্রাম লাইনের পাশে থ্যাঁৎলানো অথবা অসহায়ভাবে ঘুরছে। বৃষ্টির সময় দেখি

ভিজে জড়সড় হয়ে এক কোণে বসে কাঁপছে, কাকগুলো জ্যান্ত শরীরেই ঠোক্রাতে চাইছে। আমাকে পালিয়ে যেতে হয় — কারণ আমার কিছু করবার নেই। আমি ওদের নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারবনা।

যুদ্ধের সময় বোমার শব্দে পাগল হয়ে লন্ডনে বারো হাজার বিড়াল পথে-পথে ঘুরেছে -- কাগজে এ খবর পড়েছিলাম। কলকাতার পথে-পথে অসংখ্য মার্জারশিশুর ডাক আমাকে না পাগল করে দেয়!

৯

পিছন থেকে কাঁধে টোকা মারতেই লোকটি চমকে উঠল। সঙ্গের মেমসাহেবটি বলল, 'টেক কেয়ার ডার্লিং।'

লোকটি রেলিংয়ের ওপর বেশ কায়দায় ব্যালেন্স করে দাঁড়িয়ে ক্যামেরা বাগিয়ে ধরেছিল। দূরে এক বুড়ি শুয়ে আছে ফুটপাতে, বোঝা গেল লোকটির ক্যামেরার একচক্ষু ঐ-দিকেই। বললাম, 'ভিখিরির ছবি তুলছ বুঝি? যাঃ — এটা কি একটা সাবজেক্ট হল? — চলো, তোমায় ভালো-ভালো ভিখিরির জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি।'

লোকটি তাড়াতাড়ি রেলিং থেকে নেমে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাটা বন্ধ করবার চেষ্টা করল। আমি বললাম, 'কী, আর ছবি তুলবে না? আমি তোমাকে ভালো জায়গায় নিয়ে যাব।'

মেমসাহেবটি বলল, ''আর য়ু সীরিয়াস?'

একগাল হেসে বললাম, 'তা না তো কী? তোমরা সাহেব-মেমরা এসে কী ছবি তুলতে চাও, আমি জানিনা? তোমরা নিজেরা কি সে-সব খুঁজে পাবে? চলো, আমি আসল-আসল জায়গায় নিয়ে যাব। কী একটা বুড়ির ছবি তুলছ? — এ কি আর কলকাতার ভিখিরির ছবি হল? ফিরে গেলে তোমার দেশের লোক বিশ্বাস করবে? মনে করবে ফেক, গট-আপ। সত্যিই যে ভারতবর্ষে এসেছিলে, তার প্রমাণ দিতে হবে তো! আমি তোমাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব —'

— তুমি প্রথমটা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে। সাহেবটি বলল, 'আমাদের এমব্যাসির লোক বলে দিয়েছে — ভিখিরি-টিখিরির ছবি তুললে — অনেকসময় এখানকার লোক ক্ষেপে যায়। ক্যামেরা কেড়ে নেয়, অনেকসময় —'

— তাহলে তো প্রাণ হাতে করে ছবি তুলছ, বলো! তা ক্যামেরা-ট্যামেরা কেড়ে নেয় অনেকসময় ঠিকই। মারধোরও করে। তাছাড়া সাধু কিংবা যোগীরা

অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে দিতে পারে। সাপুড়ে গায়ে সাপ ছুড়ে দিতে পারে —

— যাঃ, ওসব নিশ্চয়ই গল্প।

— মোটেইনা। সাপুড়ে আর যোগীরা কলকাতায় ঘুরে বেড়ায় এটা গল্প? মোটেইনা — বিশ্বাস করো! আজ হয়তো এক্ষুনি দেখতে পাবনা। দু-একদিন সময় পেলে তোমায় নিশ্চয়ই ক্যামেরার ফুটো দিয়ে দেখিয়ে দিতাম — প্রকাশ্য রাস্তায় সাপ খেলানো হচ্ছে। ভালুক-নাচওলা দুপুরের রোদে ভালুকের গায়ে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে গাড়িবারান্দার নিচে। বাঁদর নাচও অহরহ। গঙ্গার ঘাটে অসংখ্য সাধু আর যোগী। যাই হোক, তোমাকে এক্ষুনি যা দেখাতে পারব — তাও কম নয়। আমি সঙ্গে আছি — ভয় নেই। তুমি টেলিভিশন না সিনেমার—

— ওসব কিচ্ছুনা। আমি শুধু নিজের কালেকশনের জন্যে। জানো তো ছবি তোলার বিষয় নতুন না-হলে ভালো লাগেনা। কলকাতার এইসব বাড়ি ঘর বা অন্য কিছু নতুন কী আর। বরং এইরকম রাস্তায় লোক শুয়ে থাকবার দৃশ্যই আমাদের কাছে নতুন।

— নিশ্চয়ই। এসো আমার সঙ্গে। গাড়িতে হবেনা, হেঁটে যেতে হবে। এসো, মেম, সাহেব।

লোকটি বৃষস্কন্ধ, শালভুজ, ফরসা দৈত্য একটি। কোন দেশের জিজ্ঞেস করিনি। সব সাহেবই আমার কাছে সমান। মেমটি এমন রংচঙে পোশাক পরেছে — যেন একটা হীরামন পাখি। এমন আলতোভাবে হাঁটছে যেন শরীরটা হাল্কা তুলোর মতো। স্বাস্থ্য আর রূপে ঝলমল করছে দুজন। সেই সঙ্গে ঐশ্বর্য। এমন চমৎকার সংসর্গে কিছুক্ষণ কাটালেও মনটা ভালো লাগে।

আমি প্রথমেই ওদের নিয়ে গেলাম মৌলালির মোড়ে। সেখানে একটি কুষ্ঠরোগী বসে, জানতাম। কুষ্ঠরোগী হিসেবে একেবারে নিখুঁত, শরীরের অধিকাংশ জায়গাতেই ব্যান্ডেজ জড়ানো, শুধু একটা হাত আর মুখটুকু খোলা। সেখানে দগদগ করছে ঘা। একটা কাঠের বাক্সে বসে থাকে — আর একটি বাচ্চা ছেলে সেটা টানতে-টানতে ভিক্ষে চায়। মেমটি স্বামীর বাহু চেপে ধরে অস্ফুট গলায় বলল 'ও মাই — নো, নো!'

আমি বললাম, 'কীরকম সাবজেক্টটা? ভালোনা? আগে এরকম আর পেয়েছ?' লোকটি বিনা শব্দে পরপর দুটো স্ন্যাপ নিল। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ইনক্রেডিবল।'

আমি বললাম, 'চলো কাছেই আরেকটা জায়গায়! সেখানে পাবে, যাকে তোমাদের ইংরেজিতে বলে, 'চোখের ভোজ'।' শিয়ালদার দিকে এগোলাম। যাবার পথেই অবশ্য ফাউ হিসেবে আরেকটি উত্তম বিষয় পাওয়া গেল। বউবাজারের

মোড়ের কাছে সেই খোঁড়া ষাঁড়টি, প্রায়ই যাকে দেখি, পিছনের পা টেনে চলে, ভারি শান্ত মুখখানি, অনেকটা — বাবুর মতো। ষণ্ড প্রভু তখন যে প্রাকৃতিক কাজটি প্রকাশ্য রাস্তায় করছিলেন, তার জন্য সবচেয়ে ভদ্র শব্দ বোধ হয়, ডিহাইড্রেটিং। ক্যামেরা গোটাবার পর সাহেবটিকে জানালাম, এটা সে সত্যিকারের একটা দুর্লভ দৃশ্য পেয়েছে। কারণ, একসময় যদিও কলকাতার পথঘাট ছিল ষণ্ডদের কৃপার অধীন, কিন্তু এখন অনেক সরিয়ে ফেলা হয়েছে, পুণ্যার্থীদের এখন অনেক খুঁজতে হয় ওদের দর্শন পাবার জন্য।

শিয়ালদাতে মনের মতো দৃশ্যই পাওয়া গেল। বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো কোনক্রমে দৈবাৎ প্যান্ট-জামা পরে ফেলেনি। যথারীতি উলঙ্গ হয়েই ছোটাছুটি করছিল। সাহেব-মেম দেখে সকলে এসে ভিক্ষের জন্য ছেঁকে ধরল। দুপুরের সময় খুপরি ঘরগুলোর সামনে উনুন জ্বালিয়ে ছাইভস্ম রান্না শুরু হয়ে গেছে, কঙ্কালসার বুড়ো-বুড়িরা গড়াগড়ি দিচ্ছে মাটিতে, যুবতী মেয়ে নেই একটিও। চতুর্দিকে একটা বিশ্রী ভাপসা গন্ধ। পাশ দিয়ে সুবেশ ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলারা ট্রেন ধরতে বা ট্রেন থেকে নেমে সবেগে ছুটে যাচ্ছেন। সব মিলিয়ে একটা অত্যন্ত নিস্পৃহ আবহাওয়ার জন্যই দৃশ্যটি অসাধারণ। বললাম, 'তোমার মুভি ক্যামেরা আনা উচিত ছিল!'

— এরা কারা?

— নাম শোননি? পূর্ব বাংলার রিফিউজি। এ আর কটা দেখছ — এ যাবৎ সব মিলিয়ে এসেছে পঁচাত্তর লক্ষ অর্থাৎ সাড়ে সাত মিলিয়ান। তুলে নাও ছবি।

— এরা জন্তুর মতো এরকমভাবে থাকে! এরাও তো আফটার অল, মানুষ! — এদের থাকার ব্যবস্থা করা যায়না?

— এই তো চমৎকার ব্যবস্থা। তুমি কি ভাবছ, এ-দেশের আদি বাসিন্দারা সবাই এর চেয়ে ভালো আছে? এখনও তো বস্তিগুলো দেখনি। তাও দেখাব।

রাস্তায় বেরিয়ে কিছুদূর হাঁটবার পর লোকটি নিজেই আমাকে একটা দৃশ্য দেখালো। একটা বাড়ির সামনে বিরাট লাইন পড়েছে। ঠেলাঠেলি, হট্টগোল, পাশে লাঠি হাতে সেপাই। লোকটি বলল, 'ও কিসের কিউ? বাড়িটা দেখে তো সিনেমা-থিয়েটার বলে মনে হয়না? তবে কি কোন মিউজিয়াম?' আমি সেদিকে তাকিয়ে বললাম, 'না, তবে ওটার ছবি তুলে লাভ নেই।'

— কেন? — লোকটি ভাবল, আমি বুঝি কোন কিছু গোপন করছি।

বললাম, 'ওরকম লম্বা লাইন তো তোমাদের দেশেও পড়ে শুনেছি সিনেমা-থিয়েটারে। সুতরাং লাইনের ছবি আর নতুন কী? আসল জিনিশটা তো আর বোঝাতে পারবনা! ওখানে রেশন কার্ড দেওয়া হচ্ছে।'

— তা দিয়ে কী হবে?

— ঐ-কার্ড দেখিয়ে খাবার পাওয়া যাবে।

— ইউ মীন, ফ্রি? মেমসাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

ওদের মুর্খতা দেখে হাসি চেপে রাখা কষ্ট। অথচ মুখের ওপর হো-হো করে হেসে ওঠা ভদ্রতা নয়। তাই বললাম, 'কেন, তোমাদের দেশে কি খাবারদাবার বিনা পয়সায় পাওয়া যায় নাকি? কী এমন দেশ থেকে এসেছ হে?'

— না না না। তবে পয়সা দিয়ে খাবার কেনার জন্য অতখানি লম্বা লাইন? সেটা দেখেই একটু অবাক লাগছে। কোন বিশেষ খাবার-টাবার নাকি? সী ফুড, অর...

— নাঃ! স্রেফ চাল গম। যাক, ও নিয়ে সময় নষ্ট কোরোনা। দৃশ্য হিশেবে এটাতে কোন মজা নেই।

মেমসাহেবকে বাইরে দাঁড় করিয়ে আমি আর সাহেবটি চট করে একটা বস্তির মধ্যে একপাক ঘুরে এলাম। সে-ও খুব চটপট ছবি তুলে এনেছে, বেশ পাকা হাত। সহস্র সচকিত চোখকে প্রশ্রয় দিয়ে আমরা বেশিক্ষণ দাঁড়াতে চাইনি। অবশ্য, খুব সহজে কাজটা মেটেনি। বস্তির মধ্যে কাঁচা নর্দমা উপছে উঠে গলিটা ছপ্‌ছপে হয়ে উঠেছিল কাদা, এঁটো-কাঁটা, আরও কয়েকটি দুরুচ্চার্য ময়লায়। আমি চটিজোড়া খুলে হাতে নিয়েছিলাম, বাইরে এসে চাপাকলে পা ধুয়ে নিলাম। কিন্তু বিদেশিটির জুতোজোড়া কাদায় মাখামাখি। আমি সেজন্য দুঃখ প্রকাশ করলাম। বললাম, 'তুমি বলছিলে তুমি ইতিহাসের ছাত্র ছিলে। তাহলে, নিশ্চয়ই জান, ভারতবর্ষ কতবড় সভ্য দেশ — পাঁচ হাজার বছর আগেও আমাদের মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মানুষরা নর্দমা ব্যবহার করতে জানত। এবং মজা কী জান — পাঁচ হাজার বছর পরেও আমাদের নর্দমাগুলো মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার মতোই আছে অবিকল। ঐ যে দেখলে গোরুর গাড়ির জন্য ট্র্যাফিক জ্যাম হয়ে গেছে। কিন্তু এ-কথা কি জান — আমাদের দেশের লোক যখন প্রথম গোরু দিয়ে গাড়ি টানতে শেখে — তখন তোমরা কোথায় ছিলে? তোমরা তখন গুহায় থাকতে কিংবা গাছের ডালে বাঁদর হয়ে ঝুলতে! কিন্তু আমরা এখনও গোরুর গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। সেই ট্র্যাডিশান সমানে চলেছে!'

বিদেশিটি বলল, 'ওয়েল নীল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু, আজকের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। আমার স্ত্রী অসুস্থ বোধ করছেন। এবার হোটেলে ফিরব ভাবছি।' মেমসাহেবটি একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। সত্যি এতখানি হাঁটাহাঁটি বোধহয় জীবনে করেনি। সোনার অঙ্গে ক্লান্তির ছাপ পড়েছে। টস্‌টস করছে চোখদুটো। আমার হাত ধরে বেশ আন্তরিকভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'সত্যি, তুমি

নিজের কাজ নষ্ট করে আমাদের সঙ্গ দিলে। অনেক ধন্যবাদ। এবার যাই।'

— সেকি ! এর মধ্যেই চলে যাবে ? আমি তো আরও কত জায়গায় নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। দেখাতাম শ্মশানে মড়া পোড়ানো, সাধু-সন্ন্যাসী — খাঁটি 'ইয়োগী', রেড ল্যাম্প ডিস্ট্রিক্ট — হাজার হাজার মেয়ে যেখানে নিজেদের দেহ পণ্য করছে, আরও দেখাতাম রাত্তিরবেলা রাস্তায় সার বেঁধে কী করে লোকেরা ঘুমোয় — অর্থাৎ যা তোমরা এ দেশ সম্বন্ধে শুনে আস, সত্যি-সত্যি সেই সব জিনিশ। আরও অনেক বিচিত্র জিনিশ দেখাতাম — অফিস-ফেরত ট্রাম-বাস, কলকাতার পাঁচ মাইলের মধ্যে মশার ঝাঁক ...। দুঃখ রয়ে গেল, তোমাদের সাপ-খেলা বা ভালুক-নাচ দেখাতে পারলামনা। কিন্তু সত্যিই ওসব এখনও আছে, বিশ্বাস করো।

মহিলাটি খুব কোমল গলায় আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি তোমার দেশের এ-সব খারাপ জিনিশ আমাদের দেখাতে চাইছ কেন ?'

— খারাপ ভালো জানিনা। আমাদের কলকাতায় বিখ্যাত ঐতিহাসিক কোন স্মৃতিচিহ্ন নেই, সমুদ্র পাড় নেই— ঠিক দেখার জিনিশ কিছু নেই। এইসবগুলোই আসলে দেখার। এ দেশে আয়রন কার্টেন নেই — তোমরাও যা খুশি দেখতে পারো — শুধু বিদেশে যাতে বেশি ঘোরাঘুরি করতে না হয়, তাই আমি সাহায্য করছিলাম।

— কিন্তু এ-সব ছবি দেখালে বিদেশে তোমাদের দেশের দুর্নাম হবে, মনে করনা ?

— মোটেইনা। এ দেশের যা সত্যিকারের চেহারা, তা লুকিয়ে লাভ কী ? ভারতবর্ষ বলতে কি শুধু তাজমহল আর অজন্তা-ইলোরা আর কোনারক-খাজুরাহো ? এ দেশে অসংখ্য ভিখিরি আর উপোসী মানুষ আছে, তা কি গোপন করার কথা ? আজ পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে ভারতবর্ষ খাবার নিচ্ছে দাতব্য হিসেবে, টাকা ধার করছে — এ তো জানা কথা। সুতরাং দেশের আসল চেহারা লুকিয়ে লাভ কী ?

— ওঃ আচ্ছা, মাফ করো আমাদের। এ-আলোচনায় যেতে চাইনা। আজ যাই। আমাদের বন্ধুত্বের চিহ্ন হিসেবে তোমাকে একটু কিছু উপহার দিতে পারি ?

— হ্যাঁ, তোমাদের দুজনের একটা করে ছবি পাঠিয়ে দিয়ো। আমি একটা রূপকথার বই লিখছি বাচ্চাদের জন্য। তোমাদের ছবি দুটো ছেপে দেব ওতে, রূপকথার দেশের মানুষ হিশেবে।

ওরা দুজনেই সমস্বরে বলে উঠল, 'নো, নো, ইউ আর কিডিং। তুমি বোধহয় গোড়া থেকেই ঠাট্টা করছ আমাদের সঙ্গে !'

১০

একঠো কালীঘাট।

আমি ভেবেছিলাম শুধু আমিই বুঝি মেয়েটিকে লক্ষ করছি। তা নয়, মেয়েটি কথাটা বলামাত্রই পাঁচ-সাতজন লোক আঁৎকে উঠে তৎক্ষণাৎ সমস্বরে বলে উঠল, 'কালীঘাট, কালীঘাট এদিকে কোথায় ?' এমনকি মদ্রদেশবাসী দাড়িওয়ালা ড্রাইভার পর্যন্ত মুখ ঘুরিয়ে মেয়েটিকে দেখল।

ব্যারাকপুরের বাস, চিড়িয়ার মোড় পেরিয়ে ছুটছে। সকাল সাড়ে আটটা।

মেয়েটি বাঁ হাতে একটা চক্‌চকে সিকি উঁচু করে ধরেছিল, আস্তে-আস্তে সেটা নামিয়ে কেমন অভূতপূর্ব চোখে তাকাল। জানলা দিয়ে একটা রোদ্দুরের তীর তার বুক ভেদ করে ওদিকে পর্যন্ত পৌঁছিয়েছে।

জানলার ওপর কনুই ভর দিয়ে হেলে বসেছিল মেয়েটি, বাঁ পা-টা একটু উঁচু করে তুলে রেখেছে। আমি অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে দেখছিলাম। একমাথা সোনাঝুরি লতার মতো হিজিবিজি ময়লা চুল, আঙুল দিয়ে মাঝে-মাঝে পিছনে টেনে সরিয়ে দিচ্ছিল। একপর্দা ধুলো সত্ত্বেও বোঝা যায় মেয়েটির গায়ের রঙ সদ্য রংধরা আপেলের মতো, বয়স চোদ্দ থেকে একুশের মধ্যে নিশ্চয়ই। চোখের মণিদুটি কটা, বনবিড়ালের মতো ভয়ংকর সরল। ঘাগরা আর কাঁচুলি পরে আছে, কাঁচুলির ঠিক মধ্যে দিয়ে একটি রুপালি স্ট্র্যাপ দেওয়া — মাঝে-মাঝে রোদ্দুরে সেটা ঝলসে উঠছে।

নিশ্চয়ই বেদেনী, অথবা যাযাবরী, আমি ভেবেছিলাম — অর্থাৎ ভ্রাম্যমাণ ভিখারিনী। বহু গল্পে পড়েছি এদের কথা, চলচ্চিত্রে দেখেছি, কলকাতাতেও কোথাও-কোথাও, কার্জন পার্কের পাশে, হাওড়া ময়দানে কখনো চোখে পড়েছে, দলবলশুদ্ধ, ছাগল-খচ্চর মোটঘাট সমেত। কিন্তু এমন একলা, এরকম বাসে, এই সুকুমার সকালবেলায় একটি বেদেনী দেখতে পেয়ে অত্যন্ত আকৃষ্ট বোধ করেছিলাম। মফঃস্বলমুখী বাসে বিবর্ণ এবং পিষ্ট চেহারার মানুষের ভিড়ে এই মেয়েটিকে মনে হল আকস্মিক প্রাপ্তির মতো। বেদেনী না-হলেও আমি তাকিয়ে থাকতাম। কোন সুন্দরী মেয়ের দিকে খোলাখুলি তাকাতে আমার লজ্জা করেনা।

...বাস রোককে, এখানে নামিয়ে দাও, উল্টোদিককা বাসমে উঠো ... কিছু লোক চেঁচিয়ে উঠল। ব্যারাকপুরের দিকে কালীঘাট কোথায় ! বাস থেমে গেল, মেয়েটি একটি বিচিত্র ভ্রূভঙ্গি করে সতেজ পায়ে নেমে গেল। যেন কালীঘাট পৌঁছনো সম্বন্ধে তার কোন দ্বিধা নেই।

আমি ছটফট করছিলাম। যেন আমার বুক থেকে কোন এক অস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছিলাম আমি। জানালা দিয়ে অনেকখানি

মুখ বাড়িয়ে ছিলাম, তারপর বাস একটু চলতে শুরু করতেই আমি যেন আমার কোন বন্ধুকে দূরে দেখতে পেয়েছি, এই ভঙ্গি করে তৎক্ষণাৎ বাস থেকে ছিটকে নেমে পড়লাম। আমার পরিধানে ভদ্র পোশাক, দাড়ি কামানো চকচকে মুখ, কোন গম্ভীর কার্যে ব্যারাকপুর যাচ্ছিলাম। কিন্তু এই অস্বাভাবিক মেয়েটি কেন এই অসময়ে, এইখানে বাসে উঠেছিল এবং কোনদিনও সে কালীঘাটে পৌঁছুবে কিনা — এ কথা জানবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছে বোধ করলাম। মনে হল, এ কথা জানতে না-পারলে, এই কৌতূহলেব অসুখে আমাকে বহুদিন ভুগতে হবে।

চকচকে কালো পিচ ঢালা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের ওপব মেয়েটি দাঁড়িয়ে ছিল। রোদ্দুর তার দেহের চেয়েও ছোট ছায়া ফেলেছে। দাঁড়িযে থাকতে-থাকতে মেয়েটি হঠাৎ বাঁ পায়েব গোড়ালিতে ভর দিযে এক পাক ঘুরে গেল — তারপর অকারণে রাস্তাব অন্যপারে চলে গেল এক ছুটে।

একি, আবার ও ব্যারাকপুরের বাসে উঠতে চায় নাকি ? আমি একটু দূবে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, রাস্তার প্রত্যেকটি লোক ভেবে নিয়েছে যে আমি মেয়েটির জন্য দাঁড়িয়ে আছি, এখন রাস্তার ওপারে মেয়েটিব কাছে আর যাওযা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। দূরে একটা বাস আসছে। আমি চোরা চোখে চেয়ে দেখলাম, নর্দমাব ধারেব একটি বনতুলসীর ফুলহীন ডাটা ভাঙবাব চেষ্টা করছে সে। হঠাৎ চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়েই প্রায় ছুটে এপারে এল, এবং সদ্য-থামা বাসে উঠে পডল। অন্য দরজা দিয়ে উঠলাম আমি। ওর দিকে সোজা মুখ কবে বসলাম।

— কাহে নেই কালীঘাট যায়গা ?

এবার কন্ডাক্টারের প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে সে দৃপ্ত ভঙ্গিতে রুখে উঠল। যেন রাস্তায় দুদিকের কোন দিকের বাসই কালীঘাট যাবেনা — এ-ত্রুটি সে সহ্য করবে-না। সহৃদয় ভদ্রমহোদয়গণ এবং কন্ডাক্টার তাকে বুঝিযে দিলে যে শ্যামবাজাব গিয়ে বাস বদল করতে হবে। এটুকু বোঝাবার জন্য তাদের অনেক বাক্যব্যয় করতে হল, যতক্ষণ-না বাস শ্যামবাজাবে এসে থামল।

তখন শ্যামবাজার অঞ্চল মানুষের ভিড়ে লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। সেখানে মেয়েটিকে বড় সামান্য এবং অসহায় মনে হয়। প্রথম দর্শনেই আমি মেয়েটির প্রেমে পড়ে যাইনি। মেয়েটিকে কেন্দ্র করে কোন রোম্যান্টিক কল্পনা আসেনি। কেন আমি মেয়েটির সঙ্গে-সঙ্গে এসেছি নিজেও জানিনা। শুধু ভেতরে-ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে, মেয়েটি যেন ভুল জায়গায় না-পৌঁছয়।

আমার ইচ্ছে হয়েছিল, মেয়েটিকে যত্ন করে কোন কালীঘাটের বাসে তুলে দিই। কিন্তু তখন উল্টে আমার এই ভয় হচ্ছিল যে, যদি সে আমায় চিনে ফেলে

কোন কথা বলে, কোন মিনতি কিংবা আদেশ করে, কিংবা চেঁচিয়ে উঠে আমাকে গালাগালি দেয়, তবে আমার ভদ্রপদবী বিচলিত হবে, এক হাজার লোক আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে হাসবে। আমি চোরের মতো মেয়েটির পিছন-পিছন আসতে লাগলাম নিঃশব্দে।

ততক্ষণে অফিস যাত্রীদের ভিড় শুরু হয়েছে। হৌসের বাবুরা পানের ডিবে হাতে করে ধীর-স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছে গাড়ির। জামার কলার চকচকে ইস্ত্রি করা, সকলেরই ভিজে মাথায় চিরুনির চিহ্ন আছে। কেরানিরা জামার হাতায় বোতাম লাগাতে ভুলে গিয়ে পরস্পর অনেক কথা বলাবলি করছে। শোভন পোশাকে সজ্জিত হয়ে মেয়েরা ধীর-স্থিরভাবে একটু বাদেই প্রচণ্ড ভিড়ের হুল্লোড় ছিনিমিনি খেলার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে। ট্রাম-বাসের পাদানিতে পা রাখবার জন্য পরম যত্নে শাড়িটা একটু উঁচু করা।

এই প্রসঙ্গে বেদেনী মেয়েটির উপস্থিতি বিরল ব্যতিক্রমের মতো। ফুটপাতের রেলিঙে পা তুলে সে ঘাগরার হাঁটু পর্যন্ত তুলে পরম অভিনিবেশ সহকারে পা চুলকোচ্ছে এবং কোন ব্যথার জায়গায় হাত বুলোচ্ছে। তারপর সে মাথা থেকে একটা উকুন বার করে দুই বুড়ো আঙুলের নখে টিপে শব্দ করে মেরে — নাকের কাছে হাত এনে রক্তের গন্ধ শুঁকল। তারপর পিছন ফিরে হঠাৎ তীব্র চোখে আমার দিকে চেয়ে একটা বাসে উঠে পড়ল।

আমি শিউরে উঠলাম, এবং বলবার চেষ্টা করলাম, ও বাস নয়, ও বাস কালীঘাট যাবে না, হাওড়া যাবে। বলা হলনা। মাথা দিয়ে ঢুঁ-মেরে ভিড় সরিয়ে নির্বিকারভাবে মেয়েটা ভিতরে ঢুকে গেল। আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আমাকে এখন জরুরি গম্ভীর কাজে ব্যারাকপুর যেতে হবে। সারাদিন এক ছাঁচের এক মাপের মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে হবে। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কোথায় যাবে, কোনদিন কালীঘাট পৌঁছবে কিনা, সকালবেলা কোথা থেকে ও এসেছিল — এই না-জানা রহস্যগুলি আমাকে যাবার পথের একা বাসের জানালার চারপাশের অন্যসব দৃশ্যগুলি সম্পর্কে অন্ধ করে রাখবে নাকি? এই বি-পথে যাওয়া মেয়েটির ছবি আমাকে আরও কতদিন জ্বালাবে কে জানে!

১১

আমাদের দুজন বন্ধু এম. এ. পাশ করে এখনও বেকার। প্রায়ই দুপুরের দিকে আমাদের আপিস-টাপিসে এসে বলে, 'আহা, তুমি একা-একা টিফিন খাও, তাই

সঙ্গ দিতে এলাম।' বন্ধু দুজনেই বহু গুণের আকর, তবুও তাদের চাকরি না-পাওয়ার একগুঁয়েমিতে আমাদের অবাক লাগে। ওদের আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, ডিগ্রি যখন আছে, তখন কলেজ বা স্কুলে শিক্ষকতার চাকুরি কেন অন্তত খুঁজে নেয় না। কলেজে না-হলেও, স্কুলের চাকরি এখনও তো খুব দুর্লভ নয়। দুই বন্ধুর উত্তর দুরকম।

প্রথম বন্ধুর বাবা, ঠাকুর্দা প্রভৃতি সকলেই শিক্ষক ছিলেন। কয়েক বছর আগে ওর বাবা রিটায়ার করবার আগেই মারা গেছেন। আমরা শ্রাদ্ধের সময় চাঁদা দিয়েছিলাম। বন্ধুটি বলল, 'কী করব ভাই, আমার তো ইচ্ছে আছে, কিন্তু মাতৃআজ্ঞা !'

— সেকি !

— মা প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছেন যে, একেবারে খেতে না-পেলে বরং দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির সামনে বসে লোকের জুতো রেখে পয়সা নেব, কিন্তু মাস্টারি করতে পারবনা। আমাদের বংশে আর কেউ মাস্টারি নিলেই মায়ের অভিশাপ লাগবে !

দ্বিতীয় বন্ধুর উত্তরটি একটু ঘোরালো। বলল, 'ইস্কুল-কলেজের জীবনে কোন একজন শিক্ষকেরও নাম মনে করতে পারিস, যিনি যথার্থ শ্রদ্ধেয় ?' আমরা যখন ঠিক কোন নামটি বলব ভেবে ভুরু চুলকোচ্ছি, তখন সে বলল, 'তোরা হয়তো পারিস, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, আমি পারিনা। প্রাচীনকাল থেকে আমাদের দেশে কত মহৎ শিক্ষকের কথা শুনেছি, কিন্তু তাঁদের ক্ষীণছায়াও আমি মাইরি দেখিনি আমার গোটা ছাত্রজীবনের কোন শিক্ষকের মধ্যে। সকলের বিরুদ্ধেই আমার অভিমান আছে। কেউই আমাকে বই-পড়ানো ছাড়া একটুও শিক্ষা দেননি। এমন কারুকে দেখিনি যাঁর জীবন আমার কাছে মনে হত অনুকরণের যোগ্য। রচনা লিখতে দেবার নাম করে ক্লাসে ঘুমোনো, ছাত্রদের ছলে-বলে-কৌশলে নিজের কোচিং-এ ভর্তি করার চেষ্টা, নিজের লেখা নোটবই গছানো, শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে 'বখাটে' হয়ে গেছি অপবাদ পাওয়া' — এইসব। দেবতুল্য চেহারা ও কণ্ঠস্বরের এক মাস্টারমশাই ছিলেন আমাদের স্কুলে, তিনিও — আমি অঙ্কে ফেল করেছিলাম টেস্টে, কিন্তু তাঁর জন্য ভাড়া-বাড়ি জোগাড় করে দেওয়ায় — আমাকে ষাট নম্বর দিয়ে পাশ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমিও ওদের মতোই হয়েছি। আমি খুব ভালো কেরানি বা অফিসার হতে পারি, এমনকি ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারও হতে পারতাম, কিন্তু কারুকে কিছু শেখাবার কোন সম্বল নেই। আমি আদর্শবাদী নই, জীবনে হয়তো অনেক অন্যায় করতে হবে — কিন্তু ছোট ছেলেদের ঠকাতে চাই না। বাচ্চাদের চোখকে আমি ভগবানের চেয়ে বেশি ভয় করি।

এসব সত্ত্বেও আমাদের পরিচিত বহু শিক্ষক আছেন। অনেকে নিশ্চিত সুশিক্ষক। অপর এক বন্ধু, আগাগোড়া সমস্ত পরীক্ষায় ফার্স্ট হতেন, তিনি অনায়াসে আই. এ. এস. হবার লোভ সংবরণ করে স্বেচ্ছায় শিক্ষক হয়েছেন। সুতরাং আমরা উনিশে জানুয়ারি শিক্ষকদের নীরব মিছিল দেখতে গিয়েছিলাম।

কথা রেখেছিলেন শিক্ষকরা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শান্ত শোভাযাত্রা। স্লোগান নেই, জিগীর নেই। অর্থাৎ ছাত্রদের মিছিল থেকে নিজেদের তাঁরা আলাদা রাখতে পেরেছিলেন। অনেক শিক্ষক তো কিছুদিন আগেই ছাত্র ছিলেন কিংবা এখনো ছাত্র, (প্রাইভেটে অনার্স বা বি. টি. ক্লাস বা রাত্তিরে এম.এ. পড়া) কিন্তু ছাত্রজীবনের অভ্যেস এখানে কাজে লাগেনি। অর্থাৎ তাঁদের নীরব মুখের ভাষা থেকে বুঝতে পারা যাবে তাঁদের দাবি ও অভিযোগ। অবশ্য মুখ দেখে বোঝা যায়না। কারণ সব মিছিলেই যা হয়, সব সমস্যা মুছে গিয়ে সেখানে একমাত্র সমস্যা হয় লাইন ম্যানেজ করা। দুজন-দুজন করে যান ... ওকি ওখানটায় ফাঁক পড়ে গেল যে ... ভিতর দিয়ে লোক যাচ্ছে কেন ... দৌড়ে মেক-আপ করুন ... ইত্যাদি। সুতরাং পোস্টার ও ফেস্টুন ছিল।

অফিসফেরৎ লোকেরা মিছিল দেখলেই তিরিক্ষে হয়ে যায়। তা দুনিয়ার যে-কোন সমস্যা নিয়েই মিছিল হোক-না। অবশ্য, দু-তিন ঘণ্টা থেমে-থাকা ট্রাম-বাসের নিশ্বাস আটকানো ভিড়ে চেপটে থাকা খুব সুখকরও নয়। কিন্তু শিক্ষকদের মিছিলের জন্য রাগ করতে দেখিনি। শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি হোক — এটা যেন প্রত্যেকেই চায়। সমবেদনায় অনেকের উক্তিও বেরিয়ে এল : শেষ পর্যন্ত মাস্টারদের মান খুইয়ে পথে নামতে হল ! কবে দেশের ...। যদিও যিনি এ-কথা বললেন, তিনিই হয়তো নিজের ছেলের গৃহশিক্ষককে পরীক্ষার পরের ছুটির মাসে মাইনে দিতে চাননা। কিন্তু এগুলো সামান্য মানবিক ত্রুটি। যেমন দেশের সমস্ত মানুষেরই প্রাথমিক শিক্ষা পাওয়া উচিত — এ-কথায় যিনি অটল বিশ্বাসী তিনিও যে নিজের বাড়ির ঝি-চাকরের লেখাপড়া শেখার কোন ব্যবস্থা করবেন, তার কোন মানে নেই।

ছাত্ররা রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে ধর্মঘট মিছিল করে লেখাপড়া গোল্লায় দেয়, বিভিন্ন প্রদেশে তারা হাঙ্গামা বাধাচ্ছে। তাদের নিবৃত্ত করার প্রধান দায়িত্ব শিক্ষকদেরই — এতে কারুর সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজে সন্দেশ খেয়ে অপরকে সন্দেশ খেতে বারণ করা যায় কি ? আজ শিক্ষকরাই ধর্মঘট-মিছিলে নেমেছেন, শক্ত গলায় জানিয়েছেন পরীক্ষার হলে গার্ডও দেবেন না। এতে ছাত্ররা নিজেদের দুষ্টুমির খোরাক পাবে নিশ্চিত। তারা বলবে, 'আরে যা-যা, স্যাররা নিজেরাই স্ট্রাইক করছে, আর আমরা পারিনা !' সুতরাং, শিক্ষকদের এই আন্দোলন সম্পর্কে মিশ্র

অনুভূতির প্রকাশ দেখতে পাওয়া স্বাভাবিক। শিক্ষকদের অভাব-অভিযোগের দাবি প্রত্যেকটা সত্যি, কোন বিবেকবান লোক তা অস্বীকার করতে পারেননা। ভিড়ের মধ্যে শোনা যাচ্ছে : 'মাস্টারদের এতটা না করলে কি চলত না ?' 'না হলে ওদের কোন দাবি মিটবে ?' এতটা চরম পথ না নিয়ে শিক্ষকরা যদি আরেকটু অপেক্ষা করতেন, সহ্য করতেন — এই-ই বেশির ভাগ লোকের মনে-মনে ইচ্ছে। শিক্ষামন্ত্রীও বলছেন, তিনি শিক্ষকদের দাবি ন্যায়সংগত বলে মানেন, কিন্তু এখন যে আর টাকা নেই, সুতরাং চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত অপেক্ষা না করলে —। ভিড়ের মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রতিধ্বনি শোনা যায়: 'কিন্তু মশাই তাকিয়ে দেখুন ওদের দিকে, ওদের তো শুধু দুরবস্থা নয়, এখন দুরাবস্থা একেবারে — আকার দেখলেই বোঝা যায় !'

অভাব শুধু টাকার নয়। শিক্ষকদের সামাজিক মূল্য এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পেশার সম্মান ক্রমশ নেমে যাচ্ছে। স্কুল-কলেজের বাইরে শিক্ষকদের আর কেউ গ্রাহ্য করেনা। একই রকমের দুজন ভালো ছাত্র — একজন আই.এ.এস. হল, ছশো টাকা মাইনে, প্রবল প্রতিপত্তি। অপরজন শিক্ষক,-সুতরাং একশো পঁচাত্তর টাকা, নগণ্য মানুষ। সরকারের যে-কোন পেটি গেজেটেড অফিসারের ক্ষমতা আছে ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দেবার, অন্য সার্টিফিকেটের কপি অ্যাটেস্ট করার। শিক্ষকের এই ক্ষমতা নেই। ছাত্ররা কাকে শ্রদ্ধা করবে — শিক্ষককে না ওই গেজেটেড অফিসারকে ? কার মতন হতে চাইবে ? পাশ করার পর আর কোন চাকরি না পেলে — তবেই লোকে কানামামা হিসেবে মাস্টারি নেয়। তিক্ততা এবং হতাশা জীবিকার প্রথম থেকেই জড়িত হয়ে যায়।

সবচেয়ে অসহায় লাগে প্রাথমিক শিক্ষকদের। কী পরাজিত আহত মুখ ! ডায়মন্ড হারবার থেকে তিনখানা রিজার্ভ করা বাসে এসে ওঁরা অনেকে ঐ মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন।

একই মিছিলে নাম-করা অধ্যাপক আর পাঠশালার মাস্টার। কিছু অধ্যাপকদের চেহারা দেখলেই চেনা যায়, খানিকটা বাবু-বাবু গন্ধ আছে। নোট বই এবং প্রাইভেট টিউশানির অতিরিক্ত আয়ের ছাপও আছে চেহারায়। তার পাশে গাঁয়ের মাস্টারদের ময়লা ধুতি, মলিন মুখ। প্রাথমিক ইস্কুল থেকেই খারাপ পড়ানো হয় বলে, কলেজের অধ্যাপকরা ভালো টিউশানি পান !

আমরা অধ্যাপক থেকে শুরু করে সকলেরই বেতন ও অন্যান্য সুযোগ বৃদ্ধি চাই। কিন্তু প্রথমেই নজর দেওয়া উচিত প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি — এবং উচিত অধ্যাপকদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবধান খুব কমিয়ে আনা। যাতে শুধু বিদ্যার মান অনুযায়ীই নয়, অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও প্রাথমিক শিক্ষক হতে পারেন। তাঁদের

দরকার বেশি। আজ স্বাধীনতার পর শিক্ষিতের সংখ্যা আরও কমে গেছে, সেদিনকার সরকারি রিপোর্টে জানা গেল। অর্থাৎ শিক্ষা-প্রসারে তো দূরের কথা, জন্মহারের সঙ্গেও শিক্ষার হার সমতা রাখতে পারছে না।

মিছিল শেষ হবার পর একটা টুকরো সংলাপ আমাদের কানে এল। একজন শিক্ষকের ক্যাম্বিশের জুতো পরা পায়ে একটি ডোরাকাটা শার্ট পরা ছেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল: আমায় চিনতে পারছেন?

— না তো।

— সেই যে স্যার, তিন বছর আগে অমুক ইস্কুলে...

— না, চিনতে পারলামনা।

— টেস্ট পরীক্ষার সময় আমি টুকলি করছিলাম। আপনি স্যার আমাকে ধরে হল থেকে তাড়িয়ে দিলেন! সেবার পরীক্ষা দেওয়াই হলনা স্কুল ফাইন্যাল! মাস্টারমশাইয়ের চোখে ভয় ঘনিয়ে এল। বখা ছেলেটি এখন কি আবার কোন প্রতিশোধ নিতে এসেছে নাকি? ছেলেটি কিন্তু বেশ বিনীতভাবেই পায়ের ধুলো মাথায় নিল। বলল, 'মাস্টারমশাই, আমি অন্যায় করেছিলাম ঠিকই।'

— তুমি পরের বার পাশ করেছিলে?

— না স্যার, আমার আর লেখাপড়া হলনা। চাকরিতে ঢুকে গেলাম।

— কোথায়?

—গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে। আপনার আশীর্বাদে ভালোই আছি। ওভাব টাইম-ফাইম মিলিয়ে শ-চারেক হয়। আচ্ছা স্যার, চলি।

মাস্টারমশাই বহুক্ষণ বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। শীর্ণকায়, প্রায়-প্রৌঢ়। হাত কাঁপছে তাঁর। না-কান্না গলায় পাশের সঙ্গীকে বললেন, 'আমি বি. এ.-তে ডিস্টিংশন পেয়েছিলাম, জানেন? আমি ম্যাট্রিকে দুটো লেটার পেয়েছিলাম। আমি পরীক্ষায় টুকতে যাইনি বা ধরাও পড়িনি বলে আজ এতদিনে আমার মাইনে একশো সাতান্ন। জানেন, ঐ ছেলেটার আমি কতটা উপকার করেছি?'

১২

আমার একটি টেলিফোন করার জরুরি দরকার হল বিকেলের দিকে। তৎক্ষণাৎ আমি কাছাকাছি পানের দোকান থেকে একটা টাকা ভাঙিয়ে প্রচুর খুচরো করে নিলাম।

কাছেই টেলিফোন কম্পানির একটি শাখা অফিস। সেখানে পরপর ছটি

খোপের মধ্যে ছটি সাধারণের ব্যবহার্য টেলিফোন, একটি নেপালি দরোয়ান সেগুলি পাহারা দিচ্ছে। প্রত্যেকটি যন্ত্রের নিচে হিন্দি-বাংলা-ইংরেজিতে প্রচুর নির্দেশ লেখা আছে। পড়লে মনে হয় যেন বিরাট একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাতে হবে এখুনি। এবং ওর সঙ্গে যেন একটা অলিখিত বাক্যও যুক্ত আছে, সাবধান, ৪৪০ ভোল্ট, অসাবধান হইলেই মৃত্যু ! আমি সাধারণত এসব যন্ত্রপাতি থেকে দূরেই থাকার চেষ্টা করি, কিন্তু সেদিন বিষম প্রয়োজন ছিল একটি খবর দেবার।

খুব সাবধানে মাথা ঠাণ্ডা করে প্রথমে ইংরেজি নির্দেশ তারপর বাংলা অনুবাদ পড়ে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করলাম। কীরকম যেন মনে হল, ঐ নির্দেশ পুরোপুরি মানতে হলে আমার চারটে হাত থাকা দরকার। আমি জামার তলা থেকে আমার লুকোনো আর-দুটো হাত বার করে চার হাতেই কাজ শুরু করলাম। প্রতিমুহূর্তে নির্দেশাবলির দিকে চোখ রেখে। যথারীতি রিসিভার তুলে, চাক্তি ঘুরিয়ে বোতাম টেপার পর ওপার থেকে কী যেন একটা গলা ভেসে এল, আমি পয়সা দিয়ে কথা বলা শুরু করতেই কড়-র কড়-র কট কট ইত্যাদি কিছু আওয়াজ হয়েই একেবারে চুপ ! আর টুঁ-শব্দটি নেই। অর্থাৎ টেকনিক্যাল ভাষায় যাকে বলে 'ডেড'। রিসিভার রেখে দিলাম। কী ভুল হয়েছে ? নির্দেশনামায় আবার চোখ বুলোতেই দেখলাম, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ না-হলে একটা বিশেষ বোতাম টিপলেই পয়সা নাকি ফিরে পাওয়া যায়।

বোতাম ধরে টেপাটেপি করলাম, সেটা গোঁয়ারের মতো চুপ করে রইল। তাতে দুঃখিত হলামনা, কারণ, যে-পয়সা একবার পকেট থেকে বেরিয়ে যায়, তা আবার ফিরে আসবে এমন অলৌকিক ব্যাপারে আমার বিশ্বাস হযনা। বুঝতে পারলাম, আমারই কোন ভুল হয়েছে, নিজের বোকামি আর কেউ দেখে ফেলেছে কিনা এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি সুট করে পাশের কুঠরিতে ঢুকে গেলাম।

পাশের খোপে ঝঞ্ঝাট কম, রিসিভার তুলতেই পিঁ-পিঁ-পিঁ আওয়াজ এল। অর্থাৎ এনগেজড়। পাবলিক টেলিফোন কী করে এনগেজড় হয়, এ-তত্ত্ব ভাবতে-ভাবতে আমি এলাম তার পাশের ঘরে। একটি লোক সেই মুহূর্তে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেই বলল, 'এটায় হবে না, আমি অনেক চেষ্টা করলাম। ফোনটা খারাপ।' কীধরনের খারাপ, কড়-কড় না পিঁ-পিঁ অর্থাৎ আগের ঘরের মতোই।

আমি চতুর্থ ঘরে গেলাম। এখানে স্পষ্ট ডায়াল টোন। সব ঠিকঠাক হল। ওপাশ থেকে গলা পেলাম। এবার পয়সা ফেলে বোতাম টেপা। তাও নিখুঁত। ওপার থেকে ভেসে আসছে, 'হ্যালো, হ্যালো ?' আমি জবাব দিলাম। উত্তর এল, 'জবাব দিচ্ছেননা কেন ? কে ?' — আমি অত্যন্ত কাতর গলায় নাম জানালাম। উত্তর এল, 'কী আশ্চর্য কথা বলছেননা কেন ? কে আপনি ?' — আমি কণ্ঠস্বর

উচ্চগ্রামে তুলে তবু মিনতির সুর বজায় রেখে বললাম, 'আমি, আমার এই নাম, চিনতে পারলেনা ?'

— কে আপনি ? ধেৎ ! কথা বলছেননা কেন ?

— এত কথা বলছি তবু শুনতে পাচ্ছনা ? তুমি কি ভগবান নাকি ?

— টেলিফোন করে একটাও কথা বলছেননা ! কে আপনি ?

আমি তখন ঘর কাঁপিয়ে গর্জন করছি। ওপার থেকে তবু সেই শুনতে না পাবার বিরক্তি। কট করে লাইন কেটে গেল। এবং বোতাম টিপে পয়সা ফেরত এলনা।

পঞ্চম ঘরে গিয়ে, সেই ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় যে-ভাবে 'ড্যাফোডিল' কবিতার সাবসট্যান্স মুখস্থ করেছিলাম সেইভাবে নির্দেশনামা মুখস্থ করে নিজেই নিজের পড়া ধরলাম। তারপর প্রতিটি জিনিশ যে ঠিকঠাক করেছিলাম তা আদালতে হলপ করে বলতে পারি। এবার পয়সা ফেলে বোতাম টেপার পর আবার সেই পরিচিত গলা। আমি জীবনের চরম অনুনয়ের সুরে বললাম, আমার নাম অমুক, দয়া করে এবার আমার কথা শোন। ওপাশ থেকে আবার ভেসে এল, কে ? কথা বলছেননা কেন ?

আমি প্রায় কান্নায় ভেঙে পড়ে বললাম, 'হে টেলিফোনের দেবতা, দয়া করে আমার কণ্ঠস্বর ওপারে পৌঁছে দাও। আমি কি বোবা হয়ে গেছি, না পৃথিবীর মানুষ আর আমার ভাষা বুঝবেনা ?'

ওপার থেকে শুনলাম, 'মা, দেখো, সেই কোন বখা ছেলে বারবার টেলিফোন করে বিরক্ত করছে। কথাও বলছেনা। একটা কথা বললে এমন শুনিয়ে দিতাম। দূর ছাই !' কট।

আমার পরম বান্ধবী আমাকে বখা বলে আখ্যা দিলেন, নিজের কানে শুনলাম। একটি উত্তর দিতে পারলামনা। পয়সাটা এবার ফেরত দেবে অন্তত, দেবতা ? না।

পাশের কামরায় বাইরেই দয়া করে নোটিস ঝোলানো আছে, এই টেলিফোন যন্ত্রটি বিকল। যাক, আর পয়সা গচ্চা গেলনা।

নেপালি দরোয়ানটি বাংলা-ইংরেজি বোঝেনা দেখা গেল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী ব্যাপার, তোমাদের মেশিন খালি পয়সা খায়, অথচ কাজ করেনা ?' লোকটা বলল, 'কমপ্লেন-বুক ? হাঁ সাব, ইধার !' অর্থাৎ দিনের মধ্যে বহুবার ঐ খাতাটি তাকে বার করতে হয়। বেশ যত্ন করে বাঁধানো খাতা। আমি উল্টেপাল্টে দেখলাম। বহুদিন এমন একা-একা হাসিনি। অসম্ভব মজার-মজার মন্তব্যে ভরা। শেষদিকের কয়েকটা মন্তব্য এই রকম :

পয়সাও নষ্ট হল, কাজও হলনা। আমার নাম-ঠিকানা দিয়ে গেলাম ! কম্পানির উচিত আমার বাড়িতে ষাট নয়া ফেরত পাঠানো।

আরেকজন :

মানুষ ঘুষ খায়, যন্ত্রও বা খাবেনা কেন ? আমি প্রত্যেকটা টেলিফোনের জন্য দুবার করে পয়সা দিয়েছি, তবু কোন কাজ হয়নি। যন্ত্রও মানুষের মতো নিমকহারাম !

এর নিচে লেখা, ছনম্বর ঘর ছাড়া আর সবকটি টেলিফোনই ঠিক আছে ! পরীক্ষা করে দেখেছি। ইতি, টেকনিক্যাল ইন্সপেক্টর।

এই লেখাটা একটু আগের, তখনও ভালো করে কালি শুকোয়নি। সুতরাং আমি আর-কিছু লিখে সময় নষ্ট করলামনা। খাতাটা ফেরত দিয়ে আমি ছুটে গেলাম পোস্ট-অফিস। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটিও একটি শাখা পোস্ট-অফিস, পূর্বের শাখা টেলিফোন ভবনটির মতো। নদীর চেয়ে শাখা নদীগুলোর যেমন বিক্রম বেশি, তেমনি শাখা অফিসগুলো অকৃতকার্যতায় আসল অফিসগুলোকে ঢের ছাড়িয়ে যায়। যে-কোন শাখা পোস্ট-অফিস এ-কৃতিত্বে জি. পি. ও.-কেও টেক্কা দিতে পারে।

পোস্ট-অফিসের টেলিফোনের সামনে দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে। একটু অপেক্ষা করতেই হঠাৎ আমার মনে হল, এত ঝঞ্ঝাটে আমি নম্বরটা ভুলে গেছি। শেষ দুটো সংখ্যা তো বারবার উল্টে যাচ্ছে। মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের টেলিফোন গাইডটা কোথায় ?'

— চুরি গেছে। নেই।

পাশ থেকে একজন ভদ্রলোক রুক্ষ গলায় বললেন, 'আপনাদের তো মশাই যখনই খোঁজ করা হয় টেলিফোন গাইড, তখনই বলেন, চুরি গেছে। আনিয়ে রাখতে পারেননা ?'

— কতবার আনব ? বারবার চুরি যায় যে ! আপনারা কমপ্লেন করুন-না ! পাশের স্ট্যাম্পের ঘর থেকে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'জানেন, মোটা শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা সত্ত্বেও ইংলন্ডের গির্জা থেকে বাইবেল চুরি যেত ?'

মেয়েটি সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়েছে বুঝলাম। কিন্তু টেলিফোন বই চুরি করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কার কী লাভ হয়, কোন্ ধর্ম-সাধনায় সিদ্ধি পায়, তা আমার বোঝার কথা নয়। স্থান ত্যাগ করে ছুটে গেলাম রাস্তার উল্টোদিকের ডাক্তার-খানায়। বিনীত ভাবে বললাম, 'দয়া করে পয়সা নিয়ে একটা টেলিফোন করতে দেবেন ?'

— টেলিফোন ? এই বিকেলবেলা ? সন্ধের পর আসবেন।

এরকম কথাও আমি জীবনে শুনিনি। আমার টেলিফোন করা দরকার এখন, আমি আসব সন্ধেবেলা ? সবিনয়ে জানালাম, 'সন্ধেবেলা লোকটির সঙ্গে আলাপ-পরিচয় বা যা-কিছু করবার জন্য আমার আসতে আপত্তি নেই, কিন্তু টেলিফোনটি আমার এখুনি করা দরকার।' তখন আসল ব্যাপারটা জানা গেল। ওর টেলিফোনের চাক্তিতে তালা আটকানো, সন্ধেবেলা ডাক্তারবাবু স্বয়ং এসে তালা খুলবেন। এখন কল রিসিভ করা যায়, কিন্তু বাইরে করা যায়না। যাই হোক, ভদ্রলোক দয়া করে আমাকে গাইডটা দেখতে দিলেন। নম্বরটা এবার কাগজে লিখে ফিরে এলাম পোস্ট-অফিসে।

টেলিফোনের সামনে আর কোন লোক নেই। ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীটি একটি বই পড়ছেন। এখানে অন্যান্য পোস্ট-অফিসের মতো লোকে এসে নিজে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করতে পারেনা। একজন লোক শুধু এজন্যই রাখা হয়েছে, যিনি লোকের মুখে নম্বর শুনে নিজে চাক্তি ঘুরিয়ে রিসিভার তুলে দেবেন। আপাতত সেই লোকটি বই পড়ছেন। মলাট দেখে বুঝলাম, গোয়েন্দা গল্প। দু-তিনবারের ডাকে সাড়া না দিতে লোকটির প্রতি মায়াবশত আমি একটু অপেক্ষা করতে লাগলাম। আহা, এই মুহূর্তে হয়তো সুন্দরী নায়িকার সামনে পিস্তল তুলে দাঁড়িয়ে আছে দুর্বৃত্ত। এখন কি আর অন্যদিকে মন দেওয়া যায়।

দণ্ড পল মিনিট কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আর না থাকতে পেরে আমি কাচুমাচু গলায় বললাম, 'দয়া করে আমাকে একটা নম্বর ডায়াল করে দেবেন ?' একবার দুবার তিনবার বলার পর লোকটি উত্তর দিলেন, 'হবে না, লাইন আউট অব অর্ডার।'

— সে কী। এই তো দেখলাম, কয়েকজন টেলিফোন করছিলেন ?

— এ লাইন কখনও ভালো থাকে, কখনও খারাপ হয়। ভূতুড়ে কাণ্ড মশাই।

এবার আমার পক্ষে মেজাজ ঠিক রাখা কষ্টকর হল। বেশ রুক্ষ গলায় বললাম, 'আপনি ওটা কাউন্টারের ওপর তুলে দিন, আমি দেখছি ওটা ভালো কী খারাপ !'

লোকটি এবার হাতের বই মুড়ে রেখে ধীরে-সুস্থে চোখ তুলে বললেন, 'আপনি রাগ করছেন ?' — তারপর, যে ভাবে লোকে ব্যবসার সঙ্গীকে গোপন সুখবর বলে, তেমনি মুচকি হেসে, এক চোখ কুঁচকে লোকটি আমাকে বললেন, 'কমপ্লেন করুন-না। ঐ তো রয়েছে খাতাটা ! লিখুন-না যা ইচ্ছে।'

তখন বিনা বাক্যব্যয়ে বেরিয়ে গিয়ে যেখানে আমার টেলিফোন করা দরকার ছিল, সেই ঠিকানায় আমি ট্যাক্সি করে উপস্থিত হলাম।

কিন্তু কমপ্লেন-বুক আমাকে কয়েকদিন তাড়া করেছে। যে-কোন সরকারি অফিসে গিয়ে কোন কিছু নিয়ে রাগারাগি করলেই দেখছি তারা কমপ্লেন-বুক

এগিয়ে দেয়। যেন এটা একটা বেশ মজার ব্যাপার। পরম দুর্মুখকে চুপ করিয়ে দেবার একমাত্র অস্ত্র। খাতাটা এগিয়ে দেবার সময় সকলেরই মুখ বেশ হাসি-হাসি থাকে।

রাত্রি সাড়ে এগারোটায় শ্যামবাজার থেকে দমদমের শেষ বাস ছাড়ে। এগারোটা আন্দাজ পৌঁছে দেখি বিরাট কাণ্ড। তখনই সার্ডিন মাছের টিনের মতো ভর্তি হয়ে একটি বাস দাঁড়িয়ে আছে। বাসের সামনেটা ভিজে, ভেতরের লোকদের ঘাম গড়িয়ে এসেছে। প্রতি দশ মিনিট অন্তর বাস ছাড়ার নিয়ম হলেও শুধু আজ এই একটা বাসই ছাড়বে আধঘণ্টা পরে শেষ বাস হিসেবে, আর গাড়ি নেই, বাইরে তখনও শ-দুয়েক লোক দাঁড়িয়ে।

ছোট গুমটিঘরের মধ্যে দু-তিনজন লোক টেলিফোন আর খাতা পেন্সিল নিয়ে কী যেন করছিলেন। সেই ঘর ঘিরে একদল যাত্রী উত্তেজিত গলায় কত কী বোঝাবার চেষ্টা করছে। ভিতরের লোকেরা একদম গ্রাহ্যই করছেননা। দু-একজন শুধু তিরিক্ষে গলায় বলছেন, 'আর বাস নেই তো কী করতে পারি আমরা ? পায়ে হেঁটে বাড়ি যান !'

এমনসময় একটি লোককে দেখলাম। দেখার মতো চেহারা। বিশাল লম্বা ও চওড়া, পাজামা ও পাঞ্জাবি পরনে — একটি চলন্ত দৈত্য ভিড়ের সকলের মাথা ছাড়িয়ে সেই গুমটি ঘরে উঁকি মেরে মেঘ-গর্জনের মতো গলায় বলল, 'কী ব্যাপার, আর বাস নেই কেন ?'

একসঙ্গে বহু কণ্ঠের বহু উত্তর। লোকটি সবাইকে এক ধমক দিল, 'আপনারা চুপ করুন। গুমটির লোকেরা জবাব দিক। বাস নেই কেন ?'

—নেই তো আমরা কী করব ? আপনারা ওপরওলাকে জানান। কমপ্লেন করুন। ঐ তো কমপ্লেন-বুক রয়েছে, জানান-না !

— কমপ্লেন-বুকে লিখব ? লোকটা হা-হা করে হেসে উঠল। আমার সঙ্গে কমপ্লেন-বুক নিয়ে ইয়ার্কি করছেন ? ওসব রঙ্গরস বুঝি আমি জানিনা ? ও-বইতে লিখে কী লাভ হয় আমি জানি। দেখবেন, আমার কমপ্লেন-বুকে লেখার কায়দা ?

তারপর লোকটি দুই বিরাট থাবা দিয়ে দমদম করে পেটাতে লাগল গুমটির টিনের দেয়ালে। পুরো গুমটিঘরটা ধরেই নাড়া দিতে লাগল। সঙ্গেসঙ্গে ভিড়ের অনেকেও হাত মেলাল তার সঙ্গে। সেই লোকটা হাসতে-হাসতেই বলল, 'হয় বাস চাই, নইলে এ-গুমটিঘর আজ উড়ে যাবে ! লাগাও ! দুম, দুম !'

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ভোজবাজি ঘটে গেল। কোথা থেকে চলে এল দুটো খালি বাস। একটা ডবল ডেকার এসেও অপেক্ষা করতে লাগল — যদি যাত্রী-সাধারণের সেবার জন্য লাগে। একাধিক সরকারি অফিসার ছোটাছুটি করে দেখতে

লাগলেন যাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। হাতজোড় করে বলতে লাগলেন, আগে প্রত্যেকটি যাত্রীর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে, তবে তাঁরা নিজেরা বাড়ি ফিরবেন। তাদের কাজই তো জনসাধারণের সেবা।

লম্বা লোকটি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে প্রত্যেকটি লোককে আগে বাসে তোলার ব্যবস্থা করে দিল। তারপর, আমি কাছাকাছি ছিলাম বলে, আমার দিকে ফিরে প্রবল হাস্যে বললেন, 'হাঃ ! আমাকে দেখাচ্ছে কমপ্লেন-বুক ! যে-রোগের যে-ওষুধ ! কিংবা যে-ক্লাসের যে-রকম অঙ্ক, বুঝলেন ? অথবা যে-বিয়ের যে-মন্তোর !'

আমি লোকটির কাছ থেকে সরে গিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে উঠলাম।

১৩

আবদুল সকালবেলা এসে বলল, 'আপনার কাছে বিদায় নিতে এলাম, আবার কবে দেখা হয় না-হয়।'

আবদুলের মতো এমন চমৎকার ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। সেই দুর্লভ ধরনের মানুষ যারা হাসতে-হাসতে দুঃখের কথা বলতে পারে। আমার চেয়ে বয়েসে বেশ ছোট, এবার বি.এ. পরীক্ষা দেবে, পড়াশুনোয় খুব ভালো, এরইমধ্যে ইংরিজি খবরের কাগজে চিঠি লেখা শুরু করেছে। দেখতে সুন্দর নয় আবদুলকে —মুখের গড়ন খানিকটা চৌকো ধরনের, অস্পষ্ট চামড়ার রং, সীমাবদ্ধ চোখ, তাছাড়া সেলুনে কায়দার চুলের ছাঁট দিতে শেখেনি — একেবারে ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবার মতো চেহারা। কিন্তু মুখে এমন একটা ঝলমলে কৌতুক লেগে থাকে সবসময় যে, ওর মুখের দিকে তাকালেই দর্শকের মুখেও একটা প্রসন্নতা আসতে বাধ্য। চব্বিশপরগনার একটা গ্রাম থেকে কলকাতায় এসেছে লেখাপড়া করতে — ওদের আত্মীয়-পরিজনের মধ্যে কেউ কোনদিন ইস্কুল-মাদ্রাসা পার হয়নি, আবদুলই প্রথম এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে, ওর বাবা এখনো চাযের কাজ করে। বাড়ি থেকে পয়সাকড়ি দেবার সামর্থ্য নেই — কলকাতায় থাকে এখানে-সেখানে, কোন চাল-চুলো নেই — ডিস্ট্রিক্ট স্কলারশিপ পায় ১৫ টাকা — সেটা মূলধন করে সারা মাস মাথা খাটিয়ে চালিয়ে দেয় — অর্থাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্রের মতো — গাঁয়ের ছেলে শহরে এসে খেয়ে না-খেয়ে লেখাপড়া শেখার জন্য প্রাণপণ করেছে। কোনদিন হয়তো, ও আমাকে এসে বলল, 'আপনি পান খান, নীলুদা ?'

— মাঝে-মাঝে দু-একটা। কেন বলো তো ?

— কাল একটা অদ্ভুত জিনিশ আবিষ্কার করলাম। কাল রাত্রে পকেটে দশ নয়াপয়সা ছিল তো, ভাবছিলাম কী করি, কী করি। ক্ষিদে লেগেছিল — চার পয়সার ছাতু খেলাম, বুঝলেন। মুখটা একটু বিশ্রি-বিশ্রি লাগছিল — তারপর, তাই চার নয়া দিয়ে একটা মিঠে পান খেলাম। তখন জানেন, ভারি আশ্চর্য, বোধহয় পানের সঙ্গে ছাতুর একটা কেমিক্যাল রি-অ্যাকশান হয়, পেট ভরে গেল — আর মনটাও খুব ভালো হয়ে গেল — কীরকম যেন ফুরফুরে লাগতে লাগল — ভাবলাম উড়তে উড়তে বাড়ি যাই। আপনি একদিন ছাতুর সঙ্গে পান খেয়ে দেখবেন?

আবদুলের সঙ্গে কথাবার্তা আমাকে একটু সাবধানে বলতে হয়। ওর সরলতার কাছে প্রতিমুহূর্তে আমার অপমানিত হবার ভয় থাকে। গতকাল রাত্রে যে শেষ দশ নয়াপয়সা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করেছে আজ সে কোন মহাশূন্য নিয়ে গবেষণা করবে — সে-সম্পর্কে আমার প্রশ্ন করা চলবেনা। প্রত্যেকের জীবন তার নিজের — তবু আমরা অপরের জীবন নিয়ে কথা বলার জন্য আকুলি-বিকুলি করি।

আমিও আবদুলকে সৎপথে আনার জন্য কিছু-কিছু চেষ্টা করেছি। গ্রামের ছেলে, আগে বিড়ি-সিগারেট খেতনা, আমিই সিগারেট ধরিয়েছি — এখন, এই মাস-দুয়েকের মধ্যেই ছাই ঝাড়ার সময় দিব্যি আঙুলে টুসকি আওয়াজ করতে শিখে গেছে। টিউশানি করতে গিয়ে কী কী উপায়ে পড়ানো ফাঁকি দিতে হয়, সে-সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছি ওকে। ট্রামে-বাসে ভাড়া না-দেবার আমার নিজস্ব পদ্ধতিগুলি শুনে-শুনেও ও এখনো ঠিকমতো রপ্ত করতে পারেনি যদিও। এছাড়া, আর-একটি কথা আমি ওকে প্রায়ই বলে থাকি, 'পড়াশুনো ছেড়ে দাও আবদুল, পড়াশুনো করে কী হবে?' এর উত্তরে ও একটা বেয়াড়া ধরনের প্রশ্ন করে, 'পড়াশুনো না-করে কী হবে, সেটা আগে বলুন!' পড়াশুনো ছেড়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবার সঙ্গে মিলে চাষবাস করা অনেক ভালো — সেটা ও কিছুতে বুঝবেনা। অর্থাৎ একাকীত্ব, মুক্তি, আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি কয়েকটা আধুনিক সাহিত্যের অসুখ ওর মধ্যে ঢুকে গেছে। ও এখন নাগরিক জীবন চায়।

অনেকদিন আবদুলের সঙ্গে দেখা হয়নি। হঠাৎ এসে ও বিদায় নেবার কথা বলতে একটু আবাক হলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'গ্রামে ফিরে যাচ্ছ নাকি?'

— না, বিদেশে। পাকিস্তানে। ঢাকা যাব।

— বেড়াতে? কবে ফিরবে?

— আর ফিরব না। ওখানেই থেকে যাব।

আমি হঠাৎ চুপ করে গেলাম। বুঝলাম, নিশ্চয়ই একটা-কিছু গুরুতর ঘটেছে! সামান্য কারণে আবদুলের মতো ছেলে বিমর্ষ হয়না। আবদুল কিন্তু

পরমুহূর্তেই হেসে উঠে বলল, 'কী, জিজ্ঞেস করলেননা, কেন যাচ্ছি ?'

বললাম, 'তুমিই বলো-না।'

— একা-একা থাকি। আজকাল বড় মন খারাপ লাগে।

— ঢাকায় কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম হয়েছে বুঝি ?

— প্রেম তো এখানেই একটা মেয়ের সঙ্গে হয়েছিল, মুসলমান বলে পাত্তা দিলনা। না, ইয়ার্কি নয়, নীলুদা আজকাল টাকা-পয়সা একদম কুলিয়ে উঠতে পারছিনা। তাছাড়া সবসময় একটা অস্বস্তি।

— অস্বস্তি ?

— কী জানেন, কাগজে টিউশনির বিজ্ঞাপন দেখে-দেখে হয়তো গেলাম — সব কথাবার্তা হল, যেই নাম জিজ্ঞেস করল, অমনি — হেসে ফেলল আবদুল — লোকগুলো এমন মজার, চট করে মিথ্যে কথাও বানাতে পারেনা। বলে, 'এখন টাকার টানাটানি — কয়েকমাস মাস্টার রাখব না এখন !' আসলে সব ঠিক হবার পর আমি মুসলমান শুনেই যে এমন মজার মুখ করে লোকেরা ...

— অনেক মুসলমানও তো বাড়িতে প্রাইভেট টিউটর রাখে, সেখানে যাওনা কেন ?

— আমি মুসলমান বলেই কেন মুসলমানের কাছে যাব ? আমি মানুষ, যে-কোন মানুষের কাছে যাব।

— অত আদর্শ রাখলে চলেনা আবদুল। বেঁচে থাকা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। মুসলমানের কাছে গেলে যদি চাকরি পাও — সেখানেই যাবে !

— তাও গিয়েছিলাম। কিন্তু জানেন তো, এদেশে মধ্যবিত্ত মুসলমান নেই। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী আছে হিন্দুদের মধ্যেই। আর বড়লোক মুসলমানেরা এক অদ্ভুত চীজ। সত্যি বলছি। তারা থাকে সাহেবী কায়দায় — তারা চায় প্যান্টকোট-পরা ইংরেজি-বলা মাস্টার — তা হিন্দু মুসলমান অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যাই হোক-না। আমার মতো ইস্তিরি না-করা জামা, ময়লা ধুতিপরা মাস্টার চায়না। অথচ আমি কি ইংরিজি খারাপ জানি ?

— বড়লোক হিন্দুরাও তাই। দুনিয়ার এমন-কোন বড়লোক নেই, যে নিজের বাড়িতে ময়লা জামাকাপড়-পরা মাস্টার রাখতে চায়।

আবদুল সরল হেসে বলল, 'কী মুশকিল, টাকা না পেলে প্যান্টকোট কিনব কী দিয়ে ?' ওর বলার ভঙ্গিতে আমাকেও হেসে উঠতে হল।

— একজন দোকানদারের কাছে গিয়েছিলাম— খাওয়া-থাকার বদলে দোকানের হিশেবপত্র রাখতে হবে। লোকটা সব ঠিক করার পর আমি মুসলমান শুনে বললে কী জানেন ? বললে, ভাই তোমাকে না নেবার কোন যুক্তিই নেই কিন্তু তবু নিতে

পারছিনা। মাপ করো ভাই। লোকটার কাচুমাচু মুখ দেখে এমন মায়া হল আমার। সত্যি খুব ভালো লোকটা, কিন্তু সংস্কারের কাছে অসহায়। আবার দু-একজন চোখ রাঙায়ও বটে, স্পষ্ট অপমান করে — কিন্তু তাতেও কিছু মনে করিনা। ও তো স্বাভাবিক। মানুষ তো আর একরকম হয়না। এখন কারুর কাছে যেতেই লজ্জা হয়। নিজের নাম বলতে যদি লজ্জা হয় — তার চেয়ে খারাপ কিছু আছে? সেইজন্য জানেন, সবসময় একটা অস্বস্তি লাগে, কীরকম কষ্ট হয়, বুকের মধ্যে যেন ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে অনবরত। নিজেকে খুব একা মনে হয়।

আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম, আবদুল কি একাই এরকম পরিস্থিতিতে পড়েছে — না ওর মতো সব মুসলমান ছেলেদেরই এ-অবস্থা? কী জানি! এমনও হতে পারে, আবদুলের একাকীত্ববোধের সঙ্গে ধর্মভেদের কোন সম্পর্ক নেই। কাফকা কিংবা কামুর লেখাটেখা পড়েই বোধহয় এসব মাথায় ঢুকেছে! হয়তো এসব সাহিত্যের অসুখ। কিন্তু অস্বস্তির কারণ যখন ও নিজেই বার করেছে — তখন সেইটাই সত্য। অন্য কোন ধারণা কি ওকে কোন সাহায্য করতে পারবে? কিন্তু ঢাকায় গেলেই ওর এই ভাব সেরে যাবে ও কী করে ভাবল? — সে কথা ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

— জানিনা ওখানে গেলেই কেটে যাবে কিনা। তবু দেখা যাক। জানেন, এখানে তো আমার কোন বন্ধুও নেই। কলেজে একটা ছেলের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হল— বনেদি ব্রাহ্মণবংশের ছেলে — অনেক কিছু জানে, অনেক আলোচনা করতাম দুজনে। ছেলেটাকে মনে হত সত্যিকারের উদার। ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পেতাম। একদিন বিকেলে একটু একা-একা লাগছে, ওর বাড়িতে গেলাম। ছেলেটা এমন তিনতলা জানলা থেকে উঁকি মেরে বলল, খুব ব্যস্ত, দেখা করতে পারবে না। আচ্ছা দেখুন তো কী বোকা — আমার কী ক্ষতি হল — ওকেই তো নিজের সঙ্গে জোচ্চুরি করতে হল! আর-একটা ছেলে — বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব আদরযত্ন করে খাওয়ায় মাঝে-মাঝে — খাতিরের ঠেলায় আমি ব্যতিব্যস্ত — পাড়ার লোককে ডেকে-ডেকে পরিচয় করিয়ে দেয় যে, আমি মুসলমান। ব্যাপারটা কী বুঝতে পারলেন তো? আমি ঠিক বুঝে নিয়েছি — মহত্ত্ব দেখানো। তারপর আর আমি যাইনা, কেন যাব বলুন!

আবদুলের কথা বলার বিশেষ গুণ এই যে কোন বিদ্রূপ বা দুঃখের চিহ্নমাত্র নেই। কথার ঝোঁকে কথা বলে যায়।

— জানেন নীলুদা, মুসলমানরা আরও খারাপ। আমি তো অনেক চাষাভূষো গরিব লোকের সঙ্গে মিশে দেখেছি। গরিব হিন্দুদের মধ্যে সাধারণত মুসলমানদের সম্পর্কে কোন রাগ বা এড়িয়ে যাবার ভাব নেই। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে আছে।

আমি তো মুসলমানদের বস্তিতে থাকি। দেখেছি হিন্দুদের ওপর সবসময়েই একটা রাগ আর হিংসে নিয়ে কথা বলে। খুব খারাপ!

— স্বাভাবিক এটাও। ওরা এদেশে সংখ্যালঘু — তাই হয়তো ভাবতে পারে ওদের ওপর অবিচার করা হচ্ছে।

— শুধু তাই না, কুসংস্কারও বেশি। শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যেও আছে। আমি কয়েকটা মুসলমান ছেলের মেসে বসে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসঙ্গীত গাইছিলাম — ওরা কী বলল জানেন? আমি হিন্দুর গান গাইছি!

— আমি এরকম কথা কখনো শুনিনি! এটা তোমার বাজে কথা। আমি অনেক মুসলমান ছেলেকে জানি — যারা রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে পাগল!

— আপনারা একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে থাকেন — তার বাইরে একটা বিরাট বাংলা দেশ আছে। আমি অনেক মুসলমানকে বলতে শুনছি যে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দ দাশ হিন্দু সাহিত্য লিখেছেন—। কিন্তু কোন হিন্দু কি কখনো বলে, নজরুল ইসলাম বা মুজতবা আলী ইসলামি সাহিত্য লিখেছেন? কখনো বলে না! আমাদের মধ্যে এরকম কুসংস্কার বেশি আছে।

— বলুক-না, তাতে কী ক্ষতি হয়েছে? তোমার তা নিয়ে অত মাথা ঘামাবার কী দরকার?

— আপনি আমাকে খুশি করার জন্য সত্যি কথাটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন!

আমি হঠাৎ অত্যন্ত চটে গিয়ে বললাম, 'বাজে বোকো না! তুমিও আমাকে খুশি করার চেষ্টায় মুসলমানদের নিন্দে করতে শুরু করেছ।' আবদুল চটপট উত্তর দিল, 'আপনি একথাটা রাগের মাথায় না ভেবে বললেন!'

আমি একটু অনুতপ্ত হয়ে চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, 'আবদুল, আমার বন্ধুদের মধ্যে কেউ হিন্দু কেউ মুসলমান — কিন্তু কখনো তা মনেও পড়েনা। তুমি আজ সকালে এসে হঠাৎ এসব প্রসঙ্গ তুললে কেন? আমি কি জানিনা, দেশে এ-সমস্যা আছে? থাকবেই। দুই জাত বা দুই ধর্ম বা দুরকম গায়ের রঙ — যে-কোনো একটা হলেই হল... এরকম মানুষ কোথাও শান্তিতে পাশাপাশি থাকতে পারেনা। ঝগড়া-মারামারির জন্য মানুষের একটা তো খেলনা চাই। তুমি আমি পাশাপাশি বসে থাকলে যুক্তিতর্ক মেনে কত কথা হবে। কিন্তু যেই দুপাশে দুটি জনতা, বা দুটো দেশ — অমনি আর কোন যুক্তি টিঁকবেনা। এসব নিয়ে আর ভাবতে চাইনা — কারণ জানি তোমার বা আমার ইচ্ছে-অনুসারে কিছুরই বদল হবেনা। আজ গোটা পৃথিবীতে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের ইচ্ছে-অনুযায়ী, কোন দেশেরই রাজনীতি চলছেনা।

— রাজনীতি ছেড়ে দিন, সাধারণ মানুষ?

— সেখানেও ঐ সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুরা এই দুই দলে রেশারেশি, অবিশ্বাস, ঘৃণা থাকবেই। সংখ্যালঘুরা সবসময়ে মনে করবেই তারা নির্যাতিত, সত্যিকারের নির্যাতিত হোক বা না-হোক। এদেশে মুসলমানরা, পাকিস্তানে হিন্দুরা, আমেরিকায় নিগ্রোরা, সাইপ্রাসে তুর্কিরা, ইউরোপে ইহুদিরা। আচ্ছা, ওটা ভুলে যাও। মনে করো কবি আর অকবি — এই দু-দল। সারা পৃথিবীতেই কবিরা সংখ্যালঘু, অকবিদের কাছে নির্যাতিত। কবি শুনলে প্রেমিকার বাবা বাড়ি থেকে দূর করে দেয়, অপিসে চাকরি হয়না, বইয়ের দোকানে মুখ বাঁকায়, মাছওলা ঠকায়, রাস্তায় পুলিশে তাড়া করে, বাড়িওলা বাড়ি ভাড়া দেয়না—

আবদুল হেসে বলল, 'আপনি কথাটা অন্যদিকে নিয়ে যাচ্ছেন।' তারপর ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে আবদুল বলল, 'আমি লোককে বোঝাতে চাই। কেন মানুষে-মানুষে এমন তফাত হবে — ধর্মের জন্য ? আমি এখানে পারলামনা, হেরে গেলাম। ঠিক করেছি, পাকিস্তানে গিয়ে মুসলমানদের বোঝাব। মুসলমানরা বেশি পেছিয়ে আছে — আমি ওদের বোঝাব — পাকিস্তানে আমার বেশি স্বাধীনতা থাকবে।

— স্বাধীনতা কথাটা কত ছোট !

— কেন ?

— তুমি মুসলমান বলে শুধু মুসলমানদের বলতে পারবে — তারা ভুল করছে। হিন্দুদের পারবেনা! আমি দৈবাৎ হিন্দুর ঘরে জন্মেছি — এখন আমি যদি বলতে যাই, মুসলমানদের বোরখা-পরা কিংবা পর্দা-প্রথা খারাপ কিংবা বাঙালি মুসলমানদের নাম কেন বাংলাভাষায় রাখা হয়না, অমনি বলা হবে আমি অনধিকার চর্চা করছি। আমাকে ওরা মারতে আসবে। তুমি যদি আবার বল, হিন্দুদের বিয়ের সময় মেয়েদেখানো-প্রথা কিংবা বিধবাদের ঝিয়ের মতো খাটানো, কিংবা জাতিভেদ-প্রথা খারাপ — তবে তোমার নিস্তার নেই। তাও তো এ-সব সামাজিক প্রথা, ধর্ম নিয়ে তো কথাই বলা যাবেনা। আমি হিন্দুধর্ম সম্পর্কে গুষ্টির পিণ্ডি করে যা-খুশি বলতে পারি, কিন্তু ইসলামের নিন্দে করতে পারবনা। আবার, তুমি ইসলামের দোষত্রুটি দেখাতে পারো, কিন্তু একবার হিন্দুদেব মূর্তি-পূজা নিয়ে কথা বলে দেখ দেখি ! এর নাম স্বাধীনতা, আবদুল ?

— তা হোক ! তবু আমাদের যতটা সাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

একটুক্ষণ চুপ করে রইলাম, দুজনেই। তারপর আবদুল গাঢ়স্বরে বলল, 'চলে যাচ্ছি, আর আপনাদের সঙ্গে কখনো দেখা হবে কিনা, কী জানি। মনটা খারাপ লাগছে।'

বললাম, 'চলো, তোমাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।'

সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় যতদূর সম্ভব চেষ্টা করলাম আবদুলকে অন্যমনস্ক করে দেবার, তবু ওর চোখ পড়ে গেল। আমাদের ফ্ল্যাটবাড়ির সিঁড়ির তলায় অন্ধকার জায়গায় একটি পরিবার এসে আশ্রয় নিয়েছে — সেদিকে তাকিয়ে ও জিজ্ঞেস করল, 'এরা কারা? আগে তো দেখিনি।'

বললাম, 'কী জানি, চলো তাড়াতাড়ি, বাস এসে গেছে।'

— ইস্, সিঁড়ির নিচের ঐটুকু জায়গায়, এখানেও ভাড়াটে নাকি?

— জানিনা, চলো চলো।

— বাঃ, এক বাড়িতে আছেন, জানেননা।

— কী জানি লক্ষ করিনি। চলো, আমার একটু তাড়া আছে।

ততক্ষণে আমরা বাড়ির বাইরে এসেছি। আবদুল হঠাৎ থেমে গিয়ে বলল, 'আপনি যেন কিছু লুকোচ্ছেন!'

— নিজের লজ্জার কথা বলব কী করে? ওরা আমার পিসীমা আর তাঁর ছেলেমেয়ে। নিজের ঘরে জায়গা দিতে পারিনি, সিঁড়ির তলায় আছেন — একথা কি আর সকলকে বলা যায়?

— নীলুদা, আমি দূরে চলে যাচ্ছি শুনে অমনিই আপনি আমাকে পর-পর মনে করছেন। ওরা কোথা থেকে এসেছেন?

— পাকিস্তান থেকে! কিন্তু, আবদুল, তুমি পাকিস্তান চলে যাচ্ছ — সেই সময়ই পাকিস্তান থেকে একটা হিন্দু পরিবারের চলে আসা নিয়ে আলোচনা করা অত্যন্ত ভালগার। আমি চাইনা। এরকম তো চলছে, জানই। সে নিয়ে আর কথা বলে কী হবে?

আবদুলের মুখ মুহূর্তে বিষণ্ন হয়ে গেল। ওখানে দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, 'ওঁরা কেন চলে এলেন? আবার কি কোন গণ্ডগোল শুরু হয়েছে?'

— না।

— আপনি সত্যি কথা বলুন।

— সত্যিই বলছি। আমি বারবার ওদের জিজ্ঞেস করেছি — কোন দাঙ্গা হয়েছে কিনা, কেউ ভয় দেখিয়েছে কিনা — নইলে এতকাল পর কেন চলে এলেন। কিছুই হয়নি। এমনিই। দাঙ্গা হয় সাধারণত শহর-অঞ্চলে। ওঁরা এসেছেন ফরিদপুরের একটা গ্রাম থেকে — সেখানে আমিও জন্মেছি — সেখানে এপর্যন্ত কোনদিন দাঙ্গা হয়নি।

— এমনি কেউ আসেনা। কেন চলে এলেন তবে?

— তুমিও তো এমনিই যাচ্ছ। অস্বস্তি! পিসেমশাই বুড়ো হয়েছেন — ওঁর বড় ছেলেটা মারা গেছে — মুসলমানদের হাতে নয়, কলেরায়। তবু, দেশের

জমিজায়গায় দিন চলে যেত। কিন্তু পিসীমার এক মেয়ে বড় হয়েছে — তার জন্যেই এখানে চলে আসা। কয়েকটা ছোকরা নাকি দিনরাত ঘুরঘুর করত, উড়ো চিঠি দিয়েছে, রাত্তিরবেলা মেয়েকে চুরি করে নিয়ে যাবে বলে শাসিয়েছে। কী এমন অস্বাভাবিক এটা? ওঁরা কি জানেননা যে, সোমত্থ মেয়েদের পিছনে ছোকরাদের ঘোরাঘুরি এখানেও বেশি ছাড়া কম নয়? তাছাড়া, এই শহরতলি-অঞ্চলের ছোকরারা উড়ো চিঠি না-দিয়ে এমনিতেই মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়। তবে, এখানে এসে কী লাভ হল, এখানে খাবার সংস্থান নেই, তবু কেন এলেন? কারণ কী জান, সন্দেহ আর অবিশ্বাস। আসবার সময়, গ্রামের অনেক মুসলমান নাকি বলেছে, যাবেননা, আপনারা গ্রামের শেষ ব্রাহ্মণ, আপনারা যাবেননা। তবু কেন এসেছেন? সেই সংখ্যালঘু হবার অপমানবোধ। ভেবেছে দিনদুপুরে মেয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেও গ্রামের একটা লোকও তখন প্রতিবাদ করবেনা। সন্দেহ আর অবিশ্বাস! তুমি যাকে আধুনিক ভাষায় বললে, অস্বস্তি।

১৪

— কী, অমন চেহারা কেন? ঘোড়ার পিঠে চেপে এলেন নাকি?

— হ্যাঁ, ঘোড়ায় চেপে নাচতে-নাচতে এলাম।

— এই ভরদুপুরে?

— আর জি কর হাসপাতালের পাশের রাস্তা দিয়ে বাসে চেপে এলে সকলকে নাচতেই হবে ভাই। আজ দশ বছর নেচে নেচে অফিসে আসছি।

— তা, রাস্তাটার নাম উদয়শঙ্কর রোড দিয়ে দিন-না।

— দিলাম। আর আমার বাড়ির পাশের রাস্তাটা তাহলে বৈজয়ন্তীমালা লেন!

দুজন লোকের এই কথোপকথন আমাকে শুনতে হল। অনেক অপরিচিত লোকের সম্পূর্ণ অনাবশ্যক কথাবার্তা আমরা শুনতে বাধ্য। কারণ, বাস-ট্রামে-ট্রেনে মুখ বুজে যাওয়া আমাদের স্বভাব নয়। একা থাকলে অপরের কথা না শুনে উপায় নেই। কার পিসশাশুড়ির গেঁটে বাত হয়েছে, কিংবা কার ন কাকিমার আপন ছেলে —না, না— আপন ন কাকিমার ছেলে বিলেত থেকে ফিরেছে কিংবা মন্দিরা নাম্নী কোন্ বালিকা অধ্যাপকের দিকে তাকিয়ে হেসেছে— এইসব শুনে যাই, যতক্ষণ না আমার সঙ্গে কোন বন্ধু জোটে। তখন আমরাই আবার সরবে ঐরকম কোন কথা শুরু করি।

তবে, একটা জিনিশ লক্ষ করেছি, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত চেহারার লোকদের

কাছ থেকে মাঝে-মাঝে দু-একটা চমৎকার রসিকতা শোনা যায়। দেশের অবস্থা যখন খুব বেশি খারাপ, নানান অনটন — রসিকতার মাত্রা তখন বেড়ে যায়। রাগারাগির বদলে হাসাহাসিতেই বাঙালিরা বেশি পারংগম বোধহয়। মাস দুয়েক আগে, বাসে এক ভদ্রলোককে বলতে শুনেছিলাম — তিনি তখনো সর্ষের তেল খান নিজেই সর্ষের ফুল থেকে বানিয়ে। কিন্তু অত সর্ষের ফুলই বা পাচ্ছেন কোথায় ? নিজের দুচোখ থেকে। উচ্চাঙ্গের রসিকতা নয়, কিন্তু বলার ভঙ্গি।

ঐরকম ভাবেই এক ডাক্তারের গল্প শুনেছি। ডাক্তারের এক রোগী এসেছে, তার বিষম মাথাধরার অসুখ। কিছুতেই সারছেনা। অনেক চিকিৎসা করা হল। শেষে ডাক্তাব বললেন, 'আপনার ব্রেনটা খুলে রেখে যান, ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে দেখি।' রোগী ভদ্রলোকেব মাথা থেকে সবটুকু ব্রেন খুলে একটা কাচের বাসনে রাখা হল, ডাক্তার তাকে বললেন এক মাস বাদে আসতে। তারপর এক মাস যায়, দুমাস যায় রোগী আব আসেনা ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার নিজেই পড়লেন মহা চিন্তায়। লোকটার হল কী ? মবেই গেল, না কী হল ? আর যদি বেঁচে থাকে, তবে ব্রেন ছাড়া কাজকর্ম করছে কী করে ? অথচ লোকটার বোন সন্ধান নেই।

অনেকদিন বাদে ডালহাউসি স্কোয়ারে লোকটিকে দেখতে পেলেন ডাক্তার। গাড়ি থামিয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিলেন, 'ও মশাই, শুনছেন, শুনছেন !' — কাছে এসে ভাবলেশহীন মুখে লোকটি বলল, 'কী ব্যাপাব ?'

— আচ্ছা লোক তো আপনি, আর এলেননা ? আপনার ব্রেন যে আমার কাছে রয়ে গেছে।

— থাক। ওটা আর আমাব দরকার নেই। আমি সরকারি অফিসে চাকরি পেয়ে গেছি।

ওডহাউসের অনুকরণ, তাতেও ক্ষতি নেই। দুজন লেখক একদিন আমাকে বলেছিলেন, পৃথিবীতে সব রসিকতা শেষ হয়ে গেছে, খাঁটি নতুন রসিকতা নাকি হবার আর উপায় নেই। আমিও একটি বিদেশী প্রবন্ধে পড়েছিলাম, পৃথিবীতে সত্যিকারের নতুন কোন 'গল্প' আর বানানো সম্ভব নয়। এগারো রকমের বেশি প্লট হতে পারেনা। এখন শুধু পরিবেশ নতুন হবে। সেইজন্যেই হয়তো পুরোনো রসিকতায় আর একটি লোককে নতুন করে খুশি হতে দেখলাম। সম্প্রতি বাসের ভাড়া বাড়ায় তিনি দুঃখিত হননি। মহা খুশি হয়ে বন্ধুকে বলছেন, 'আমার ভাই ভালোই হল, আগে হেঁটে অফিসে যাওয়া-আসা করে চব্বিশ নয়া পয়সা বাঁচাতাম, এখন হেঁটে গেলে বাঁচবে তিরিশ পয়সা। বাস ভাড়া আরও বাড়লে আমার ব্যাঙ্কে বহু টাকা জমবে।'

আর-একটি সুন্দর কথা শুনেছিলাম এক বৃদ্ধের মুখে। হাতে একটি দেড়

কিলো রুইমাছ ও কয়েকটি নধর ফুলকপি। একজন জিজ্ঞেস করল, 'কী গণেশ-দা, এই বাজারে অত বড় মাছ ? বাড়িতে মচ্ছব নাকি ?' 'না ভাই, বুড়ো হলাম, ছেলেটাকে চাকরিতে ঢোকাতে হবে তো ! এখন থেকে সাহেবকে নিজের গাছের রুইমাছ আর পুকুরের ফুলকপি না দিলে চলবে কী করে ?'

আর চিড়িয়াখানায় সেই লোকটির চাকরি করার গল্প ? কে না জানে ঐ গল্প। একদিন ট্রামে বসে একজন লোককে ঐ গল্পটিই বলতে শুনে এমন বিরক্ত হচ্ছিলাম। সবচেয়ে খারাপ লাগে জানা-রসিকতা অপরের মুখে শুনতে? নিজে বার-বার বলতে খুব খারাপ লাগেনা যদিও। কিন্তু গল্পটার শেষ শুনে বুঝলাম, বক্তা একজন সত্যিকারের শিল্পী। পাঠক, ধৈর্য ধবে আর-একবার শুনুন। বক্তা অবশ্য কানাই নামে তার কোন-এক চেনা লোকের নামে গল্পটা চালাচ্ছিলেন। অর্থাৎ কানাই এম. এ. পাশ করেও কোন চাকরি পাচ্ছিলনা। তারপর, তার এক মুরুব্বি তাকে চিড়িয়াখানায় ঢুকিয়ে দিল। চিড়িয়াখানার শিম্পাঞ্জিটা মরে গেছে, তার খাঁচায় শিম্পাঞ্জির ছাল পরে কানাইকে থাকতে হবে। কয়েকদিন বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজ করেও কানাই ওপরওলার মন পেলনা। (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে বিষণ্ণ শিম্পাঞ্জিকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন— তা বোধহয় ঐ ছদ্মবেশী কানাইকে দেখেই) ওপরওলা এসে ধমকে কানাইকে বললেন, এরকম মানুষের মতো চুপ করে বসে থাকলে তার চাকরি যাবে। সুতরাং তারপব থেকে দর্শক এলেই নেচে-কুঁদে কানাই খুব খেলা দেখাতে লাগল। তার ধরে ঝুলে ডিগবাজি খেয়ে তার কসরত হল দেখবার মতো। শেষে একদিন দর্শকদেব মধ্যে দেখতে পেল ওর কলেজের সহপাঠিনী অরুণা সান্যালকে। কোনদিন অরুণার মন পায়নি কানাই। আজ তাকে খুশি করাব জন্য শিম্পাঞ্জি-বেশী কানাই মহা লম্ফঝম্প জুড়ে দিল। তারপর একবার হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় গিয়ে পড়ল পাশের খাঁচায়। সে খাঁচাটা বাঘেব। বাঘ খাঁটি হালুম গর্জন করে এক লাফে এসে পড়ল ভয়ে আধ-মরা কানাইয়ের কাছে। তক্ষুনি তাকে না খেয়ে ভালো করে শুঁকে দেখতে লাগল। তারপর কানাইয়ের কানের কাছে মুখ এনে বাঘ বলল, 'ভয় নেই দাদা, আমিও বাংলার এম.এ.।'

১৫

এমনসময় ধাক্কা লাগল। ল্যাডো গাড়িটা দিশাহারা হয়ে প্রথমে সবগুলো চাকা বেঁকে, — সেইসময় প্রবল হায়-হায় ধ্বনি জনতার — পিছন দিকে গড়িয়ে যেতে

লাগল বেগে, আর ঐ প্রবল, তেজী, দৃপ্ত বেগবান পুরুষ অশ্ব সেই টানে পিছিয়ে যাচ্ছে, সামনের দুটি পা শূন্যে তুলে থামাবার চেষ্টা করল পিছিয়ে যাওয়া গতি। পারলনা। কোচোয়ান আগেই মাটিতে পড়ে গেছে। চি-হিঁ-হিঁ আর্তকণ্ঠ না আক্রোশের হুংকার কী জানি। অমন শক্তিমান ঘোড়া, পিছনের দুই পা ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়েও রুখতে পারলনা নিজেকে বা গাড়িটা। চিৎ হয়ে পড়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ওর চারপাশে মানুষের গোল বৃত্ত।

আমি দোতলার জানালা দিয়ে দেখছিলাম। বৃষ্টি না-হওয়া মেঘের কোমল ছায়ায় চমৎকার সন্ধেবেলা দোতলা বাসের জানালার পাশে বসতে পাওয়ার গর্বে আমি বাসের মানুষদের দিকে আর একবারও তাকাইনি। টিকিটের পয়সা হাতে নিয়ে বাঁ-হাত বাড়িয়েছিলাম অবহেলায়। যেন ওজন্য আমাকে বিরক্ত না-করা হয়। আমি সর্বক্ষণ বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। তাকিয়ে মেঘ দেখছিলামনা অবশ্য, মেঘে কারুর মুখের ছায়া না-ভাসলে বেশিক্ষণ দেখাও যায়না, আমি নিচের দিকে তাকিয়ে খানিকটা করুণার দৃষ্টিতে মন্থর মানুষের স্রোত দেখছিলাম।

সেইসময় ঘোড়ার গাড়িটা আমার চোখে পড়ে। ল্যান্ডো বা টমটম কী বলে ওগুলোকে আমি ঠিক জানিনা, এক-ঘোড়ার গাড়ি, গাড়ির রং মসৃণ চকচকে কালো, ঘোড়ার রং সাদা — পুরো সাদা নয়, শিরদাঁড়াব্যাপী লালচে প্যাচ, কোচোয়ানের মাথায় মুরেঠা, তকমা-আঁটা পোশাকে পিছনে দাঁড়িয়ে হুঁসিয়ার-দার। উত্তর কলকাতার দু-একটি বনেদী বাড়িতে এখনো কয়েকটি এরকম গাড়ি আছে জানি, কিন্তু সহসা চোখে পড়েনা, এ গাড়িটাকে দেখে মনে হয় যেন অকস্মাৎ ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে উঠে এল।

গাড়িটা দেখার সঙ্গে-সঙ্গেই আমার প্রবল ইচ্ছে হল, গাড়িটার মধ্যে যিনি বা যাঁরা আছেন তাঁদের দেখার জন্য। এইসব অভিমানী, পরাজিত তবু মুখে অহংকারের হাসি-ফোটানো মানুষদের দেখতে এখনো খুব কৌতূহল হয়। বনেদীবাড়িগুলো থেকে এইসব জুড়িগাড়ির চল বন্ধ হতে শুরু করে মোটরগাড়ি আসবার পর — এখন অবশ্য, সেসব বাড়ির অনেকেরই আর জুড়ি বা মোটর কোনটা রাখারই সামর্থ্য নেই। মনে আছে, একবার আমি আমার এক বন্ধুর বাড়ির অন্দরমহলের শয়নঘরে গিয়েছিলাম। বন্ধুটির পূর্বপুরুষ কলকাতার অভিজাত সমাজের একজন ছিলেন। ওদের রং-জ্বলা কুৎসিত বিরাট বাড়িটির খিলান ও মণ্ডপ, ধুলোয় ঢাকা ঝাড়লণ্ঠন দেখলে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। কিন্তু দেখেছিলাম, বন্ধুটির মা রান্না করছিলেন একটা বেনারসি শাড়ি পরে। পুরোনো খাঁটি, ভারি চমৎকার, অত্যন্ত দামি শাড়ি — কিন্তু ওর মাকে রান্নাঘরে দেখে সেই মুহূর্তে বুঝতে পেরেছিলাম, ওদের দারিদ্র্য কত নৃশংস জায়গায় এসেছে, দারিদ্র্যের এমন বীভৎস

রূপ আমি শিয়ালদার ফুটপাথে মরে-থাকা ভিখারির মধ্যেও দেখিনি। বন্ধুর মা আমাকে দেখে কিছুটা যেন অপ্রস্তুত হয়েছিলেন, পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রণাম করি, তিনি আশীর্বাদ করার সময় একটু হেসেছিলেন, চাপা বিষাদময় ক্রুদ্ধ অভিমানের হাসি।

ল্যান্ডোর আরোহীদের সহজে দেখতে পাইনি। পর্দা ফেলা ছিলনা, কিন্তু ঘোড়াটা দুলকি চালে ছোটার বদলে বেশ জোরে দৌড়োচ্ছিল। কখনো ডবল-ডেকারের পাশাপাশি আসেনি। ভালো জাতের, বোধহয় একেই ওয়েলার ঘোড়া বলে, ঘোড়াটার মধ্যে যেন পাল্লা দেবার স্পৃহা এসেছিল। মাঝে-মাঝে আমাদের বিরাট দৈত্যের মতন বাস হুস করে ওকে পেরিয়ে বহুদূর এগিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াটা তখন গ্রীবা ফিরিয়ে দেখছে। আবার স্টপে এসে বাস থামার সময় লোকের ভিড়, জেনানাদের ওঠা-নামার অবকাশে টক্ টক টক্ শব্দে ঘোড়ার গাড়ি আমাদের পেরিয়ে যাচ্ছে, ঘোড়াটা তখন আর অবহেলায় বাসের দিকে চেয়েও দেখছেনা। একবার কী-একটা কারণে পথ আটক, বাস ও ল্যান্ডো দুটোই থামল, ঘোড়াটার থেমে থাকা যদিও পছন্দ নয় — অসহিষ্ণুভাবে মাটিতে পা ঠুকছে। তখন আমি আরোহীদের দেখতে পেয়েছিলাম।

একটি নবীনা নারী ও একজন প্রবীণ পুরুষ। দুজনের বয়সের ব্যবধান অন্তত পঁচিশ। অর্থাৎ মেয়েটির বয়েস কুড়ি থেকে পঁচিশ হলে, পুরুষটি পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। যে-রকম হয়, দুজনেই অত্যন্ত গৌর বর্ণের, সুকুমার স্বাস্থ্য, মেয়েটি সেই জাতের সুন্দরী যাদের মুখ বিনা প্রসাধনেও অত্যন্ত উজ্জ্বল দেখায়, ওর চোখ দুটি নিশ্চিত লক্ষণ সেনের কাটা দিঘির জলের মতো কালো ও গভীর — আমি ভালো করে না দেখতে পেয়েও বুঝেছিলাম।

মানুষের স্বভাবই এই, সকলেরই কিনা জানিনা, অন্তত আমার — কোনও অচেনা নারী-পুরুষ একসঙ্গে দেখলেই তাদের সম্পর্কটা মনে-মনে ভাবা। বাক দত্ত-দত্তা, প্রেমিক-প্রেমিকা, দিদির বর ও স্ত্রীর বোন, স্বামীর বন্ধু ও বন্ধুপত্নী, দাদার বন্ধু ও বন্ধুর বোন, দুই শত্রুপক্ষ অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রী ইত্যাদি, এসব জানার আমার কোনও দরকার নেই, একটি যুগলকে এই কয়েক মিনিট দেখছি আর হয়তো জীবনে দেখবনা — ওদের সম্পর্ক জেনে কী লাভ আমার, তবু মন এসব যুক্তি মানেনা, মাথার মধ্যে আন্দাজের পাশাখেলা চলে। মোটরগাড়ির যাত্রীদের দেখে আন্দাজ করা খুব শক্তও নয়, গাড়ি বা ট্যাক্সিতে দুজন নারী-পুরুষ যখন কঠিন মুখে দুজন দুদিকে চোখ ফিরিয়ে বসে থাকে, তখন নিশ্চিত বোঝা যায় ওরা স্বামী-স্ত্রী, একটু ঘনিষ্ঠ, পথচারীদের সম্বন্ধে উদাসীন, কিছুটা বিসদৃশভাবে বসে-থাকা যুগল দেখলে গোপন সম্পর্কের কথা মনে আসে।

কিন্তু এদের দেখে কিছুই বোঝা যায়না। এরা ঠিক কঠিন মুখে নয়, কিন্তু চাপা রাশভারী গাম্ভীর্য নিয়ে এবং হেলান দিয়ে নয়, দুজনেই উন্নতদেহে বসে আছে। যেন পথ চলতে প্রগল্‌ভতা, কথা বলা, ওদের মানায়না। ওরা পিতা-পুত্রী, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী যা-কিছু হতে পারে।

বাধা সরে যেতেই আবার গাড়ি চলতে আরম্ভ করল। অসহিষ্ণু ঘোড়াটা এবার ছুটতে লাগল খুব জোরে। যেন এবার আর কিছুতেই সে ডবল-ডেকারকে এগিয়ে যেতে দেবেনা। এবারই সত্যিকারের প্রতিযোগিতা, কেউ হ্যান্ডিকাপ পায়নি, একই খড়ির দাগ থেকে দৌড় শুরু করেছে। ঘোড়াটার জন্য আমার মায়া হল, অমন সুন্দর জন্তুটা — ঘোড়ার মতো সুন্দর প্রাণী আর বোধহয় পৃথিবীতে একটিও নেই —যার শরীরে প্রতিটি অঙ্গ সুষম, অমন সুন্দর জন্তুটা হেরে যাবার দুঃখ পাবে! মনে-মনে ভাবলাম, হেরে গেলেও তোর দুঃখ নেই রে, মরে গেলেও তুই গতির প্রতীক হিশেবে বেঁচে থাকবি চিরকাল, এই ডবল-ডেকারও বোধহয় হর্স-পাওয়ার দিয়ে মাপা। ঘোড়াটা তবু জেতার দারুণ চেষ্টায় ছুটছিল। সামনেই ট্রাফিকের লাল আলো, বাস আস্তে-আস্তে থেমে গেল, ঘোড়াটা লাল আলো মানলনা, কী জানি কোচোয়ান থামাবার চেষ্টা করেছিল কিনা, ছুটে এগিয়ে গেল।

এমনসময় ধাক্কা লাগল। ক্রস রোড থেকে আরেকটা ডবল-ডেকার, ঘোড়ার চি-হিঁ-হিঁ-র চেয়েও তীব্র যান্ত্রিক শব্দ উঠেছিল বাসের ব্রেক কষার। আমরা স্পষ্ট দেখলাম দৃশ্যটা। ধাক্কা যেন লাগেইনি প্রায়, শেষমুহূর্তে ব্রেক কষে বাস থামার আগে ল্যান্ডো গাড়িটাকে যেন শুধু আলতোভাবে কোণাকুণি ছুঁয়ে দিল। তাতেই গাড়িটা ঝাঁকানি দিয়ে বেঁকে জোরে পিছিয়ে আসতে লাগল, ঘোড়াকে পিছন দিকে টেনে কোচোয়ান নিচে পড়ে গেছে, ঘোড়াটা অসহায়ভাবে দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়েও থামতে পারলনা, পিছিয়ে আসতে-আসতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল। ঘোড়া কি জীবনে পিছু হটেছে, অভ্যেস নেই, পড়ে তো যাবেই। যাক, দুর্ঘটনা সামান্য।

আমি তৎক্ষণাৎ পথে নেমে এসেছিলাম। কীজন্য ঠিক জানিনা। দেখা গেল একজন মানুষেরও প্রাণ যায়নি, পিছনের লোকটি আগেই লাফিয়ে নেমে গিয়েছিল, কোচোয়ান ওপর থেকে পড়ে গেলেও শুধু মাথা ফেটেছে, রক্তাক্ত মুখ — কিন্তু জ্ঞান আছে, সুতরাং প্রাণের ভয় নেই। প্রৌঢ় ও যুবতীটি গাড়ি থেকে নেমে পাশাপাশি চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, প্রৌঢ়ের একটি হাত থুতনিতে রুমাল চেপে ধরা, যুবতীটি অক্ষত, আগেরই মতো শান্ত। শুধু ঘোড়াটা চিৎ হয়ে ছটফট করছে, ওঠার সাধ্য নেই।

মানুষের যদিও দুটি চোখ, কিন্তু একই সঙ্গে দুচোখে দুপাশের দুটি দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি কী করে দেখেছিলাম জানিনা — একই সঙ্গে আমি ঐ শান্ত

যুবতী ও মুমূর্ষু ঘোড়াকে দেখেছিলাম প্রতিমুহূর্তে। এমন একটা কাণ্ডের পরও কী করে অমন অবিচলিত, শান্ত হয়ে ছিল, একটুও ব্যস্ত হয়নি, উত্তেজিত হয়নি — স্থির চোখে মেয়েটি দেখছিল অত বড় জন্তুটার মৃত্যুর ছটফটানি। মেয়েটি এমন কিছু অসাধারণ নয়, সাধারণ সুন্দরী নারী — এমনকী ওর মাথার কাছে সিনেমার পোস্টারে যে নায়িকার মুখচ্ছবি আকা ছিল — তার কাছে সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় এ মেয়েটি নিশ্চয়ই হেরে যাবে — তবু অমন কমনীয় গাম্ভীর্য ও পেল কোথায়, কী করে নির্নিমেষে দেখতে পেরেছিল একটা পুরুষ প্রাণীর মৃত্যু? মেয়েটি এমনভাবে দাড়িয়েছিল — যেন কলকাতার কোনও পথে আগে সে কখনো দাঁড়িয়ে থাকেনি এতগুলো চোখের সামনে — এবং এরকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যে ওকে মানায়না — সে-সম্বন্ধে ও পূর্ণ সচেতনা।

আর ঘোড়াটা মহাকাব্যের করুণতম দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। ঐ বলশালী, বিশাল, জোয়ান অশ্ব চিৎ হয়ে পড়ে প্রাণপণে চেষ্টা করছে উঠে দাঁড়াবার। মুখে বল্গা, চামড়ার ফিতের জটের মধ্যে আটকে থেকে ছিঁড়ে উঠে দাড়াবার প্রয়াস, প্রকাণ্ড সাদা পেটটা যন্ত্রণায় কুঁকড়ে যাচ্ছে, বিশাল চোখ ঘুরছে অসহায়, বিহ্বল, প্রবল ত্রাসে। ঘোড়া কোনদিন বসেনা, শোয়না, চিৎ হয়ে পড়া মানে তো নিশ্চিত মৃত্যু। এমনভাবে পা ছুঁড়ছে যে, কারুর সাহস নেই ওকে তুলে দেবার চেষ্টা করে।

হঠাৎ আমার মনে হল, এই যেন কলকাতার শেষ ল্যান্ডো গাড়ির শেষ ঘোড়া। অবলুপ্তির আগে আরেকবার শেষ চেষ্টা করছে উঠে দাড়াবার। ওর সুদৃশ্য দেহের বলবান পেশীগুলো ফুলে-ফুলে উঠছে চেষ্টায়। পারবেনা, তা তো জানিই, কিন্তু এত পায়-হাটা মানুষের ভিড়ের মধ্যে ওর ঐ পতন, মৃত্যুর চেয়েও করুণ। ঘোড়াটার মুখ দিয়ে সাদা গেঁজলা বেরিয়ে শরীর নিথর হয়ে গেল।

একটাও মানুষ মরেনি শুধু নিতান্ত একটা ঘোড়া, এ খবর জেনে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে ছত্রভঙ্গ হল কৌতূহলী জনতা।

১৬

এমন গ্রীষ্মে এত অসংখ্য ফুল ফুটল কেন এ-কলকাতায়? যেখানে যে-কোন সবুজের অস্তিত্ব আছে, এরণ্ড কিংবা মহাদ্রুম, প্রত্যেক সবুজের সঙ্গেই অন্য-একটা রঙের ফুল ফুটেছে, এমনকী, ময়দানের ঘাসেও ফুটেছে ঘাসফুল। এত ফুলের বাহার দেখে, হঠাৎ আমার অনুতাপ হল, কেন আমি সব ফুলের নাম জেনে রাখিনি আগে। নাম না-জেনে ফুলকে আদর করা যায়না। শেকসপীয়র ভুল বলেছিলেন,

কিংবা অনেক বদলে গেছে ফুল ও মেয়েরা, মেয়েদেব যে-কোন নামে ডাকা যায়, বিয়ের পব তো সব মেয়েবই নাম বদলে যায়, অনেকসময ডাকনামও, কিন্তু গোলাপকে চামেলি নামে ডাকা কে সহ্য কববে? 'গন্ধবাজ' শুনলেই যেমন অন্ধকাবে পাতাব আড়ালে লুকানো রাজমুকুটের মতো সেই ফুলটি চোখে ভাসে, ওকে আব অন্য নামে ডাকা সম্ভব? 'বজনীগন্ধা' নামটা কোথাও উচ্চাবিত হলে, কেন জানিনা, আমাব তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে, আবাকানেব পাহাড়ে-পাহাড়ে পলাতক সুজাব কোন-এক যুবতী কন্যাব শবীব। খুব স্পষ্ট মনে পড়ে, যেন গত বছরেব স্মৃতি। যেমন ভাটিফুল। ঐ নামেব ফুল আমি কখনও চোখে দেখিনি কিংবা দেখলেও চিনিনা, কিন্তু কী জোবালো নাম! শুনলেই শবীব কাঁপে। আমি নিশ্চিত জানি, যেদিন আমি প্রথম ভাটিফুল দেখব, আমাকে নতজানু হযে বসে ক্ষমা প্রার্থনা কবতে হবে। দোতলা বাসে যেতে-যেতে মযদানের একটা উঁচু গাছেব মাথায ঝাক ঝাক বসে থাকা হলুদ ফুল দেখলাম। ও ফুলগুলোব নাম কী? কে যেন বলল, বাধাচূড়া। সবসমযই কৃষ্ণচূড়া ফুলেব গাছেব উল্টোদিকে বাধাচূড়াব গাছ থাকে। কিন্তু যতক্ষণ-না এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পাবছি, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ হলদে ফুলগুলোকে পুবোপুবি তাবিফ কবতে পাবছিনা। ফুলেব নামেব মূল্য অনেক।

আমাব বন্ধু সমীব আমাকে বিপদে ফেলে গেল। চৌবাস্তাব মুখে দাড়িযে কিছুক্ষণ কথা বলছিলাম, ওব হাতে দুটো চাপা ফুল ছিল। একবাব অন্যমনস্কভাবে ওব হাত থেকে ফুলদুটো একটু নিতেই, সঙ্গে-সঙ্গে ও বলল, 'ফুলদুটো তোমাকে দিলাম।' তাবপব আমাকে প্রতিবাদ কবাব বিন্দুমাত্র সুযোগ না-দিযে — আচমকা কোন মানুষকে ধাক্কা দিযে জলে ফেলে পালিযে যাবাব মতো, ও ছুটে গিযে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে অদৃশ্য হযে গেল। আমি অসহায ও বিমূঢভাবে দাড়িযে বইলাম। হাতে চাপা ফুলদুটো। চাপা ফুল! ভাবতেও শবীব শিউবে ওঠে, এ-ফুল আমি হাতে বেখে কী কবব? অথচ আমাব পকেটেব অন্ধকাবে সিগাবেটেব প্যাকেটেব পাশাপাশি, কিংবা রুমালেব সহবাসে এ ফুল বাখাব নয। আমাব হাতে দুটো চাপা ফুল নিযে আমি সাবা বাস্তা ঘুবব, এ দৃশ্য আমাব কাছেই কল্পনাতীত। ফুল হাতে বাখাব নয, অন্য কারুকে দিযে দেবাব। সমীব বোধহয এ ফুল দেবাব মতো কারুকে পাযনি, তাই আমাব হাতে তুলে দিযেই লজ্জায দ্রুত ছুটে পালাল। কিন্তু, আমি কাকে দেব এই ফুল? তাছাড়া, আমাব হাতে ফুল থাকা বেশিক্ষণ নিবাপদ নয।

•

এখানে ফুল সম্পর্কে আমাব একটি অত্যন্ত কুস্বভাব ব্যক্ত কবি। আমি ফুল হাতে বাখা পছন্দ করিনা। গাছ-টাছে ফুটে থাকলে বেশ ভালোই লাগে, কিন্তু হাতে নিলেই আমি তৎক্ষণাৎ মানুষেব মতো হযে যাই। অর্থাৎ অত্যন্ত লোভ

হয়। কোন ফুল দেখে হঠাৎ খুব ভালো লাগলে আমার খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমি অনেক ফুল খেয়েছি। ফুল-খাওয়া দেখলে অনেকে চটে যায়। কী আশ্চর্য! যেন আমি মানুষ খুন করছি। কেউ-কেউ বলে, ফুল নাকি বিষাক্ত হতে পারে। তারা নাস্তিক। আমি কোন দ্বীপে গিয়ে 'লোটোস' নামের ফুল খেয়ে দেখিনি, কিন্তু, জবা কিংবা গন্ধরাজ, গ্যাঁদা কিংবা গোলাপ আমি খেয়ে দেখেছি, এমনকি পদ্মফুল, পোস্তফুলও, ওরা সবাই নিষ্পাপ। ফুলটাকে না-খেয়ে শুধু গন্ধ শুঁকে বাহবা দেওয়া কীরকম অস্বাভাবিক লাগে আমার কাছে। ডলুমাসির বাড়িতে গিয়েছিলাম, নিউ আলিপুরে জাপানি কায়দায় চমৎকার বাড়ি করেছেন, আমাকে করিডরের সারি-সারি টবে ফুল দেখাচ্ছিলেন। জিনিয়ার সঙ্গে সন্ধ্যামালতীর ব্রিড করিয়ে উনি একটা হাল্কা রঙের নতুন ফুল তৈরি করেছেন। আমি দেখে এত অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম যে নিচু হয়ে ঝুঁকে গন্ধ শোঁকার ছলে একটা পাপড়ি দাঁত দিয়ে কেটে চিবিয়ে দেখলাম। ডলুমাসি এমন আঁতকে উঠলেন, বাড়ির সব লোকজনকে ডেকে এমন-একটা দৃশ্যের অবতারণা করলেন যে, বিরক্ত হয়ে আমি ও-বাড়িতে আর যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছি!

সেই থেকে খানিকটা সজাগও হয়েছি অবশ্য। এই চৌরাস্তায় দাঁড়িয়ে আমি যদি চাঁপা ফুলদুটো কচকচ করে চিবিয়ে খাই এখন, তবে এখুনি আমায় হয়তো এক হাজার লোক ঘিরে ধরবে। ভাবতেও আমার পিঠ শিরশির করে উঠল অথচ ইচ্ছেও করতে লাগল খুব। স্বাধীনভাবে শিল্প-চর্চা করার কত বাধা! দুনিয়াটাই ফিলিস্টিনে ভর্তি।

তবু আমি নোখ দিয়ে একটা পাপড়ির কোণ ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখলাম। নিখুঁত। তৎক্ষণাৎ আমার মনে হল, এ-ফুল নিশ্চয়ই উর্বশী চাঁপা। ফুলের শ্রেষ্ঠ চাঁপা, চাঁপার শ্রেষ্ঠ উর্বশী চাঁপা। দেখেই একটু মনে হয়েছিল। উর্বশীর মতোই এ-চাঁপার গায়ের রং, উর্বশীর বাঁ হাতের মাঝখানের আঙুলের মতো এর গড়ন।

উর্বশী চাঁপা আমাকে প্রথমে চিনিয়েছিলেন ডি কে। সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত যখন এলগিন রোডে থাকতেন, ওঁদের বাড়ির পাশে ছিল একটা বিরাট চাঁপা ফুলের গাছ। চাঁপা ফুলের অত বড় গাছ আগে কখনো দেখিনি, বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। ও-গাছটায় বারোমাস ফুল ফুটত। সব গাছেরই ফুল ফোটার একটা নির্দিষ্ট ঋতু আছে, কিন্তু এক-একটা চাঁপা ফুলগাছ চিরযৌবনা। সারাবছরই ফুল ফোটায়, উর্বশীর মতোই ভালোবাসার দিনক্ষণ মানেনা। ডি কে আমাদের মাঝে-মাঝে সেই ফুল দিতেন, আমি খেয়ে দেখেছি, ও-রকম স্বাদ অন্য ফুলে জীবনে পাইনি কখনও।

কিন্তু, এখন এই দুটো ফুল নিয়ে আমি কী করব? তামাকের গুঁড়োর সঙ্গে

মিশিয়ে ওদের আমি পকেটে রাখতে পারিনা। আবার বেশিক্ষণ হাতে রাখার ধৈর্য নেই। হাতে নিয়েই-বা কোথায় যাব? কাকে দেব? এই ফুল কোন মেয়ের হাতে তুলে দেবার মতো সর্বনেশে কথা আমি চিন্তাও করতে পারিনা। কোন নারীর কাছে গিয়ে আমি বলতে পারি, নাও, তুমিই এই ফুলের যোগ্য! মেয়েরা ফুল সহ্য করতে পারেনা, কিংবা ফুলের যোগ্যতা। আমি হর্টিকালচারল গার্ডেনে ফুলের প্রদর্শনী দেখতে প্রতিবার যাই। ওখানে অনেক মেয়ে তাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ সাজসজ্জা করে আসে। আমি ঠিক কাদের দেখতে যাই, নিঃসন্দেহে জানিনা। তবে ঐ ফুলের বাগানে আমি সজ্জিত মেয়েদের শত-শত দুঃখিত মুখ দেখেছি। ঈর্ষার দুঃখ। সঙ্গী পুরুষরা যখন রক্তগোলাপের ঝাড়ের দিকে উৎসুক মুখে চেয়ে থাকে, তখন দেখেছি মেয়েদের মুখে অন্যমনস্ক ঈর্ষা। ওরা সেই ফুলের পাশে কতখানি যোগ্য এই দ্বিধা। মেয়েদের হাতে যখন কেউ কোন ফুল তুলে দেয়, তখন আমি লক্ষ করেছি সেইসব মেয়েদের মুখ। মুহূর্তে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, মুখগুলি ক্ষণকালের জন্য চলে যায় ভুলস্বর্গে। ভাবে, দাতা বুঝি কুসুমের বদলে গ্রহিতাকেই বিজয়িনী করল।

যাক, কিন্তু আমি ফুলদুটো নিয়ে কী করব? চেনা মেয়েদের কথা দূরে থাক, পথের যে-কোন সুন্দরী মেয়েকে হঠাৎ ডেকেও আমি ফুলদুটো দিতে পারিনা? দিয়ে বলতে পারিনা, এই নিন, এ-শুধু আপনার সৌন্দর্যের প্রতি নির্লোভ স্তুতি। এ-দেশে ওরকম নীতি নেই। স্তুতি জিনিশটাকে আজকাল আর কেউ নির্লোভ ভাবেনা। সেইজন্যই তো কবিদের আর স্থান নেই এ-সমাজে।

শেষপর্যন্ত আমি বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলাম, ফুলদুটো নিয়ে একি ঝঞ্ঝাট! এই দুটো সুগন্ধ ফুল আমার সন্ধেবেলাটা নষ্ট করে দিচ্ছে, আমি এতক্ষণ চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি স্থাণুর মতো। কী করব এদের নিয়ে, না-জেনে। শেষপর্যন্ত কি ফুলদুটো শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হবে? ঠিক করলাম, খুন করব ওদের। কুসুমহত্যায় নারীহত্যার অপরাধ নেই। ইচ্ছে হল, নির্মম আঙুলে ওদের ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলি। কিন্তু এমন রাগ চড়তে লাগল আমার, মনে হল ঐ শাস্তিও যথেষ্ট নয়। তখন ঠিক করলাম, ওদের ট্রামলাইনের ওপর ফেলে দেব, তারপর পর-পর ট্রাম এসে ওদের থেৎলে দেবে – সেটা আমি চোখের সামনে দাঁড়িয়ে দেখব। আমি রাস্তার এ-পাশে দাঁড়িয়ে ফুলদুটোকে দূরের ট্রামলাইনের দিকে ছুঁড়ে দিলাম।

ঘটনা গল্পের চেয়েও সাংঘাতিক হয়। হুস করে একটা কালো মোটরগাড়ি এল মাঝপথে, ফুলদুটো গাড়ির জানালা দিয়ে গিয়ে পড়ল একটি মেয়ের কোলে। আমি ভয় ও লজ্জায় সরু হয়ে গেলাম। আমি ফুল খেতে পারি, কিন্তু অচেনা

মেয়ের গায়ে ফুল ছুঁড়ে দেবার মতো রোম্যান্টিক কু-কীর্তি করা আমার স্বপ্নের অতীত। সম্পূর্ণ আকস্মিক এই কাণ্ড। গাড়িটা একটু দূরে গিয়েই থেমে গেল। আমি চোরের মতো সরে গিয়ে গ্যাসপোস্টের আড়ালে লুকোলাম। মনে-মনে তখন আমি হাতজোড় করে আছি। কিন্তু এগিয়ে গিয়ে ক্ষমা চাইবার ইচ্ছে হলনা, বা সাহস।

গাড়িটা একটুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল, আহা, কী রূপ মেয়েটির, সরল দীর্ঘ শরীর বাটিকের-কাজ-করা সিল্কের শাড়ি-পরা, কালো কোঁকড়া চুলের মধ্যে যেন গন্ধরাজ ফুলের মতন মুখখানা ফুটে আছে। মেয়েটি এদিকে এগিয়ে এল। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল একটি যুবা। এর রূপেরও তুলনা নেই — আথবদের মতো দেহ, কিন্তু কমনীয়, সাহেবি পোশাক-পরা, দাড়ি কামাবার পর ফর্সা মুখে নীলচে আভা পড়েছে। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেল, এরকম সুসদৃশ জুটি কদাচিৎ চোখে পড়ে। এরকম যৌবনবন্ত দম্পতি দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। এদের উচিত নয় আমাকে রাগ করে শাস্তি দেওয়া। ওরা যেমন মনের সুখে যাচ্ছিল, তেমনিই চলে যাক-না মনের সুখে। দুটো ফুল আর কী বিঘ্ন ঘটাবে।

ছেলেটি দ্রুত এসে মেয়েটির বাহু ছুঁয়ে বলল, 'আঃ সুনন্দা, এসো, গাড়িতে ফিরে এসো, কী দরকার।'

— দাঁড়াও, একবার দেখে যাই, লক্ষ্মীটি।

— কাকে?

— আমি জানি কে ফুল ছুড়েছে।

হঠাৎ পুরুষটি মেয়েটির বাহু থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল, 'তুমি তাহলে আজও অজয়কে ভুলতে পারনি?'

মেয়েটি অসহায়ভাবে বলল, 'একটু দাঁড়াও। রাগ কোরো না। একবার অন্তত দেখা করে যাই। এখানেই কোথাও নিশ্চয়ই লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একবার শুধু।...'

মেয়েটি আকুলভাবে তাকাল এদিক-ওদিক। যুবকটি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের দেখে, হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, ওরকম অসুখী মুখ আমি আর জীবনে দেখিনি। জানতাম উর্বশী চাপা সর্বনাশিনী।

১৭

নিউমার্কেটে অনেকে যায় রকমারি মনোহারী জিনিশপত্র দেখেশুনে কিনতে। আবার কেউ-কেউ যায় — যারা কিনতে এসেছে, তাদের দেখতে। আমার বন্ধু হরিশ ঐ দ্বিতীয়দলের। হাওড়ার দিকে একটা ইস্কুলে পড়ায় হরিশ, থাকে ঐ দিকেই। কিন্তু প্রত্যেকদিন সন্ধেবেলা তাকে চৌরঙ্গি এলাকায় দেখা যাবে। বিলিতি সিনেমা-হলগুলির সামনে — কোনটার কখন শো ভাঙে তার মুখস্থ, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে, যেন কাকে খুঁজছে — অথবা কেউ আসবে ওর জন্য — এমন প্রতীক্ষার মুখে তাকায় চৌদিকে — তারপর যখন সকলেই ঢুকে যায় হলের মধ্যে — ও তখন ছোট্ট একটু হেসে এগিয়ে যায়। শ্লথ পায় ঘুরতে-ঘুরতে নিউমার্কেটের মধ্যে যায়, বারবার চক্কর দেয়, গভীর মনোযোগ দিয়ে হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি দেখে, প্রত্যেকটি মুখ, এমন অধ্যবসায় ওর যে কোন দোকানের মধ্যে ঢুকে যে তরুণী মহিলাটি অনেকক্ষণ ধরে কিছু কেনাকেটা করছেন — যার শুধু পিঠটুকু দেখা যাচ্ছে — আমাদের হরিশ কোন ছুতোয় গ্লাসকেসের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে, সেই মহিলাটির মুখ না-দেখা পর্যন্ত নড়েনা। ততক্ষণে সিনেমা-হলগুলিতে ইন্টারভ্যাল শুরু হয়েছে, সুতরাং ব্যস্ত হয়ে হরিশ আবার বেরিয়ে যায়, ভিড়ের মধ্যে মিশে একটা সিগারেট ধরিয়ে এমন ঘন-ঘন টানতে থাকে যে মনে হবে হরিশও হল থেকে বেরিয়েছে ইন্টারভ্যালে, সিগারেট শেষ করেই আবার ঢুকে যাবে। তারপর দমকা ঝড়ে সবকটা শুকনো পাতা উড়ে যাবার মতো ঘন্টা শুনে টিকিট-কাটা নারী-পুরুষেরা এক মুহূর্তে উধাও হয়ে যাবার পর — সম্পূর্ণ ফাঁকা আলো-ঝলমল প্রবেশপথে একা দাঁড়িয়ে থাকে হরিশ। একটু পরে আস্তে-আস্তে বাসস্টপে এসে অনেকগুলো বাস ছেড়ে দেয়। বেশ আসক্ত এবং প্রীতিভরা চোখে পথের বিশেষ-বিশেষ চলন্ত মূর্তিকে খুঁটিয়ে দেখে —। একসময় বাস ধরে বেশ খুশি মনে বাড়ি ফিরে যায়। ভুলেও কোনদিনও কোন সিনেমা-হলের ভেতরে ঢোকেনি, নিউমার্কেট থেকে একটিও জিনিশ কেনেনি আজ পর্যন্ত।

পর-পর তিনদিন হরিশের সঙ্গে আমার একই জায়গায় একই সময়ে দেখা হবার পর জিজ্ঞেস করলাম, 'কী রে, তুই এখানে রোজ কী করিস?'

— বেড়াতে আসি।

— শালকের ছুতোর পট্টি থেকে তুই রোজ চৌরঙ্গিতে বেড়াতে আসিস?

হরিশের বয়েস প্রায় তিরিশ, দোহারা ছিপছিপে চেহারা, টিকোলো নাক, বিবাহিত, বাড়িতে ডিমওয়ালা এলে প্রত্যেকটি ডিম জলে ডুবিয়ে পরীক্ষা করে তবে কেনে, জামা ছিঁড়ে গেলে শীতকালে কোটের নিচে পরবার জন্য আলাদা করে জমিয়ে রেখে দেয়, এ-বছরের দোলের জামা কেচে তুলে রাখে আগামীবারের

দোলের জন্য, রাস্তায় চারটে পয়সা কুড়িয়ে পেলে সঙ্গে-সঙ্গে দুটো পয়সা দেয় ভিখিরিকে— এ-হেন হরিশ রোজ চৌরঙ্গিতে নিছক বেড়াতে আসে? শুনে কীরকম আশ্চর্য লাগে। কিন্তু তখন দাঁড়িয়ে কথা বলার সময় নেই হরিশের। চলতে শুরু করেছে, আমাকে সঙ্গে আসতে বলে। ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমিও পূর্ববর্ণিত ভ্রমণ-দর্শন সমাপ্ত করি, চোখদুটো বিস্ময়ের চিহ্ন করে। আমার দেখা পেয়ে বিরক্ত হয়নি, বরং একটু খুশিই হয়েছে হরিশ, মনে হল। বলল, 'সন্ধের দিকে আগে একটা টিউশানি করতাম, ছেড়ে দিয়েছি। এখন এখানে রোজ বেড়াতে আসি। মনটা বেশ ভালো থাকে।'

— কেন, এখানে রোজ-রোজ কী দেখার আছে?

— দেখতে জানলেই দেখা যায়। কত সুন্দর-সুন্দর মেয়ে-পুরুষ এখানে...

— তা ঠিক। কিন্তু —

— চোখ জুড়িয়ে যায়, ভাই! সারা কলকাতার ছাঁকা জিনিশ দেখতে পাওয়া যায় যে-কোন সন্ধেবেলা চৌরঙ্গিপাড়ায় এলে। এই সিনেমা-হলগুলোতে, নিউমার্কেটে কেউ খারাপ পোশাক পরে আসেনা। খারাপ চেহারারও কেউ আসেনা বড়-একটা। আমার বড় ভালো লাগে দেখতে এদের।

— সে কী রে, শুধু-শুধু ভালো জামাকাপড়-পরা মেয়ে-পুরুষ দেখতে—

— মেয়ে-পুরুষটা কথার কথা। আমি আসি শুধু মেয়েদেরই দেখতে, ফ্র্যাঙ্কলি বলছি।

— এটা একটা কাজের কথা বটে। কিন্তু তুই তো বেশ স্পষ্ট স্বীকার করলি।

— করবনা কেন? সুন্দর জিনিশ দেখার মধ্যে লজ্জার কী আছে? সারা কলকাতার মধ্যে মাত্র এ-জায়গাতেই তুই একসঙ্গে এত সুন্দর মেয়েদের দেখতে পাবি। স্বাস্থ্যবান, মুখে হাসি মাখানো, কী সুন্দরভাবে পোশাক পরতে জানে, প্রসাধন করতে জানে। চকচকে মুখ — কিন্তু পাউডার কিংবা পেন্ট দেখতে পাবিনা। কারুকে দেখতে প্রজাপতির মতো, কেউ চন্দনা পাখি, কেউ হিরামন। তন্বী, শ্যামা, শিখরিদশনা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা ইত্যাদি-ইত্যাদি সংস্কৃত বিশেষণের সবরকম নায়িকা দেখতে পাবি এখানে। দেখলে চোখ সুস্থ হয়। থাকি ভাই বস্তির পাশে — সেখানে দিনরাত নোংরার মধ্যে চেল্লাচেল্লি, ইস্কুলে দেখতে হয় কতকগুলো হাড়-জিরজিরে ছেলে, পথেঘাটে সবসময় ভিখিরি-ফিকিরি আর কুচ্ছিৎ মানুষের মেলা -- ও-সব দেখতে-দেখতে চোখ পচে যায়। এখানে এসে তাই রোজ খানিকটা সৌন্দর্য দেখে যাই। তুই অবশ্য বলতে পারিস, কেন, সৌন্দর্য কি শুধু মেয়েদেরই মধ্যে? প্রকৃতির—

— না, আমি তা বলতামনা।

— অন্য-কেউ বলতে পারে। কিন্তু কী জানিস, কয়েকদিন গঙ্গার ঘাটে কিংবা

শিবপুরের বাগানে প্রকৃতি দেখতেও গিয়েছিলাম। পোষালনা। গাছপালার প্রধান দোষ ওরা বদলায়না। একইরকম। কিন্তু প্রত্যেকটি মেয়ে আলাদা। এমনকী, এক-একটা মেয়ে এক-একদিন আলাদা। জানিস, আজকাল আমি নভেল-নাটকও পড়িনা। পড়ার দরকার হয়না। এখানে এতগুলো গল্পের নায়িকা। এদের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বোঝার চেষ্টা করি কোন্ মেয়েটি স্বামীর গরবে গরবিনী, কে লুকিয়ে প্রেম করছে, কার স্বামী লম্পট, কার সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে অনেকদিন পর ছেলেবেলার প্রেমিকের, কে হঠাৎ দেখতে পেল নিজের প্রেমিকের সঙ্গে অন্য মেয়েকে। আমি সব বুঝতে পারি। পেরে লুকিয়ে হাসি। ঐ যে মেয়েটাকে দেখছিস একা-একা উদাসিনীর মতো ব্লাউজপিস্ কিনছে — পরশুদিনই ওকে দেখেছি একটা সুন্দর ছেলের হাত ধরে ঘুরতে, হাসতে-হাসতে গড়িয়ে পড়ছিল তার গায়ে। আজ ওর দুঃখে আমার মনে কষ্ট হচ্ছে। তুই আসবি মাঝে-মাঝে?

যখন কলেজে পড়তাম একসঙ্গে, তখন হরিশ বলত, সব মেয়েই গুপ্তচর। সবকটা মেয়েই স্পাই, জানিস? ও বেশ জোর দিয়ে বলত। ওরা পৃথিবীতে এসেছে শুধু খবর বার করে নেবার জন্য। মেয়েরা জানেনা এমন-কোন জিনিশ আছে? এমন-কোন ছেলেকে দেখেছিস — যে মেয়েদের কাছ থেকে কিছু লুকোতে পেরেছে? মেয়েরা কাছে এসে ছলাকলা দিয়ে হেসে অভিমান করে ছেলেদের পেটের সব খবর বার করে। পেট বা হৃদয় যাই বলিস।

ছাত্রজীবনে আমি শব্দতত্ত্ব নিয়ে খুব মাথা ঘামাতাম। হরিশের এই অভিনব থিয়োরিরও গূঢ় কারণ আমি শব্দতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলাম। সেসময়ে আমরা খুব ফিলম দেখতাম — হরিশও ছিল পাঁড় সিনেমাখোর, অবশ্য যদি অন্য কেউ ওর টিকিট কাটত। ভালো-ভালো বই এলে ও কারুকে ওর টিকিট কাটার জন্য প্রায় হাতে পায়ে ধরত। সেসময়ে আমাদের হৃদয়েশ্বরী ছিল ইনগ্রিড বার্গমান। ওকে মনে হত স্বর্গের দেবী। ছায়াছবিতে ওর হাসি, অশ্রু আমাদের ঘন-ঘন হৃৎকম্প ঘটাত। ইনগ্রিড বার্গমানের একটা ছবিও বাদ দিতামনা। ওর নামের আদ্যক্ষর দুটি নিয়ে আমরা আদর করে ওকে ডাকতাম আই বি। আই বি! আই বি থেকে স্পাই ভাবা খুব সহজ, সেই থেকেই হরিশের কাছে সব মেয়েই স্পাই। কিন্তু হরিশ একসময় সব মেয়েদের গুপ্তচর ভাবত, এখন দেখছি ও-ই মেয়েদের পেছনে গুপ্তচরগিরি করে বেড়াচ্ছে। পুরোনো কথা মনে পড়তেই হঠাৎ আর-একটি কথা মনে পড়ল। আমি বিষম উৎসাহে বললাম, 'হরিশ, আই বি কলকাতায় এসেছে।'

— কে?

— ভোর মনে নেই। ইনগ্রিড বার্গমান। কাগজে ওর আসার খবর পড়েছিলাম,

আজ দুপুরে দেখলাম গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বেরুচ্ছে। ওঃ, এখনো কী রূপ।

— জানি। হরিশ বিমর্ষ গলায় বলেই চুপ করে গেল।

— কী রে। ইনগ্রিডকে একবার দেখতে ইচ্ছে করে না? এত সৌন্দর্য দেখবার ইচ্ছে।

— দেখেছি কাল সন্ধেবেলা নিউমার্কেটে। কী হতাশ হয়েছি কী বলব। এখানে যত রূপসী মেয়েদের দেখি — কারুকে চিনিনা, নাম জানিনা — কিন্তু ওদের ব্যক্তিগত জীবনের কথা কল্পনা করতে আমার ভালো লাগে, মনে-মনে আমি ওদের সম্পর্কে গল্প বানাই। কিন্তু যাকে আগে থেকেই মনে-মনে জানি তাকে স্বচক্ষে দেখলে কী খারাপ লাগে! ইনগ্রিড সম্পর্কে সব জানি, কটা বিয়ে, কটা ছেলেমেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু সিনেমায় ওকে মনে হত নন্দন কাননের অপ্সরী। জারের হারানো মেয়ে চিরযৌবনা আনাস্টাসিয়া। কাল তাকে নিজের চোখে দেখলাম — এরকম সাধারণ নগণ্য কুচ্ছিৎ মেয়ে কম দেখেছি। একবার হাই তুলল, দেখলাম, উফ ...

— কী হল রে।

— হাই তোলা অবস্থায় দেখলাম। একটা বিকট মুখ। ঘোড়ার মতো দুটো বিরাট মাড়ি। কেন যে দেখলাম ওকে। ওর সারা মুখে যা মাখানো দেখলাম — তা স্বর্গীয় সুষমা নয়, নিরবচ্ছিন্ন বোকামি। আমি আর-কোন কল্পনার রূপসীকে কাছ থেকে দেখতে চাইনা। কেন ওর কথা মনে করিয়ে দিলি? বাড়ি যাই।

১৮

দোতলা বাসের ঠিক সামনের জানালায় বসে ছিলাম, তাই অমন সুন্দরভাবে দেখতে পেলাম দৃশ্যটা। সন্ধেবেলা অন্ধকার হয়ে এসেছে, বিশাল চকচকে চৌরঙ্গি, জ্বলে উঠেছে আলো! কীড স্ট্রিট যেখানে এসে মিশেছে চৌরঙ্গিতে, সেখানে মসৃণ কালো চওড়া চৌরঙ্গির ঠিক মাঝখানে একটি লোক শুয়ে আছে।

হঠাৎ ঝাঁকুনি দিয়ে বাসটা থেমে গেল। সমস্ত লোক হুড়মুড় করে এসে উঁকি দিল জানালা দিয়ে। চৌরঙ্গিতে এরকম দৃশ্য আগে কেউ দেখেনি, অথবা দেখেছে হয়তো— দুপাশের সিনেমা-হলগুলোর মধ্যে পর্দায় — কিন্তু এমন জীবন্ত, রক্তমাংসের দৃশ্য। সত্যিই দৃশ্যটির কম্পোজিশনের তুলনা হয়না। চৌরঙ্গি রাস্তাটাকে দেখাচ্ছে ধুধু করা বিশাল, রবিবারের সায়াহ্ন হলেও পথে আর একটি লোকও নামেনি, শূন্য, কালো রাস্তার ঠিক মাঝখানে সাদা পোশাক-পরা লোকটি শুয়ে আছে। এই সন্ধেবেলা ঐ লোকটাই যেন এ রাস্তার অধিপতি। দুহাত দুদিকে

সম্পূর্ণ ছড়ানো, পা-দুটো টান করা। মুখে একটু বিকৃতি নেই, দুঃখ নেই, রাগ নেই — খানিকটা যেন উদাসীনতা। কষ দিয়ে খানিকটা রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, দেখা যায় কি, দেখা যায়না।

আমার সঙ্গিনী বললেন, 'উঃ কী ভয়ংকর দৃশ্য!'

আমি বললাম, 'তোমার ভয়ংকর লাগল? আমার তো সুন্দর লাগছে। ঠিক ফাঁকা রাস্তার মাঝখানে — অমন হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে থাকা সিনেমায় দেখলে তো আর্টের প্রশংসা করতে!'

— বাজে বকবক কোরোনা। চলো নেমে পড়ি। এক্ষুনি বাস পোড়াবে।

আমি বললাম, 'না, দেখে মনে হচ্ছে খানিক্ষণ আগে ঘটে গেছে। বাস পোড়াবার হলে এতক্ষণে শুরু হয়ে যেত! কাছেই দেখলাম কয়েকটি পুলিশ ও একটি অক্ষত একতলা বাস দাঁড়িয়ে আছে।'

— তাহলে সরিয়ে নিয়ে যায়নি কেন? এটা কি সকলের দেখার জিনিশ?

— নেবে, নেবে। অনেকরকম নিয়ম-কানুন আছে তো! চট করে ডেড বডি ছোঁয়া যায়না। তুমি মুখ ফিরিয়ে বসো-না!

বাসের মধ্যে ততক্ষণ হই-হল্লা, জুতোর শব্দ, জিব ও ঠোঁটের সংযোগে যাবতীয় বিচিত্র ধ্বনি-ব্যবহার শুরু হয়ে গেছে। কয়েকজন উৎসাহী নেমে গিয়ে কাছ থেকে দেখতে গেল, একজন কনস্টেবল কাছাকাছি এসে সরবরাহ্ করে গেল কিছু তথ্য। আমরা ওপরতলায় বসেই জানতে পারলাম লোকটির পকেটে কোন কাগজপত্র নেই। এখনও অজ্ঞাতপরিচয়। সঙ্গিনীকে বললাম, 'একজন অজ্ঞাতপরিচয় মানুষের এর চেয়ে মহান মৃত্যু আর কী হতে পারে? সকলের চোখের সামনে, রাজার মতো!'

তিনি বললেন, 'একজন মানুষ মরল, আর—'

— কলকাতা শহরের কোথাও-না-কোথাও এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই আরও একজন লোক মরছে। সারা পৃথিবীতে কয়েক শো—

— একি কথা হল?

— কেন না? মরা ইজ মরা। মানুষ মরছে এবং মানুষ মরবে — এইটাই আসল। নিজেরা কতক্ষণ বেঁচে আছি সেইটাই বড় কথা, অন্য লোকের মরা নিয়ে দুঃখ করার কী আছে? তাছাড়া এই লোকটা হয়তো আত্মহত্যা করেছে। মরা আর আত্মহত্যা তো এক নয়!

— যাঃ ভাল্লাগেনা। চলো নেমে পড়ি। গোলমাল হচ্ছে। এখনই হয়তো বাসে আগুন লাগানো শুরু হতে পারে।

— না, না, ভয় নেই। আগুন লাগলে গোড়া থেকেই লাগে। তাছাড়া ওটা

আগুনের গোলমাল নয়। বাস ছাড়তে দেরি হচ্ছে কেন হয়তো তা নিয়ে। আবার কেউ কেউ হয়তো বলছে আর একটু পরে, আমার এখনো দেখা হয়নি।

— তুমি তো সব-জান্তা!

— তুমি আগুন লাগাবার ভয় পাচ্ছ। আমি অন্য দৃশ্যও দেখেছি। সকাল দশটার সময় অফিসযাত্রী ভিড়ভর্তি গাড়িতে — ইংরেজিতে যাকে বলে সার্ডিন প্যাকড় — লোকে অদৃশ্য হাতল ধরে ঝুলে চলেছে — এমনসময় একজন লোক পড়ে গেল, পিছনের চাকায় দুটো পা-ই কাটা গেল তার। গাড়ি থেমে গেল, পুলিশ আসবে — তারপর কতক্ষণে ও-গাড়ি ছাড়বে কে জানে! বাসভর্তি লোক চেঁচিয়ে উঠল — পাশ কাটিয়ে টেনে চলো-না ড্রাইভারদাদা। ব্যাটাচ্ছেলে মরার আর সময় পেলনা — এই অফিসের টাইমে, এই নিয়ে তিনদিন লেট!

— সত্যি, এমনভাবে গাড়ি চালায় না! উঃ, কে কতক্ষণে প্রাণ নিয়ে বাড়ি ফিরবে —

— কী মুশকিল। গাড়ি চালাবার কী দোষ। মনে করো-না — গাড়ি-চাপা পড়াটা একটা নতুন রোগ। আগে বন্যায় প্রতি বছর হাজার-হাজার লোক মরত, এখন বাঁধ দিয়ে বন্যা বন্ধ করা হয়েছে। কলেরা-টাইফয়েড-টি বি হলে লোকে বাঁচতনা। এখন ওসব অসুখ তো নস্যি। তার ওপর শান্তির বাণী দিয়ে পৃথিবীর বড়-বড় যুদ্ধ আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সব লোক তো চিরকাল বাঁচলে চলবেনা। কিংবা সবাই থুত্থুড়ে বুড়ো হয়ে মরলেও অনেক ঝঞ্ঝাট। তাই প্রকৃতি তার নিজের রাস্তা খুঁজে নেয়। এখন দেখা দিয়েছে গাড়ি-চাপা রোগ। ক্যান্সারেরও ওষুধ বেরুবে, কিন্তু গাড়ি-চাপা রোগের ওষুধ বেরুবেনা। কাগজে পড়নি — প্রত্যেক বছর ক্রীসমাসের সময় আমেরিকায় পাঁচ-ছ'শো লোক মারা যায়।

— এর থেকে বাবা, যুদ্ধও ভালো।

— যুদ্ধ আর কী এমন। হিটলার যত লোক মেরেছে, তার চেয়ে পৃথিবীর বেশি লোক মেরেছে মোটরগাড়ি। কতবড় সাংঘাতিক অসুখ তাহলে এটা ভেবে দেখো।

— অসুখে তবু লোকে ভুগে-ভুগে মরে। এ একেবারে —

— বাঃ। তুমি কখনো শোননি — একজন লোক কথা বলছেন কথা বলছেন হঠাৎ এমনসময় উঃ বলে একেবারে অক্কা। কিংবা কোন লোক খবরের কাগজ পড়ছে বসে-বসে — হঠাৎ মাথাটা ঝুঁকে পড়ল সামনে, শেষ? থ্রম্বসিসেও অনেকসময় এইরকম হয়। অথবা, মাঠের মধ্যে গাছতলায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে — হঠাৎ কড়াৎ করে বাজ পড়ল! কিছুদিন আগে বুলু দাশগুপ্ত নামে একজন খুব ভালো ফোটোগ্রাফার মারা গিয়েছিলেন এইভাবে — কাগজে পড়নি?

এরকমভাবে মরলে তুমি কার ওপর রাগ করবে? কীসে আগুন লাগাবে? যত রাগ গাড়ির ওপর।

— নিজে যেদিন পড়বে, সেদিন বুঝবে।

— নিজে পড়লে তো আর দুঃখ করার জন্য পরে বেঁচে থাকবনা। তুমি না-হয় দু-এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে।

— ইস্, বয়ে গেছে আমার।

— ভূত হয়ে এসে তাহলে ঘাড় মটকাব তখন বলে দিচ্ছি।

মনোযোগ অন্যদিকে দিতে হল। রাস্তা থেকে নতুন গোলমাল শুনে আমরা আবার জানালা দিয়ে মুখ বার করে দেখলাম। সত্যি-সত্যি কি গাড়িতে আগুন লাগাবে না কি? না, পুলিশের আর-একটা গাড়ি এসেছে, সেইসঙ্গে মৃতদেহ নিয়ে যাবার ভ্যান। দুজন খাঁকি হাফশার্টপরা লোক হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে চ্যাংদোলা করে তুলল মৃত লোকটাকে। মধ্যবয়স্ক, মাথায় অল্প টাক, জোয়ান পুরুষ, মুখখানি প্রশান্ত। বয়ে নিয়ে যাবার সময় লোকটার একটা হাত লটপট-লটপট করে ঝুলছিল। 'মড়ার হাত মাটি ছুঁতে চায়—' কমলবাবুর লেখায় পড়েছিলাম। এতক্ষণ নজর পড়েনি, এখন দেখলাম লোকটার এক হাতে তখনও একটা ক্যালেন্ডার শক্ত করে ধরা। প্রাণ ছেড়েছে কিন্তু ক্যালেন্ডারটা ছাড়েনি। ওঃ, লোকটি তাহলে আত্মহত্যা করেনি, আমি বুঝতে পারলাম। কারণ সময় ও ভবিষ্যৎ জানার ওর লোভ ছিল। 'ডেথ কাপীস নো ক্যালেন্ডার' — ছেলেবেলায় ওয়ার্ডবুকে পড়েছিলাম, হঠাৎ মনে পড়ল।

আমাদের বাস তখন ছেড়েই ছুটে চলল হু-হু করে। শীত ফুরিয়ে এবার বসন্তের মিষ্টি হাওয়া লাগছে গায়। আমার সঙ্গিনী আর একটিও কথা না-বলে হঠাৎ চুপ করে গেলেন। ওঁকে কেমন যেন ক্লান্ত দেখাতে লাগল সেইমুহূর্তে। বুকের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে আর কোনদিকে না-চেয়ে বসে রইলেন। আমি আর তাঁকে বিরক্ত করলামনা।

আমরা বেরিয়েছিলাম থিয়েটার দেখব বলে। বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটার পর আমার সঙ্গিনী অকস্মাৎ বললেন, 'আমি আজ আর থিয়েটার দেখতে যাবনা।'

— সেকি! কেন?

— আমার গা গুলোচ্ছে। আমি বাড়ি ফিরে যাব। উঃ, এরকম দৃশ্য যেন আমার কোন শত্রুও কখনো না-দেখে!

— কী ছেলেমানুষ তুমি! এরকম সামান্য ব্যাপার নিয়ে কেউ নিজের মন খারাপ করে! কত কষ্ট করে পেয়েছি টিকিট আর তোমার সঙ্গে এই সন্ধেবেলা।

তা নষ্ট করবে ? আমরা যারা বেঁচে আছি, আমাদের তো আনন্দে থাকতেই হবে। চলো থিয়েটার দেখি—

— থিয়েটার তো দেখলাম ! রাস্তায় ঐরকম দৃশ্য — আর সেই তোমার লেকচার !

১৯

তর্কাতর্কি হচ্ছিল বাড়ির ঝি-চাকরকে অবসর সময়ে লেখাপড়া শেখানো উচিত না কি এই নিয়ে। প্রায় সকলেই এতে একমত ছিলাম, কিন্তু একবন্ধু রেগে উঠে বললেন, 'কী বিশ্রী ধারণা তোমাদের ! বাড়িতে ঝি-চাকরদের লেখাপড়া শেখানো খুব একটা মহৎ কাজ হবে মনে করছ ? বাড়িতে ঝি-চাকর রাখাই যে কত অন্যায়, সেটা বুঝতে পারছনা ? আর কতদিন এরকমভাবে মনুষ্যত্বের অপমান করা হবে ? প্রত্যেকের উচিত, নিজের-নিজের পরিবারের কাজ নিজেদের করে নেওয়া। তাকিয়ে দেখো আমেরিকার দিকে। জান, সেখানে স্বয়ং রকফেলারের বাড়িতেও চাকর নেই ?'

অপর বন্ধু বিনীতভাবে বললেন, 'জানি, কথায়-কথায় আমেরিকার কথা উল্লেখ করা তোমার একটা কু-স্বভাব। আমরা কেউ আমেরিকায় যাইনি, সে দেশ দেখিনি। তবে যতদূর শুনেছি, আমেরিকার সঙ্গে আমাদের দেশের তুলনা করা বোকামি — না, না, তোমার ক্ষেত্রে বোকামি বলছিনা, বরং বলা যায়, বুদ্ধি ব্যয় করার আলস্য। ঝি-চাকর রাখার প্রয়োজনটা পারস্পরিক। সকলেই যদি ভদ্রভাবে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায়, তবে লোকে বাড়িতে ঝি-চাকরের কাজ করতে আসবে কেন ? রিকশা চাপা অমানবিক বলে এখনই সকলে রিকশায় চড়া বন্ধ করে রিকশাওলাদের না-খেতে দিয়ে মেরে ফেলার মধ্যে কোন মনুষ্যত্বের পরাকাষ্ঠা আছে আমি জানিনা। আমেরিকার কথা আপাতত ভুলে, তোমার উচিত রাস্তার একটি ভিখিরির ছেলেকে তোমার বাড়িতে চাকরের কাজ দেওয়া, আর —

— হাঁ, চুরি করে সব ফাঁক করে দিক আর কি !

— সেটুকু লোক চেনার ক্ষমতা নেই ? তাকে কিছু-কিছু লেখাপড়া শেখালে, সে বরং পরে স্বাধীন জীবিকা নেবার সুযোগ পেতে পারে। আর ভিখিরি হয়ে থাকলে, সে পড়ে না-খেয়েই মরত বা চোর-গুণ্ডা হত। একটু লেখাপড়া শেখালে আমাদেরও সুবিধে। অন্তত চিঠি ফেলে দিয়ে আসতে বললে — চিঠিটা রাস্তায়

গিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবেনা, কিংবা ঘড়িতে চাবি দিতে বললে — সারা বাড়ি খুঁজে চাবি নিয়ে আসবেনা, কিংবা সেই যে, একজন তার চাকরকে বলেছিল — 'আমায় যখন কেউ ডাকবে, তখন আগে তাকে বাইরের ঘরে বসাবে — তারপর আমায় খবর দেবে, বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবেনা।' তারপর একদিন চাকর এসে বলেছিল, 'আজ্ঞে আপনাকে একজন ডাকছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বসাতে পারিনি, শেষটায় শুইয়ে রেখে এসেছি!' — অর্থাৎ টেলিফোন!

অপর একজন বন্ধু বললেন, 'চাকরদের লেখাপড়া শেখানো খুব ভালো। কিন্তু তাতে অনেক মূল্য দিতে হয় নিজেদেরও। আমাদের বাড়িতে শত্রুঘ্ন বলে একটি চাকর ছিল। বেশ জোয়ান, ছটফটে ছেলেটা। বড়দা তাকে লেখাপড়া শেখালেন। ছেলেটার মাথাও ছিল, চটপট অনেকখানি শিখে গেল। তারপর বড়দা তাঁর বন্ধুকে বলে কুলটির কারখানায় চাকরি করে দিলেন। এখন বেশ ভালো চাকরি করছে, স্কিলড ওয়ার্কার হয়ে গেছে, কাজকর্ম শিখে ওভারটাইম ইত্যাদি নিয়ে মাসে চারশোর মতো রোজগার — আমার চেয়ে বেশি। একদিন ওর সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে দেখা, চমৎকার ফিটফাট চেহারা, প্যান্টালুন, জুতোর সঙ্গে মোজা, নাইলনের হাওয়াই শার্ট। দেখে আমার খুব ভালো লাগল, ছেলেটা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে. শুনলাম বিয়েও করেছে। ওর প্রতিষ্ঠার সবখানি কৃতিত্বই আমাদের পরিবারের — এই কথা ভেবে বেশ গর্বও বোধ করলাম। কিন্তু তারপরই এমন একটা কাণ্ড করল! একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে — একটা কায়দা করে ঠোঁটে আটকাল, তারপর কিছুক্ষণ এ-পকেট ও-পকেট হাতড়ে — ফস্ করে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "ছোড়দাবাবু, আপনার কাছে দেশলাই আছে?" আমার এমন খারাপ লাগল।'

— এটা তোমার অন্যায়। দু-একজন চেঁচিয়ে উঠলেন।

— জানি তোমরা কী বলবে। রাস্তার যে-কোন লোক, অচেনা কোন কারখানার শ্রমিক এমনকী কোন ভিখিরিও দেশলাই চাইলে আমরা অপমানিত বোধ করিনা। কিন্তু পুরোনো চাকর চাইলেই অপমানিত বোধ করা আমার ডিকাডেন্ট মেন্টালিটি। তা হয়তো ঠিক। কিন্তু অপমানিত যে হয়েছিলাম, তা অকপটেই স্বীকার করছি। শক্‌ড হয়েছিলাম বলা যায়। আগে কখনো চাইতনা, এখন এরকম স্বাভাবিক ভাবে...। বলতে পারো, ওর স্বভাব বদলাবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহলে আমাকে 'ছোড়দাবাবু' কেন ডাকল? 'এই যে অমুক বাবু' বলে নাম ধরে ডাকাই ওর উচিত ছিল। বাড়িতে এসে এ-ঘটনাটা বলতে বাড়িশুদ্ধ সবাই, এমনকী বড়দা পর্যন্ত হঠাৎ বিষম চটে গেল শত্রুঘ্নর ওপর। সকলেই ওকে বলল নিমকহারাম।

উপস্থিত অনেকে আমার এ-বন্ধুর গল্প শুনে হেসে ফেললেন। তখন আর

কে-যেন বললেন, কেন শরতের বাড়ির চাকরের গল্প? শরৎ, বলো-না! সে ঘটনাটা সত্যিই চমকপ্রদ। শরৎ বলতে শুরু করলেন :

ছেলেটা সত্যিই ভালো ছিল। মুখ বুজে কাজ করত, মুখে কখনো, কোন বিরক্তির ছায়া ছিলনা। মেদিনীপুরের ছেলে, কী যেন ছিল ওর আসল নাম, আমরা ওকে ডাকতাম মদন বলে। আমাদের বাড়িতে সব চাকরের নামই মদন, পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। নিত্যনতুন চাকর এলে প্রত্যেকের নাম মনে রাখা কষ্ট, আর চাকরদের নাম সাধারণত বেশ গালভারি হয় — গোবর্ধন, বগলাপ্রসাদ, দীনতারণ, কালীয়দমন এইসব — কাজেই ওসব ঝঞ্ঝাটের বদলে আমাদের বাড়িতে সবাই মদন। একমাত্র ঠাকুরমারই এই নামে আপত্তি, ওঁর কাছে সব চাকরের নামই বদন, কারণ মদন হাজার-হোক দেবতার নাম, আর চাকরবাকরের নাম ঠাকুর-দেবতার নামে হলে ওঁর নাকি সবসময় বকুনি-ঝকুনি দিতে অসুবিধে হয়।

এ ছেলেটা আমাদের বাড়িতে এসেছিল খুব বাচ্চা বয়সে। নিজের নাম ভুলে ও মদন নামটাই বেশ মানিয়ে নিয়েছিল। সবসময় ফিটফাট পরিচ্ছন্ন থাকত। স্মৃতিশক্তিও ছিল ভালো, বাজার থেকে যা-যা আনতে বলা হত, প্রত্যেকদিন নির্ভুলভাবে সবকটা আনত। ওরকম স্মৃতিশক্তি দেখেই ওকে লেখাপড়া শেখাবার কথা আমাদের মনে আসে। মা ওকে এক-দুই লিখতে শেখালেন। আমার বোন শেখাল অ-আ-ক-খ। তারপরও ওর প্রবল উৎসাহ দেখে আমরা সব ভাইরাই মাঝে-মাঝে একটু-আধটু পড়াতে লাগলাম ওকে। দু-চারখানা বই কিনে দিলাম। ছেলেটা সবকটা বই পড়ে-পড়ে মুখস্থ করে ফেলল, হাতের লেখা লিখে-লিখে লেখাটা করে ফেলল মুক্তোর মতো। ইংরেজিও পড়তে শিখলে কিছু-কিছু। বিশ্বাস করো ছ-সাতবছরের মধ্যেই ছেলেটা প্রায় ম্যাট্রিক স্ট্যান্ডার্ড পর্যন্ত শিখে ফেলল। স্বভাব হয়ে গেল আরও ভদ্র, মার্জিত। চাকর বলে লোকে বুঝতেই পারতনা। অনেকে আমাকে ডাকতে এসে ওকে বলত, তোমার দাদাকে ডেকে দাও তো! আমরাও ওকে একটু সমীহ করতে শুরু করলাম, সবরকমের কাজের হুকুম করতে দ্বিধা করতাম।

ছেলেটা হয়ে উঠল বইয়ের পোকা। আমাদের বাড়ির যাবতীয় বই পড়ে শেষ করল — আমার আলমারির তোমাদের দেওয়া আধুনিক কবিতার বইগুলো পর্যন্ত! দুপুরবেলা, বাড়ির রোয়াকে বসে রাজ্যের ঠাকুর-চাকররা যখন বিড়ি ফুঁকতে-ফুঁকতে এক-এক বাড়ির কেচ্ছা বিনিময় করে, আমাদের মদন তখন ছাদের সিঁড়িতে বসে-বসে গল্পের বই পড়ছে। অন্য চাকরদের সঙ্গে একদম মিশতনা। কোন কুসংসর্গে পড়েনি, মাইনে পেয়ে প্রত্যেকমাসে দেশে টাকা পাঠায় নিজে মনিঅর্ডার ফর্ম ফিল-আপ করে। আমরা ওকে অন্য কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে

দেবার কথা বলেছিলাম। যেতে চায়নি। মদন বলত, এ-বাড়িতে ও ঘরের ছেলের মতো আছে। যদি এ-বাড়ির কাজ ছেড়েই দেয় — তবে অন্য কোথাও ও আর চাকরি করবেনা — কারখানা বা অফিসেও না, ও স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবে। সেজন্য পয়সা জমাচ্ছে।

যা হোক, চাকর হিশেবে মদন আইডিয়াল। মালটিপারপাস চাকর। আমার বাবা চোখে ভালো দেখতে পেতেননা। দুপুরবেলা মদনের অতিরিক্ত কাজ হল বাবাকে খবরের কাগজ পড়ে শোনানো। সেজন্য ওর তিনটাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হল। ও পুরো কাগজটা, প্রথম লীড থেকে শেষপাতার প্রিণ্টারস লাইন পর্যন্ত সবকথা, বিজ্ঞাপন সমেত তন্ন-তন্ন করে পড়ে শোনাত। বাড়ি থেকে সকলে বেরিয়ে গেলেও মদনকে পাহারা রেখে যেতাম নির্ভয়ে। তারপর —

তারপর একদিন সকালে আর মদন নেই। একটা অলওয়েভ রেডিও আর আমার মেজো ভায়ের একটা হাতঘড়িও নেই। আছে মদনের একটি চিঠি, টেবিলের ওপর চাপা দেওয়া। অনবদ্য চিঠি। ঠিক ভাষাটা মনে নেই। তবে অনেকটা এইরকম। আমার মাকে লেখা:

শ্রীচরণকমলেষু মা,

কিছুকাল হইতে আমার একঘেয়ে লাগিতেছিল জীবন। তাই ভাগ্যপরীক্ষার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। ব্যবসাই করিব ঠিক করিয়াছি। এখন আপনার আশীর্বাদ পাইলে হয়। পুরা মূলধন হাতে নাই, তাই রেডিও আর ঘড়িটা লইয়া গেলাম। দুটোই আপনাদের অপ্রয়োজনীয়। বড় দাদাবাবু একটি নতুন ট্রানজিস্টার রেডিও কিনিয়াছেন, সুতরাং এটাতে আর আপনাদের কী দরকার? একবাড়িতে দুটো রেডিও রাখার দরকার দেখিনা। ট্রানজিস্টারটা বড়দাদাবাবুর শখের, তাই অলওয়েভটাই লইলাম। আর মেজদাদাবাবু, গতমাসে বিবাহে একটা সোনার হাতঘড়ি পাইয়াছেন। সেটি লইনাই। কিন্তু তিনি পুরানোটি দিয়া এখন কী করিবেন? বাড়ির আর-সকলেরই হাতঘড়ি আছে। মেজদাদাবাবু দুই হাতে দুইটি ঘড়ি পরিবেননা জানি। সেরকম কাহাকেও দেখিনাই। সুতরাং পুরানোটি আমি লইলাম। তবে শপথ করিতেছি, একদিন-না-একদিন এই দুইটি জিনিশের দাম ঠিকই আপনাদের শোধ করিয়া দিব। ইতি আপনার দাস — মদন।

আমাদের পরিবারে একটা মিটিং বসে গেল — পুলিশে খবর দেওয়া হবে কিনা, এই নিয়ে। মায়ের প্রবল আপত্তি। শেষপর্যন্ত সবাই ঠিক করল পুলিশে জানানো হবেনা। মদনের চিঠিটা ভাঁজ করে রেখে দেওয়া হল। বাড়িতে আত্মীয়-স্বজন এলে মা তাঁর চাকরের গৃহ-শিক্ষার নিদর্শনটি গর্বের সঙ্গে দেখাতেন।

দিন-পনেরো পর, আর-একটা চিঠি এল। মদন লিখেছে, সে বিষম অনুতপ্ত।

সে খুব দুরবস্থায় আছে। পাপকাজ দিয়ে শুরু করলে কোন উদ্দেশ্যই সফল হয়না। তার ওপর আমাদের যে বিশ্বাস ছিল সেটা ভঙ্গ করে সে মহাপাপ করেছে। হাতঘড়িটা সে বেচে ফেলেছে। কিন্তু রেডিওটা সে ফেরত দিতে চায়। তাছাড়া চোরাই মাল বলে লোকে মাত্র ৬০।৭০ টাকায় কিনতে চায় ওটা। কিন্তু মায়ের অমন দামি শখের জিনিশটা সে জলের দামে বেচতে পারেনি। ওটা সে ফেরত দেবে — কিন্তু নিজে মুখ দেখাতে চায়না। বউবাজারের একটা ঠিকানায় বলাই নামে একটি লোকের কাছে ওটা আছে, আমরা যেন কেউ গিয়ে নিয়ে আসি। এবং মদনকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করি।

এবার পুলিশে খবর দিলাম। কারণ ঠিক্কানাটা বউবাজারের একটি কুখ্যাত পল্লীর। পুলিশের লোক তো পুরো ঘটনাটা শুনে হেসেই বাঁচেনা। তারপর বলল, কাল ভোরে হানা দেবে। চোরাইমাল উদ্ধারের জন্য ভোরে হানা দেওয়াই নাকি প্রকৃষ্ট উপায়। আমাকেও সঙ্গে যেতে হবে আইডেন্টিফাই করতে।

গেলাম। একটু দূরে দুজন সেপাইকে নিয়ে ইন্সপেক্টার আর আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। একজন সাদা পোশাক-পরা পুলিশ চিৎকার করে ডাকতে লাগল, 'বলাই, বলাই !' তখনো ভালো করে ভোর হয়নি, সাড়ে চারটে-পাঁচটা বাজে। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পর দোতালার জানালা দিয়ে একটা শুটকো মতো লোক গলা বাড়িয়ে বলল, 'কে ?' তারপরই কী ভেবে মুখটা সরাৎ করে ভেতরে ঢুকিয়ে নিল আবার। আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। তখন ফের শুরু হল ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কা। এবার একটি মেয়েছেলে দরজা খুলে জানাল, এখানে বলাই বলে কেউ থাকেনা। আমরা সবাই হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লাম বাড়ির মধ্যে। ইন্সপেক্টার প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, 'ডাক বলাইকে। দেখেছি সে দোতালায় আছে ! বেগড়বাই করবি তো সবাইকে চালান দেব !'

বলাই নেমে এল এবং মা কালীর দিব্যি করে জানাল, সে মদন বলে কারুকে চেনেনা।

—চিনিস না-চিনিস রেডিওটা বার কর আগে। —

—কিন্তু রেডিওর তো সব পার্টস খুলে ফেলা হয়েছে ! —

—নিয়ে আয় সেই খোলা পার্টস ! এরপর ইন্সপেক্টার হুংকার দিয়ে উঠলেন, 'এবার বল সেই ধম্মপুত্তুর মদনটা কোথায় ?' — পেছন থেকে মেয়েটা হঠাৎ বলল, 'সে এখানে থাকেনা, সত্যিই থাকেনা, তাকে ছেড়ে দিন বাবু !'

একটা জিনিশ দেখে আগাগোড়া অবাক হয়েছিলাম যে, মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে মদন এসে কোন্ পরিবেশে উঠেছে। আগে সে কারুর সঙ্গে মিশতনা। বেশ-একটা রুচিজ্ঞান ছিল। একটা অন্যায় করার সঙ্গে-সঙ্গে চুম্বকের মতো

আন্ডারওয়ার্লডি তাকে টেনে এনেছে। আবার একটা দরদ-দেখানো মেয়েও জুটিয়েছে। মেয়েটা তখনও বলছে, 'মদনকে ছেড়ে দিন বাবু, সে বেচারি —'

আমি আগাগোড়া চুপ করেই শুনছিলাম। শরতের গল্প শুনতে-শুনতে খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ভৃত্যতন্ত্র সম্পর্কে আমার উৎসাহ কম, অভিজ্ঞতাও নেই। আমাদের বাড়িতে কোনদিন চাকর রাখা হয়নি। ফুটফরমাশ বেশির ভাগ আমাকে দিয়েই খাটানো হয়। কিন্তু হঠাৎ একটা মজার প্রশ্ন মনে পড়তেই আমি শরতের গল্প-বলা থামিয়ে দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, একটা প্রশ্ন তোমাদের কারুর মনে এসেছে ? মদন চুরি-করা শিখল কী করে ?'

কারণ মদন খুব বাচ্চা বয়েস থেকে আছে শরৎদের বাড়ি। ওখানেই বড় হয়েছে। অন্য চাকরদের সঙ্গে মিশতনা। লেখাপড়া শিখেছে। শরৎদের বাড়ির পরিবেশেই মানুষ। আর পরিবেশ অনুযায়ীই তো মানুষের চরিত্র তৈরি হয়। তাহলে, চুরি করার কথা ওর মনে এল কী করে ? শরৎদের বাড়িতে নিশ্চয়ই চুরিবিদ্যের চর্চা নেই, আশা করা যায়। আর পাঠ্যবইগুলোর মধ্যেও বোধহয় চুরি করতে শেখানো নেই। তবে ছোঁড়াটা শিখল কোথা থেকে ?

বন্ধুদের দু-একজন বললেন, 'আঃ আগে গল্পটা শেষ করতে দে-না।' আমি বললাম, 'ছিঁচকে চুরির গল্প কী-আর-এমন রোমাঞ্চকর হবে। তার চেয়ে এ-প্রশ্নটা অনেক জরুরি। আমার তো মনে হয়, ঐ যে বললে ও রোজ দুপুরে খবরের কাগজ পড়ে শোনাত — সেই খবরের কাগজ থেকেই চুরি করতে শিখেছে। বিশেষ করে ওর ছিল ব্যবসা করার ইচ্ছে। খবরের কাগজে কি প্রত্যেক দিন ও পড়েনি বড়-বড় ব্যবসায়ীদের চুরির কাহিনী ? চুরির খবরেই তো ভর্তি। এক-একদিন এক-একজন বাঘা-বাঘা ব্যবসায়ীর চুরির কাহিনী! আর-একটা ইণ্টারেস্টিং পয়েন্ট, মদন চুরি করল ঘড়ি আর রেডিও, কিন্তু শুধু রেডিওটা ফেরত দেবার কথা লিখেই সে নিজেকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা পাবার অধিকারী ভাবল কী করে? এটাও সে শিখেছে খবরের কাগজ পড়ে ! সে শিখেছে চুরি করার পর অর্ধেকটা ফেরত দিলেই আর কোন শাস্তি নেই, অপমান নেই, একেবারে সসম্মানে মুক্তি। দেখনি কাগজে কৃষ্ণমাচারীর ঘোষণা ? ব্ল্যাকমানির বাংলা চোরা-টাকা — যাদের কাছে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি চোরা-টাকা আছে, তারা যদি স্বেচ্ছায় এসে স্বীকার করে — ব্যাস, তা হলে শুধু ৬০ ভাগ জমা দিয়ে দিলেই হবে। আর সব মাপ, কোন বিচার নেই, শাস্তি নেই। চম্বলের ডাকাতদেরও আত্মসমর্পণ করার পরও শাস্তি হয়েছিল। কিন্তু যে ব্যবসায়ীরা চোরা কারবার করে, খাদ্য বাজার থেকে লুকিয়ে, ওষুধে ভেজাল দিয়ে পরোক্ষভাবে বহু লোককে খুন করে কোটি-কোটি টাকা

জমিয়েছে — তারা শুধু এসে একবার স্বীকার করলেই হল, যাট ভাগ জমানো টাকা জমা দিয়ে দিলেই হল, আর কোন শাস্তি নেই! যে আসনে ছিল সেখানেই রয়ে গেল। মদনও দেখেই শিখেছে নিশ্চিত। মদনের আর দোষ কী! মদনকে লেখাপড়া শিখিয়ে বেশ করেছিলে, কিন্তু খবরের কাগজ পড়তে দিলে কেন? তাইতো ও মহাজনদের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছে!'

২০

ভিড়ের মধ্যে তীক্ষ্ণ, তেজি মেয়েগলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, 'নো, আ আম নট গননা সীট দেএর, আ আম অল রাইট!'

লম্বা ট্রামের একপাশে আমি, অন্যদিকে এই ঘটনা। আমি ছটফটিয়ে উঠলাম। তৎক্ষণাৎ অকুস্থলে উপস্থিত হতে ইচ্ছে হল আমার, কিন্তু অত ভিড় ঠেলে সামনে এগুবার সাধ্য তখন বাতাসেরও নেই। ইচ্ছে হল, লোকের কাঁধের ওপর উঠে উঁকি মেরে দেখি। যদিও কথাটা সাধারণ, এর মধ্য থেকে রোমাঞ্চকর কাহিনীর সূত্র আবিষ্কার করার কোন কারণ নেই। নিশ্চিত কোন মহিলাকে দেখে — লেডিজ সীটে বসে থাকা পুরুষেরা, পাশাপাশি দুটি সীটে চারজন পুরুষ — এ ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে, কেউ জানালায় মুখ ফিরিয়েছে, কেউ অন্ধ ও বধির সেজেছে, প্রত্যেকেই আসলে একাগ্র হয়ে ভেবেছে, আঃ, অন্য সীটটা খালি করুক-না, ... আর সেই সময় ঘর্মাক্ত, পিষ্ট দাঁড়িয়ে থাকা পুরুষরা জিঘাংসার মনোবৃত্তিতে বলেছে, কর্কশ গলায়, 'এই-যে, দেখতে পাচ্ছেননা, লেডিজ সীটটা ছাড়ুন।' — আর তখন দুই সীটের লোকেরা আড়চোখে তাকিয়ে দূরত্ব মেপেছে — কোন আসন দণ্ডায়মান অপেক্ষমাণ মেয়েটির সবচেয়ে কাছে — সেই অনুযায়ী দুজন লোক প্রবল অনিচ্ছা সারাশরীরে ফুটিয়ে গা মোচড়াতে-মোচড়াতে -- মুখে, ঈশ্বর জানেন, কী বিড়বিড় করতে-করতে উঠেছেন। আর তখন এবংবিধ লাঞ্ছনার পর, সেই রমণী যদি আত্মসম্ভ্রমশীলা হন, বলেছেন, থাক, আপনারাই বসুন, আমি বসবনা। এ তো খুব সাধারণ কাণ্ড! প্রতিদিনের অসংখ্য। কিন্তু আমি অন্যরকম গন্ধ পেয়েছিলাম। কারণ, গলার আওয়াজটা অত্যন্ত জোরে, কোন মেয়ের পক্ষে। ইংরেজি উচ্চারণ বিদেশি ধরনের, 'নো' কথাটা এমনভাবে বলেছে, যেন সংস্কৃতের মতো বিসর্গ আছে, নোঃ।

তখন ওখানে গুঞ্জন চলছে, মেয়েটি আরও কিছু বলল, বোঝা গেলনা। আমি অতিকষ্টে আঙুলে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আরও তিন ইঞ্চি লম্বা হয়ে — কণ্ঠস্বরের

অধিকারিণীকে একপলক দেখতে পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে চমৎকৃত হতে হল।

জ্বলজ্বলে হলদে রঙের স্কার্ট-ব্লাউজপরা একটি কুচকুচে কালো মেয়ে। খুব সম্ভবত নিগ্রো, বয়েস উনিশ-বাইশ, ট্রাম একটা মিশনারি কলেজের সামনে একটু বেশি থেমেছিল, হয়তো সেখানকার ছাত্রী। মুখ দেখে মনে হল, মেয়েটি কোন কারণে খুব রেগে গেছে, আঁটস্বাস্থ্যে উদ্ধত শরীর, সকালবেলার আপিস-মুখো ট্রামে একটি মূর্তিমান ব্যতিক্রম। এইসব জল-রঙ মানুষ, যাদের পকেটে ময়লা রুমাল, ফর্সা জামার নিচে ছেঁড়া গেঞ্জি, পালিশ করা জুতোর মধ্যে ফুটো মোজা — যাদের জীবনে একমাত্র উত্তেজনা সহযাত্রীর পা মাড়িয়ে দিয়ে খানিকটা ঝগড়াঝাঁটি করা (সবসময় ভেতরে-ভেতরে সজাগ থেকে, মারামারি পর্যন্ত না-এগোয়) — তাদের মধ্যে ঐ নিগ্রো মেয়েটি, ওর ঐ অটুট কালো শরীর ও হলদে পোশাক মিলে যেন একটা রঙের হৈ-হৈ পড়ে গেছে, তাছাড়া ঐ তেজি, দ্বিধাহীন সরল কণ্ঠস্বর। একটুকরো আবার শুনতে পেলাম : ইউ পিপল হেইট মী ! আমার আন্তরিক বাসনা হল ঐ দৃশ্য কাছাকাছি গিয়ে উপভোগ করি কিংবা অংশ নিই, কিন্তু এমন ভিড়, আঃ অসম্ভব ! মেয়েটি কেন বলছে, লোকে ওকে ঘৃণা করছে ? যদি ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বলতে পারতাম !

আমি বিদেশি নারী-পুরুষ দেখলেই অযাচিতভাবে কথা বলার চেষ্টা করি। দেখেছি তাতে ওরা খুশিই হয়। আমাদের দেশের যেসব লোক বিদেশে গেছে, তাদের অভিজ্ঞতা এই যে বিদেশের রাস্তায় হঠাৎ কোন লোক ডেকে কথা বললে খুব ভালো লাগে। তাতে মনে হয়, ওদেশের সাধারণ লোকও তাকে গ্রহণ করেছে, স্বীকার করছে। কিন্তু আমাদের দেশে বিদেশিদের সঙ্গে এমন ব্যবহার সচরাচর করা হয়না, সঙ্গে পাই আমি চেষ্টা করি, আমার ইনজিরি জ্ঞানের জন্য লজ্জা হয়না, আমি বাঙালিদের সঙ্গে ভুল ইংরেজি বলে ফেললে লজ্জা পাই, সাহেব-মেমদের না। এখানে ভিড় ঠেলে এগুতে না পারার দুঃখে মরমে মরে গেলাম। একবার চেষ্টা করে নাকে গুঁতো খেয়ে চক্ষে অন্ধকার দেখছি।

অথচ ওখানে কেউই মেয়েটির সঙ্গে স্পষ্ট কথা বলছেনা। অনেকেই পরোক্ষে উক্তি করছে। কেউ-বা বাংলায় মন্তব্য, ওরে বাবা কী তেজ রে ... কালো মেমসাহেবদের চোট সাদা মেমদের তিনগুণ বেশি হয় ... আপিসের টাইমে ওঠা কেন বাবা ! ...

আমি তখনই ঠিক করলাম, নেমে যাবার সময় মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে হবে। এখন এগিয়ে যাবার যখন কোন উপায় নেই। তাছাড়া সবাইকে গোঁত্তা মেরে ঠেলেঠুলে গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথা শুরু করলে — পঞ্চাশজোড়া চোখ আমার দিকে চেয়ে থাকবে। কে কী মন্তব্য করে, তাই বা ঠিক কি ! থাক। ততক্ষণ আমি

মেয়েটির সঙ্গে মনে-মনে কথা বলা শুরু করলাম। আমাদের কাল্পনিক সংলাপ নিম্নরূপ:

আমি: তুমি কি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান না নিগ্রো?

মেয়েটি: (তখনো মুখে ক্রোধ) অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান? কী বিশ্রী এই কথাটা। তোমরা এ-নামটা বদলাতে পার না। একটা জাতকে উল্লেখ করার সময়, সবসময় তাদের কুৎসিত জন্মবৃত্তান্তটাও উল্লেখ করতে হবে! না, আমি তোমাদের ঐ সো-কলড অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নই।

— ও, তবে নিগ্রো বুঝি?

— নিগ্রো? ছি, ছি, তোমাদের লজ্জা করেনা? 'নিগ্রো' কোন জাতের নাম হয় বুঝি? তুমি নিজে কি মঙ্গোলিয়ান না দ্রাভিডিয়ান? আমি একজন আফরিকান! সাউথ আফরিকা আমার দেশ।

— ও, আচ্ছা, মাপ চাইছি। কিন্তু তুমি বড্ড রেগে আছ। ওখানে কী হয়েছিল? কেউ খারাপ ব্যবহার করেছিল?

— বিশেষ কিছু না, এমন খারাপ ব্যবহার তো তোমাদের দেশে সবাই করছে!

— কেন, একথা বলছ কেন?

— তোমরা কালো লোকদের ঘেন্না করো। বিদেশের কালো লোকদের। তোমরা নিজেরাও যদিও কালো। তুমি নিজেই তো আবলুষ কাঠের মতো কালো।

আমি একটু আহত হয়ে মনে-মনে সংলাপের মধ্যেও আরও মনে-মনে বললাম, যাঃ এটা কী বলছ, আমার চেনাশুনো মেয়েরা তো আমাকে বেশ ফরসাই বলে। তা যাকগে, এই ট্রামের মধ্যে কালো-সাদার কী দেখলে?

আমাকে দেখেই দুটো লোক ধড়পড় করে সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল—

— ওঃ, হো-হো, তুমি বুঝি এটা জাননা? এতে কালো-সাদার কী আছে? মেয়েদের দেখলে আমাদের দেশের গাড়ি-টাড়িতে সৌজন্য দেখিয়ে জায়গা ছেড়ে দেওয়া হয়।

— ডোনট টক রট। ওসব জানি, এতদিনে জেনে গেছি — কতটা সৌজন্য আর কতটা বাধ্যতামূলক। কিন্তু দুটো লোক উঠল কেন? একজন উঠলেই তো আমি আর-একজনের পাশে বসতে পারি!

এবার আমি, মনে-মনেই যখন কথা, তখন একটু ইয়ার্কির লোভ সামলাতে পারলামনা। বললাম, তোমাকে এমন সুন্দর দেখতে, তোমার জন্য তো গাড়িসুদ্ধু সকলেরই জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ানো উচিত ছিল!

মেয়েটি একটু মুচকি হেসে বলল, তোমার এটা বাজে খরচ হল। যাক, আমি আগেও দেখেছি, আমি বসলে পাশে আর কেউ বসেনা। অত্যন্ত ভিড়ের গাড়িতেও

একটা জায়গা ফাঁক পড়ে থাকে!

— তুমি ভুল বুঝেছ। অচেনা মেয়ের পাশে এসে বসে পড়া আমাদের দেশে এখনও চালু হয়নি। তুমি কালো বলে বা নিগ্রো ... থুড়ি আফরিকান বলে নয়। শুধু-শুধু তুমি একটা ধারণা করে বসে আছ যে, কালো বলে লোকে তোমাকে অপছন্দ করছে!

— শুধু-শুধু? তুমি জান তোমাদের একজনের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। সেখানে একটা বাচ্চা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে ফেলেছিল।

— সে একধরনের কাঁদুনে বাচ্চা থাকে। যে-কোন অচেনা লোক দেখলেই কাঁদে। আমেরিকান বা জাপানি হলেও কাঁদত।

— খুব লুকোবার চেষ্টা করছ। আমাদের দক্ষিণ আফরিকায় সাদা লোকরা আমাদের কুকুরের মতো ঘেন্না করে। সেইজন্য বাবা-মা আমাকে পড়াশুনোর জন্য পাঠালেন ভারতে। তোমাদের শুনেছিলাম জাতিভেদ প্রথা আছে। কিন্তু বর্ণবিদ্বেষও কম নেই। তোমরা সবাই কালো — একটু রঙের হেরফের, এরই মধ্যে যে এক পোঁচ ফর্সা, তার অহংকারে মাটিতে পা পড়েনা। জান, আমাদের ক্লাশের একটি বাঙালি মেয়ে বলছিল, তার দিদির বিয়ে হয়নি, কারণ রং কালো।

— সে নিশ্চয়ই শুধু কালো নয়, সেইসঙ্গে নাক খ্যাঁদা, কাঠিকাঠি হাত-পা, বেঁটে। এমনিতে সুশ্রী আর স্বাস্থ্যবান হলে — শুধু কালো রঙের জন্য আজকাল আর বিয়ে আটকায়না। এই ধরো-না, তোমার তো রং কালো — কিন্তু তোমার মতো এমন সুন্দর চেহারার মেয়ে যদি বিয়ে করতে রাজি হয় তবে এদেশে হাজার ছেলে তোমাকে বিয়ে করতে চাইবে।

— যাও, যাও, শুধু ঠাট্টা করছ। কালো রঙের জন্য আমার মোটেই লজ্জা নেই। তোমাদের থাকতে পারে। আমি কালো রংকেই সবচেয়ে সুন্দর মনে করি।

হঠাৎ দেখি ট্রাম ওয়েলিংটনে এসেছে, আর সেই মেয়েটি ভিড় ঠেলে নামার চেষ্টা করছে। আমার চমক ভাঙল। এতক্ষণ মনে-মনে কথা বলছিলাম এবার মেয়েটির সঙ্গে সত্যিই দু-একটা কথা বলতে হবে। আমিও টুপ করে নেমে পড়লাম। কী করে কথা আরম্ভ করি? মেয়েটি নেমে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তারপর দেখি পানের দোকানে গিয়ে কী যেন জিজ্ঞেস করছে, দোকানদার বুঝতে পারছেনা। এই সুযোগে আমি কাছে গিয়ে বলি, 'তোমায় কোন সাহায্য করতে পারি?'

মেয়েটি কালো মুখ আলো করে এক ঝলক হেসে বলল, 'এখানে ডকটরস লেন এই নামের রাস্তাটা কোথায় বলতে পার?'

— হ্যাঁ নিশ্চয়ই? কাছেই তো! আমিও ঐ দিকে যাচ্ছি — আমার সঙ্গে

আসতে পারো।

— ধন্যবাদ।

কয়েক পা একসঙ্গে চলার পরই নাকি বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাই আমি জিজ্ঞেস করি, 'ট্রামে কি তোমার কোন অসুবিধে হয়েছিল?'

— বিশেষ কিছু না। সামান্য ব্যাপার। আমার হঠাৎ মাথা গরম হয়ে যায়— !

দেখলাম মেয়েটি বিশেষ কথা বলতে উৎসাহী নয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তো মনে-মনে কথা বলে আমি ওর চরিত্র তৈরি করে ফেলেছি। মনে হল, আমার রং যথেষ্ট কালো নয় বলেই বোধহয় মেয়েটি আমাকে পছন্দ করছেনা।

পার্কের ওপাশে একটি সাহেব দাঁড়িয়েছিল। টকটকে ফর্সা রং। সুপুরুষ, স্বাস্থ্যবান। ইওরোপীয় সম্ভবত, উচ্চবিত্ত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও হতে পারে! সাহেবটি এই মেয়েটিকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, 'হাই জেনি!'

মেয়েটি ওকে দেখতে পেয়েই চঞ্চলা, গতিশীলা হয়ে গেল। এক ছুটে গিয়ে সাহেবটির বাহুলগ্না হল। আমাকে একটা বিদায় জানাবার কথাও মনে পড়েনি। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা দুজনে একসঙ্গে এগিয়ে গেল খানিকটা, তারপর কী মনে করে মেয়েটি হঠাৎ পিছন ফিরে আমার উদ্দেশে হাত নেড়ে দিল একবার।

২১

একটি লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হল, তিনি বারবার বলতে লাগলেন, এমন বদলে গেল! এমন বদলে গেল! কথা বলার সময় তাঁর কপালের একটি শিরা কাঁপে।

—এখানে তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ছিল, কোথায় গেল?

পার্কের উল্টোদিকের ফাঁকা মাঠে চুন, সুরকি, বালি ডাঁই করা। মিস্ত্রিরা বসে-বসে ইট ভেঙে খোয়া করছে, কয়েকটা বাঁশ পুঁতে তার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়েছে ছাতা। এমন রোদ্দুর যেন মানুষগুলো চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। লাল শাড়িপরা একটি মেয়ে রাস্তা পার হয়ে গেল, যেন বহে গেল একটা লাল ঢেউ, জাপানি ছবির মতন যেন অদৃশ্য চারিদিকের মধ্যে একটি লাল রেখার ঝলক। লাল রং গ্রীষ্মকে বেশি আকর্ষণ করে, মেয়েটি যেন এক দুপুরের সমস্ত গ্রীষ্ম সরিয়ে নিয়ে অত্যন্ত প্রশান্ত ভঙ্গিতে হেঁটে চলে গেল। এই রোদ্দুরে তার সামান্য আক্ষেপ নেই। মেয়েরা শীত এবং গ্রীষ্ম উভয় সময়েই সমুদ্বিগ্নমনা।

ভদ্রলোক মেয়েটির অপস্রিয়মাণ মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করলেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে, ইট-ভাঙা মজুরদের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে পানের দোকানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা ছিল, কোথায় গেল।'

লোকটি বেশ লম্বা অথবা অত্যন্ত রোগা বলেই বেশি লম্বা দেখায়, রং কালো, সুপুরুষ বলা যায়না, কিন্তু চোখে এমন-একটা ক্লান্তি ও বিষণ্ণতা আছে যাতে তার মুখকে একটা আলাদা সৌন্দর্য দিয়েছে। ফাঁকা মাঠের দিকে তাকিয়ে তিনি তেত্রিশ নম্বর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করছেন। লোকটির লম্বা ছায়া পড়েছিল ফুটপাতে, অজান্তে সেই ছায়ার ওপর আমি দাঁড়িয়েছিলাম বলেই হয়তো লোকটির সঙ্গে অল্পক্ষণের মধ্যে আমার আত্মীয়তা হয়ে গেল।

— বাড়ি তো ছবছর আগে ভাঙা হয়ে গেছে।

— তা তো দেখছি। কিন্তু সে বাড়িব লোকেরা?

— পালবাবুরা। জীবনবাবু চলে গেলেন বোম্বাই, তাঁর ভাই এ-বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চম্পাহাটিতে বাড়ি করেছেন, আশি হাজার দাম পেয়েছিলেন, বাড়ির তো নয়, বাড়ি তো লঝঝরে হয়ে গিয়েছিল, জমিরই তো দাম!

— না, না তুমি ভুল করছ। আমি তেত্রিশ নম্বর বাড়ির কথা বলছি। সে বাড়িতে তো পাল বলে কেউ থাকতনা। ওটা ছিল রায়চৌধুরীদের বাড়ি। পরমেশ রায়চৌধুরী, অনিমেষ, অবিনাশ —

— না বাবু, আমি তো এসে পালবাবুদেরই দেখছি। আপনার বোধহয় ঠিকানা ভুল হয়েছে। এ-বাড়ি পালবাবুরাই বিক্রি করেছেন।

— না আমার ভুল হয়নি। দোতলা বাড়ি, সামনে ঝুল বারান্দা, বারান্দাটা পুরো ছিল জাল দিয়ে ঘেরা, ওখানে পরমেশবাবু ঝাঁক-ঝাঁক মুনিয়া পাখি পুষতেন। বাড়ির দুপাশে রোয়াক, তিন-চার ধাপ সিঁড়ি দিয়ে উঠে সদর দরজা —

কথা বলতে-বলতে লোকটি আবার চুন-সুরকির স্তূপ আর মিস্ত্রি বসে-থাকা ফাকা মাঠের দিকে তাকালেন। এইসময় এগিয়ে এসে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বুঝি অনেকদিন পর কলকাতায় এলেন?'

— হ্যা, প্রায় পনেরো-ষোলো বছর। ঠিক ষোলো বছর চার মাস পর। আপনি রায়চৌধুরীদের চিনতেন?

— না, আমি এদিককার কিছু চিনিনা। তবে মনে হচ্ছে, রায়চৌধুরী ও-বাড়ি বিক্রি করেছিলেন পালদের, পালরা আবার বিক্রি করে গেছে। এখন ভেঙে ফেলা হয়েছে।

— কিন্তু রায়চৌধুরীদের তো এ-বাড়ি বিক্রি করার কোন কারণই ছিলনা।

— ষোলো বছর বড় দীর্ঘ সময়।

— তা ঠিক।

লোকটি একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। রাস্তার আশেপাশে অন্য বাড়িগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন একবার। তারপর আপন মনেই বলতে লাগলেন, অনেক বদলে গেছে। আর কোন-কোন বাড়ি ভেঙে নতুন হয়েছে বা অদৃশ্য হয়েছে ঠিক মনে পড়ছেনা, কিন্তু বুঝতে পারছি, অনেক বদলে গেছে।

তারপর আমার দিকে ফিরে আবার বললেন, 'রায়চৌধুরীদের ঠিকানা কোথা থেকে পাই বলতে পারেন?'

আমি আগেই জানিয়েছি যে আমি এ-অঞ্চলের লোক নই, রায়চৌধুরীদের চিনিনা, সুতরাং আমাকে ও-প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা অবান্তর। তবু লোকটির অন্যমনস্কতা লক্ষ করে বললাম, 'আপনার অন্য কোন চেনা লোকদের কাছে খোঁজ করুন, যাঁরা রায়চৌধুরীদেরও চিনতেন। তাঁদের কাছে ঠিকানা পেতে পারেন। আপনি কি আজই এলেন?'

— কাল রাত্রে। ষোলো বছর পর প্রথম এলাম দেরাদুন থেকে। আগে কিছুদিন কার্সিয়াং ছিলাম।

এরপর আর-কিছু জিজ্ঞেস করা উচিত কিনা বুঝতে না পেরে চুপ করে রইলাম। ভদ্রলোক নিজেই বললেন, 'আমার টি-বি হয়েছিল। বাঁচার কোন আশাই ছিলনা। অনেকের হয়তো ধারণা আমি মরেই গেছি। আমি কিন্তু এখন ভালো হয়ে গেছি, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছি!' — লোকটা শেষের কথাটা এমন ব্যগ্রভাবে বললেন যেন আমার বিশ্বাস করা না-করার ওপরে অনেক-কিছু নির্ভর করছে।

— দশবছর আগেই আমার প্রথম সেরে যায়। কিন্তু তখুনি আমি কলকাতায় ফিরে না-এসেই ওখানেই থেকে গিয়েছিলাম। শরীরটাও সারিয়ে ফেরার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু তারপর দুবার আমার রিলাপস করে রক্তবমি করতে-করতে আমার গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ সেরে গেছি। তিনবছর আগেই ডাক্তার আমাকে গ্যারাণ্টি দিয়েছিলেন যে, আমার আর হবেনা। তবু দীর্ঘ তিনবছর আমি ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছি। আর-কোন উপসর্গ দেখা দেয়নি। এখন আমি সুস্থ, প্রায় আপনাদের মতোই স্বাভাবিক মানুষ। ভেবেছিলাম এদিকে আর ফিরবনা। ও-দিকেই থেকে যাব। কিন্তু—

— শেষপর্যন্ত কলকাতা টেনে আনলে।

— কলকাতায় আমার তেমন আকর্ষণ নেই। আমি চলে যাবার পর প্রথম দু-তিন বছর বন্ধু-বান্ধবরা খুব চিঠিপত্র দিত— তারপর আস্তে-আস্তে কমে

দাদা মারা গেছেন গত বছর। শুধু আকর্ষণ ছিল এই তেত্রিশ নম্বর বাড়ির। যখন সুস্থ হয়ে উঠলাম, তখন বারবার মনে পড়তে লাগল কৈশোর — প্রথম যৌবনে যখন আমি সুস্থ ছিলাম, সেই দিনগুলোর কথা। সেই সময়টা কেটেছে এই বাড়িতে। এ-বাড়িতে আমার বন্ধু অনিমেষ থাকত। আর ওর তিন বোন। লীলাদি, মায়া আর ছায়া। ওরা চার ভাইবোন ছিল কাছাকাছি বয়সের — সকলেই আমার বন্ধু। একটা আশ্চর্য কথা কী জানেন, তখন যে লাল শাড়িপরা একটি মেয়ে গেল — তাকে দেখে আমি বিষম চমকে গিয়েছিলাম। আচ্ছা মেয়েটিকে আপনিও দেখেছিলেন, না আমার চোখের ভ্রম?

— আমিও দেখেছি।

— আশ্চর্য। বিশ্বাস করুন, অবিকল অনিমেষের ছোট বোন ছায়ার মতো দেখতে। ঠিক সেইরকম মন্থর অহংকারী হাঁটার ভঙ্গি। অথচ ছায়া তো হতেই পারেনা. এতদিনে ছায়ার আরও ষোলো বছর বয়েস বেড়েছে। তাছাড়া ছায়া ও-রকম একা রাস্তায় বেরুতনা, সবসময় সঙ্গে চাকর বা দারোয়ান থাকত।

কী জানি, কী ভেবে হঠাৎ আমি বলে ফেললাম হয়তো আপনার দেরাদুনে থেকে য'ওয়াই উচিত ছিল। না-ফিরলেই পারতেন।

লোকটি ঈষৎ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর আমার অনধিকার চর্চায় বিরক্ত না-হয়েই বললেন, 'ফিরব না-ই ভেবেছিলাম।'

কলকাতা থেকে যখন জ্বরে আচ্ছন্ন অবস্থায় চলে যাই, বিষম অভিমান নিয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, এ-শহর আমাকে চায়না, আমিও আব এ-শহরের কাছে ফিবে আসবনা! কিন্তু কলকাতাকে মনে পড়ার একটা সাইকল আছে। পাঁচবছর পব-পব বিষম মন কেমন করে। গতবছর থেকেই ফেরার জন্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। ওখানে থাকতাম একা-একা। আলাদা একটা ঘর ভাড়া নিয়ে! কিন্তু একাকীত্ব মানুষকে ক্রমশ নির্বোধ করে দেয় — কবিরা যাই বলুক, একাকীত্বই আমাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। কিন্তু যদি জানতাম তেত্রিশ নম্বর বাড়িটা নেই— ! জানেন, ঐ জায়গায় — ভদ্রলোক আমাকে আঙুল দিয়ে একটা শূন্যস্থান দেখিয়ে বললেন — ছিল সদর দরজা, তারপর একটা গলির মতন, পরে চাতাল, সেখানে একটা লম্বা কাঠের বেঞ্চ পাতা থাকত। ওখানে আমরা বসে রাস্তার মানুষ চলাচল দেখতাম; চোখে পড়ত উলটোদিকের পার্ক, ফুচকাওলাকে ডেকে নিয়ে যেতাম ভেতরে। অনিমেষ বাড়িতে না-থাকলেও আমি ওর বোনদের সঙ্গে বসে গল্প আর হাসিঠাট্টা করতাম। তখন আমি বুঝতে পারিনি, লীলা, ছায়া আর মায়া — এর মধ্যে কাকে আমি ভালোবাসতাম। পরে নির্জন প্রবাসে বসে অনেক

ভেবেছি, বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম, আর-একবার ঐ বাড়িতে ঢুকে কাঠের বেঞ্চিটায় বসতে পারলেই মনে পড়বে। কিন্তু—

একটুক্ষণ চুপ। ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে লোকটি বললে, 'যাক তবু বাড়িটা ভেঙে ফেলে এখন ও শূন্য মাঠ। আমি মাঠের মধ্যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছি কল্পনায়। কিন্তু এর বদলে যদি দেখতাম, চৌকো লম্বা দেশলাই-এর বাক্সের মতো, আধুনিক বিশ্রী একটা নতুন বাড়ি, তাহলে খুব খারাপ লাগত।

কথাবার্তা অত্যন্ত ব্যক্তিগত এবং সেন্টিমেন্টাল দিকে চলে যাচ্ছে দেখে আমি ঘোরাবার চেষ্টা করে বললাম, 'কলকাতা শহরের আর কী-কী বদল দেখলেন? আমাদের তো চোখে পড়েনা।'

—কলেজ স্ট্রিট! চেনাই যায়না। সিনেট হলের গম্ভীর থামগুলো আর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মূর্তিটাই নেই, সেখানেও উঠছে একটা দেশলাই-এর বাক্স-বাড়ি। কাল রাত্রের দিকে চৌরঙ্গি-অঞ্চলের দিকে ঘুরছিলাম, নতুন নিয়ন আলোয় এ-শহর সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে আমার কাছে। কোন্ কোন জিনিশ বদলে গেছে আমি ঠিক বলতে পারবনা, কিন্তু বুঝতে পারছি অনেক-কিছু বদলে গেছে। অনেক, প্রায় একটা অন্য শহর।

আমি বললাম, 'বৌদ্ধ গাথায় আছে, এক নদীতে কেউ দুবার স্নান করতে পারেনা। নদীর নাম এক থাকলেও নদীর জল বদলে যাচ্ছে অনবরত। সেইরকম একবার চলে গেলে এক শহরে বোধহয় কেউ আর দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারেনা। ফিরতে হয় অন্য শহরে।'

— হয়তো তাই। বুঝতে পারছি, এ-শহর আমার সে-চেনা শহর একটুও নয়। দেখি যদি রায়চৌধুরীদের ঠিকানা খুঁজে পাই। অনিমেষ আর ওর বোনদের সঙ্গে দেখা হলে হয়তো সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়বে।

বিদায় নেবার সময় আমি মনে-মনে ভাবলাম, অনিমেষ রায়চৌধুরী আর তার বোনদের সঙ্গে এই লোকটির আর দেখা না-হলেই বোধহয় ভালো হয়। সেই বাড়ির বদলে চৌকো দেশলাইয়ের বাক্সমার্কা বাড়ি দেখলে ভদ্রলোক যেমন দুঃখিত হতেন — সেই রায়চৌধুরীদের এখন দেখলে বোধহয় তার চেয়েও বেশি দুঃখিত হবেন। শহর আর কী বদলেছে, বদলেছে এ-শহরের মানুষ। মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারছেননা। এরকম নিস্পৃহ, কঠিন, তিক্ত, সেকেন্ড-ব্রাকেট-ভুরু মুখের মিছিল কী আগে ছিল এ-শহরে? যে-কোন মানুষের মুখ দেখলেই বুঝতে পারতেন। এমনকী আমার মুখ দেখেও।

২২

শুনেছি ফরাসি দেশে পাঁচশো ফ্রাঁর নোটের (ওল্ড ফ্রাঁ) একটা ডাকনাম আছে : মিজারেবল। অর্থাৎ যন্ত্রণা! কারণটি এই, শুনতে যদিও পাঁচশো টাকা, কিন্তু ওর দাম আসলে পাঁচ টাকা। অত বড় একখানা নোট, অত টাকার ছাপমারা — কিন্তু কিছুই কিনতে পারা যায়না বিশেষ। পকেটে হাত ঢুকিয়ে এরকম একটা পাঁচশো ফ্রাঁর নোট হঠাৎ বার করে খাঁটি প্যারিসিয়ান ঝংকার দিয়ে ওঠেন, ' ও, বন ফরতুন! ম্যার্দ! মিজারেবল! (অনুবাদ : ওঃ, এ যে দেখছি লাখ টাকা! গু-গোবর! যন্তোন্না!)

ঐরকম নাম পাঁচশো টাকার (অর্থাৎ বর্তমানের পাঁচ টাকার) নোটেরই ভাগ্যে পড়ার একটা অপ্রত্যক্ষ কারণ আছে। ফরাসি দেশই বোধহয় পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে — সাহিত্যিকদের ছবি ছাপা হয় টাকার নোটে। রাসিন, কর্নেই ভলতেয়ার, ভিক্টর উগোর ছবি আছে বিভিন্ন নোটে। পাঁচশো ওল্ড ফ্রাঁর নোটে। ভিক্টর উগোর ছবি। এবং উগোর বিখ্যাত বই 'লে মিজারেবল'-এর স্মৃতির ঐ পরিণতি জনতার মুখে-মুখে।

সে যাই হোক, সকলেই জানেন, ফরাসিরা স্বভাবতই অতিশয়োক্তিপরায়ণ। আমাদের দেশে কিন্তু পাঁচ টাকার অনেক দাম। সেজন্য, আচমকা চৌরঙ্গির বাসস্টপে দাঁড়িয়ে রাস্তা থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট কুড়িয়ে পেয়ে আমি ভীষণ খুশি হয়ে গেলাম। এই পাঁচ টাকায় আমি এখন একটা গোটা রাজ্য কিনতে পারি। কলকাতার পথে-ঘাটে টাকা-পয়সা ছড়ানো — এরকম প্রবাদ বহুদিন হল সারা ভারতবর্ষে প্রচলিত যেজন্য বিভিন্ন প্রদেশ থেকে দলে-দলে লোক কলকাতায় ছুটে এসেছে ভাগ্য ফেরাতে। কথাটা মিথ্যে কী, এখনো তো অনেক ধনী ব্যক্তির মড়া পোড়াতে নিয়ে যাবার সময় পথে-পথে খইয়ের সঙ্গে পয়সা ছড়ানো হয়। তবে এই পাঁচ টাকার নোটটি নিশ্চয়ই শ্মশানযাত্রীরা ছড়ায়নি। কোন অতিব্যস্ত লোকের পকেট থেকে পড়ে গেছে অসাবধানে। খাঁটি পরিষ্কার পাঁচ টাকা — জাল নয়, এমনকী, আজাদ হিন্দ ফৌজের টাকাও নয়। আমি বিনা দ্বিধায় তুলে নিলাম।

আগে নিতামনা। বাবা-মা, গুরুজনেরা এরকম একটা কুসংস্কার ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন যে, কুড়ানো পয়সা নিতে নেই। পয়সা কুড়িয়ে নিলে নাকি পকেট থেকে তার ডবল আবার বেরিয়ে যায়। অনেকদিন এই কুসংস্কারটা রক্ষা করেছিলাম — আমার চোখ বিশ্রী রকম ভালো বলে অনেক কিছু দেখতে পাই — নর্দমার পাশে চকচকে সিকিটাও চোখ এড়ায়না। কিন্তু কখনো তুলিনি। আমার সততার একটি উদাহরণ দিচ্ছি। একবার মৌলালি থেকে কলেজ স্ট্রিট যাবার খুব দ্রুত দরকার ছিল। নয়া পয়সার অত্যল্প আগের যুগ, পকেটে আমার একটি নিঃসঙ্গ

এক আনি, অথচ বাস ভাড়া সাত পয়সা। মৌলালি থেকে বৌবাজার সমান দূর, ওখান থেকে বাসের ভাড়া এক আনা। কিন্তু ওটুকু হেঁটে যাবার ধৈর্য ছিলনা, সময় ছিলনা —। সুতরাং ঠিক করেছিলাম, ঐ কয়েক স্টপ বাসের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলতে-ঝুলতে কন্ডাক্টরকে ফাঁকি দিয়ে চলে যাব — তারপর বউবাজার থেকে টিকিট কাটালেই হবে। কিন্তু এমন নিরাশ হলাম — একটা বাস এল অস্বাভাবিক ফাঁকা। বিকেলবেলা ওরকম ফাঁকা বাস আসা অবিচার ছাড়া কী — যেখানে মানুষের হ্যান্ডেল ধরে ঝুলে যাবার সুযোগ নেই। অগত্যা মনমরা হয়ে ভিতরেই ঢুকতে হল — একটা বসবার পুরো জায়গা পেয়ে গেলাম পর্যন্ত, এবং দেখলাম, পায়ের কাছে একটা চকচকে আনি পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম, না, আমারটা ঠিক আছে, এই দ্বিতীয়টি ঈশ্বরপ্রেরিত। সুতরাং ঐ আনিটা তুলে নিয়ে সাত পয়সা ভাড়া দিলেই সব ঝঞ্ঝাট মিটে যায়। কিন্তু ঐ-যে আমার ধর্ম ও সততা বোধ, কুড়ানো পয়সা নেবনা। আমি পয়সাটাকে জুতোর তলায় চাপা দিয়ে রাখলাম — মতলবখানা এই যে, বউবাজার পেরিয়ে গেলে আমি ঐ পয়সাটা ব্যবহার না-করে আমার নিজস্ব এক আনারই টিকিট কাটব। আর তারসঙ্গে কন্ডাক্টর এলে — আমি পয়সাটাকে পা দিয়ে দূরে ঠেলে দিয়ে তাকে বলব, আমার পয়সাটা পড়ে গেছে, তুলে দিন তো। তাবপব ওর হাত দিয়েই তুলিয়ে, আমি না-ছুঁয়ে, টিকিট কাটব সাত পয়সার, উড়ো খই যাবে গোবিন্দের কাছে। কন্ডাক্টর দরজার মুখে দাঁড়িয়ে দন্তারবিন্দ-প্রস্ফুটিত করে তার পার্টনারের সঙ্গে গল্প করছে। যথারীতি বউবাজারে বাস পৌঁছুতেই হুড়মুড় করে উঠল বহু লোক — নতুন যাত্রী, পুরোনো যাত্রীরা মিশে গেল। কন্ডাক্টব পরে এসে আমাব টিকিট চাইতে আমি অম্লানবদনে কাটলাম এক আনার। তারপর পা সরিয়ে বললাম, এখানে কাব পযসা আছে, আপনি তুলে রাখুন।

এখন আব ওসব ভাবিনা। ঝট কবে পাচ টাকাটা তুলে নিলাম। পকেট থেকে ডবল বেবিয়ে যাবার সম্ভাবনা কবে ঘুচে গেছে। এখন পকেট খুবই শোচনীয় অ্যানিমিয়ায় ভুগছে। তাছাড়া পাঁচ-পাঁচটি টাকা, এই টাকা ইচ্ছে করলে সূর্যের আলো গাঢ় করে দিতে পাবে, সু-বাতাস বইয়ে দিতে পারে, আলো জ্বেলে দিতে পারে অন্ধকার ময়দানে। পাঁচ টাকা অর্থাৎ এখন পাঁচশো পয়সা — এই কথা ভাবলেই তো সংখ্যাতত্ত্বের এক আশ্চর্য ভোজবাজি ঘটে যায় — মনে হয় কী বিপুল এর পারচেজিং 'পাওয়ার'। পাঁচশো পয়সায় ফুচকা পাওয়া যাবে আড়াইশো — চিনেবাদাম অন্তত এক হাজার। ছোলা আজকাল কিনতে পাওয়া যায়না, নইলে তা-ও পাওয়া যেত তিন-চার হাজার। সারা মাসের খবরের কাগজ কিনে যাবতীয় সু-সংবাদ ভোগ করা যেতে পারে। অথবা চিড়িয়াখানা দেখতে যাওয়া যায়

কুড়িবার। কিংবা বাসে চাপা যায় অন্তত পঞ্চাশবার। এ-তো গেল শৌখিন ব্যবহারের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিশের জন্যও কীরকম কাজে লাগতে পারে। পাঁচশো পয়সার গম পাওয়া যাবে তেরো হাজারটি, চাল একুশ হাজার। চিনি পাওয়া যেতে পারে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টুকরো। ভাবলে মাথা ঘুরে ওঠে। যদি গুলি সুতো কিনি, পাঁচশো পয়সায় সাড়ে চার মাইল লম্বা সুতো আসতে পারে আমার অধিকারে। পাটকাঠি কিনলে ঘরভর্তি পাটকাঠি। মোমবাতিও পাওয়া যেতে পারে অন্তত পঞ্চাশটা। স্কুলের ছাত্রদের যদি রচনা লিখতে দেওয়া হয়, তোমাকে পাঁচ-পাঁচশো পয়সা দিলে কী করবে — তাহলে তারা নিশ্চয়ই লিখবে — এই পয়সায় একটা নাইট.স্কুল খুলে দেবে — কিংবা গ্রামে-গ্রামে বিদ্যুৎ এনে দেবে কিংবা কিনে ফেলবে ঘুড়ির দোকানের যাবতীয় ঘুড়ি।

ঐ বিপুল মুদ্রাব আর সদব্যবহার করা যায় একটি বই কিনে। যে-কোন বই নয় একটি পঞ্জিকা। পঞ্জিকা মেনে চললে সারা বৎসরের জন্য নিশ্চিন্ত। একাদশী অমাবস্যার উপবাস, যাত্রা নাস্তি, অশ্লেষা-মঘা, আজ অলাবুভক্ষণ নিষেধ, কাল বার্তাকু মানা, এই-এই দিন আমিষ বর্জন। এমন মনের সুখে দিন কাটাবার আর কী পথ আছে। ছেলেবেলায় আমাদের ইস্কুলেব দারোয়ানের মুখে যেমন তার আহার্যতালিকা শুনেছিলাম — ভাত, ভাত-সেদ্ধ আব ভাতের তরকাবি। সেইসঙ্গে নুন তো আছেই। অর্থাৎ চার-কোর্সের ডিনার। যেদিন খুব শৌখিনতা করার ইচ্ছে হত সেদিন মবিয়া হয়ে রাখত পুঁইশাকের দেখনাই। অর্থাৎ সকালবেলা পুঁইশাক রেঁধে সেটা না-খেয়ে, শুধু দেখে-দেখে খাওয়া। রাত্রিবেলা সত্যিকারের পুঁইশাকসমেত ভোজ।

দেখনাই প্রসঙ্গে ছেলেবেলার আর-একটি গল্প মনে পড়ল। পূর্ববঙ্গ থেকে কলিকাতায় আসবার পথে গোয়ালন্দের স্টিমারঘাটের হোটেলে গরম-গরম ইলিশমাছের ঝোল দিয়ে ঐশ্বরিক খাদ্য পেতাম ছপয়সায়। হোটেলে সাধারণের জন্য দুরকম রেট ছিল। ভাত, খেঁসারির ডাল ও বেগুন কুমড়োর তরকারি — এই নিরামিষ খাবারের জন্য তিন পয়সা। আর মাছের ঝোলসমেত ছপয়সা। আর-একটা বিশেষ রেটও ছিল। মাছের দেখনাই। অর্থাৎ নিরামিষের সঙ্গে একটা প্লেটে মাছও রেখে যাবে একটা, কিন্তু প্লেট থেকে মাছ না-ছুঁয়ে শুধু ঝোলটুকু ঢেলে নিয়ে, মাছটা দেখে-দেখে ভাত খাবার পর আবাব মাছটা ফেরত দিলে চার পয়সা। আমাদের পাশে এক পাইকার এসে খেতে বসে দেখনাই-এব অর্ডার দিয়েছে। পরম পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠে আবার মাছটা ফেরত দিয়ে ঢেকুর তুলে ম্যানেজারের কাছে দাম দিতে গেছে। গোয়ালন্দের ইলিশের তো ঝোলেই আদ্দেক স্বাদ। ম্যানেজার তাকে চার্জ করল পাঁচ পয়সা। পাইকার তো রেগেই অস্থির। একি

অন্যায় কথা, তার বেলা নতুন রেট, চার পয়সার জায়গায় পাঁচ পয়সা চাওয়া হচ্ছে তার কাছে। ম্যানেজার ঝিমুচ্ছিল, চোখ না-তুলেই বলল, ও হালার বাই হালা, দেহি নাই বুঝি! তুই যে চসছোস। (অনুবাদ : ওরে স্ত্রীর ভ্রাতাস্য ভ্রাতা, আমি বুঝি দেখিনি। তুই যে মাছটা চুষে নিলি একবার!)

বাসস্টপে দাঁড়িয়ে পাঁচশো পয়সার নোটখানির বিপুল সম্ভাবনার কথা ভেবে আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন মনে পড়ল, কিছুদিন আগে কাগজে একটি খবর বেরিয়েছিল যে, বীরভূম জেলার কোন চৌকিদার যেন এখনও দশটাকা মাইনে পায় মাসে। তাই নিয়ে খানিকটা টিপ্পনি আর হা-হুতাশ করা ছিল। কিন্তু কেন? ভেবে অবাক হলাম। দশ টাকা — একহাজার পয়সা কি কম হল নাকি। ওর থেকেই লোকটা কত পয়সা জমাচ্ছে, কে জানে!

২৩

আমার মামাতো বোনের স্বামীকে কেন যে আমি কোনদিন আর পছন্দ করতে পারবনা — সেকথা কারুকে খুলে বলতে পারবনা। কিছুদিন আগে বিয়ে হল, দেখতে খারাপ নয় ছেলেটি এবং তার চেয়েও বড় কথা, বেশ ভালো চাকরি করে, হাসিখুশি, দরাজ হাতে সিনেমা-থিয়েটার দেখাচ্ছে, অল্পবয়সী শ্যালক-শালিকাদের সঙ্গে প্রভূত ঠাট্টা-ইয়ার্কি এবং গুরুজনদের দেখলেই টিপটাপ করে প্রণাম করা, অর্থাৎ নতুন জামাই হিসাবে ঠিক যে-রকম হওয়া উচিত। আমি সম্পর্কে গুরুজন, কিন্তু ভারিক্কি নই বলে বেশ-একটা মার্জিত রসিকতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। ছেলেটিকে অপছন্দ করার কোনই কারণ নেই আমার, বরং খুবই ভালো লাগার কথা। কিন্তু আমি ওকে দেখলেই এড়িয়ে যাই। পারতপক্ষে কথা বলিনা। যদিবা কথা বলতে হয় কখনো, মুখে হাসি থাকলেও, ভিতরে একটা অদ্ভুত ঝাঝ ও ঘৃণা মেশানো থাকে।

কারণ, আমি ওকে চিনতে পেরেছি। ও আমাকে চেনেনা, কিন্তু এ-বিয়ে হবার অনেক আগে ওকে আমি একবার মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য দেখেছিলাম। সেই থেকে, ওর মুখ আমার চিরকাল মনে থাকবে। ওকে না-ঘৃণা করে আমার উপায় নেই। অথচ সেকথা মনে করিয়ে দিয়ে ওকে এখন আর অভিযোগ করা যায়না।

বাসে বিষম ভিড় ছিল, বছর পাঁচেক আগের কথা। অসম্ভব গরম, অন্যলোকের ঘাম আমার গায়ে এসে লাগছে, পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে রকমারি জুতো। এক-একবার ঢেউয়ের মতো ধাক্কায় হেলে পড়ছি। হঠাৎ আমার

পাশের সীটের ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। তিনি এবার নামবেন, একটা জায়গা খালি হবে এবং সে-জায়গাটা আমারই সবচেয়ে কাছে। ভদ্রলোক বেরিয়ে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছি। হঠাৎ একটু দূর থেকে, দু-তিনজন লোকের পিঠ সরিয়ে একটা ব্যাগ-সুদ্ধ হাত এগিয়ে এল, ধপ্ করে ব্যাগটা রাখল সেই জায়গায়। যেন জায়গাটা রিজার্ভড হয়ে গেল। তারপর শরীর এঁকেবেঁকে, দুমড়িয়ে ঠেলেঠুলে একটি যুবক এসে ধপ্ করে সেই জায়গায় বসে পড়ল। বসেই অন্যদিকে তাকাল যাতে আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি না-হয়। যুবকটির সেই চরম নির্লজ্জতায় আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। সুবেশ, সুদর্শন যুবকটি, এমন নয় যে শরীর অসুস্থ, শুধু একটু বসবার জন্য ঐরকম ঠেলেঠুলে জঘন্য অভদ্রতার পরিচয় দেবে — আমি কল্পনাও করতে পারিনি। আমি বিষম অপমানিত হলাম। আমার পাশে দাঁড়ানো আর-একটি লোক আমার দিকে সহানুভূতিসূচক হাসল বলে অপমানে আমার শরীর আরও জ্বলে গেল।

আমার অপমান বসতে না-পারার জন্য নয়। লোকটির অভদ্র ব্যবহারে। ও-লোকটা আমাদের ভদ্র হবার সুযোগ দিলনা। আমি ভিড়ের ট্রামে-বাসে কখনো বসিনা। বিশেষত যদি একা থাকি। যদি দৈবাৎ আমার সামনে কোন বসাব জায়গা খালি হয়, আমি সেটার সামনে আগলে দাঁড়াই, তারপর তাকাই লোকের চুলের দিকে। দেখি, কার মাথার বেশি চুল পাকা। সেই বৃদ্ধ বা বৃদ্ধোপম লোকের দিকে চেয়ে গলায় এক রাজ্যের বিনয় ঢেলে বলি, আপনি বসুন। তারপর, না, না, সেকি, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, না তা কি হয়, হ্যাঁ আপনি বসুন, বেঁচে থাকো বাবা, আজকাল এরকম! লোকটিকে শেষপর্যন্ত বসিয়ে ছাড়ি। হাতের কাছে বৃদ্ধ না-পেলে, কোন স্ত্রীলোক বা বালককে। এই বিনয় বা ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আমি গর্বোদ্ধত মুখে তাকিয়ে থাকি। বলা বাহুল্য, আমার উদারতার কথা এখানে লিখতে বসেছি, এতটা ক্যাড আমি নই। উদারতা নয়, ওটা আমার অহংকার। ঐ সীট-লোভী, শকুনের মতো জনতা — যাদের সবারই চোখ তখন ঐ একটি খালি সীটের দিকে — সেখানে আমি দাঁড়িয়ে অন্যরকম ব্যবহার করতে, সীট ছেড়ে দেবার উদারতা দেখাতে যে আনন্দ পাই, তার তুলনায় নিজে বসার পর সামান্য পশ্চাৎদেশের সুখ কিছুই না। তখন মনে হয়, ঐ সীটটার আমি মালিক, রাজা, যাকে ইচ্ছে বিলিয়ে দিতে পারি। মানুষের প্রতি দয়া দেখাতে পাবার সুযোগের মতো সুখের সুড়সুড়ি আর কিছুতে পাওয়া যায়না।

কিন্তু সেদিন ঐ যুবকটি ছিঁচকে চোরের মতো আগে থেকে ব্যাগ বাড়িয়ে জায়গাটা দখল করে নিতে, আমার অসম্ভব রাগ হয়। রাগ হয়, আমার ভদ্রতা দেখাতে না-পারার ক্ষোভে। তাছাড়া ঐ ছেলেটা, বা অন্য লোকেরা কী ভাবল,

আমিই ঐ জায়গাটায় বসার জন্য উৎসুক, লোভী ছিলাম? পাশের লোকটা, তবে আমার দিকে সমবেদনার হাসি হাসল কেন?

তখন, ঐ সীটে-বসা ছেলেটির মুখ দেখতে আমার খুব ইচ্ছে হয়। ব্যাগ হাতে নিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে সুবেশ যুবকটি বসে আছে। কিন্তু, আসলে সাধুবেশে একটি পাকা চোর। পরের জায়গা চুরি করে। ইতর, জোচ্চোর কোথাকার! তোমার মুখ না-দেখে আমি ছাড়ছিনা। তোমার মতো ঘৃণ্য চরিত্রের মানুষকে আমার সারাজীবন চিনে রাখা দরকার।

আমি মুখ নিচু করে সেই যুবকটিকে জিজ্ঞেস করি, 'এখন কটা বাজে?' ছেলেটি বোধহয় উৎকর্ণ হয়ে ছিল, নিজের অপরাধবোধে বোধহয় সজাগ হয়েছিল, কেউ কোন মন্তব্য করে কিনা। যদিও তাকিয়ে ছিল জানালা দিয়ে বাইরে, কিন্তু কান খাড়া ছিল বোধহয় এদিকে। আমার প্রশ্নে ধড়মড় করে নড়েচড়ে উঠে বলে, 'অ্যাঁ?'

— কটা বাজে?

— কী বলছেন?

— ক-টা বাজে, বলবেন দয়া করে? আমি চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্ন করি। যুবকটি অবাক হয়ে আমার কঠিন লোহার মতো মুখের দিকে তাকায়। বোধহয় একবার ভাবে যে, আমি অসম্ভব রেগে গেছি, ওর উঠে আমাকেই সীট ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা যদি ও করত, অর্থাৎ আমাকে ও ওর নিজের মতো বা জনতার মতো সীট-লোভী মনে করে তা প্রকাশ করত, তাহলে আমি সেইমুহূর্তে বোধহয় ওকে মেরেই বসতাম! তার বদলে, ছেলেটি বসে থেকেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে, ভ্যাবাচ্যাকা গলায় বলে, 'দশটা বাজতে দশ!' ততক্ষণ আমি ওর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি, ওর মুখের ছাঁচ তুলে নিই আমার মনে, ঐ মুখ আমার চিরকাল মনে থাকবে, চিরকাল আমি ঘৃণা করব।

আমারই ভাগ্যের দোষে, সেই ছেলেটি হয়েছে আমার মামাতো বোনের স্বামী। এখন দেখা যাচ্ছে, কী সুন্দর ভালো ছেলে। সবাই বলছে, হীরের টুকরো জামাই। সত্যিই অরুণার ভাগ্য বলতে হবে। আমিও ওর চরিত্রে কোন খুঁত দেখতে পাইনা, এমন মানানসই ব্যবহার, যেখানে ঠিক যেমন দরকার। কিন্তু সেই মুখ আমার মনে আছে, আমার কাছে বিষম ঘৃণ্য ঐ মুখ, দেখলেই আমি মুখ ফিরিয়ে নিই। অথচ ছেলেটির আমাকে নিশ্চয়ই মনে নেই, আমার সঙ্গে ওর ব্যবহার এত সহজ। অর্থাৎ বাসে ও বহুবার সীট চুরি করেছে, এখনো করে চলেছে বোধহয়, আমার সঙ্গে একটা ঘটনা ওর মনে থাকবে কী করে।

অথচ, একথা আমি কারুকে বলতে পারিনা। বললে, বাড়ির সবাই নিশ্চয়

হো-হো করে হেসে উঠবে। বলবে, আগ-বাড়িয়ে একটা খালি সীট পেয়ে বসেছিল, এটা আবার দোষের নাকি? তুমি বসতে পারনি, এইজন্য তোমার রাগ? আহা, তখন কি আর পুলকেশ জানত যে একদিন তুমি ওর গুরুজন হবে? তাহলে, নিশ্চয়ই তোমাকেই সীট ছেড়ে দিত। — এসব শুনে আমার মাথায় খুন চড়ে যাবে বলেই আমি কারুকে বলিনা। ওর বিরুদ্ধে আমার একমাত্র অভিযোগ, আমাকে দয়া দেখাবার সুযোগ না-দিয়ে ও কেন নিজেই আগে জায়গা জুড়ে বসেছিল? আমি হয়তো ওকেই বসতে অনুরোধ করতাম।

আহা, অরুণা সুখী হোক। কিন্তু অরুণার স্বামী পুলকেশকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারবনা — যতদিন-না ও নিজের মোটরগাড়ি কেনে। মোটরগাড়ি কিনলে একমাত্র তখনই হয়তো আমার মন থেকে ওর সীট চুরির অপবাদটা মুছে যাবে।

২৪

জীবনে একবারই মাত্র কিছুদিনের জন্য আমি একটা দামি কলম ব্যবহার করেছিলাম। একটি ১৮ কারেট সোনার নিব-দেওয়া শেফার্স কলম। আমার বাবা খুব-একটা উদার, মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেননা। বিশেষত ছেলেদের উপহার-টুপহার দেবার দিকে তার কোন ঝোঁক ছিলনা। কিন্তু সেবার আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে বাবা হঠাৎ দিলদরিয়াভাবে ঘোষণা করলেন, অনেকটা সর্বসমক্ষেই, যে আমি যদি একবারেই ম্যাট্রিক পাশ করতে পারি, তবে আমাকে তিনি একটা দামি কলম কিনে দেবেন। ওরকম আকস্মিক ঘোষণার কারণ, আমি ভেবে দেখেছি, তাঁর নিশ্চিত দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আমি কিছুতেই পাশ করতে পারবনা, আমি পাশ করলে বিশ্বসংসারে একজনও ফেল করবেনা সে-বছর, সুতরাং রীতিমতো উদারতা দেখাবার সুযোগে, তিনি ওরকম একটা দামি ঘোষণা করে ফেলেছিলেন। এবং তারপর থেকে, আমি দেরি করে বাড়ি ফিরলে বা দুপুরে সিনেমায় পালিয়ে গেলে কিংবা ইতিহাস-বই চাপা দিয়ে গোয়েন্দা-গল্প পড়ার সময় ধরা পড়লে — বাবা আর আমাকে বকুনি না-দিয়ে, মৃদু, রহস্যময় হাসি হেসে বলতেন, পাশ করলে আমি কিন্তু সত্যিই একটা কলম কিনে দিতাম।

অনেক অসম্ভব ব্যাপারই পৃথিবীতে ঘটে। আমার বন্ধুরা যদিও এখনো অনেকে বিশ্বাস করেনা, কিন্তু একথা সত্যিই, আমি কিন্তু ম্যাট্রিকটা অন্তত ঠিকই পাশ করেছিলাম এবং সেবার, ঐ প্রথম বারেই।

আমার পাশ করার খবরে বাবা বোধহয় খানিকটা বিমর্ষ হয়েই পড়েছিলেন। কয়েকদিন খুব মন-মরা অবস্থায় দেখেছি। এমনকী, অন্যের সঙ্গে আলাপ করতে শুনেছি পর্যন্ত, যে, আজকাল নাকি পরীক্ষা-টরিক্ষার স্ট্যান্ডার্ড এত নিচে নেমে গেছে, গোরু-গাধাও পাশ করে যায়! তাঁদের আমলে, যখন উইলসন সাহেব ছিলেন — ইত্যাদি।

যাই হোক, শেষপর্যন্ত একটা কলম কিনে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। শৌখিন, শেফার্স কলম। কলমটা আমি সবসময় পকেটে নিয়ে ঘুরতাম, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে বসে গল্প-গুজব করার সময় অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে কলমটা পকেট থেকে বার করে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতাম, কাগজে হিজিবিজি কাটতাম। আসল উদ্দেশ্য ছিল, কলমটা সকলকে দেখানো, আমি যে পরীক্ষায় পাশ করেছি তার নির্ঘাৎ প্রমাণ।

আমার জীবনের সেই একমাত্র শৌখিন কলম পকেটমার হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যেই। কিন্তু সেজন্য আমার দুঃখ হয়নি। আমার বাবার ধারণা ছিল, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর যে মাস-তিনেক ছুটি থাকে, সেই সময়টাতেই অধিকাংশ ছেলে-মেয়ে বখে যায়। ইউনিভার্সিটির অত্যন্ত অন্যায় এতদিন ছুটি রাখা। ঐসময় ছেলেরা লেখাপড়া করেনা, অলস মাথা শয়তানের কারখানা, ঐসময়টাতেই প্রেম-ট্রেম করার দিকে মন যায়। এইসব কারণে, বাবা আমাকে ঠিকপথে রাখবার জন্য একটিও পয়সা হাতখরচ দিতেননা। তাছাড়া, ঐরকম দামি কলম কিনে দেবার পর আর অর্থব্যয়ে তাঁর একেবারেই মতি ছিলনা বোধহয়। এবং উনি বিশ্বাস করতেন যে, প্রেম-টেম করার সময় পয়সা খরচ করতে পেলে ছেলেরা বিড়ি-সিগারেটও খেতে শেখে, সুতরাং পয়সা না-পেলেই আর ওপথে যাবেনা। আমাকে তিনি ট্রামের একটা মাসিক টিকিট কিনে দিয়েছিলেন, যাতে আমি গাড়ি-ভাড়ার ছুতো করেও একটা পয়সা চাইতে না-পারি। কিন্তু আমার হাতে তখন বাজার করার ভার ছিল, এছাড়া রেশন আনা, — আমার খুব একটা দৈন্যদশা ছিলনা।

একদিন একটা ট্রাম-স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। সদ্য দোতলা রঙিন বাস বেরিয়েছে তখন কলকাতায়, অথচ আমি তাতে উঠতে পারিনা — আমাকে ট্রামেই যেতে হয়। সেদিন একটা চমৎকার নীল রঙের বাস এসে থামল আমার সামনে, জানলার পাশে একটি মেয়ে বসে আছে। আহা কী রূপ, মনে হল বিশ্বসংসারে এর চেয়ে রূপসী মেয়ে আর নেই। আমি তৎক্ষণাৎ যেন বিশ্বসংসার ভুলে গেলাম! মনে হল, এই সুন্দরীকে আর-একটু সময় দেখতে না-পেলে আমার জীবনই বৃথা। ট্রামের টিকিট থাকা সত্ত্বেও আমি লাফ দিয়ে বাসে উঠলাম। ঠেলে-ঠুলে সেই সুন্দরীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। কিন্তু, বেশিক্ষণ মোহিত হবার সুযোগ পেলামনা, কারণ মেয়েটি তার পরের স্টপেই নেমে গেল। বিষণ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি পকেটে

হাত দিলাম, দিয়েই চমকে উঠলাম, আমার বুকের মতো বুক-পকেটও ফাঁকা। পেনটা উধাও। ট্রামের টিকিট থাকা সত্ত্বেও বাসে ওঠার ঐ ফল। কিন্তু আমি দুঃখ করিনি। সুন্দরী নারীর জন্যে সেই প্রথম আমার আত্মত্যাগ।

জীবনে আমার পকেট মারা গেছেও সেই একবার। আর কখনো না। তার প্রধান কারণ অবশ্য, আমার পকেট স্বভাবতই ফাঁকা থাকে, কলম আর জোটেনি। কিন্তু পকেট মারা না-গেলেও একটি পকেটমারের সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল।

বিকেলবেলা ভিড়ের বাসে আসছি, শিয়ালদা পেরুবার পর, হঠাৎ আমার নাকের কাছটা একটু চুলকে উঠল। নাকটা চুলকোতে গিয়ে — কী যেন একটা ব্যাপারে আমার খুব অস্বস্তি লাগল। একটা কী যেন রহস্য। আমার একহাতে বাসের হ্যান্ডেল ধরা, একহাত নিজের পকেটে। তবে কোন হাতে আমি নাক চুলকোলাম? আমার তো তিনটে হাত হতে পারেনা। এই তো টের পাচ্ছি পকেটে নিজের সেই হাত, আর-একহাতে সত্যিই হ্যান্ডেল ধরে আছি, আর-একটা হাতে এই মাত্র নাক চুলকোলাম। তাহলে? আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই আমি বিদ্যুৎগতিতে নাক চুলকোনো হাতটা দিয়ে পকেটের হাতটা চেপে ধরলাম। পকেটের মধ্যে দুটো হাতে খুব হুড়োহুড়ি হতে লাগল, কিন্তু, আমি প্রবলভাবে দৃঢ় মুষ্টিতে সেই হাতটা ধরে আছি। মুখে কিছু বলিনি। সেই হাতটা অনুসরণ করে, সেই হাতের মালিককে দেখলাম। আমারই পাশে দাঁড়ানো রোগা চেহারার একটি যুবক। আমার পকেটে কিছুই ছিলনা, কয়েকটা বাজে কাগজপত্র আর খুচরো পয়সা, কিন্তু সেই অনধিকার-প্রবেশকরা হাতটি আমি পকেটের মধ্যেই ধরে রেখেছি, এ-অবস্থায় একবার 'চোর', 'পকেটমার' বলে চেঁচিয়ে উঠলেই সবাই — বাসের সব-কটা লোক, ছেলেটাকে মেরে একেবারে ছাতু করে দেবে। যে-সব লোক কোনদিনও দুর্গাপুজো, কালীপুজো কিংবা রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে চাঁদা দেয়না, তারাও পকেটমারকে মারার সময় চাঁদা দিতে এগিয়ে আসে।

তখনও বজ্রমুষ্টিতে হাতটা ধরা, তাকিয়ে দেখি ছেলেটির চোখে বিষম মিনতি মাখানো। অর্থাৎ কিছু তো নিতে পারেনি, এই অবস্থায় ওকে যেন আমি আর মার না-খাইয়ে ছেড়ে দিই। আমি চোখ দিয়ে ওকে ভস্মসাৎ করলাম প্রায়। মুখে একটুও কথা হলনা। কিন্তু চোখে-চোখে আমাদের কথা হল কিছুক্ষণ। ছেলেটি চোখ দিয়ে আমার কাছে ক্ষমা চাইছে। আমি চোখ দিয়ে ওকে ধমকাচ্ছি। যে-কোন মুহূর্তে ওকে মার খাওয়াতে পারি। হঠাৎ দেখি ছেলেটির চোখ দিয়ে সত্যি-সত্যিই এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল। তখন হাসি পেল আমার। আমি বন্দী হাতটাকে মুক্তি দিলাম পকেট থেকে। ছোকরাটা সঙ্গে-সঙ্গে বাস থেকে নেমে গেল।

কিন্তু সেই যে ছেলেটির চোখে-চোখে এতক্ষণ তাকিয়েছিলাম, ফলে ছেলেটির মুখ আমার মনে আঁকা হয়ে গেল। সম্ভবত ওর মনেও আমার মুখ।

একদিন বাসে উঠতে যাচ্ছি, পাশ থেকে একজন বলে উঠল, 'ওঃ, আপনি এ-বাসে উঠছেন? থাক্, তাহলে আমি আর উঠবনা!' তাকিয়ে দেখি সেই পকেটমার ছেলেটা, আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। আমিও হাসলাম। আরও একদিন বাসের ভিড়ের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখা। এবারও ছেলেটা বলল, 'আমি নেমে যাচ্ছি স্যার, কিছু বলবেননা।' চট্ করে সত্যিই নেমে গেল।

তারপর থেকে ছেলেটার সঙ্গে প্রায়ই আমার দেখা হত। একদিন অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্পও করেছিলাম। পকেটমারদের জীবনের সুখ-দুঃখের কথা কিছু শুনতে হয়েছিল। ওদের অভাব-অভিযোগ, ওদের প্রতি পুলিশের অবিচার। সেদিন একটা জিনিশ লক্ষ করেছিলাম, প্রত্যেকেরই যে-কোন ব্যাপারে নিজস্ব অনেক দাবি থাকে। ওর দাবি শুনে মনে হল, পকেটমার-সমাজেরও জীবিকার একটা প্রোটেক্শান দরকার, ওদের কাজের বোনাস ও ইনক্রিমেন্ট, এবং সাধারণ লোকের পকেটে যথেষ্ট টাকা থাকা ও মানুষজনের চরিত্র কিছুটা আপনভোলা ও উদাসীন করে দেওয়া — সরকারেরই দায়িত্ব। নইলে ওদের জীবিকা চলবে কী করে? এই যে, এখন বেশির ভাগ লোকের পকেটেই টাকা থাকেনা — এটা তো একটা নিশ্চিত সরকারি ষড়যন্ত্র, পকেরমারদের জব্দ ও বেকার করার জন্য।

আমি ছেলেটিকে বললাম, 'ওসব কথা থাক্। শুনেছি তোমাদের সারাদিনের সব রোজগার এক জায়গায় জড়ো হয়। তারপর পেন, ঘড়ি ইত্যাদি বিক্রি করার ব্যবস্থা হয় একসঙ্গে। ভাই, আমার একটা শেফার্স কলম চুরি গিয়েছিল বাসে। তোমাদেরই কারুর কাজ। সেটা আমায় ফেরত দিতে পার? আমি সেটার দাম দিতেও রাজি আছি। কিন্তু, ওটা আমার বাবার স্মৃতিচিহ্ন।'

— আপনার পেন? কবে গেছে?

— বছর তিন-চার আগে।

— ওঃ, অতদিন আগের জিনিশ পাবেননা। এরপর কিছু চুরি গেলে — আমায় বলবেন। আপনার জিনিশ আমি ঠিক ফেরত দিয়ে দেব।

— কিন্তু ওটাই দেখো-না চেষ্টা ক'রে। আমার কলমের গায়ে আমার নাম লেখা আছে। ওটা আমার বাবা দিয়েছিলেন। বাবা মারা গেছেন, তাই ওটা আমি রাখতে চাই।

— না স্যার, ওটা পাবার কোন চান্স নেই। আপনি অন্য কলম চান তো বলুন। খুব ভালো কলম এনে দেব — ঐ শেফার্সই।

— না না, সে দরকার নেই। তোমাদের কাছ থেকে কলম নিয়ে মরি আর-

কি! শেষে রাস্তায় কোন লোক নিজের কলমটা চিনতে পেরে...

— আপনার কলমটা কোথায় মারা গেছে?

— কলেজ স্ট্রিটে, এক শীতকালের সন্ধেবেলা।

— হুঁ, ওটা গগনলালের এলাকা। আচ্ছা, দেখব এখন গগনলালকে জিজ্ঞেস করে।

— দেখো-না, ওটা আমার খুব শখের!

— আপনি যাবেন গগনদার বাড়ি?

— আমি যাব? সে কি হে?

— হ্যাঁ স্যার, গগন আমাদের মতো নয়, রীতিমতো ভদ্দর লোক, বিরাট তিনতলা বাড়ি। তিনপুরুষ ধরে ওদের এই ব্যবসা। উনিই তো আমাদের সর্দার।

— যাঃ! তিনপুরুষ ধরে পকেটমারের ব্যবসা?

— বিশ্বাস করুন! বাড়িসুদ্ধু সকলের। আপনি যদি প্রতিজ্ঞা করেন, কারুকে বলবেননা, তবে আপনাকে আমি গগনদার বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। অবশ্য, পুলিশকে হাত করা আছে গগনদার!

সত্যরক্ষাব খাতিরে আমি গগনলাল সামন্তের বাড়ির ঠিকানা জানালামনা। কিন্তু সেখানে গিয়েছিলাম। গগনলাল সামন্ত একটি মধ্যবয়স্ক ঘাড়-ছাঁটা লোক, দেখলে মনে হয় রাজনীতি করেন। আমাকে তিনি খুব-একটা পছন্দ করলেননা। আমার সঙ্গীর দিকে আড়চোখে বারবার ভ্রূকুটি করলেন। আমার সঙ্গী সারা দেহটা মুচড়ে অশেষ কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে জানাতে লাগল, যে একদিন আমি ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি, সেইজন্যই — মানে সামান্য একটা উপকার, কলমটা আমার বাবার স্মৃতি— ইত্যাদি।

গগনলাল বললেন, 'চারবছর আগের কলম পাবার কোন উপায় নেই। এরপর যদি আবার কোন' — ইত্যাদি। সেইসঙ্গে পকেটমারের সর্দার আমাকে একটি উপদেশও দিলেন, 'ট্রামে-বাসে সাবধান হয়ে চলাফেরা করাই ভালো, বুঝলেন!'

কথা হচ্ছিল বাড়ির সদর দরজায় দাঁড়িয়ে। এমন সময় হিলতোলা জুতোর টকটক শব্দ করতে-করতে একটি ঝলমলে পোশাক-পরা যুবতী বেরিয়ে এল বাড়ি থেকে। একঝলক তার দিকে তাকিয়েই চারবছর আগের সেই সন্ধেবেলার স্মৃতি মনে পড়ল। হ্যাঁ, কোন সন্দেহ নেই, এই সেই বাসের মধ্যে জানালার ধারে বসে-থাকা সুন্দরীর মুখ। যা দেখে আমি মোহিত হয়েছিলাম। হ্যাঁ, নিশ্চিত, কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটিকে দেখেই আমার মনে হল, আমার যদি আর-একটা কলম থাকত, আমি ওর পায়ে অর্ঘ্য দিতাম আবার।

২৫

আমি একটি অলীক শহরের অধিবাসী। যখন একা-একা পথ হেঁটে যাই, তখন আমি আমার ছায়ার মুখোমুখি থাকি, পাশাপাশি নয়। আমি ঠিক কোন্ দিকে যাব বুঝতে পারিনা, আমার ছায়া পথনির্দেশ করে। অনেকসময় বলে, রাস্তাটা বাঁদিকে বেঁকে গেছে, তোমার যাবার দরকার সামনে, কিন্তু তুমি এখন ডানদিকেই যাও। এমন অবাস্তব, অলীক, অভ্রপুষ্প, মায়া, দৃষ্টিবিভ্রম এই পথগুলি।

বস্তুত, যে-কোন বাস্তব শহরের রাস্তাই হওয়া উচিত সোজা। কখনও বাম-দক্ষিণে বেঁকে যাবেনা। রাস্তা তো আর নদী নয় যে, যে-কোন দিকে ঘুরে যাবার অধিকার আছে। নদী ইচ্ছেমতো যায়, ইচ্ছেমতো লুকোচুরি খেলে, নারী-শরীরের মতো প্রত্যেক বাঁকে-বাঁকে নতুন সৌন্দর্য দেখানো তাকে মানায় — কারণ খেয়ালিপনা প্রকৃতিরই ভূষণ। কিন্তু মানুষ যেখানে সম্মিলিতভাবে কাজ করে সেখানে খেয়ালিপনার কোন অবকাশ নেই — সেখানে শুধু কেজো, দরকারি, শ্রীহীন — সরকারি চিঠির ভাষা ও কাগজের মতো কঠোর ও কুৎসিত হওয়াই স্বাভাবিক। যেমন, নদী আঁকাবাঁকা হয়, কিন্তু মানুষের কাটা খাল হয় সোজা আর লম্বা। মঙ্গলগ্রহে কিংবা চাঁদে প্রথম মানুষের অস্তিত্বের কথা বিজ্ঞানীদের মনে আসে — যখন দূরবীনে কয়েকটা লম্বা-লম্বা খালের মতো দেখা গিয়েছিল। ওরকম সোজা বলেই মনে হয়েছিল — ওগুলো নদী নয়, প্রাকৃতিক নয়, প্রাণীর তৈরি। সেই নিয়মে, প্রতি শহরের পথ হওয়া উচিত চওড়া, সোজা, বিচার-বিভাগীয় তদন্তের মতো দীর্ঘ। তার বদলে আমার এই অলীক কলকাতা শহরে সব রাস্তাই কুটিল ও বক্র, মানুষের মনের মতো অলিগলি।

আরেকটি অদ্ভুত কাণ্ড এই শহরের বাড়িগুলি। এক-একটা বাড়ির দেয়াল এক-এক রঙের হয় কেন? বাড়ি চিনতেই পারিনা। এমন নানান রঙের বাড়ি হলে কি সহজে চেনা যায়! আমার কোন-একটা বাড়িতে যাবার দরকার হলে — আমি যে-কোন রাস্তায়, যে-কোন দিকে মোড় ঘুরে যে-কোন বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলি, অমুক আছে? ঠিক কোন-না-কোন অমুক বেরিয়ে আসে। বাংলা ভাষায় দুটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় শব্দ আছে, 'অমুক' আর 'ইয়ে', অধিকাংশ বাক্যালাপ আমি এই দুটি শব্দপ্রয়োগে সেরে ফেলি। কোন অসুবিধে হয়না। কিন্তু বাড়িগুলো নানা রঙের হওয়ার কোন যুক্তিই নেই। 'ঈশ্বর গ্রাম সৃষ্টি করেছেন, মানুষ সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষ সৃষ্টি করেছে নগর।' তাহলে, মানুষের গড়া নগর ঈশ্বরের সৃষ্টির চেয়ে আলাদা হবেনা? লাল-নীল-হলুদ-গোলাপী কেন বাড়ির রং, ওসব তো ফুলের রং হয়, বাস্তব শহরের যে-কোন বা প্রতিটি বাড়ির রং হওয়া উচিত কালো, কালোই হওয়া উচিত সমস্ত মানবসমাজের রং। প্রকৃতির

একমাত্র কালো অঙ্গ তো যা দেখছি কয়লা, তাও থাকে মাটির নিচে, মানুষ সেগুলো ওপরে তুলেও পুড়িয়ে ছাই রং করে দিচ্ছে। সুতরাং, সমস্ত শহরের বাড়ির রং কালো করে দেওয়া উচিত আইন করে, কোন বাড়ি আর ময়লা দেখাবেনা, কুৎসিত দেখাবেনা, আলাদা দেখাবেনা। একমাত্র আলাদা রং, সাদা রঙের হোক দেবালয়গুলো — মন্দির মসজিদ চৈত্য গির্জা সিনাগগ। দেবালয় আর মানুষের বাড়ির রং যদি এক হয়, তবে দেবালয়গুলো আলাদা করে-করে তৈরি করার দরকার কী? 'হৃদয়-মন্দির' শব্দটা যে আজকাল অপ্রচলিত হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ হৃদয়ের কোন রং নেই, মানুষের দেহকে দেবতার আয়তন হিসেবে ভাবতে অনেক কষ্ট হয়, কেননা মানুষকে শুধু মানুষ হিশেবে চিনতেই বহু সময় কেটে যায়।

আঃ, কল্পনা করেও কত সুখ! যেদিন আমার শহর বাস্তব হয়ে উঠবে — প্রতিটি পথ পিচবাঁধানো চকচকে, যতদূর দৃষ্টি যায় সোজা — দুপাশের প্রাসাদসারি নিখুঁত কালো রঙের, কোথাও অন্য রঙের মলিনতা নেই — মাঝে-মাঝে দু-একটি শ্বেত-শুভ্র দেবালয় ছাড়া। প্রকৃতি জানে কীভাবে সুন্দরের দর্শন করতে হয়, মানুষ জানেনা। প্রকৃতি জানে, সুন্দর জিনিশ সবসময় দেখতে নেই, মাঝে-মাঝে চোখের আড়াল করতে হয় — পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের আকর যে নারী — তাকেও অনবরত দেখলে পুরোনো ও মলিন হয়ে যায় — মানুষ তবুও নারীকে মলিন করে। আমি এই তত্ত্ব জেনে একটি বিশেষ নারীকে ঘনঘন দেখতে যাইনি। কিন্তু নারীও মলিনা হতে চায় — সে আমাকে ভুলে গিয়ে অপর ঘনঘন-আসা পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠা হয়েছে। প্রকৃতির যেটুকু কালো রং, সেটুকু সৃষ্টির নয়, বিস্মৃতির, অর্থাৎ রাত্রি। প্রকৃতির যত সৌন্দর্য দিনেরবেলায় দেখায়, সেগুলো আবার আড়াল করে রাখে সারারাত। সেইজন্যই প্রকৃতি মলিন হয়না, হয়তো।

না, শুধু তাই নয়। রাত্রিবেলা চাঁদ ও তারাগুলো দেখার জন্য অমন চমৎকার অন্ধকার পটভূমিকা তৈরি করে। দিনের আলোয় যাঁরা চাঁদ দেখেছেন — তাঁরা জানেন, সে চাঁদ ব্যবসায়ীর লাল রঙের বাড়ির পাশে লাল রঙের মন্দিরের মতোই কুৎসিত দেখায়। শুভ্র দেবালয় দর্শনের জন্য শহরের প্রতিটি বাড়ি কালো না হলে চলেনা।

এই অলীক শহরের মানুষগুলোও এমন দুর্বোধ্য যে, আজ পর্যন্ত কারুকে একবিন্দু বুঝতে পারলামনা। একদা আমি দুটি লোকের সংলাপ শুনেছিলাম একটি জটিল রাস্তার মোড়ে। দুটি লাল ও বেগুনি রঙের মানুষ। বলা বাহুল্য, ওদের গায়ের রং লাল কিংবা বেগুনি ছিলনা, স্বাভাবিক মানুষের গায়ের রং যেমন হয়, ময়লা ঘোলাটে জলের মতো। কিন্তু ওদের একজন একটা কটকটে লাল রঙের র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে ছিল, বাকিজন বেগুনি রঙের স্যুট। ওদের দুজনের পোশাকই এমন

চড়া রঙের যে দেখলে প্রথমেই মনে হয় ওদের কোন নাম নেই — দুটি লাল ও বেগুনি রঙের মানুষ মাত্র। ওদের সংলাপ এইরকম : বেগুনি লালকে দেখে হন্তদন্ত হয়ে বলল, এই যে বাবলু, তোর সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল, তিরিশটা টাকা দে তো। — লাল একটু উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, টাকা নেই তো ভাই।

— বাড়ি গিয়ে দিবি চল! আমার হঠাৎ বিশেষ দরকার পড়েছে!

— আমার বাড়িতেও টাকা নেই।

— মহা মুশকিল হল তো। আচ্ছা, তুই একটা চেক্ লিখে দে-না, আমি কাল দশটার মধ্যেই ভাঙিয়ে নেব এখন।

— আমার ব্যাঙ্ক চেক্-বই দেয়না।

— সেকী রে, তোর কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট?

— ব্লাডব্যাঙ্কে।

আমি স্তম্ভিত হয়ে এই বাক্যালাপ শুনলাম। সারাদিনটা সেদিন আমার দুশ্চিন্তায় গেল — ওদের কথার মর্মার্থ বুঝতে না-পেরে নয়, অন্য কারণে, ওদের রং বুঝতে না-পেরে। যে-লোকের ব্লাডব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট তাকে দেখে লাল মানুষ মনে হতে পারে, কিন্তু যে ঋণ চাইছে সে বেগুনি কেন? কী যুক্তি থাকতে পারে এর? সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য এই কাণ্ডটি ওরা করে গেল আমার চোখের সামনে!

আরেকদিনও এরকম সংলাপ শুনেছিলাম আমি। সেদিন আমার মনে হয়েছিল -- কোন বাস্তব শহরে চিড়িয়াখানা থাকা উচিত নয়। সম্পূর্ণ অবান্তর পাগলামি বলা যায়। একদিন আমার এই অলীক শহরের চিড়িয়াখানা দেখতে গিয়েছিলাম আমি — তখন শীতের মৌসুমি পাখি এসেছে। কিন্তু পাখি দেখার বদলে — হিংস্র জন্তু-জানোয়ারগুলো দেখার কৌতূহলই বেশি হল আমার — কারণ ওদের তো সহজে দেখতে পাইনা। একটি ঝোপের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ঝোপের আড়ালের বেঞ্চি থেকে টুকরো সংলাপ কানে এল। একটি বিরক্তি ও ভয়-মিশ্রিত বালিকার চাপা কণ্ঠ, 'না, একী অসভ্যতা হচ্ছে, ছাড়ুন।'

গলার মধ্যে আস্ত পান্তুয়া ঢোকানো অবস্থার মতো স্বরে একটি পুরুষের উক্তি, 'একি লীলা, তুমি রাগ করছ!'

— না, সত্যি ভাল্লাগেনা। চলুন এবার যাই।

— একটু বসো! আমাকে বুঝি তোমার একটুও ভালো লাগেনা?

— ওসব কী কথা। আঃ না, চলুন।

— তোমাকে আমার এমন ভালো লাগে। সত্যি লীলা, তোমার মতন —

— একি একি! না আপনার সঙ্গে আমার আসাই উচিত হয়নি।

— আমাকে তুমি ভুল বুঝছ। আমি সত্যি তোমাকে এত —। তোমাকে কাছে

পাবার জন্য –

– ইস্, ছি-ছি-ছি। ছাড়ুন, ছাড়ুন, উঃ, দূর হয়ে যান! আমি একাই যেতে পারব। অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার!

– হা-হা-হা। তুমি সত্যি রেগে যাচ্ছ –

আমার পায়ের নিচ দিয়ে দুটো শিকড় বেরিয়ে আমাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখেছিল। নইলে, আগেই আমি স্থানত্যাগ করতাম। কিন্তু পরেও বহুক্ষণ আমি ওখান থেকে নড়তে পারলামনা। ওই একদৃশ্যের বেতার নাটকটার জন্য নয়, ওরকম তো যেখানে-সেখানে আকছার ঘটছে, এমনকী বেতারেও ওরকম কুচ্ছিৎ নাটক শোনা যায় অসংখ্য। কিন্তু, আমি অনড় হয়ে ছিলাম, কারণ মেয়েটির 'জানোয়ার' বলার সঙ্গে-সঙ্গে লোকটির হা-হা করে হেসে ওঠার মধ্যে আমি অবিকল একটি হায়নার ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। চিড়িয়াখানার রেলিংয়ের বাইরে, খোলামেলা মাঠে ঝোপের পাশে হায়নার ডাক শুনতে পাই। তাহলে আর চিড়িয়াখানায় ও-সব জানোয়ার পুষে লাভ কী? সেদিনই আমার উপলব্ধি হয়েছিল একথা যে, ক্লাইভ স্ট্রিট কেন রেলিং দিয়ে ঘিরে রাখেনি। ক্লাইভ স্ট্রিটে একদিন প্রকাশ্য দিনমানে আমি দুটি কুমীরকে পাশাপাশি বুকে হেঁটে যেতে দেখেছিলাম। তাদের দুজনেরই মাথায় পাগড়ি এবং হাতে গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ। কুমীর দুটো গল্প করতে-করতে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেল। এবং একটা সর্ষের তেলের পুকুরে নেমে সাঁতার কাটতে লাগল।

কিন্তু এরসঙ্গে কিছুরই তুলনা হয়না সেই বৃদ্ধের। এই অলীক শহরের দুর্বোধ্যতম মানুষ। কাল রাত্রে।

আমার এক বন্ধু আমাকে একবার বলেছিল যে, যে-কোন অচেনা মেয়েকেই 'আপনাকে আগে অনেকবার দেখেছি' বললে খুব খুশি হয়। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার উপায় – এবং রোগ শুনলেই ওষুধের নাম বলা – পৃথিবীর যাবতীয় লোকের স্বভাব। যাই হোক, বন্ধুটির উপদেশমতো আমি একবার এক জনসম্মিলনীতে একটি অচেনা রূপসী যুবতীকে বলেছিলাম, আমায় চিনতে পারছ, ইন্দ্রাণী? কেমন আছ? – এর উত্তরে মেয়েটি বলে যে, সে আমাকে একটুও চিনতে পারেনি, তার নাম ইন্দ্রাণী নয় এবং আমাকে দেখার পরমুহূর্ত থেকে সে আর ভালো নেই। একটুও দমিত না-হয়ে আমি তবু বলেছিলাম – আমি তাকে বহুকাল ধরে চিনি, একজন্ম আগে থেকে, গতজন্মে তার নাম ছিল ইন্দ্রাণী। আমার মনে আছে, আমি জাতিস্মর! মেয়েটি এ-কথায়ও একটুও বিচলিত হয়নি, এবং এর পরবর্তী আখ্যান এখানে আর বিবৃত করার দরকার নেই – শুধু এটুকু বললেই হবে – সেদিনের স্মৃতি আমার পক্ষে সুখকর নয়।

কিন্তু, কাল রাত্রে আমি একজন সত্যিকারের জাতিস্মরেরই দেখা পেয়েছিলাম হয়তো। সন্ধের পর আকাশ-জোড়া মেঘ, আমি একা ছিলাম। এই শহরে আমার কোথাও যাবার জায়গা ছিলনা, কোন একটি মুখও মনে পড়েনি, যার কাছে গিয়ে নির্ভয়ে বলতে পারি, কতদিন তোমায় দেখিনি, তুমি কেমন আছ? মেঘলা আকাশের নিচে বোধহয় সব মানুষই নিজেকে খুব একা মনে করে, কারণ সে-সময় তার ছায়াও পড়েনা। একা থাকতে-থাকতে আমার মন বিষম ভারী হয়ে গেল। আমি রাস্তার মানুষদের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম, এরা সন্ধেবেলায় কে কোথায় যায় বোঝা যায়না। কে এখনই বাড়ি থেকে বেরুল, কে বাড়ি ফিরে চলেছে — কে এইমাত্র একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা করে এলো, কে এখন দেখা করতে যাচ্ছে — এসব কিছুই কারুর মুখে লেখা নেই। এমনকী, একটা ফার্নিচারের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে আয়নায় দেখতে পেলাম — আশ্চর্য, সব মানুষের মুখই আমার মতো দেখতে, কোন তফাত নেই। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ময়দানের মধ্যে বহুক্ষণ হাটতে-হাঁটতে হঠাৎ থেমে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ি, একটু পরেই ঘুম আসে।

যখন ঘুম ভাঙে, তখনও বৃষ্টি আসেনি, বরং মেঘ কেটে জ্যোৎস্না উঠছে। নীল রঙের জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নার রং এমন স্পষ্ট নীল রেখায় যে আমি অবাক হতে গিয়েও ভাবি — অভিসারে যাবার সময় রাধাও নিজেকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিলিয়ে দেবার জন্য নীল রঙের শাড়ি পরত। ফলে, আমি জ্যোৎস্না থেকে অন্যমনস্ক হয়ে রেড রোড ধরে হাঁটতে শুরু করি। সেইসময় সেই জাতিস্মরের সঙ্গে আমার দেখা হয়। লোকটি বিশাল কৃষ্ণচূড়াগাছের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে ছিল। অত রাত, প্রথমে আমি ভেবেছিলাম দুর্বৃত্ত। কিন্তু, লোকটি অতিশয় বৃদ্ধ। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাও অস্বাভাবিক — গাছে হেলান দিয়ে বাহুতে মুখ ঢেকে। আমি কাছে এগিয়ে বলি, 'আপনার কি শরীর অসুস্থ লাগছে? আমি কোন সাহায্য করতে পারি?'

লোকটি আমার দিকে ভারী কাচের চশমার মধ্য দিয়ে তাকালেন। তারপর বললেন, 'না, আমি ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন তো?'

আমি একটু বিব্রত হয়ে বলি, 'ও আচ্ছা. বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি। এত রাত্রে — এভাবে, সেইজন্যই —'

— আমি রোজ এখানে আসি। অনেক রাত পর্যন্ত থাকি। এই গাছটি আমার বন্ধু!

আমি একটু কাষ্ঠ হাসির চেষ্টা করে বলি, 'তা বটে, গাছপালা ছাড়া খাঁটি বন্ধু আজকাল পাওয়াই মুশকিল।'

— না, মানুষই মানুষের বন্ধু হয়। গাছ গাছের।

আমি চলে যাবার ভঙ্গিতে দু-একপা এগিয়েছিলাম, এবার লোকটির দিকে আবার ঘুরে তাকালাম। লোকটি আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললেন, 'যদি বলি, আমি আরজন্মে গাছ ছিলাম? আমার মনে আছে!'

আমি বললাম, 'যদি বলি' আর সত্যি-সত্যি বলার মধ্যে অনেক তফাত।

— সত্যিই আমি আগের জন্মে গাছ ছিলাম। এই গাছটার পাশে। এ তখন ছিল আমার বন্ধু। আমার ফুল থেকে মৌমাছি উড়ে গিয়ে ওর ফুলে বসত। আমি জাতিস্মর। আমার মনে আছে।

আমি এবার বৃদ্ধকে যা সন্দেহ করার তাই করি। একটু হেসে বললাম, 'তা নয়, আপনার আগের জন্মের কথা মনে আছে। কিন্তু এ-জন্মের সবকথা মনে আছে কি? যেমন আপনার নাম কী, বাড়ি কোথায়, আজ কী বার? কত তারিখ, এখন কটা বাজে — এইসব?'

লোকটি বললেন, 'সব জানি, সব মনে আছে। আর এও জানি, তুমি একটি অজ্ঞান ছোকরা। তোমার চোখ খুব খারাপ। তুমি অবিলম্বে চশমা নাও। নইলে হোঁচট খেয়ে মরবে!'

— আচ্ছা ধন্যবাদ, চলি এবার।

আমার খিদে পেয়েছিল, তাই একটু জোরে হাঁটতে থাকি। তারপর শর্টকাট করার জন্য রেড রোড ছেড়ে মাঠের মধ্যে নামার সঙ্গে-সঙ্গে একটা গর্তে পড়ে হোঁচট খেয়ে পা মুচকে পড়ে যাই। কিন্তু ব্যথার বদলে বিস্ময়ে কঁকিয়ে উঠি আমি। আশ্চর্য, বৃদ্ধ কী করে জানাল আমি হোঁচট খাব। অথবা, ও বলেছে বলেই আমি হোঁচট খেলাম। ইচ্ছে হল জাতিস্মর বৃদ্ধের কাছে ফিরে গিয়ে গাছের পাশে যদি বৃদ্ধকে দেখতে না-পাই, যদি অদৃশ্য হয়ে গিয়ে থাকে — তবে এই মধ্যরাত্রে শুধু-শুধু ভয় পেতে হবে আমাকে। অথবা, বুড়োটাকে সত্যিই ওখানে এখন দেখতে পেলে আমি এবার ভয় পাব — দেখতে না-পেলে বরং নিশ্চিত হতে পারি। কিন্তু, ঝুঁকি নিয়ে আমি আর ফিরে গেলামনা।

তাহলে, হোঁচট-খাওয়া সম্পর্কে বুড়োর কথা সত্যি হলে — আগের কথাগুলোও সত্যি। আমার চোখ খারাপ — এটা ওই বুড়ো পুরু কাচের চশমা দিয়ে দেখতে পেল! আমার দেখার ভঙ্গি খারাপ, অনেকেই বলেছে, আমি মানতে চাইনা, আমি বলি, আমি বিশেষভাবে দেখি। সে যাই হোক, আমার আই-সাইট অত্যন্ত ভালো — আমি এক মাইল দূর থেকে কোন বন্ধুর পকেটের দশ টাকার নোট দেখতে পাই — এত শক্তিশালী আমার দৃষ্টিশক্তি, অথচ, আমার চোখের দেখা খারাপ, সেটাকে স্বাভাবিক করার জন্য আমাকে চশমা নিতে হবে — তবে

আমি হোঁচট খাবনা — এ-কথা আমাকে বলে এক চশমা-পরা জাতিস্মর — যুক্তির জালে আমি বিহ্বল হয়ে পড়ি। দূরে, শহরের সবকটা বাড়ির রং এখন কালো দেখাচ্ছে।

জ্যোৎস্নায় আমার একটা ছোট্ট ছায়া পড়েছে। সেই দিকে তাকিয়ে আমি টুকরো হেসে নিচু গলায় বলি, থাক্, যথেষ্ট হয়েছে। নীললোহিত, আর তুমি 'বিশেষ দ্রষ্টব্য' লিখোনা।

নীললোহিতের চোখের সামনে

শীলা ও অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে

১

পাঁচটি সুস্থ সবল শহুরে যুবক চিড়িয়াখানায় গেছে কেন? চিড়িয়াখানায় ওরা কী দেখবে? পাঁচটি ছেলে হঠাৎ এক বিকেলবেলা ঠিক করে ফেলল, 'চল চিড়িয়াখানায় জন্তুজানোয়ার দেখে আসি'—এটা আমার কীরকম অবিশ্বাস্য মনে হয়। যুবকরা বিকেলবেলা যাবে খেলার মাঠে কিংবা সিনেমায় লাইন দেবে কিংবা রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে গুলতানি করবে—মেয়েদের দেখলে এক চোখ বন্ধ করবে বা শিস দেবে কিংবা রাজনৈতিক মিছিলে যোগ দিয়ে তেজী শ্লোগান দেবে কিংবা অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি-পটকাবাজি করবে—এগুলোই স্বাভাবিক।

জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে যদি শখ থাকেই তাহলে সকালবেলা কুকুরের গলায় চেন বেঁধে বেড়াতে বেরুবে অথবা বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে যাবে শিকার করতে। কিন্তু চিড়িয়াখানায জানোযার দেখতে যাবে কেন? অবশ্য চিডিযাখানায় কতরকম জানোয়ার আছে আমি জানিনা।

চিডিয়াখানায সাধারণত যায় কারা? অধিকাংশই কলকাতার বাইরেব লোক। কলকাতার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলোতে কলকাতার লোক সাধারণত যায়না। গ্রাম থেকে, অন্য প্রদেশ থেকে লোকেরা কলকাতায় বেড়াতে এলে চিড়িয়াখানায় যাবেই। কলকাতার লোকও যায়, রবিবাব বা ছুটির দিন সপরিবারে, তিন-চারটে বাচ্চা থাকবেই— এবং সবই ঐ-বাচ্চাদের জন্যই। শিশুদের বিস্ময় বড়রা উপভোগ করে। আরও কেউ-কেউ যায়, বিশেষত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা, খাবারদাবার ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়াখানার সুন্দর মাঠে পিকনিক করে।

যুবক-যুবতীরাও যায়, কিন্তু তারা একা নয়, এবং একসঙ্গে দুজনের বেশি নয়। পাখি কিংবা পশু দেখার দিকে তাদের বেশি ঝোঁক নেই, সাদা বাঘ দেখার জন্য তারা লাইনে দাঁড়ায়না, তারা অলস পায়ে ঘুরে-ঘুরে খোঁজে একটি নিরিবিলি বসার জায়গা। সেবকম জায়গা পাওয়াও যায়, মাঠে অপূর্ব ফুলেব শোভা, জলের ধারে গাছের ছায়া, ছিমছাম বেঞ্চ। কখনো ভেসে আসে সিংহগর্জন, হস্তির বৃংহিত। একসঙ্গে হাজার পাখির ডাক—আর ওরা দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় ফিসফিস করে কথা বলে।

এদের সবাইকেই চিড়িয়াখানায় মানায়, কিন্তু ঐ পাঁচজন যুবক কেন? ওরা কি ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানা দেখেনি? যৌবনে এই পশুপ্রীতি কেন? অবশ্য

আড়ালে দুজন বসে আছে, তাদের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। হঠাৎ কানে এসেছিল সেই ঝোপ থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর, 'আঃ হচ্ছে কী, ছাড়ো ছাড়ো, ইস, না আর কোনোদিন আসবনা, জানোযাব কোথাকাব।' মেয়েটি চিড়িয়াখানায বসে কোন জানোয়ারের কথা বলেছিল, আমাব দেখা হয়নি।

সেই যুবক পাঁচজনও বিশেষ কোন খাঁচাব সামনে ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছেনা। তাবাও ঘুবছে হালকা পায়ে। পাঁচজনই পবেছে সরু প্যান্ট, চক্রাবক্রা জামা, অতি-কাযদায আঁচড়ানো চুল। সন্ধানী চোখে ঝোপে-ঝাড়ে নিবালা বেঞ্চে উঁকি মাবছে। দৈবাৎ কোন ছেলেমেযে পাশাপাশি দেখলেই জমে যাচ্ছে তাবা। বোঝা গেল, তাবা পশুপাখি দেখতে আসেনি, এমনকি মেয়ে দেখতেও আসেনি,—এসেছে এত দূবে পয়সা খবচ কবে অন্যদেব জ্বালাতন কবতে। ওদেব নিজেদেব কোন মেয়ে-সঙ্গী নেই, সুতবাং অন্যদেব ওবা শান্তিতে থাকতে দেবেনা।

ওদেব ভাষা খুব চেনা। ঘনিষ্ঠ হযে বসে-থাকা ছেলেমেযেদুটিব একেবারে কাছে গিয়ে ঘিবে দাঁড়িযে বলবে, 'এই যে, অ্যা, কলেজ পালিযে এইসব। মাকে বলে দেব।'. 'পিবীতি কাঁটালেব আটা, লাগলে পবে...', 'মাইবি, মেযেটাব মুখে কিবকম লপচু-লপচু ভাব দেখছিস।' 'আবে শালা, আবাব পদ্যেব বই এনেছে, পদ্য শোনানো হচ্ছিল।' ইত্যাদি।

ছেলেটি-মেযেটি কিছুক্ষণ আড়ষ্ট হযে বসে থাকে, তাবপব সুড-সুড কবে উঠে যায, একটু দূবে গিযেই দ্রুত পা চালায। পাঁচটা চোঙা প্যান্ট-পবা ছেলেব ব্যবহাবেব প্রতিবাদ কববে, এমন সাহস ওদেব নেই। ওবা পৃথিবী উল্টে দিতে পাবে। ছেলেমেযেদুটি উঠে পালিযে গেলে ওবা সাফল্যে অট্টহাসি হাসে।

তবে, ওবকম নিভৃতে বসে থাকা ছেলেমেযে ওবা বেশি পাচ্ছিলনা। তিন-চাব জাযগায হানা দিযেই স্টক শেষ। কিন্তু ওবা আট আনাব টিকিট কেটে ঢুকেছে, ওদেব পযসা উসুল হচ্ছিলনা। ঘুবতে ঘুবতে ওবা একটা বড দলেব সামনে এসে পড়ল।

পাখিব ঘবেব সামনে শতবঞ্চি বিছিযে বসেছে একটি দল, প্রায পঁচিশ-তিবিশ জন, অর্ধেক-অর্ধেক ছেলেমেযে। সম্ভবত কোন ক্লাব, তাবা সঙ্গে খাবাব এনেছে, হার্মোনিয়ম তবলা ও গানেব খাতা এনেছে। স্বাস্থ্য ও প্রাণসম্পদে ভবা ছেলেমেযে, অনাবিল হাসি ও আনন্দ কবতে জানে। তাবা কেউ কাৰুকে নিযে আলাদা হযে যাচ্ছেনা, কেউ গদগদ নয, বসিকতাব জন্য খাবাপ ভাষা ব্যবহার কবাব দবকাব হচ্ছেনা।

সেই পাঁচজন যুবক একটু দূরে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। ঐ-দলের মেয়েগুলোর মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে ওরা অবস্থাটা যাচাই করার চেষ্টা করতে লাগল। ওরা যেন সুনীতিরক্ষক পুলিশ। কোথাও ছেলে আর মেয়েরা একসঙ্গে বসেছে, এটা ওরা সহ্য করবে না। এখানেও ওরা আওয়াজ দেওয়া শুরু করবে কিনা, সেটা ঠিক করতে একটু সময় নিল। ঐ-দলে প্রায় পনেরো-ষোলোজন ছেলে আছে, যদিও কালচার-মার্কা ক্যাবলাকান্ত ছেলে সব, ধুতি-ফুতি পরা ল্যাজে-গোবরে, এদের শালা রুখে ওঠার ধক নেই, তবু যদি ওঠে, পনেরোজন তো, দেখা যাক।

ওদের দলের অনুষ্ঠান এবার আরম্ভ হবে। শীত শেষ হয়ে এসেছে, মেঘ নেই, ঝকঝকে নীল আকাশ, রঙিন ফুলে চিড়িয়াখানার মাঠটা রঙের সমুদ্র, দুর্লভ সব পাখির ঘরের সামনে ওরা আনন্দ করতে এসেছে। গোল হয়ে বসেছে, কয়েকটা ফ্লাস্ক থেকে বেরুল কফি, কাগজের গেলাসে ঢালা হতে লাগল, একজন বলল, 'আগেই খাওয়া-দাওয়া? আগে গান শুরু হোক!' আরেকজন বলল, 'কফি খেতে-খেতে গান।' আরেকজন বলল, 'এই মন্দিরা সেই যে ফুলগুলো এনে-ছিলে?' মন্দিরা বলল, 'ও হ্যা, সেগুলো তো দেওয়া হয়নি!'

এরা পাঁচজন একটু দূরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এতগুলো মেয়ে দেখেও ওরা এখনও আওয়াজ দিতে পারছেনা, এইজন্যে বেশ অস্বস্তি। একজন ফিসফিস করে বলল, 'ফিস্টির নামে ফষ্টিনষ্টি করতে এসেছে শালারা।' আর একজন বলল, 'এসব পাবলিকের জায়গায় ওসব বেলেল্লাপনা, মামদোবাজি নাকি?' আরেকজন, 'দেব শালাদের ধুনে?'

সেই দলটায় গান শুরু হবার আগে একটি মেয়ে উঠে সবাইকে একটা-একটা করে গোলাপ ফুল দিল। লাল গোলাপ, তাজা। মেয়েটির হাতে অনেক গোলাপ ছিল, সবাইকে দিয়েও ফুরোলনা, হাতে অনেক রয়ে গেল। মেয়েটি খুব ছটফটে হাসিখুশি খোলামেলা ধরনের। ফুলগুলো নিয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাল। বেশ কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েও ওদের দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে, মেয়েটি তাদেরও একটি করে ফুল দিল। দিতে-দিতে সে সেই পাঁচজন যুবকের সামনে এল, দ্বিধা করলনা, বলল, 'আপনারা ফুল নেবেন? নিন-না।'

সেই পাঁচজন জবরদস্ত মস্তান একটু অপ্রস্তুত। লজ্জায় তারা শরীর বেঁকাতে লাগল। মেয়েটি টপাটপ তাদের হাতে একটা করে গোলাপ দিয়ে ফিরে গেল নিজের দলে। সেই পাঁচজন ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতন, পরস্পর মুখ তাকাতাকি করতে লাগল।

গান শুরু হয়ে কিছুক্ষণ চলার পর ওরা তখনও দাড়িয়ে। যে-মেয়েটি ফুল

দিয়েছিল, ওরা পাঁচজন তাকেই একদৃষ্টে দেখছে। সেই দল থেকে আরেকটি ছেলে উঠে এসে ঐ পাঁচজনকে বলল, 'আপনারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আসুন-না আমাদের সঙ্গে বসবেন।'

এরা অতিশয় ভদ্র হয়ে বলল, 'না, না—।'

সেই ছেলেটি বলল, 'কেন আসুন-না, অনেক জায়গা আছে।'

পায়-পায় এগিয়ে এসে এরা বসল ধারের দিকে। চোঙা প্যান্ট, পা মুড়ে বসতে অসুবিধে হয়, বসেছে এঁকেবেঁকে, আনস্মার্টভাবে, হাতে ফুল। ওরা কোরাস গাইছে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। তারপর একজন এদের জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা গান জানেননা? একটা গান শোনান-না।'

এরা সমস্বরে বলল, 'না-না আমরা গান জানিনা!'

—সে কি, কোন গান জানেননা?

—না।

আসলে ওরা পাঁচজনেই অনেক সিনেমার গান দু-তিন লাইন করে জানে। কিন্তু এরকম জায়গায় বসে কখনো গান করেনি, তাই সাহস পেলনা।

—ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে কোরাসে গলা মেলান!

—কী গান?

—আলোকের এই ঝর্না ধারায় ধুইয়ে দাও।

ওরা এ-গান জানেনা। তাদের সবাই যখন প্রাণখুলে একসঙ্গে গাইতে লাগল, এরা পাঁচজন শুধু বসে রইল চুপ করে। পরস্পরের মুখের দিকে দেখছে মাঝে-মাঝে। অবিলম্বেই ওদের কথা আর-সবাই ভুলে গেল। আপনমনে গান গাইছে তারা। এরা পাঁচজন একটু বাদেই উঠে পড়ল, কারুর কাছ থেকে বিদায় না-নিয়েই চুপচাপ চলে গেল।

বেশ-কিছুটা দূরে গিয়ে ওরা একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল। একজন বলল, 'যাঃ শালা কী ন্যাকামি মাইরি!'

আরেকজন বলল, 'মেয়েটা বেশ দেখতে ছিল, ওকে পেলে কলজেটা বাঁধা দিতাম।'

আরেকজন হাতের গোলাপ ফুলটা মাটিতে ছুঁড়ে বলল, 'ধ্যুৎ যত মেয়েলিপনা।'

আরেকজন ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগল নিঃশব্দে।

আরেকজন ফুলটা গোপনে পকেটে রেখে বিমর্ষভাবে বলল, 'আজ আর কিছু ভালো লাগছেনা, চল বাড়ি যাই।'

আমার মেজোকাকার ছেলের বিয়ে, নেমন্তন্নবাড়িতে সে কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড!

মেজোকাকা টালিগঞ্জে নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাঁর বড় ছেলের বিয়ে, সুতরাং বেশ ধুমধামের ব্যাপার। দিল্লি আর পাটনা আর গৌহাটি থেকে পর্যন্ত আত্মীয়স্বজন এসেছেন, গম্‌গম্ করছে সারা বাড়ি, আমি কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে অকারণে ব্যস্ত হয়ে খুব কাজ দেখাচ্ছি। গৌহাটির পিসেমশাই চা বাগানের ম্যানেজার—মানুষকে হুকুম করা তাঁর অভ্যাস—সুতরাং যখন-তখন ভরাট গলায় যাকে-তাকে হুকুম করে কর্তৃত্ব দেখাচ্ছেন, মেয়েরা শাড়ি-গয়নার আলোচনায় মুখের ফেনা তুলে ফেলেছে, মেজোকাকা মাংসওয়ালাকে খুব কচি নয় অথচ চর্বি থাকবেনা--এমন পাঁঠার কথা বোঝাচ্ছেন, কুটুমবাড়ির দেওয়া জিনিশপত্রের মাঝখানে মেজোকাকিমা নৈবেদ্যর ওপরে কিসমিসটির মতন বসে আছেন, এইসময় কাণ্ডটা ঘটল।

ছাদে দই-মিষ্টি তৈরি হচ্ছে—আমি তার তদারকি করছিলাম, বিকু এসে চুপি-চুপি আমাকে বলল, 'নীলুদা, তুমি ছাড়া আর-কেউ পারবেনা, তাই তোমাকেই বলতে এলাম, তুমি যদি একটু চেষ্টা করো, মানে ইয়ে...।' আমি হাসতে-হাসতে বললাম—'লজ্জা কী বাবাজীবন, বলেই ফেলো! কিন্তু আজ তো দেখা হবেনা, আজ কালরাত্রি!' বিকু বলল, 'না না, তা নয়, ওর শরীরটা ভালো নেই—'

আমি সরলভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর মানে কার?'

বিকু বলল, 'ঐ-যে তোমার ইয়ের, মানে শরীরটা ভালো নেই, তাই বলছিলাম কী, মেয়েরা যদি আচার-টাচার খানিকটা কমিয়ে একটু তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেয় ওকে—'

এরপর বিকুর সঙ্গে খানিকটা ঠাট্টা-ইয়ারকি করে আমি ওর অনুরোধ ঠেলতে না-পেরে নিচে নেমে এলাম, যদি হিংস্র কৌতূহলী মেয়েদের সরিয়ে নতুন বউয়ের একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। ভাগ্যিস এসেছিলাম, তাই আমি সেই কাণ্ডটার সাক্ষী হতে পারলাম।

উৎসববাড়ি সরগরম করে রেখেছিল আর-একজন, বড়কাকার মেয়ে কাজলদির ছেলে রিন্টু। বয়েস মাত্র চার বছর, কিন্তু সে একাই একশোজনের সমান। ফুটফুটে ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, দেবশিশুর মতন কান্তি, কিন্তু আসলে একটি এক নম্বরের বিচ্ছু। কখনো সে ছাদে, কখনো সে একতলায়, কখনো রান্নাঘরে—সব জায়গায় রিন্টু, জরুরি সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে রিন্টু এসে গণ্ডগোল উৎপাত শুরু করবে। সব উৎসববাড়িতেই বোধহয় ঐরকমের এক-একটি বিচ্ছু

থাকে। কিন্তু রিণ্টুকে বকুনি দেবার উপায় নেই—বড়কাকার সে আদরের নাতি —ওকে শুধু ধমকালেই কাজলদির মুখ ভার।

ছাদ থেকে নেমে এসে আমি নতুন বউ যে-ঘরে বসে আছে সেইদিকে যাচ্ছিলাম, রিণ্টু আমার জামা টেনে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'নীলুমামা, ঐ-ঘরে ঐ-বস্তাটায় কী আছে?' সারাদিন ধরে রিণ্টুর মুখে ওটা কী, কেন, ওটা কোথায় —এতবার শুনতে হয় যে আর ধৈর্য থাকেনা—সুতরাং আমি উত্তর না-দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, রিণ্টু তবু আমার পিছন-পিছন আসতে-আসতে বলল, 'বলো-না, ঐ-বস্তাটায় কী আছে, বলো-না!' সিঁড়ির পাশে ভাঁড়ার ঘরে অনেককিছু কিনে রাখা হয়েছে—রিণ্টু তারই একটা বস্তা দেখিয়ে বারবার বলছে, 'বলো-না, ওটায় কী আছে! বলো-না!' বাধ্য হয়েই সেই বস্তাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে আমি রাগতভাবে উত্তর দিলাম, 'ওটায় চিনি রাখা আছে। যাও, এবার খেলতে যাও!'

রিণ্টু আমার জামা ছেড়ে দিল, তারপর বেশ অভিমানী সুরে বলল, 'ওটার ওপরে হিসি করে দিয়েছি।'

—অ্যাঁ???

আমিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি, মেজোকাকাও পাশ থেকে কথাটা শুনেছেন, দুজনে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'অ্যাঁ? কী বললি রিণ্টু?'

রিণ্টু বেশ সহজভাবেই, সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'আমি ঐ চিনির বস্তার ওপর হিসি করে দিয়েছি। মাকে ডাকলাম, মা যে আসছিলনা—'

যেন একটা বোমা পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্য সব চুপ। নতুন বউয়ের গয়নার ডিজাইন লক্ষ করছিলেন কাজলদি, তিনি যেন ভূত দেখবার মতন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রিণ্টুর দিকে। সন্দেহ কী রিণ্টুর জাঙ্গিয়া তখনও ভিজে, আমরা কয়েকজন ভাঁড়ার ঘরে ছুটে গেলাম, চিনির বস্তাটা ভিজে জবজব করছে—অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিল তো রিণ্টু, তাই বেশ অনেকখানি—

ব্ল্যাকমার্কেট থেকে সাড়েচারটাকা দরে কেনা ৫০ কিলো চিনি। মেজোকাকার মুখখানা গুড়ের মতন চটচটে হয়ে এল, তিনি ধপ করে বসে পড়ে বললেন, 'একী সব্বনেশে ব্যাপার, এখন পাওয়া যাবে কিনা আর, এতগুলো টাকা—ওফ!' মেজোকাকিমাও ছুটে এসেছিলেন, তিনি বুদ্ধিমতী, তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'চেঁচিয়ে বাড়িশুদ্ধু লোককে শোনাচ্ছ কেন? চুপ করো-না, কী হয়েছে কী?'

পঞ্চাশ কিলো চিনির দাম দুশো পঁচিশ টাকা। সমস্যা, এক্ষুনি অতটা চিনি আবার জোগাড় করা যাবে কিনা। তাছাড়া অতগুলো টাকা বাজে খরচ। মেজোকাকা অসহায়ের মতন আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'এখন কী করি বলো তো নীলু —ওফ—'

মেজোকাকিমা বললেন, 'চুপ করো, সারা বাড়ি চেঁচিয়ে শোনাচ্ছ কেন?'

আমি মেজোকাকিমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললাম, 'হ্যাঁ মানে, ছোটছেলের ইয়ে তো খুব পাতলা হয় একটু বাদে উপে যাবে—কেউ টের পাবেনা।'

পিছন থেকে কে যেন বলল, 'হ্যাঁ, রিণ্টু বলছে বলেই তো আমরা জানতে পারলাম, যদি না-বলত, কেউ হয়তো টেরও পেতামনা।'

মেজোকাকা বলে উঠলেন, 'না, না, না এখন লোকজন জানবেই—শেষে এত আয়োজনের পর ঐ সামান্য ব্যাপারের জন্য বদনাম হবে—'

দুম-দুম করে পা ফেলে কাজলদি ঘরে ঢুকে বললেন, 'কোথায় গেল সে-হতভাগা ছেলে? আমি আগেই বলেছিলাম, ও-ছেলে নিয়ে আমি সন্ধেবেলা এসে শুধু নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেই হত, তা না—'

মেজোকাকা বললেন, 'না, না কাজল, তুই ওকে কিছু বলিসনা, ও অবোধ শিশু—'

কাজলদি বললেন, 'শোনো কাকা, চিনির দামটা আমি দিয়ে দেব, তুমি আবার আনিয়ে নাও।'

—সে কী কথা, তুই দাম দিবি কী? ছিঃ! সামান্য টাকা—

—মোটেই সামান্য নয়। ঐ-টাকার জন্যে আমি কারুর কথা শুনতে পারবনা। আমার ছেলে পাজি,—আমার ছেলে খারাপ, আমি শিক্ষা দিতে জানিনা—

কাজলদি অবস্থাটা আরও ঘোরালো করে ফেললেন। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। তারপর রাগারাগি কান্নাকাটি আরও বাড়তে লাগল, আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম। ছাদে উঠে দেখি—ঠাকুররাও এ-খবর জেনে গেছে, তারা উনুনের সামনে বসে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। এত তাড়াতাড়ি কী করে খবর ছড়ায় কে জানে! আর ছাদের কোণে তিন-চারটে বাচ্চার সঙ্গে প্রবল বিক্রমে খেলায় মেতে আছে রিণ্টু। তার কোন গ্লানি নেই। হঠাৎ আমার হাসি পেল।

জর্জ ওয়াশিংটনের গল্প শুনেছিলাম বাগানের ফুলগাছ কেটে ফেলে বাবার কাছে সেই কথা স্বীকার করেছিলেন, ছেলেবেলায় তার বাবা ফুলগাছের দুঃখ থেকেও ছেলের সাহস ও সত্যবাদিতায় বেশি খুশি হয়েছিলেন। আর সত্যবাদিতার জন্যই বোধহয় তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। দিব্যদৃষ্টিতে আমি রিণ্টুকে দ্বিতীয় জর্জ ওয়াশিংটন হিশাবে দেখতে পেলাম। কী সরল মুখ করে রিণ্টু তখন বলেছিল, আমি চিনির বস্তায় হিসি করেছি! আমাদের পরিবারের একজন পরে প্রেসিডেন্ট হবে এই সম্ভাবনার কথা জানতে পারায়—আজ রিণ্টুকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা উচিত। এর তুলনায় ৫০ কিলো চিনি কিংবা ২২৫টা টাকা তো কিছুইনা।

কিন্তু তার জের চলল অনেকক্ষণ। মেজোকাকা আবার টাকা খরচ করে চিনি

কিনতে প্রস্তুত, বদনামের ভয়ে। কাজলদির গোঁ—তিনিই ঐ-টাকাটা দেবেন—নইলে শ্বশুরবাড়িতে তার নিন্দে হবে। এর সঙ্গে যোগ দিলেন ছোটমামা। ছোটমামার কেমিস্ট্রিতে বিলিতি ডিগ্রি আছে। তিনি দাবি তুললেন আবার চিনি কিছুতেই কেনা চলবেনা। ব্যবসায়ীরা গোরুর হাড় পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে, আর এ তো সামান্য বাচ্চা ছেলের হিসি। চিনি জ্বাল দিয়ে রসগোল্লার রস হবে—অতক্ষণ আগুনের জ্বালের পর কোন দোষই থাকবেনা! এতখানি চিনি নষ্ট হবে? দেশের এইজন্যই উন্নতি হচ্ছেনা—যতসব কুসংস্কার! আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাকি অনেকেরই দেখা গেল সাত পুরুষে কবে যেন কার ডায়াবিটিস ছিল—তারা তো মিষ্টি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল—সুতরাং এতে তাদের কিছু যায়-আসেনা! কাজলদির স্বামী একটু বাদে এসে সব শুনে প্রথমেই রিন্টুকে ডেকে ঠাস্-ঠাস্ করে দুটি চড় কষালেন, প্রেসিডেন্টের বাবা হবার সম্ভাবনা তিনি মনে স্থান দিলেননা।

অবস্থা যখন চরমে উঠল, তখন এলেন মেজোকাকিমার গুরুদেব। দেওঘর থেকে তিনি দয়া করে এসেছেন বিয়ে উপলক্ষে। ভুঁড়িওলা বিশাল চেহারা, দেখলে ভয়-ভক্তি হয়। ঐসব গুরুদেবদের উপকারিতা আমি সেদিন বুঝতে পারলাম। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার বেশ দ্রুত উপস্থিত বুদ্ধি ওঁরা ব্যবহার করতে পারেন। তিনি প্রথমে সব ব্যাপারটা শুনলেন, এমনকী ছোটমামার তীব্র বক্তৃতা পর্যন্ত। তারপর স্মিতহাস্যে বললেন, 'ঐ চিনি যদি আমি খাই, তাহলে তোরা খাবি তো? শিশু হচ্ছে নারায়ণ, শোন্ তাহলে একটা গপ্পো, বৃন্দাবনে একদিন শ্রীকৃষ্ণ...। গল্পটা মহাভারত কিংবা কোন পুরাণে যে নেই—সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। গল্পের মূলকথা শ্রীকৃষ্ণও নাকি একদিন যশোদার ননীমাখনে হিসি করে দিয়েছিলেন, তাই দেখে সুদাম ঘেন্না প্রকাশ করায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এখন থেকে শিশুর ইয়েকে যদি কেউ ঘেন্না করে—তাহলে সে আমার দয়া পাবেনা। গুরুদেব ঐ চিনির বস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওঁ শুদ্ধি, ওঁ শুদ্ধি।'

চমৎকারভাবে সব মিটে গেল। শুধু ছোটকাকা আমাকে এক পাশে ডেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'তুই রান্নার ঠাকুরদের বলিস চিনি আবার নতুন করে কেনা হয়েছে। দরকার কী! যদি জিজ্ঞেস করে তাহলেই বলবি, না জিজ্ঞেস করলে কিছু দরকার নেই—'

সেবার আমাদের বাড়ির রান্নার মধ্যে রসগোল্লাই হয়েছিল সবচেয়ে ভালো। রসগোল্লার নতুন ধরনের স্বাদে প্রশংসা করে গেলেন নিমন্ত্রিতরা সবাই। আর আমি? অতক্ষণ পরিবেশন করে অন্য বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ফস্টি করার পর—আমার আর খাবার সময় কোথায়? আমি দুটো রসগোল্লা রিন্টুর মুখে গুঁজে দিয়েছিলাম।

৩

ভদ্রলোককে দেখে আমার বারবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছিল। বিভূতিভূষণ যদি এই লোকটিকে দেখতেন, তাহলে এঁর কথা খুব সুন্দরভাবে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। আমার সে-ক্ষমতা নেই। বিভূতিভূষণের একটি গল্প অস্পষ্ট মনে আছে। মুদির দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করত একজন বুড়ো লোক, দোকান-টোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে একটা নিরালা জায়গায়, গাছতলায় বসে কবিতা লিখত। নিজের কবিতাই আবেগে চোখ বুজে ঢুলে-ঢুলে পড়ত। সেই কবিতার হয়তো কোন মূল্য নেই, কিন্তু লোকটির অনাবিল আনন্দের দৃশ্যটি বিভূতিভূষণ অপূর্বভাবে ফুটিয়েছিলেন।

নীলমাধববাবু অবশ্য ওরকম দরিদ্র নন। পরিবেশ, অবস্থা সবকিছুই আলাদা।

ওঁর সঙ্গে দেখা উড়িষ্যার একটি ছোট্ট শহরে। শহর ঠিক বলা যায় না, যদিও রেলস্টেশন আছে, কিন্তু গ্রামই প্রায়। সুযোগ পেলেই মাঝে-মাঝে আমি এখানে-ওখানে বেরিয়ে পড়ি, সেইরকম ঘুরতে-ঘুরতে, ভদ্রক-এর কাছে সেই ছোট্ট জায়গাটায় গিয়ে পড়েছিলাম। দুপুরবেলা একটা বটগাছের নিচে বাঁধানো গোল বেদীতে বসেছিলাম চুপচাপ, কিছুই করার নেই, ফেরার ট্রেন সেই সন্ধের পর। জায়গাটায় কোন হোটেলও নেই। বাজারের কাছে গোটা দু-এক চায়ের দোকান —সেখান থেকে দুদিনের বাসি পাঁউরুটি ও আলুর দম নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিয়েছি। যে-টুকু ঘুরেটুরে দেখার, দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা হয়ে গেছে, এখন কিছুই করার নেই, বটগাছের ছায়ায় বসে থাকা ছাড়া। স্টেশনের বেঞ্চির চেয়ে এ-জাযগাটাই ভালো, স্টেশনে বড্ড মাছি ভনভন করছিল।

মন্দ লাগছিল না বসে থাকতে, একা একটা অপরিচিত জায়গায় গাছতলায় বসে থাকলে নিজেকে বেশ পথিক পথিক মনে হয়—যেন আমি পায়ে হেঁটে নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে গাছের ছায়ায় দু-দণ্ড জিরিয়ে নিচ্ছি। রেললাইনের ওপারে গোটা কয়েক শিমুলগাছ একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোথায় যেন অনেকক্ষণ ধরে একটা ঘুঘু ডাকছে 'ঠাকুরগোপাল ওঠো, ওঠো—' বলে, ঘুঘুর ডাকে নির্জনতা অনেক বেড়ে যায়।

কুঁচোনো ধুতির ওপর ফতুয়া-পরা, হাতে ছড়ি—একজন প্রৌঢ় যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলেন, কোন কথা বললেননা। খানিকটা বাদে আবার চেয়ে দেখি, তিনি তখনও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। এবার আমি একটু লাজুকভাবে হাসলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

—কলকাতার ছেলে মনে হচ্ছে?

—কী করে বুঝলেন!

—দেখলেই বোঝা যায়। এদিকে কী করতে আসা হয়েছিল?

—এমনিই!

—এমনিই কেউ এখানে আসে? এখানে কি কিছু দেখার আছে নাকি?

মানুষ কোথায় কী দেখতে যায়—তা কারুকে বলে বোঝানো যায়না। যদি বলতাম, বটগাছের তলায় এই বাঁধানো বেদীটাই আমার দেখতে ভালো লাগছে, শুধু এটা দেখার জন্যই এখানে আসা যায়—তাহলে কি উনি বিশ্বাস করতেন? এমনি-এমনি ঘুরে বেড়ানো বোধহয় অপরাধ—আমি অপরাধীর মতন মুখ করে রইলাম।

সন্ধেবেলায় ট্রেন ধরব শুনে তিনি জোর ক'রে আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অনেকদিন তিনি কলকাতার কোন লোকের সঙ্গে কথা বলেননি। প্রৌঢ়ের নাম নীলমাধব সিংহ, বাড়িটা বেশ ছিমছাম পরিষ্কার—জংলা মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে বেশ নিরালার সাদা একতলা বাড়ি। গেটের সামনে সাদা পাথরে লেখা আছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

নীলমাধব সিংহের পূর্বপুরুষ একসময় বাংলাদেশের লোক ছিলেন, শ-খানেক বছর ধরে উড়িষ্যার ঐ ছোট্ট জায়গাটায় আছেন। নীলমাধবের পিতৃ-পিতামহ মারোয়াড়ি মহাজনদের মতন চাষীদের টাকা দাদন দিতেন, তারপর প্রচুর সুদে টাকা উসুল করে নিতেন। বংশানুক্রমিক এই ব্যাবসাই ছিল, নীলমাধব ওটাকে ঘৃণিত কাজ মনে ক'রে নিজে ঐ-পেশা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি কিছুই করেননা।

বাড়িতে দুটি মাত্র লোক, নীলমাধব আর তাঁর স্ত্রী—স্থূলাঙ্গিনী বর্ষীয়সী মহিলা—আমাকে দেখে খাতির করবার জন্য এমন হাঁসফাঁস করতে লাগলেন যে আমি বিব্রত বোধ করলাম খুব। আমাকে খাওয়াবার জন্য তক্ষুনি ভাত চড়িয়ে দিলেন, কোন আপত্তি শুনলেননা।

বাড়ির ভেতরটা ঝকঝকে, আসবাবপত্রগুলো বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো, দেখলে বোঝা যায়, এই প্রৌঢ় দম্পতির অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, কোন কিছুর অভাব নেই। বাড়িতে খবরের কাগজ আসেনা, নীলমাধব আমাকে জানালেন যে গত সাত-আট বছরের মধ্যে তিনি একদিনও কাগজ পড়েননি। তবে তাঁর ছেলে একটা ব্যাটারির রেডিও পাঠিয়েছে, সেটাই তাঁর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অবলম্বন।

আধঘণ্টার মধ্যে ওঁদের পারিবারিক ইতিহাস আমার শোনা হয়ে গেল। ওঁদের

দুটি ছেলে একটি মেয়ে, সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। একজন ছেলে দিল্লিতে চাকরি করেন, অন্যজন রাউরকেল্লায়, মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন একটি ওড়িয়া ছেলের সঙ্গে, তারা থাকে ভুবনেশ্বরে। দুই ছেলে এবং মেয়ে-জামাই কত পেড়াপিড়ি করেছে ওঁদের নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু ওঁরা আর কোথাও যেতে চাননা। শহরের হৈ-চৈ ওঁদের একদম পছন্দ হয়না—এই গ্রামের প্রতিটি পায়ে-চলা রাস্তা, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি গাছ তাঁর চেনা—এসব ছেড়ে কোথাও যেতে চাননা। এখানকার মানুষজনও ঐ-দম্পতিকে খুব ভালোবাসে। নইলে, মাঠের মধ্যে ফাঁকা বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি পড়ে রয়েছে, কোনোদিন তো চুরি-ডাকাতিও হয়না।

তারপরেই আমি একটা বিচিত্র ব্যাপার জানতে পারলাম। কাচের আলমারিতে বেশ-কিছু বই আছে, অধিকাংশ বই-ই রামায়ণ-মহাভারত-জাতীয়। সময় কাটাবার জন্য সেগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, আলমারির একটা তাক জুড়ে একটাই বইয়ের অনেকগুলি কপি। একখানা নিয়ে পাতা উল্টে দেখলাম, 'মানুষই ভগবান'; লেখকের নাম 'অধম সেবক'।

আমার হাতে বইটি দেখে নীলমাধব একগাল হেসে বললেন, 'ও বইটা আমারই লেখা। চোদ্দবছর আগে কটক থেকে ছাপিয়েছিলাম। জওহরলাল নেহরু, বিধান রায়, মদনমোহন মালব্য, মেঘনাদ সাহা, রাজাগোপাল আচারি—সবাইকে পাঠিয়েছিলাম একখানা করে। অনেকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তোমাকেও একটা দিচ্ছি—'

যে-বই জওহরলাল নেহরু, বিধান রায় ইত্যাদি পেয়েছেন, সে-বই একখানি আমারও পাওয়া নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। সেরকম কৃতার্থ মুখ করেই বইটা নিলাম। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে, বড়-বড় ভাঙা টাইপে চৌষট্টি পাতার বই। আগাগোড়া পদ্য। লেখা খুবই কাঁচা, ভগবান মানুষ হয়ে জন্মায়না, মানুষই আসলে ভগবান—এই কথা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রথম আরম্ভ এইরকম :

> দেহধাম জেন ভাই পুণ্য দেবালয়
> পরিচ্ছন্ন রাখিলে তাহে দেবতার অধিষ্ঠান হয়...।

দুলাইন পড়েই ভক্তিভরে বইটি রেখে দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'পড়ো-না, পড়ো, এখনও তো খাবার দেবার দেরি আছে!'

প্রৌঢ়ের উদ্‌গ্রীব চোখের সামনে আমাকে বইটির সবকটি পৃষ্ঠা পড়তে হল। আসলে ফাঁকি দিয়েছি, সব পড়িনি—পড়া যায়না, পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে গেছি মাত্র। কাঁচা লেখা হোক, তবু বিস্ময়কর নিশ্চিত। কয়েক পুরুষ ধরে বাংলাদেশের বাইরে আছেন, তবু বাংলা ভুলে না-গিয়ে তার চর্চা রেখেছেন তো, সেটাই বা কম কী!

নীলমাধব বললেন, 'আর-একখানা লিখছি। তুমি শুনবে একটু? এখানার নাম দিয়েছি 'নব গীতা'। দেশের এই যে দুরবস্থা এই যে এত চাঞ্চল্য, তার কারণ মানুষ এই জন্মরহস্য, এই পৃথিবীর রহস্য ভুলে গেছে। মানুষকে এই মায়াময় জগতের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সবকিছুই যে পূর্বনির্দিষ্ট, মানুষ শুধু নিমিত্তমাত্র...'

প্রৌঢ়ের আশা, আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই 'নব গীতা'ব রচনা তিনি শেষ করতে পাববেন। তাবপর কটক কিংবা বালেশ্বব থেকে ছাপিয়ে বিলি করবেন বিনা পযসায়। আবার পাঠাবেন ইন্দিবা গান্ধী, জ্যোতি বসু, মোবারজী দেশাই প্রভৃতিকে। এবং এই বই পড়ামাত্রই সবাব মন বদলে যাবে, সব হানাহানি বিশৃঙ্খলা থেমে যাবে, মানুষে-মানুষে ভাই-ভাই হযে যাবে।

ধপধপে সাদা চালেব ভাত খেলাম, সঙ্গে মুগেব ডাল, বেগুন ভাজা, ও বাড়িতে তৈবি ঘি। নীলমাধবেব স্ত্রী ভাবি যত্ন কবে খাওয়ালেন। তারপর খাটেব ওপব শীতলপাটি বিছিযে দিলেন আমার বিশ্রামেব জন্য। আর নীলমাধব অন্য খাটে বসে খুলে ধরলেন চাবখানি লাল খেরোব খাতা। আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলেন তাঁব 'নব গীতা', ওঁর স্ত্রীও ভক্তিভরে শুনতে লাগলেন। আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠছে নীলমাধবেব গলা, উৎসাহে জ্বলজ্বল কবছে ছানি-পড়া চোখ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলে এই দৃশ্যটি কত সুন্দব লিখতে পাবতেন। আমি আব কী লিখব। আসল ব্যাপার যা হযেছিল, শুনতে-শুনতে আমার দারুণ ঘুম পেযে যেতে লাগল। অথচ ঘুমিয়ে পড়াটা খুবই অভদ্রতা। আবাব খাওযাব পর এবকম শীতলপাটিতে বসে ঘুম আটকে বাখাও শক্ত। সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে কবছে, কিন্তু এইরকম প্রৌঢ-প্রৌঢার সামনে চট কবে পকেট থেকে সিগাবেট বাব করতে কিন্তু-কিন্তু লাগছে। এক-একবার ঢুলুনি আসছে, আব আমি নিজেব পাযে চিমটি কাটছি। জোব করে চোখ টান করে চেযে থাকাব চেষ্টা কবছি। ঘুমটা তাড়াতেই হবে, কেননা, ঐ কবিতাব ভাষা যতই দুর্বল আব পুরোনো হোক—এই এক নির্জন গ্রামে একজন প্রৌঢ় একখানি বই লিখে দেশেব সব কোলাহল অনাচাব থামিয়ে দেবে—এই আশা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের দৃশ্যটি সত্যিই দেখাব মতন।

৪

জিপিও-র সামনে বিরাট লাইন পড়েছে বেকার যুবকদের। পোস্ট অফিসের কেরানিব কিছু চাকরি খালি হবে, সেইজন্য ফর্ম বিলি হচ্ছে। আগে থেকেই জানা

গেছে, চাকরি দেওয়া হবে একশো চল্লিশ জনকে, সেইজন্য ফর্ম বিলি করা হবে চৌদ্দ হাজার। একটা আধটা পোস্ট তো নয়, একশো চল্লিশটা, লাইনের ছেলেদের মধ্যে বেশ খানিকটা উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

আমি বাসের গুমটিতে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বেকার যুবক বলতে আগেকার গল্প-উপন্যাসে যে-বর্ণনা পাওয়া যেত, এরা কেউই সেরকম নয়। কারোরই রোগা, না-খেতে-পাওয়া চেহারা কিংবা মলিন পোশাক নয়, দিব্যি সব স্বাস্থ্যবান চেহারা প্রাণশক্তিতে টগবগ্ করছে। অনেকেই পরেছে চাপা ড্রেন পাইপ, জামায় বাহার আছে, চুল আঁচড়েছে দারুণ কায়দায়। এইসব চেহারা দেখলে মায়া কিংবা বিরক্তি আসেনা, এইসব চেহারা দেখলে ভালো লাগে।

লাইনেব মধ্যে আমার চেনা একটা ছেলে ছিল, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চেঁচিয়ে বলল নীলুদা, আপনি এখানে কী করছেন, তারপর লাইনের অন্য একটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমার জায়গাটা রাখবেন তো দাদা।' আমার দিকে সে এগিয়ে এল লাইন ছেড়ে।

আমি আগে যে-পাড়াধ ভাডা থাকতাম, ছেলেটি সে-পাড়ার! আমাব সঙ্গে বেশ পবিচয় ছিল, নানান ছুতোয় চাঁদা নিতে আসত, বহু বই পড়ত, নিয়ে আর ফেবত দেয়নি।

আমি বললাম, 'কী রে বাবলু, কেমন আছিস।'

- আপনি এখানে কী করছেন?

একটু চোরা হাসি দিয়ে বললাম, 'আমিও ভেবেছিলাম ফর্ম নেবার জন্য লাইনে দাঁড়াব, তোকে দেখে আর লজ্জায় দাঁড়াতে পারলামনা। প্রেসটিজে লাগল!'

বাবলু রীতিমতন দাঁত বার করে বলল, 'যা-ন। আপনি এই সামান্য ছ্যাঁচড়া চাকবির জন্য লাইন দেবেন? আপনি তো আজকাল—'

—লাইন ছেড়ে যে চলে এলি, আবার ঢুকতে পারবি?

—হ্যাঁ, এক দাদাকে বলে এসেছি। এখন ফর্ম দেওয়া বন্ধ আছে।

—দাদা মানে? এখানকার পাতানো দাদা?

—না, না, ওর সঙ্গে এরকম সাতটা লাইনে আর তিনটে ইনটারভিউতে দেখা হয়েছে। আমরা দুজনেই ভেটারান।

—তুই বি এসসি পড়তিস না? পাশ করেছিস? নাকি তার আগেই চাকরির জন্য—

—কী করব বলুন, আমাদের ফ্যামিলিতে একটা ব্যাপার হয়ে গেল—

—যাক শুনতে চাইনা! একটা-কিছু বিপদ হয়েছে তো? মানুষের দুঃখের কথা শুনতে আমার আর ভালো লাগেনা। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাই, পথে-ঘাটে শুনি, এই যে, হাজারখানেক ছেলে দাঁড়িয়েছে—এদের

প্রত্যেকের জীবনেই এরকম কিছু আছে, আমারও আছে। সবই তো জানি, শুনে কী হবে?

—নীলুদা, একটা সিগারেট খাওয়াবেন।

বাবলুর সাহস বেড়েছে। আগে আমাকে দেখলে সিগারেট লুকতো, এখন সরাসরি চেয়েই বসল। আমি অবশ্য তেমন রাগ করলামনা, ছেলেছোকরাদের খানিকটা ঔদ্ধত্য থাকলে আমার ভালোই লাগে। সিগারেট দিয়ে দুজনে ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই বুঝি এরকম চাকরির খবর পেলেই ছুটে আসিস?'

—কী আর করি দাদা, চেষ্টা তো করতেই হবে?

—এক-একবার চাকরির চেষ্টা করতে গিয়ে কত খরচ পড়ে?

—আপনি ঠিক আসল কথাটা ধরেছেন তো। সত্যি, চাকরি না-পাওয়ার চেয়েও এইসব খরচাগুলোর জন্যই বেশি গায় লাগে। তা ধরুন, যাতায়াত বাসভাড়া তিরিশ নয়া, সার্টিফিকেটের কপি টাইপ করাতে নেয় চল্লিশ-চল্লিশ আশি, তারপর রেজিস্ট্রির জন্য আশি—টাকাদুয়েক মিনিমাম! কোন কোন শালার অফিস (আমার সামনে 'শালা' কথাটা উচ্চারণ করেও বাবলু জিভ কাটলনা) আবার পোস্টাল অরডার চায়।

—এমপ্লয়মেন্ট একসচেনজে নাম লেখাসনি? তাহলে তো আর দরখাস্ত করতে হয়না!

—আপনি আছেন কোথায়? তিন বছরে একবারও কল পাইনি। তবু এইসব খুচখাচ দরখাস্তে অনেকসময় ইনটারভিউ পাওয়া যায়। ইনটারভিউতে আবার ডবল খরচ। পাঁচ-ছঘন্টা ধরে হয়তো ফুডের জন্য কিছু পয়সা চলে যায়!

—এরকম কত জায়গায় দরখাস্ত করেছিস?

—ইনটারভিউ দিয়েছি তেরোবার। আনলাকি থারটিন পার হয়ে গেছি, এবার যদি পাওয়া যায়।

—এখানে তুই চাকরি পাবি আশা করছিস? কাগজেই তো বেরিয়েছে, একশো চল্লিশটা পোস্টের জন্য চোদ্দ হাজার ফর্ম বিলি হবে। তার মানে প্রতি একশোজনের জন্য একটা পোস্ট। কী করে বাছবে? কোন যুক্তিসম্মত উপায় আছে? এখানে অনেকের স্বাস্থ্য ভালো, সবাই স্কুল ফাইনাল পাশ তো বটেই, বি এ, বি এসসি, এম এ পাশও আছে হাজার হাজার। তারমধ্যে একশো চল্লিশ জনকে কী করে বাছবে? তুই কি এখানে লটারির টিকিট কাটতে এসেছিস?

বাবলু চুপ করে আমার দিকে তাকাল। নাকটা অদ্ভুতভাবে কুঁচকে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করল। সিগারেটটা টুসকি মেরে ছুড়ে দিল রাস্তার মাঝখানে। তারপর জামার হাত গুটিয়ে আমার সামনে এসে বলল, 'নীলুদা হাতখানা দেখছেন? মাস্‌ল

টিপে দেখুন! শরীরে এখন দারুণ জোর, কোন অসুখবিসুখের নামগন্ধও নেই। সারাটা দিন কী করে কাটাই বলুন তো! সারাদিনরাত চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা যায়? কোথাও একটা লেবারের চাকরি পেলেও করতাম, তা সব ফ্যাক্টারিতেও তো এখন লোক নেওয়া একদম বন্ধ! আর বাড়িতে থাকলেই তো, এটা নেই সেটা নেই, এত বড় বুড়োধাড়ি ছেলে কিছু করতে পারেনা—এইসব শুনতে হয়! আর নয়তো পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে গুণ্ডামি-ছিনতাই করতে হয়। তাহলে বলুন তাই করব, টাকাপয়সার জন্য নয়, জোয়ান ছেলে—সারাদিনে একটা কিছু তো কাজ চাই, কোন কাজ নেই—কী করব, বলে দিন আমাকে!'

আমি বিচলিতভাবে বললাম, 'বাবলু, তুই একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন! আমি এর উত্তর কী করে জানব। এ তো আমারও প্রশ্ন। কে উত্তর দেবে জানিনা।'

৫

নদী কোথা থেকে আসছে—এর উত্তর তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন, নদী আসে মহাদেবের জটা থেকে। কথাটা সত্যি কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য আমি নিজেও অনেক নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে আমিও একই উত্তর শুনেছি, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

নদীর পাড়ে বসে আমি আর-একটি প্রশ্ন করেছি, যখনই যেখানে নদী দেখেছি, আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে সেই প্রশ্ন, 'নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এর উত্তর পেতে আমার দেরি হয়েছে। সকালে, সন্ধ্যায়, একা বা দলবলের সঙ্গে, শহরে বা নির্জন প্রান্তরে যেখানেই আমি নদী দেখেছি, খুব গোপনভাবে জিজ্ঞেস করেছি, 'নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' কখনো এই উত্তর শুনিনি, 'সমুদ্রে'। না, নদী আমাকে কোনোদিন কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে বলেনি, আমি সমুদ্রে যাচ্ছি। অথচ জানি তো নদী সমুদ্রেই যায়, আর কোথাও তার যাবার উপায় নেই, তবু নদী কখনো নিজের মুখে সে-কথা বলেনা।

মানুষও তো যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে, কিন্তু মানুষ কি সে-কথা বলে? রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ হনহন করে হেঁটে চলেছে, যদি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী, কোথায় চলেছেন? তিনি কি উত্তর দেবেন, মৃত্যুর দিকে? অথচ, সেইটাই তো সত্যি উত্তর। কিন্তু, কোথায় চলেছেন, একথা জিজ্ঞেস করলে, সব মানুষেরই

অন্তর্নিহিত একটি উত্তর, আর-একজন মানুষকে খুঁজতে। সবাই সারাজীবন আরেকজন মানুষকে খুঁজছে—সে-খোঁজাই বোধহয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ায়না। নদীও যায় সমুদ্রের দিকে, কিন্তু সেকথা বোধহয় তার মনে থাকেনা, সেও বোধহয় আর-একটি নদীকে খোঁজে। পৃথিবীতে এমন একটিও নদী আছে কি, যে পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে একা-একা, সোজা গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে? ভূগোলে এমন-কথা কখনো পড়িনি। এরকম চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী নদী বোধহয় পৃথিবীতে একটাও নেই। সব নদীই আর-একটা নদীকে খোঁজে, সমুদ্রে যাবার আগে।

যাইহোক, নদী আর মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলো আর সস্তা তুলনাটা বেশি টেনে লাভ নেই। মানুষের কথা যাক, আমি শুধু নদীর কথাই বলি।

জগদীশচন্দ্র নদীর ভাষা বুঝতেন, আমার সে-ক্ষমতা নেই। আমি নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ? নদীর জলে তখন অস্পষ্ট কোলাহল, তরঙ্গের বিভঙ্গ, যেন নদীর মধ্যে তখন খুব একটা হাসাহাসি পড়ে গেছে, পিকনিকে মেয়েদের মতন তরল ইয়ার্কিতে আসল কথা গোপন করার চেষ্টা, বুঝতে পেরেছি, নদী আমায় উত্তর জানাতে চায়না, কিন্তু তার ছটফটানি দেখলে বুঝতে পারা যায়, সে অন্য নদীকে খুঁজতে যাচ্ছে।

এলাহাবাদের ত্রিবেণীসংগম আমি বার ছয়েক দেখেছি, কলকাতার কাছেই ত্রিবেণীও আমার দেখা, আরও অনেক নদীর মিলনকেন্দ্র দেখার স্মৃতি আমার আছে, তবু, কোথাও কোন নদী দেখলেই এখনো আমার মনে হয়—কোথায় সে অন্য নদীর সঙ্গে মিশেছে—একবার দেখে আসি। জগদীশচন্দ্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গঙ্গোত্রীর অভিমুখে গিয়েছিলেন, আমিও একবার দুই নদীর মিলনকেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলাম। জগদীশচন্দ্রের তুলনায় আমার প্রতিভা যত ছোট, ভাগীরথীর তুলনায় সেই নদীও তেমনি ছোট।

রোগা ছিরছিরে নদী, নাম হারাং। সাঁওতাল পরগনার নামসূচক গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর সাঁওতালি নাম হারাং, বাংলায় হারান বলতে ইচ্ছে হয় আমাদের, এমনই করুণ, অভিমানী, হারিয়ে যাবার মতন চেহারা; তার হারান নাম হলে অবশ্য আর নদী থাকে না, বলতে হয় নদ, কিন্তু নদ কথাটা আমার পছন্দ নয়, বিশ্রী শুনতে, মেয়ে-পুরুষ যাই হোক, সব নদীই নদী, যেমন সব পাখিই পাখি, পুরুষ পাখিদের তো আমরা পাখ বলিনা।

সেই হারাং নদীর পাশে ডাকবাংলো, সেখানে কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন শহুরে বাবু ও বিবি। আমাদের পরনে চোঙা প্যান্ট, হাতে ট্র্যানজিস্টার, মহিলা দুজনের হ্রস্ব জামার ফাঁক দিয়ে বহু বাতাস ঢুকতে পারে —অর্থাৎ পোশাকের মধ্যে অনেক জানলা-দরজা, ঠোঁট ও পায়ের নোখ লাল,

অদূরে দাঁড়ানো জিপগাড়ি। আমাদের সরু-মোটা গলা ও ট্র্যানজিস্টারের কর্কশ নিনাদে সেই নির্জন নদীতীর গমগমে হয়ে উঠেছিল, প্রতি সকালবেলা এক-চতুর্থ ডজন মুর্গি কিনে এনে মহোল্লাসে হত্যা করা হচ্ছে, খোঁজ করা হচ্ছে মহুয়ার, হিন্দি ফিলমের নায়কের মতন প্যান্টের পা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে আমরা যখন-তখন নদী পেরিয়ে যাচ্ছি।

মহিলা দুজন বলেছিলেন, 'মাগো, কী বিশ্রী নদীটা, দেখলে বমি আসে! আর কোন ডাকবাংলো পাওয়া গেলনা?'

সত্যি সে-নদী দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়না, অনেক উদ্যোগ-আয়োজন করে খাড়া পাড় বেশ নেমে গেছে বটে, কিন্তু বহতা পরিসর আট-দশফুটমাত্র এবং হরেদরে হাঁটুজল। চারিপাশে এবড়ো-খেবড়ো পাথর ছড়ানো, জলের রং অপরিষ্কার, যেন নদী নয়, জঙ্গলের খোলা ড্রেন। সে-নদীর একমাত্র গুণ, রাত্রিবেলা অস্পষ্ট আলোয় যখন চতুর্দিক ঝাপসা—তখন শুধু হারাং নদীর জল চকচক্ করে, শোনা যায় অস্পষ্ট ছলছল শব্দ। সেইটুকুমাত্র গুণের জন্যই আমরা সন্ধ্যাবেলা হারাং নদীর পাড়ে পাথরের চাঁই-এর ওপর বসতাম। খোলা গলায় বেসুরো গানের পরিহাস-রসিকতা হত, ওগো নদী আপনবেগে পাগলপারা—এই গানও কেউ গেয়েছিল।

ডাকবাংলোর কীপারের নাম লেটু, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লেটু, এ-নদীটা কোথা থেকে আসছে রে?'

লেটু কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দেয়, 'আসেনি তো। এ-নদী তো এখানেই ছিল! ই হারাং নদী বটে!'

শুনে আমাদের দলের কেউ-কেউ হাসে। অনুমান করা যায়, হারাং নদী কাছেই কোনো পাহাড়ি জলপ্রপাত থেকে এসেছে। কিন্তু নদীটা গেছে কোনদিকে? সমুদ্রে নিশ্চয়ই নয়, এ-নদীর চোদ্দপুরুষেও কেউ সাগরদর্শন করতে পারবেনা। লেটুকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, প্রশ্নটার গুরুত্ব আনবার জন্য হিন্দিতে, 'লেটু ই নদী ইধার কিৎনা দূরতক গিয়া? 'লেটু হিন্দি জানেনা, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে, 'উও জঙ্গলের মধ্যে কুথাও হারিয়ে গিয়েছে হবেক।'

মুর্গি বিক্রি করতে আসে ওসমান মিঞা, সে অনেক জানেশোনে, বুড়োমানুষ —তার অনেক অভিজ্ঞতা, তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় হয়তো, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আমার ভরসা হয়না, আবিষ্কারের নেশায় আমায় পেয়ে বসে, মনেমনে সংকল্প করে ফেলি, নদীটা কোথায় গেছে দেখতে হবে। হঠাৎ নিশ্চয়ই শুকিয়ে যায়নি, যত ছোটই হোক এরও তো জলে স্রোত আছে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর কারুকে কিছু না-বলে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম একা, একটা গরাণ গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়েছি, জুতো

পরিনি, শুধু গেঞ্জি গায়ে—খাঁটি পর্যটকের চেহারা। কিছুটা যেতেই দেখতে পেলাম আমাদের দলের মহিলা দুজনের অন্যতমা হারাং নদীর খাদে নেমে বনতুলসী কিংবা ঘেঁটু পুষ্প -চয়নে ব্যস্ত। আমাকে দেখে মুখ তুলে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'একটু এদিক দিয়ে ঘুরে আসছি!' শ্রীমতী বললেন, 'আমিও যাব।' বললাম, 'না-না, তোমায় যেতে হবেনা।'—একথা বলেই ভুল করেছিলাম। কেননা, মেয়েদের কোন জিনিশ বারণ করলে তারা শোনে কখনো? সেটাতেই জেদ ধরে। সুতরাং তিনি বললেন, 'হ্যাঁ যাব!' আমি তবু বললাম, 'না, যেতে হবেনা! ওরা বকাবকি করবে। তাছাড়া আমার ফিরতে দেরি হবে।' শ্রীমতী বললেন, 'বেশ করব যাব। তোমার সঙ্গে তো যাচ্ছিনা, আমি আলাদা যাচ্ছি।'—অর্থাৎ তিনি রইলেন নদীর অন্য পারে, সেই প্রাচীন রূপকথার নারী-পুরুষের মতন।

নদী কোথা থেকে আসছে—তা দেখার আমার কৌতূহল নেই, সুতরাং নদীর স্রোত যে-দিকে আমরা সেই দিকে হাঁটছিলাম। ক্রমশ জঙ্গল একটু ঘন হল, একটু গভীর, নদীর পাড় দিয়ে চলার রাস্তা নেই—এমন রুক্ষ পাথর ও আগাছার ঝোপ। তাছাড়া আর-একটা অসুবিধে, গ্রামবালকরা তাদের সকালের কাজকর্ম নদীর ধারেই সেরে রেখে যায়—যে-কোন মুহূর্তে তাতে পা পড়ার সম্ভাবনা। ওপার থেকে শ্রীমতী চেঁচিয়ে বললেন, 'কী বিশ্রী জায়গা, আমার আর ভালো লাগছেনা।' আমি বললাম, 'কে তোমায় আসতে বলেছিল?' শ্রীমতী রাগতভাবে বললেন, 'চলো, ফিরে যাই।' আমি বললাম, 'তুমি ফিরে যাও। আমি যাবনা।' শ্রীমতী এবার কাঁদো-কাঁদো, 'এতটা চলে এসেছি, এখন আমি একলা ফিরব কী করে!' আমি বললাম, 'তাহলে যা-ইচ্ছে তাই করো।' শ্রীমতী এবার বললেন, 'নীলুদা, আপনি এরকম—'

তখনো নদী তেমন চওড়া হয়নি, কিন্তু জল গভীর হতে শুরু করেছে। কিছু একটা দেখতে পাবার উত্তেজনা এসেছে আমার মধ্যে। আমি এগিয়ে চললাম, শ্রীমতী একবার এপারে আসবার চেষ্টা করলেন কিন্তু জলে নেমে দেখলেন শাড়ি অনেকখানি তুলতে হয়, সুতরাং নিবৃত্ত হয়ে অগত্যা আবার সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। এবং অবলীলাক্রমে মিথ্যা অভিযোগ করে বললেন, 'তুমি শুধু-শুধু আমায় এতদূর নিয়ে এসে—এখন একা ছেড়ে দিতে চাও!' বেশ জোরে হাওয়া বইছে সুতরাং আমাকে চেঁচিয়ে ওপার থেকে বলতে হল, 'কী মিথ্যেবাদী! মোটেই আমি তোমাকে আনিনি। আমি একা-একা আসছিলাম, তুমিই তো জোর করে আমার সঙ্গে এলে।' শ্রীমতী আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'মোটেই না। আমিই তো একা-একা ফুল তুলছিলাম। তুমিই তো দেখিয়ে-দেখিয়ে আমার সামনে দিয়ে আসছিলে, উদ্দেশ্য আমায় সঙ্গে ডাকা।' আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, 'বয়েই গেছে আমার তোমায় ডাকতে!'

ক্রমে বেশ বেলা হয়ে এলো, রোদ্দুর প্রগাঢ়, ইচ্ছে হয় গা থেকে গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে। কিন্তু ওপারে মাত্র তো কয়েক হাত দূরেই শ্রীমতী, সুতরাং খালি গা হওয়া যায়না। পথে একটা ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে এলাম, একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই—এমন ছোট গ্রাম শুধু হোগলাপাতার কয়েকখানা ঘর আর কিছু মুর্গি ছাগল ও উলঙ্গ শিশু। আবার জঙ্গল। দুপুরের কাছাকাছি আমি সেই অভীষ্ট অঞ্চলে পৌঁছুলাম।

লাট্টুর মতো দেখতে একটা ছোট্ট টিলা, ভেড়ার লোমের মতন তার গায় ছোট-ছোট আশসেওড়ার জঙ্গল, তার মাঝখান দিয়ে বিনা নোটিশে নেমে এসেছে আর-একটা নদী, একটু পুরুষ ধরনের বলশালী নদী, পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে তার জলে সাদা ফেনা পর্যন্ত ওঠে। সেই নাম-না-জানা নদীতে এসে মিশেছে আমাদের হারাং। এখানেই হারাং-এর জন্ম সার্থক। হারাং যেখানে অন্য নদীতে মিশেছে—সেখানে তারও জল স্বচ্ছ, তার জল দুলছে, ঘূর্ণিতে নেচে উঠছে, আনন্দে সেখানে সে আত্মহারা, যেন সেই জায়গাটা অবিকল একটা পেঙ্গুইন এডিশান প্রয়াগসঙ্গম। ঐ ছিরছিরে, রোগা পটকা হারাং এখানে ঘূর্ণি ঘুরিয়ে নাচছে। আমি আবিষ্কারের আনন্দে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শ্রীমতী বললেন, 'আমি ওপারে যাব!' এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্রোধ নেই, অনুনয়। আমি বললাম, 'চলে এসো!' শ্রীমতী বললেন, 'পারছিনা, তুমি এসো।' আমিও পা ডুবিয়ে লাঠি বাড়িয়ে দেখলাম, জল বেশ গভীর, তাছাড়া স্রোতের টান খুব, পা স্থির রাখা যায়না। বললাম, 'উঁহু, যেতে পারছিনা।' শ্রীমতী করুণকণ্ঠে বললেন, 'আমার একা ভালো লাগছেনা। না, তুমি এসো। যেমন করে হোক।' —আমি বললাম, 'একা কোথায়। এই তো এদিকে আমি রয়েছি, কতটাই-বা দূর।' শ্রীমতী তবু বললেন, 'না, তুমি এদিকে এসো। মাঝখানে নদীটা ভালো লাগছেনা।' আমি বললাম, 'তাহলে আগেই এলেনা কেন? যখন জল কম ছিল?' শ্রীমতী বললেন, 'আগে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু এখন আমার একা ভালো লাগছেনা।'

শ্রীমতী তখন সেই দুই নদীর মেশার জায়গায় জলের ঘূর্ণি ও ঢেউভাঙার খেলার দিকে বিষণ্নমুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

৬

পণ্ডিতমশাইকে গিয়ে বললাম, আপনি একটা বিধান দিন। ধর্ম তো মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই। ধর্মের তো উদ্দেশ্য মানুষকে মেরে ফেলা নয়।

পণ্ডিতমশাই উঠোনে হাঁটু ছড়িয়ে বসেছিলেন। হাঁটুর দুপাশে গোল করে সুতো জড়ানো, অর্থাৎ উনি পৈতের গ্রন্থি দিচ্ছেন, এখন কোন কথা বলবেন না। রিফিউজি কলোনির ছোট কাঁচা বাড়ি, মাটির উঠোন, একপাশে একটা ঝিঙে গাছে তকতক করছে দুটো নতুন ঝিঙে। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে এসেছিলাম আমার ঠাকুমার জন্য। আমার ঠাকুমা কয়েকদিন ধরে কিছুই খাচ্ছেননা প্রায়, সামান্য কিছু দাঁতে কাটছেন। দুসপ্তাহ ধরে আমাদের এলাকায় রেশনে, আলোচাল দেওয়া হচ্ছেনা। আমার ঠাকুমা সাঁইত্রিশ বছর ধরে বিধবা, তিনি সেদ্ধচাল খাবেননা, আর প্রায় সারাজীবন পূর্ববঙ্গে থেকে এসেছেন–সুতরাং ভাতের বদলে রুটি মুখে রোচেনা, রুটি খেলে নাকি সহ্য হয়না, ফল খেতেও অরুচি; অতএব, ক'দিন ধরেই এটাওটা অজুহাত দেখিয়ে প্রায়োপবেশন করে আছেন। বহু চেষ্টা করেও আমি আতপচাল জোগাড় করতে পারিনি। ঠাকুমাকে একবার ধমকে বললাম, 'সেদ্ধচালই খাও-না। কে দেখতে যাচ্ছে।' ঠাকুমা একগাল হেসে বললেন, 'খাবার সময় আমি নিজের চোখে তো দেখবই! নাকি, অন্ধকারে খাওয়াবি।'

আমি বললাম, 'ঠাকুমা, আমি অনেক বই পড়েছি, বিধবাদের সেদ্ধচাল খাওয়া বারণ–একথা কোথাও লেখা নেই। তুমি আমার কথা রেখে খাও!'

তিনি বললেন, 'ওসব যুদ্ধ-বিপ্লব তোরা করিস বাপু। আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে–এখন আমি পরকালটা ঝরঝরে করতে যাব? দুদিনের জন্য নিয়ম ভেঙে চিতায়ও শান্তি পাবনা। রোদ্দুরে ঘেমে এসেছিস, যা, মুখেচোখে জল দিয়ে আয়। তারপর আমার কাছে বোস, পাখার হাওয়া করি।'

মাথার ওপর ইলেকট্রিকের পাখা ঘুরছে, তবু 'হাওয়া করি' বলা ঠাকুমা-দিদিমাদের অভ্যেস। শুনলেই মনে হয় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ি, মনে হয় আঃ, কী ঠাণ্ডা!

ক'দিন ধরেই ঠাকুমাকে দেখে খুব মন খারাপ লাগছে। শুধু খাওয়া না, একটা প্রতিষ্ঠানই যেন বন্ধ হয়ে গেছে। ৭০ বছর বয়েস হয়ে গেলেও তাঁর শরীর এখনও শক্ত আছে, নিজেই নিজের রান্না করেন। খুব ভোরে উঠে স্নানটান সেরে পুজো-আহ্নিকে ঘণ্টাদুয়েক কাটে, তারপর ঢোকেন হবিষ্যি-রান্নাঘরে। তারপর প্রায় সারাদিন ধরে টুকটাক কত কী যে রান্না চলে তার ঠিক নেই। নিমপাতা ভাজা, হিঞ্চে শাক, ডাঁটা চচ্চড়ি, আলুর খোলা ভাজা, উচ্ছে আর লাউয়ের সঙ্গে মেথি

পোড়া দিয়ে কাঁচা মুগের ঠাণ্ডা ডাল, কাটোয়ার ডাঁটাচচ্চড়ি, চিচিঙ্গের ছেঁচকি—এইসব গাছপালার আবর্জনা খেয়ে শরীরের কিছুই হয়না জানি, তবু ঐ রান্নাতেই আনন্দ আর সময় কাটান। আনন্দে আছেন বলেই শরীর ভালো আছে। আমি মাঝেমাঝে টুকটাক উঁকি দিয়ে ঠাকুমার রান্না এটাসেটা চেয়ে খেতাম। আরও ছেলেবেলায়, ঠাকুমা যখন সারা ঘরে বাসনপত্র ছড়িয়ে খেতে বসে গল্প করতেন, আমি তখন আমডাল-মাখা ভাতের এক গেরাস খাবার জন্য মুখ বাড়িয়ে দিতাম। ক'দিন ধরে—এসব বন্ধ। ঠাকুমা আর রান্নাঘরে ঢোকেননা—ভাতই নেই, শুধু, শাক-তরকারি কে খায়। ফলটল কেটে দেওয়া হচ্ছে ওঁর জন্য, কিন্তু ওঁর সারাদিন সময় কাটে কী করে?

পণ্ডিতমশাই পৈতের গ্রন্থি বেঁধে, মুখ তুলে বললেন, 'আমি আর কী করব বলো। তোমরাই বলো-না গিয়ে সেদ্ধচালই খেতে। আজকাল তো অনেকেই খাচ্ছে।'

—সে তো আমাদের মা-মাসিমা-বৌদির বয়েসী যাঁরা অনেকদিন শহরে আছেন—তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের সেদ্ধচালে আপত্তি নেই। কিন্তু দিদিমা-ঠাকুমাদের কে বোঝাবে? আপনারা ছাড়া?

—শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে, নিয়ম ভাঙার কথা মুখ দিয়ে কী করে উচ্চারণ করি বলো? তাছাড়া, তোমার ঠাকুমা হলেন স্বর্গত অমুকচন্দ্র অমুকের বিধবা স্ত্রী, কত বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন তোমার ঠাকুরদাদা, তাঁর পত্নীকে শাস্ত্র না-মানার কথা আমি নিজের মুখে বলতে পারবনা।

—পণ্ডিতমশাই, এর মধ্যে শাস্ত্রটা আবার কোথায়? শাস্ত্রে আত্মসংযমের কথা থাকতে পারে, কিন্তু না-খাইয়ে মেরে ফেলার কথা আছে?

—তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করা আমার সাজেনা। শাস্ত্রের রহস্য অনেক গূঢ়।

একথা বলে তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যার অনুক্ত বক্তব্য হল, খুব না হয় দুপাতা ইংরিজি পড়ে প্যান্টালুন চড়িয়ে সিগারেট টানতে শিখেছ, কিন্তু আসতে তো হল আমার কাছে! দেখো-না বাছাধন, এমন ইস্ক্রু টাইট দেব—। আমার ইচ্ছে হল পণ্ডিতমশাইয়ের রোগা দেহটা, দুহাত দিয়ে শূন্যে তুলে একটু শাস্ত্রচর্চা করি। কিন্তু তখনই মনে পড়ল, মাথা গরম করলে এখানে কার্যসিদ্ধি হবেনা। সুতরাং আমি প্যান্টালুনের ক্রিজ অগ্রাহ্য করে ওঁর পাশে মাটিতেই দুম করে বসে পড়লাম। এবং বিনীত গলায় জানালাম, 'পণ্ডিতমশাই, আমি শাস্ত্র কিছুই জানিনা—কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়, শিক্ষার দোষ। আমায় কেউ শেখায়নি, শেখবার সুযোগও দেয়নি। তবে, যে-কোন সংস্কৃত কথা শুনলেই মনে হয় শাস্ত্রের

কথা। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না, বিপদে নিয়মো নাস্তি? এখন যখন আতপ পাওয়া যাচ্ছে না–'

–লুচি ভেজে খাওয়াও। ফল খাওয়াও।

–কিন্তু ওঁর যে সহ্য হয়না। ভাত খাওয়া চিরকালের অভ্যেস। অম্বুবাচীর সময় ওঁকে তিনদিন উপোস করতে দেখেছি, কিন্তু এখন যে ছ-সাত দিন হয়ে গেল! আপনারা শাস্ত্র দেখে যদি বিধান দেন যে, সেদ্ধচালে কোন দোষ নেই, তাহলে বাংলাদেশে কত বিধবার যে উপকার হয়।

–সেদ্ধচালে শরীর উত্তপ্ত হয়, তা জান!

আমি কোনক্রমে হাসি চেপে বললাম, 'অরুণের জ্যাঠামশাইয়ের বয়েস পঁচাত্তর, তিনি সেদ্ধচাল খেলে উত্তপ্ত শরীর নিয়ে যদি–'

–পুরুষের কথা আলাদা! শাস্ত্র লোকাচারে বিধবার অনেককিছু ভক্ষণ করার নিষেধ আছে।

–বিদ্যাসাগরমশাই শাস্ত্র ঘেঁটে যদি বিধবাবিবাহের নির্দেশ বার করতে পারেন, আপনারা বিধবার সেদ্ধচাল খাবার নির্দেশ বার করতে পারবেননা?

পণ্ডিতমশাই শরীর মুচড়ে বললেন, 'আমাকে যে একটু বেরুতে হবে, বাবা। এখন তো তর্কের সময় নয়, এবার তাহলে তুমি–'

পণ্ডিতমশাইয়ের নির্দেশ আমি আদায় করতে পারিনি। কিন্তু বাজার থেকে তখুনি আমি ভালো-ভালো কোম্পানির লিভার এক্সট্র্যাক্ট, প্রোটিন কিনে এনে বোতলের লেবেল ছিঁড়ে ঠাকুমাকে খাওয়াচ্ছি। বিধবার পক্ষে আমিষ খাওয়া উচিত নয়, তবু আমি অন্য কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াচ্ছি। কিন্তু, আমার মন পরিষ্কার, আমি জানি আমি কোন অন্যায়, কোন পাপ করছিনা।

সরমাদি আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। এখন বয়েস ৪২, দশবছর আগে বিধবা হয়েছেন। সরমাদি সংস্কৃতে বি.এ. অনার্স, একটা স্কুলে কাজ করেন, শাস্ত্র শোনার জন্য কোন পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে যাননা। সরমাদি রঙিন শাড়ি পরেন, হাতে একগাছি করে সোনার রুলি, সেদ্ধচাল খান–কিন্তু পাড়ায় সরমাদির নামে কোন অপবাদ নেই, সকলেই তাঁকে সমীহ করে। আমি সরমাদিকে একদিন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'সরমাদি, তুমি এতসব ভেঙেছ, কিন্তু তুমি এখন আর মাছ-মাংস খাওনা কেন? তুমি তো জান বিধবাদের মাছ-মাংস খাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় থাকতে পারেনা। বিপত্নীকরা যদি পারে–তবে বিধবাদেরই বা কেন–। তুমি সাহস করে–'

সরমাদি বললেন, 'দূর পাগলা!'

আমি বললাম, 'না সত্যিই, তোমাদের মতো কয়েকজনের উচিত আরম্ভ করা।

প্রকাশ্যে স্বীকার করা। তোমাদের মতো যাদের লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তারা যদি শুরু করে, অন্যান্য সাধারণ ঘরের বিধবারাও ভরসা পায়। দেখো, আজকাল দুধ-ঘি কিছু খাওয়া যায়না, শুধু শাক-পাতা আর একবেলা ভাত খেয়ে বিধবার চল্লিশ পেরুতে-না-পেরুতেই পুরো বুড়ি। দাঁত পড়ে যায়, চোখ খারাপ হয়, শরীর বেঁকে যায়, ঘর থেকে বেরুতে পারেনা, জীবন্মৃত অবস্থা। বুড়ি মেমসাহেবদের দেখো তো একা-একা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। বার্ধক্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ ঘরের বুড়ি-বিধবারা?'

সরমাদি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, একেই বাজারে মাছ-মাংসের যা অবস্থা! তার ওপর যদি আবার বিধবারা খাওয়া শুরু করে, তোদের কপালে একটুকরোও জুটবেনা।'—তারপর সরমাদি নিচু গলায় বললেন, 'না, তোকে সত্যিকথা বলি, আগে, মানে কপাল সাদা হওয়ার আগে মাছ খেতে বিষম ভালোবাসতাম। একবেলা মাছ না থাকলে মুখে ভাত রুচতনা। কিন্তু এখন মাছ খেতে কেন পারিনা জানিস, লোকে হ্যাংলা বলবে। ভাববে, আমার লোভ কতখানি। সাদা কাপড় বেশি ময়লা হয় বলে যুক্তি দেখিয়ে আমি রঙিন শাড়ি পরতে পারি, সোনার চুড়ি যখন আছেই—তখন বাক্সে না-রেখে হাতে রাখাই নিরাপদ। কিন্তু মাছ-মাংসের বেলায় কোনই যুক্তি টিঁকবেনা। শুধু ভাববে, আমার হ্যাংলামি। এমনকী বিধবারা প্রেম করে আবার বিয়েও করতে পারে, কিন্তু নিজেনিজেই মাছ-মাংস খাওয়া শুরু করতে পারেনা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা যদি এতে সম্মতি দেন, সমাজে প্রচার করেন, কাগজে-টাগজে লেখেন, বাড়ির পুরুষেরা যদি জোর করে, তবে চালু হতে পারে। দেখ, হয়তো আস্তেআস্তে এসব বদলে যাবে।'

আমি বললাম, 'বদল হয় হয়তো, কিন্তু এত আস্তে যে চোখে দেখা যায়না। ছেলেবেলায় দেখতাম ট্রামের জানালার পাশে বসা একধরনের টিপিক্যাল অফিসযাত্রী, ঠনঠনের কালীবাড়ির পাশে এলেই মেশিনের মতো যাদের হাত কপালে উঠে যেত। ভাবতাম, আমাদের জেনারেশনে হয়তো এসব বদলে যাবে, কিন্তু এখনও ঠিক ঐ একই চেহারার লোকদের দেখি কপাল ঠুকতে। বছর পনেরো আগে একটা অফিসে একজন লোক আমার কাছে ঘুষ চেয়েছিল। মাঝবয়েসী, গুঁপো চেহারার সেই লোকটা। সেই অফিসে কয়েকজন ছেলে-ছোকরা কর্মচারীও ছিল। ভেবেছিলাম, বুড়োরা বিদায় নিলে—এই ছেলে-ছোকরারাই যখন সব চেয়ারে বসবে—তখন সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। কয়েকদিন আগে সেই অফিসে গিয়েছিলাম, ঠিক সেইরকম মাঝবয়েসী আর-একটা গুঁপো লোক আমার কাছে ঘুষ চাইল। এরা বদলায়না, এরা অমর। ভেবে দ্যাখো আমাদের পাড়ার যে ভটচাজ্যি পণ্ডিতমশাই—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে কি উনিই ছিলেন না?'

টুকুন আমার এক বন্ধুর বোন—হঠাৎ বাসে তার সঙ্গে দেখা। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস, ভারি ছটফটে ঝলমলে মেয়ে, বছর তিনেক আগে ওর বিয়ে হয়ে যাবার পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার ছোট বোনের বন্ধু ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল গতমাসে আমার বোনের বিয়েতে তো টুকুন আসেনি। আমার বোনের ও প্রাণের বন্ধু, নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই করেছিল। আমি জিগগেস করলাম, 'এই টুকুন, তুই আমার বোনের বিয়েতে এলিনা কেন রে? ভারি অহংকারী হয়েছিস, না?'

টুকুন হঠাৎ মুখের আলো নিবিয়ে আস্তেআস্তে বলল, 'পরে একদিন যাব। বিয়েবাড়িতে বিধবাদের যেতে নেই।'

আমি আর্ত চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, টুকুনের বাবা পাশ থেকে বললেন, 'বিয়ে হবার দুমাস পরেই টুকুনের স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেছে!' আমি টুকুনের দিকে তাকালাম, কোন চিহ্ন নেই, দামি রঙিন শাড়ি পরেছে, হাতভর্তি গয়না, খোঁপায় হাতির দাঁতের ফুল, কপালে লাল টিপ পর্যন্ত। কিন্তু মনে হল একটা খড়-মাটির প্রতিমার গায়ে পোশাক চড়ানো। আমি আবার তাকালাম, হ্যাঁ, অবিকল খড়-মাটির প্রতিমা। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ শরীরের রঙ জ্বলে যাবে, উঠে যাবে, গায়ের মাটি গলে যাবে, দু-এক বছর পরেই আমি টুকুনের দেহের খড়ের কাঠামোটা শুধু দেখতে পাব!

৭

'নাগরদোলা ঘুরছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জোরে. আরও জোরে ঘোরাও। আরও। দুধ-সাবু খেয়ে চালাচ্ছ নাকি? আরও জোরে?'

বিপরীত দিকের দোলনটা থেকে সেই মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল, 'এই, এই, আর না. আর না—আমার মাথা ঘুরছে! থামাও থামাও!'

সুন্দরী মেয়েকে ভয় দেখাতে কার না ইচ্ছে হয়! হোক-না অচেনা! আমি লঘু গলায় ফের দোলনাওয়ালাদের উত্তেজিত করতে লাগলাম, 'না, না থামবে না। আরও জোরে!'

মেয়েটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, না, খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি! দোলনা ছিঁড়ে পড়বে!'

আমি বললাম, 'অত ভয় পেলে নাগরদোলায় উঠতে গেছেন কেন?'

এই থেকে আলাপ। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় ঘুরন্ত বাতাসের মধ্যে দেখা। এক দোলনায় আমরা চারজন, অন্য দোলনায় ওরা। আমাদের দোলনায়

বন্ধু, তার স্ত্রী ও শ্যালকের সঙ্গে আমি, ও-দোলনায় ওরা চারজন মেয়ে। সেই মেয়েটির গায়ের রং কুচকুচে কালো। কিন্তু অমন রূপসী মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। সবার চোখ ঘুরে-ঘুরে ঐ মেয়েটির দিকেই আসবে। কালো ঝকঝকে শরীর তার পরনে সাদা শাড়ি, ব্লাউজ সাদা, চটি সাদা, হাতে ঘড়ির ব্যান্ডটাও সাদা, আর-কোন অলংকার নেই—গলায় শুধু একটা শ্বেত মুক্তামালা। কোনাবকের সুরসুন্দরী মূর্তি যে দেখেছে সেই শুধু মেয়েটির রূপ খানিকটা অনুমান করতে পারবে।

নাগরদোলা থামল, ওরা নেমে পড়তেই আমি বললাম, 'একি, হয়ে গেল? আর-একবার ঘুরবেন না?'

অচেনা মেয়েরা সবসময় অনুরোধ বোঝে না। অনুরোধকে মনে করে 'আওয়াজ দেওয়া'। সেই মেয়েটি কিছু বলবার আগেই তার সঙ্গিনী অন্য একটি বার্লি-খাওয়া চেহারার মেয়ে বলল, 'কী অসভ্য ছেলেগুলো, চল কৃষ্ণা—'

নাম জানলাম, কৃষ্ণা। আমার এক পিসিরও গায়ের রং ছিল খুব কালো —নাম ছিল পূর্ণিমা। অচেনা লোকজনের মধ্যে তাঁকে পূর্ণিমা বলে ডাকলে তিনি হেসে আকুল হতেন। বলতেন, 'চেঁচিয়ে ডাকিস না—লোকে পূর্ণিমা শুনে তাকিয়ে দেখবে কালো একখানা অমাবস্যা।'

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের রোগ নির্ণয়ের মতন শান্তিনিকেতন মেলায় সবাই সবার কোনো-না-কোনো সূত্রে চেনা। বিকেলবেলা আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলাম তার এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে। সেই অধ্যাপকের আবার এক অন্যবন্ধুর ছোটবোনের চারজন বান্ধবী বেড়াতে এসেছে। ওরকম সম্পর্ক ধরলে পৃথিবীর সবাই যে সবাইকার বন্ধু-বান্ধবী, মানুষ সেটা ভুলে যায়। সুতরাং আমার বন্ধুর বন্ধুর ছোট বোনের চারজন বান্ধবীকে আমি মোটেই পর ভাবলাম না। আপন-আপন ভেবে বিনাদ্বিধায় আলাপ-পরিচয় শুরু করে দিলাম। নাগরদোলার সেই চারজন, তাদের মধ্যে কৃষ্ণা।

অনেক মেয়ের কালো রঙের জন্য লজ্জা থাকে। কৃষ্ণার নেই, কৃষ্ণা অহংকারী। সে জানে, সব পুরুষই তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বাধ্য। চায়ের কাপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, 'আপনি ভারি পাজি। নাগরদোলা অত জোরে চালাতে বলছিলেন কেন?'

আমি বললাম, 'চলুন, আমার সঙ্গে আবার চড়বেন আসুন। আমি ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি!'

কৃষ্ণার সঙ্গিনী সেই বার্লি-খাওয়া মেয়েটি কড়া চোখে তাকাল। তাকে দেখলেই মনে হয়—ভবিষ্যতে সে কোন মেয়ে হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট হবে। তা হোক, তাতে আমার কোন ভয় নেই। আমারই পেড়াপিড়ি ও আগ্রহাতিশয্যে

ফের দলবল মিলে সবাই এলাম নাগরদোলায় চাপতে। এখন তো আলাপ হয়ে গেছে, এখন আর দ্বিধা কী! নাগরদোলায় প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে আমি কৃষ্ণার বাহু চেপে ভয় দেখিয়ে বললাম, 'এবার ফেলে দিই? দিই ফেলে?' বাচ্চা বালিকার মতন কৃষ্ণা হাসতে-হাসতে ভয় পেতে লাগল। আমি এমনিতে একটু বোকা-সোকা, লাজুক ধরনের ছেলে, কিন্তু কৃষ্ণার পাশে বসে হঠাৎ যে কী করে সেদিন অত চালু হয়ে গেলাম, কে জানে!

কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে পড়ল—যদিও কৃষ্ণা থাকে বালিগঞ্জে—আমি থাকি চরম উত্তর কলকাতায়—তবু ওর চেনা কয়েকজনকে আমি চিনি—আমার চেনা কয়েকজনকে চেনে কৃষ্ণা। ঐ যে আগেই বলেছি, বন্ধুর বন্ধুতেই পৃথিবীটা ভর্তি।

শান্তিনিকেতনে আমি একদিন বেশি থেকে গেলাম, আগের দিন চলে গেল কৃষ্ণারা। যাবার আগে কৃষ্ণা ওর বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার লিখে দিয়ে গেল, আমিও দিলাম আমারটা। স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার আগে বেশ আন্তরিকভাবেই বলল, 'বাড়িতে আসবেন কিন্তু একদিন। ঠিক আসবেন!'

শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলাম মাসাঞ্জোর, সেখান থেকে দুর্গাপুর ঘুরে কলকাতায় ফিরলাম সাতদিন বাদে। রাত্তিরবেলা জি টি রোড ধরে বন্ধুর জিপে করে আসছিলাম, সেদিন চাঁদের আলো পৃথিবীটা ধুইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল কৃষ্ণার কথা।

কিন্তু কৃষ্ণাকে আমি কোনদিন ফোন করিনি, চিঠি লিখিনি, দেখা করতেও যাইনি। কেন? ঠিক কারণটা আমি নিজেও জানিনা। এইজন্যই তো আমি গল্প লিখতে পারিনা। গল্পে যা-যা মানায় তার কিছুই ঠিকমতো আমার মাথায় আসেনা। শান্তিনিকেতনে অমন চমৎকারভাবে যে-রূপসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়ে যে কলকাতায় আবার দেখা করতে বলল--তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ করাই তো স্বাভাবিক, গল্পেও সেইরকম হয়। কৃষ্ণার সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা এখনো আমার কাছে আছে—অথচ একদিনও আর দেখা হয়নি।

আমি কেন দেখা করিনি? একজন মানুষের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। একই মানুষ, কিন্তু মায়ের সামনে, অফিসের বড়বাবুর সামনে, বন্ধুর সামনে, স্ত্রীর সামনে এবং প্রেমিকার সামনে, ছোটভাইয়ের সামনে—সে বিভিন্ন, বলা যায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব। সেইরকম, যে-মানুষ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় বেড়াচ্ছে আর যে কলকাতার ভিড়ের বাসে ঝুলছে—এরা দুজনেও আলাদা। শান্তিনিকেতনে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোন দ্বিধা ছিল না, বিনা

ভূমিকায় অনায়াসেই লঘু চাপল্য এবং ইয়ারকি শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতায় অন্যরকম। শান্তিনিকেতনের সেই একখানা বিরাট আকাশ, লাল ধুলোর রাস্তা, মেলার হট্টগোল আর সোনাঝুরি গাছে হাওয়ার ঢেউ—এই পটভূমিকার বদলে ট্রামলাইন পেরিয়ে গলিতে ঢুকে বাড়ির নম্বর খুঁজে—দরজার কলিংবেল বাজিয়ে বা কড়া নেড়ে বৈঠকখানায় বসে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু অন্যরকম হতে বাধ্য। টেলিফোন করেই-বা কী বলব? বলব কোথাও দেখা করতে? নিয়ে যাব কোন রেস্টুরেন্টে? যাকে নাগরদোলায় চাপার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তাকে কি ঠিক সেই একইভাবে রেস্টুরেন্টে আসার আমন্ত্রণ জানানো যায়? আমি ভেবে পাইনি। আমি আর দেখা করিনি কৃষ্ণার সঙ্গে।

দেখা করিনি, কিন্তু ক্ষীণ আশা করেছিলাম—কৃষ্ণা নিজে হয়তো আমাকে চিঠি লিখবে বা দেখা করবে। আবার জানতাম, তা অসম্ভব। কোন মেয়ে যেচে কোন ছেলেকে চিঠি লেখে নাকি আগে?—ছেলেটিকে তার ঠিকানা দেওয়া সত্ত্বেও! আর, কৃষ্ণা ওরকম ঝলমলে রূপসী—তার নিশ্চয়ই অনেক অনুরাগী—তার বয়েই গেছে আমার মতন হেঁজিপেঁজিকে চিঠি লিখতে।

পৌষমেলা হয় শীতকালে তখন প্যান্ট-কোট পরার সময়। কৃষ্ণার ঠিকানা লেখা কাগজটা রয়ে গেল আমার কোটের পকেটে। শীত ফুরোলে কোটটা কাচতে না-দিয়েই আলমারিতে তুলে রাখলাম। পরের বছর শীত যখন পড়ি-পড়ি করছে —গরম জামাগুলো সব নামতে শুরু করেছে—কোটের পকেট থেকে অন্য অনেক কাগজপত্রের সঙ্গে বেরুল সেই ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজটা। মনে পড়ল আবার কৃষ্ণার কথা, সেই কষ্টিপাথরের মতন উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, সেই শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ, মনে পড়ল সেই শ্বেতবসনা সুন্দরীকে। বুকের মধ্যে একটু টনটন করে উঠল। কৃষ্ণা খুব আন্তরিকভাবে বলেছিল ওর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে। কেন দেখা করিনি! এখন কী করব! ধুৎ, কী পাগলামি! একবছর আগে দেখা হয়েছিল এখন গিয়ে বলা যায়, আমি এসেছি, এতদিনে আমার সময় হল!

কাগজটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। প্রত্যেক বছর প্রথম শীতে কোটের পকেট থেকে সবকিছু বার করি—অনেক পুরোনো কাগজপত্র বাতিল হয়ে যায়, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা ফেলতে ইচ্ছে করেনা। চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দিয়ে ভাবি, থাক্-না। পড়ে-পড়ে কৃষ্ণার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার আমার মুখস্থ হয়ে গেছে —তবু ওর নিজের হাতের লেখাটা ফেলি না! এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার—এই একটা বাড়ির ঠিকানা আমার মুখস্থ—যে বাড়িতে আমি কখনো যাইনি সাত বছর কেটে গেছে, আর কখনো যাবও না। কৃষ্ণার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। অথচ ঐ নাম্বার কোনদিন আমি ডায়াল করিনি।

কত দরকারি ঠিকানা, কত গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নাম্বার ভুলে গিয়ে কত অসুবিধা হয়—কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কৃষ্ণার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আমার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী। এরকম অযৌক্তিক কাণ্ড করলে কি আর গল্প হয়?

বরং মাঝে-মাঝে ভাবি কৃষ্ণা তো একবার ভাবলেও পারত—ওর ঠিকানা-লেখা কাগজটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—ওর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বারটা আমার মনে নেই —সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। কিন্তু ওকি আমায় একটা চিঠিও লিখতে পারত না? কিংবা টেলিফোন? এই ভেবে কৃষ্ণার ওপর প্রবল অভিমান হয় আমার।

৮

কইখালি পেরিয়ে এসেছে ওরা। এয়ারপোর্টের পিছনদিক ঘুরে এসে পড়েছে নতুন তৈরি হাইওয়ে পর্যন্ত। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এই হাইওয়ে সল্টলেকের পাশ দিয়ে চলে গেছে বেলেঘাটা পর্যন্ত, এখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি, মজুররা খাটছে। সেই চারজন বিশ্রাম নেবার জন্য হাইওয়ের ওপাশে গাছতলায় খাটিয়াটা নামাল। তারপর বিড়ি ধরাল।

মড়া বয়ে নিয়ে চলেছে, সেই কইখালি থেকে আসছে, যাবে বোধহয় নিমতলা ঘাট পর্যন্ত। দুপুরের রোদে এতখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা, এখন যিনি মড়া—সেই ভূতপূর্ব ভদ্রলোকটির শখ দেখলে আশ্চর্য লাগে, অথবা বোধহয় মৃতের আত্মীয়স্বজনেরই এই শখ। যদিও আত্মীয়স্বজন কেউ মড়ার সঙ্গে যাচ্ছে বলে তো মনে হয় না, বোধহয় পাড়াপ্রতিবেশী বা ভাড়াটে লোক দিয়ে কাজ সারছে। চারটে লোকের কোমরে গামছা বাঁধা, বোধহয় গাঁজা খেয়ে চোখ লাল, যে-কর্কশ সুরে বলহরি হরিবোল বলে চেঁচাচ্ছে, তাতেই বোঝা যায়, মৃত লোকটির সঙ্গে ওদের কোন আত্মীয়তা নেই। আত্মীযস্বজন বোধহয় আগেই গাড়ি চেপে শ্মশানে হাজির হয়েছে। এর বদলে, স্বগ্রামেই পুড়িয়ে গঙ্গায় শুধু অস্থি বিসর্জন দিলে তো হতো।

হাইওয়ে ধরে একদল লোক আসছে, তাই দেখে ঐ চারজন আবার 'বলহরি' রব তুলে খাটিয়া তুলল। একজন বলল, দেখিস একটু আস্তে, লাশ বড দুলছে।

আরেকজন বলল, 'উঃ যা ভারী, মাইরি, লাশ একেবারে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে!'

—শুধু ফুলবে কেন, গোপেনবাবুর গতরটাও তো কম ছিল না।

চারজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। 'লে, লে, পা চালিয়ে চল। সন্ধের আগেই গঙ্গা পাইয়ে দিতে হবে।'

—বেরিয়েছিলাম বেশ ছায়ায়-ছায়ায়, আকাশে মেঘ ছিল। হঠাৎ এমন সুর্যি উঠে গেল! একেবারে কালঘাম ছুটিয়ে ছাড়ছে।

—গোপেনবাবুর যেমন ভাগ্য!

হাইওয়ে পেরিয়ে এসে এপারে বাগুইহাটির রাস্তা। এবার কোন্‌দিক দিয়ে যাবে, সেটা আলোচনা করার জন্য ওরা আবার খাটিয়া নামিয়ে জিরোতে বসল। নামাবার সময় বলল, 'দেখিস, সাবধানে। পা-দুটো না বেশি ঝুলে পড়ে!'

দুজনের মত হাইওয়ে ধরেই ফাঁকায়-ফাঁকায় বেরিয়ে গিয়ে একেবারে উল্টোডিঙ্গির ধার দিয়ে শহরে ঢুকবে। আর দুজন বলল, 'কেন বাগুইহাটি দিয়েই যাওয়া যাক্-না। বাগুইহাটির খাল পেরুলে সোজা রাস্তা ধরে যশোর রোড, সেখান থেকে শ্যামবাজার আর কতটুকু!'

—কিন্তু হাইওয়েটা বেশ ফাঁকা ছিল!

—আর রোদ যে চচ্চড় করছে! মড়া নিয়ে যাব তার আর ফাঁকা রাস্তা আর ভিড়ের রাস্তা কী? তুই মরলে তোকে নিয়ে যাব ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, মরার পর তো শালা সবই ফাঁকা!

কয়েকবার জিরিয়ে-জিরিয়ে, ওরা চলে এল বাগুইহাটির খাল পর্যন্ত। একজনও বদলি নেই, ঐ-চারজন রোগা জিরজিরে লোক এতটা রাস্তা বয়ে আনতে হাঁপিযে গেছে একেবারে, কপালে ঘাম। তবু গলা ফুলিয়ে হাঁকছে, বলহরি হ-রি-বো-ল!

একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়েছিলেন খালপারে, পাশ দিয়ে মড়া যেতে দেখে নাক কুঁচকে বললেন, 'ইস ডিউটিতে আসতে-না-আসতেই একটা মড়া দেখতে হল! একটু আস্তে চেঁচাও-না বাবা। ভগবান তো আর কানে কালা নন!'

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বাগুইহাটির খাল কচুরিপানায় ভর্তি, বেড়াবার পক্ষে খুব একটা আদর্শ জায়গা নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মতো ওঁরও দুটো উদ্দেশ্য থাকে সবসময়, ব্লাডপ্রেসার কমাবার জন্য একটু হাঁটাচলা, আর সেই ওপারের বাগুইহাটির বাজারটা দেখে আসা—ভালো কই মাছ উঠেছে কিনা। কিন্তু মাছের থলিটা নিয়ে বেরুতে পারেন না—ওপার থেকে থলি হাতে করে এলেই পুলিশ উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে—ভেতরে চাল কিনা। এপার পর্যন্ত রেশনিং এলাকা, ওপারে খোলাবাজার, পোলের পাশে পুলিশের ছাউনি।

মড়া দেখে তিনি ছড়িশুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর জিজ্ঞেস

করলেন, 'কে মায়া কাটাল? মেয়ে না পুরুষ?'

—পুরুষ।

—কোথা থেকে আসছ ভাই তোমরা? কোন পাড়ার?

—কইখালি।

—কইখালির কে?

—গোপেন সাহা।

—অ্যাঁ! গোপেন সাহা! কবে মরল।

—সাহা কে বলল? গোপেন সান্যাল।

—গোপেন সাহা আমার বহুকালের বন্ধু। ওয়ারটাইমে তার সঙ্গে আমি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে একসঙ্গে কাজ করেছি! শরীরটা তার খারাপ যাচ্ছে শুনেছিলাম। একবার নামাও তো, মুখটা দেখে নি।

—বললাম তো অন্য লোক। সাহা নয়, সান্যাল!

—বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। একবার নামাও-না, দেখে সন্দেহটা মিটিয়ে নিই। অন্যলোক হলে তো ভালোই।

—এখন নামানো হবেনা। পা চালিয়ে চল!

—এক মিনিটে কী এমন অনর্থ হয়ে যাবে? বুড়ো মানুষকে শুধু-শুধু চমকে দিলে। একটু নামিয়েই দেখাও-না!

—পা চালিয়ে চল-না। বেলা পড়ে এল।

ক্যালভার্টে কয়েকটা ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। লোক-চারজন মড়ার খাটিয়া নিয়ে প্রায় ছুটছে দেখে, তারা দৌড়ে এসে ওদের ধরল। জোর করে খাটিয়া নামাল। সরিয়ে ফেলল ওপরের কাপড়। মাথার কাছে একটা পরচুলো দেওয়া মুখোশ, পায়ের কাছে দুটো নকল মাটির পা। শরীরের জায়গায় ছবস্তা চাল ঠাসাঠাসি। মৃতদেহ নেই, সেখানে মানুষকে বাঁচাবার বস্তু।

হৈ হৈ, পুলিশ ডাকা, ভিড়। এই ছেলেগুলোই আজকাল চোরাকারবারী ধরার জন্য খুব সজাগ। অনেকসময় ওরাই রিকশা কিংবা গোরুর গাড়ি সার্চ করে—পুলিশ না-থাকলে, এমনকী লোকের বাজারের থলি কিংবা ডাক্তারের ব্যাগ পর্যন্ত, দৈবাৎ চাল পেয়ে গেলে পুলিশ ডাকে। পুলিশের দারোগা ছুটে এসে হুইসল বাজালেন, চারজন কনস্টেবল ছুটে এল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের ধরা গেলনা। হঠাৎ তিন-চারটে কুকুর ঝগড়া করতে-করতে এসে ভিড়ের মধ্যে পড়তেই, ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, সেই চারজন লোক সেই ফাঁকে ছুট দিল প্রাণপণে—দক্ষিণপাড়া পেরিয়ে কেষ্টপুর দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। ওদের ধরা গেল না কিন্তু বামাল গ্রেফতার হল। ভিড়ের অনেকেই

চিনতে পেরেছে—ঐ-চারজন নাকি পাকা চোরাচালানি।

এই ঘটনা আমি শুনি লোকমুখে। চাল পাচার করার এই অদ্ভুত গল্পটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকে প্রত্যেকটি শ্মশানবন্ধু দলেরই খাটিয়া নামিয়ে মড়া চেক করে দেখা হতে লাগল।

কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। বাগুইহাটির বাজারে আমিও মাঝে-মাঝে কইমাছের খোঁজে যাই। দিন দশেক পরে, আমার চোখের সামনেই সেই অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটল।

খাটিয়ায় চাপিয়ে চারজন লোক মড়া নিয়ে আসছে। কালভার্টে সেইরকম কয়েকজন যুবক বসে। খালপারে পুলিশের দারোগা। হঠাৎ যুবক কয়েকজন বলে উঠল, 'আরেঃ!'

তারা বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল। সেই আগের চারজন লোকই আবার একটা খাটিয়া নিয়ে আসছে। এ-ও কখনও সম্ভব, ওরা এত বোকা হতে পারে? যুবকরা বলল, 'সেই চারজন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক সেই চারজন।'

আরেকজন বলল, 'না, ঠিক সেই চারজন নয়। তার মধ্যে তিনজন। আমার ভালো মনে আছে। সেই চারজনের তিনজন আর একটা লোক নতুন। ঐ গাট্টাগোট্টা লোকটা আগেরবার ছিলনা। কী ব্যাপার?'

দারোগা সাহেব পর্যন্ত চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনি কোমরে হাত দিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওদের প্রতীক্ষায়। লোকগুলো তীব্র স্বরে বলহরি ধ্বনি দিতে-দিতে কাছে এগিয়ে এল। এতগুলো উৎসুক চোখের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল, কিছুই বলতে হল না, খাটিয়া নামিয়ে রাখল। গাট্টাগোট্টা নতুন লোকটা নিজেই ওপরের কাপড় সরাল। সত্যিই একটা মৃতদেহ। একটা রোগা শুটকো লোক মরে আছে। ওদের একজন বলল, 'দেখুন, চাল নেই, সত্যিকারের মড়া। চাল নেই, দেখুন!'

আমিও উঁকি মেরে দেখলাম। খুনটুন পর্যন্ত নয়, সাধারণভাবে একটা লোক মরেছে। ভিড়ের মধ্যে একজন অস্ফুটভাবে বলল, 'এই সেই চারনম্বর লোকটা।'

৯

ঠিক বিকেল পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট, আউট্রাম ঘাটের সামনে যে-মূর্তি তার ডানদিকের কোণ ঘুরে আসবে একটি মেয়ে, মেয়েটির পরনে একটি বোম্বাই

ছাপাশাড়ি, পায়ে গোলাপি রঙের 'লাকি' চটি, চুল বিনুনি-করা নয়, এলোখোঁপা, মেয়েটির হাতে থাকবে লাল রঙের হাতব্যাগ।

আর ঠিক সেই সময়েই ঐ মূর্তিটার দিক থেকে অকস্মাৎ বাঁক নেবে একটি ছেলে, ছেলেটির পরনে চওড়া-পাড় ধুতি এবং মুগার পাঞ্জাবি, মাথার চুল একটু কোঁকড়া, হাতে থাকবে ডি এইচ লরেন্সের কাব্যসংগ্রহ (পেপারব্যাক)।

ছেলেটি এবং মেয়েটি ঠিক পাঁচটা পনেরোয় ঐ মূর্তির দুপাশ দিয়ে এসে মুখোমুখি হবে। ছেলেটি বলবে, আরেঃ! কিন্তু মেয়েটির উদ্দেশ্যে নয়। মেয়েটির পিছন-পিছন আসা একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোকও এইসময় বলবেন, আরেঃ! যদিও আগে থেকেই জানা, কিন্তু দুজনকেই আরেঃ! বলতে হবে যথোচিত বিস্ময় ফুটিয়ে। তারিখ, কোন এক রবিবার।

ওরা থমকে দাঁড়াবে। ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে যুবকটির কাঁধ চাপড়ে সোল্লাসে বলবেন, কী খবর! বহুকাল পর দেখা। আলাপ করিয়ে দি, এই আমার ভাগনি, অরুণা, অরুণা রায়, এখন স্কটিশে বি.এ. পড়ছে। আর, অরুণা, এ হচ্ছে সুবিমল সান্যাল—আমার অনেককালের চেনা। মেয়েটি রক্তিমগণ্ডে হাত তুলে নমস্কার করবে আলতোভাবে—ততক্ষণে ছেলেটির নমস্কার সারা হয়ে যাবে।

ঐ-যে ভদ্রলোকটি সুবিমল সান্যালের কাঁধ চাপড়ে বহুকাল পরে দেখা হবার জন্য পুলক সোচ্চার করলেন, তিনি অবশ্য সুবিমলকে কস্মিনকালেও চেনেননা, আগে কখনও দেখেননি। তবু তিনি বলবেন, এসো সুবিমল একটু চা-খাওয়া যাক। তাড়া নেই তো তোমার? আরে, অরুণার সামনে অত লজ্জা করছ কেন, অরুণা খুব স্মার্ট মেয়ে, কলেজে কত ডিবেট করেছে।

তারপর—

এখানেই স্বীকার করা ভালো, আমি রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর লেখা একেবারেই লিখতে পারিনা। ঘটনার সাসপেন্স শেষ পর্যন্ত টিঁকিয়ে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। খালি মনে হয়, শেষটা আগে বলে ফেলি, পাঠক আমার চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান, সে বহু আগেই বুঝে ফেলে আমার বোকামির প্রয়াস দেখে হাসছে। কোন-এক রবিবার আউট্রাম ঘাটে পাচটা পনেরোয় কী-কী ঘটবে—তা আমি আগে থেকেই কী করে জানলাম, সেই কারণটাই বলি আগে।

কারণ খুব সোজা। সুবিমল আমার কাছে এসেছিল। সুবিমলের বিয়ে হবার কথাবার্তা চলছে। ওর বাড়ির লোক উনচল্লিশ জায়গায় পাত্রী দেখে, শেষ পর্যন্ত অরুণা রায়কে প্রায় পাকা পছন্দ করেছে। অন্যান্য জরুরি বিষয়েও মতের মিল হয়েছে দুপক্ষের। কিন্তু সুবিমল আধুনিক ছেলে, সে প্রেম করে অসবর্ণ বিবাহ করতে পারেনি বটে, কিন্তু একবারে চোখে না-দেখে বাপ-মায়ের কথা শুনেই

একটা অচেনা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে —এত কাঁচাও সে নয়। এ-বিষয়ে সে-বাড়িতে একটা বিদ্রোহই করেছে বলা যায়। অথচ, পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়ে ফরাসে বসে একটি লাজুক-লাজুক মেয়েকে দেখা—এ-প্রাচীন প্রথাতেও তার মত নেই। এতে নাকি নারীত্বের অবমাননা না কী-যেন হয়।

সুতরাং এই অভিনব পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটা সুবিমলেরই। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে এই পরিকল্পনাটা তৈরি করে সুবিমল নিজের বুদ্ধিতে কীরকম খুশি হয়েছে বুঝতে পারি। সুবিমল আমাকে বলল, এর মধ্যে খারাপ কিছু আছে, বল? সহজ-সরলভাবে আলাপ-পরিচয় হবে—দুজনেই দুজনকে জানতে পারব আগে থেকে!

যাইহোক, বন্দোবস্ত সব ঠিকঠাক। ডুয়েল লড়ার সময় যেমন একজন 'সেকেন্ড ম্যান' লাগে সেইরকম, সুবিমল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

আধুনিক হবার প্রাণপণ চেষ্টায় সুবিমল হয়তো শেষপর্যন্ত একটা 'প্রেম' করে বিয়ে করার চেষ্টাই করে যেত, কিন্তু ইতিমধ্যে ও একটা ভালো সরকারি চাকরি পেয়েছে, এবং বছর না-ঘুরতেই, ওকে ট্র্যান্সফার করেছে দুমকায়। সেই নির্জন জায়গায় কী করে একা-একা থাকবে--সেইজন্যই ওর বাবা-মা বিয়ের জন্য জোর করেছেন। সুবিমলও মত না-দিয়ে পারেনি।

আমি শুনে প্রচণ্ড খুশিতে হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, 'বাঃ, এ-তো চমৎকার ব্যাপার, মাইরি! বল, বল, তারপর কী হবে? মেয়েটা কি আগে থেকেই তোর পরিচয় জানবে?'

—জানাব তো কথা নয়। যদি না, নিজে গোপনে জেনে থাকে। মেয়েদের কৌতূহল তো জানিস!

—মনে কর ঐ সময়টাতেই যদি বাইচান্স আর-একটা তোরই মতো বা তোর চেয়েও ভালো চেহারার ছেলে এসে পড়ে—তবে ঐ মামা ভদ্রলোক তাকেই সুবিমল বলে পিঠ চাপড়াবে? ভদ্রলোক তো তোকে কখনো দেখেননি।

—ছবি দেখেছেন।

—বাঃ! সময়টাও বেছে নিয়েছিস চমৎকার! পাঁচটা পনেরো—পাঁচটা নয়, সাড়ে পাঁচটাও নয়—তাহলে প্ল্যান ধরা পড়ে যেতে পারত! তাছাড়া, শীতকালের ঠিক ঐ-সময়টাতেই কনে-দেখা-আলো পড়ে, নারে?

সুবিমল এবার একটু লজ্জা পেল। আমি বললাম, 'যদি এই মেয়েকেই তোর পছন্দ হয়—তবে ফুলশয্যার রাত্রে এই ঘটনাটা নিয়ে তোরা দুজনে খুব হাসাহাসি করতে পারবি। আচ্ছা বল, তারপর কী কী হবে?' চা-খেতে তো বসা হল, বুঝলাম —কথাবার্তা কীরকম হবে?

—তারপর আর-কিছু ঠিক করা নেই। কথাবার্তা যে-ভাবে এগোয় আর-কী।

হঠাৎ দেখা হলে লোকে যা কথা বলে আর-কী!

—যাঃ! আমাকে তো সব জেনে রাখতে হবে! আমি যাতে আবার কোন বেফাঁস কথাবার্তা না-বলে ফেলি! আমার বোধহয় বেশি কথা বলাও ঠিক হবেনা। তাহলে না শেষকালে মেয়েটির আমাকেই পছন্দ হয়ে যায়। আমাকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক সাজতে হবে। তোর ভয় নেই, আমি ভুরু কুঁচকে নাকটা বেঁকিয়ে আমার মুখটা যতদূর সম্ভব কুচ্ছিৎ করে রাখব আগাগোড়া। কথাবার্তা কী বলবি বল, তুই নিশ্চয়ই কিছু ভেবে রেখেছিস।

সুবিমল হেসে বলল, 'যাঃ, আগে থেকে ভেবে কোন কথা বলা যায়না।'

আমি বললাম, 'কথাবার্তা কীরকম হবে আমি কল্পনা করতে পারি। মামা ভদ্রলোকটি পাকেচক্রে তোর চাকরির কথা জিজ্ঞেস করবে। তুই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবি তার কলেজের কথা। কোন-কোন সাবজেকট বেশি ভালোবাসে। এম.এ. পড়ার ইচ্ছে আছে কিনা। মাঝখানে একবার, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে, গঙ্গানদীতে চড়া পড়ে যাওয়ার সমস্যা আর সি এম পি ও'র দ্বিতীয় ব্রিজ বানাবার পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়ে যাবার পর—তুই তোর হাতের লরেন্সের কাব্যসংগ্রহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে একফাঁকে অরুণা নাম্নী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবি, লরেন্সের কবিতা তার ভালো লাগে কিনা। মেয়েটি জানাবে, সে লরেন্সের 'রকিং হর্স উইনার' নামে একটি গল্প পড়েছে, ('লেডি চাটার্লিস লাভার' পড়ে থাকলেও বলবেনা)—তুই লরেন্সের যে-কোন একটা কবিতার চার-পাঁচলাইন চেঁচিয়ে পড়ে বলবি, আঃ, এটা পড়ে দেখুন, কী চমৎকার কবিতা। ঐ-ফাঁকে তোর দেখে নেওয়া উদ্দেশ্য, মেয়েটির ইংরেজি উচ্চারণ কেমন। কারণ, অফিসারের বউদের নানা পার্টিতে যেতে হয়—ইংরেজিটা একটু ভালো জানা দরকার!'

সুবিমল বলল, 'যাঃ, তুই বেশি ইয়ার্কি করছিস। রবিবার ফ্রি আছিস কিনা বল।'

আমি বললাম, 'সুবিমল, তুই একটা গাধা!'

—বিয়ের আগে সবাইকেই গাধা-গাধা দেখায়!

—তুই ব্ল্যাকমার্কেট করছিস কেন?

—ব্ল্যাকমার্কেট?

—তাছাড়া কী? ঠিকঠাক করা বিয়েকে তুই প্রেমের বিয়ে বলে চালাতে চাস! যেন এক সন্ধেবেলা দুজনেরই দুজনকে গভীর পছন্দ হয়ে গেল! তোর বাবা অবশ্য পণ নেবেননা জানি, বউভাতের খরচ বলে হাজার চারেক টাকা নিতে পারে! দানসামগ্রী নিয়ে কোন কথাই উঠবেনা, সে তারা মেয়েকে যা ভালো বোঝেন দেবেন। অবশ্য, তোর হাতঘড়িটা যে খারাপ হয়ে গেছে, সে-কথাটা কোনক্রমে

ওঁরা জেনে যাবেনই। আর দুমকাতে গিয়ে নতুন সংসার পাততে হবে—সেজন্য আসবাবপত্র যদি মেয়ের মা মেয়ের জন্য শখ করে কিনে দেন, তাতে কার কী বলার আছে?

—তুই ঠাট্টা করছিস, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়।

—জানি। সকলেই বিদ্রোহী নয়। বিদ্রোহী সাজাও যায়না। মূর্তিমান উগ্র আধুনিক যখন একটি শাড়ি পরানো টাকার পুটলিকে বিয়ে করে, তখন সে বন্ধুদের কাছে কাঁচুমাচুভাবে বলে, কী করব ভাই—মা বুড়ো হয়েছেন, মায়ের ইচ্ছে—। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যেও নয়। মা যদি অবুঝও হন, তবু তোকে দুঃখ দিয়ে ক'জন বিদ্রোহ করতে পারে, জানিনা। আমি তোকে সে-কথা বলছিও না।

—তুই জানিস না, আমি মা-বাবাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তাছাড়া বাড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, কার জন্য? সেরকম মনের মতো মেয়ে পেলাম কোথায়? মনের মতো দূরের কথা, এই তিরিশ বছরের জীবনে একটা মেয়ের সঙ্গে তেমনভাবে আলাপই হল না। অথচ আমি মোটামুটি সুস্থ-স্বাভাবিক ছেলে! তোর যে-সমাজ পণপ্রথা ওঠাতে চায়, জাতিভেদ, কাস্টসিস্টেম ঘোচাতে চায়—সে-সমাজ ছেলেমেয়েদের সহজভাবে মেলামেশা করার সুযোগ দিয়েছে? খুব তো বিদ্রোহ-ফিদ্রোহ বড়-বড় কথা বলছিস! একটা ভিন্নজাতের মেয়েকে বিয়ে করে যে বাড়ির গোঁড়ামি ভাঙব—সেরকম একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল কোথায়? ওসব বড়লোকদের মধ্যে হয়—অথবা কবিটবিদের, আমরা মেশার সুযোগ পেলাম কোথায়? একটা মেয়ের সঙ্গে একটু একা কথা বললেই তো—অমনি সবার ভুরু কুঁচকে উঠল! তাই শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, দূর ছাই!

—তুই যা করছিস তাতে আমি কোনই আপত্তি করিনি। আমি শুধু বলছি ইস্কাবনকে ইস্কাবন বলে ডাকতে। ঠিক করা বিয়ে যখন হচ্ছে, তখন পুরোপুরিই হোক! চল, আমরা মেয়ে দেখতে যাই মেয়েরই বাড়িতে। ফরাসের ওপর বসে লুচি-সন্দেশ সাঁটতে-সাঁটতে পাত্রীকে বলব, একটু হাঁটো তো মা! হারমোনিয়ামে রবীন্দ্রসংগীত শুনি। চুলের গোছায় হাত দিয়ে দেখি মোজা লুকোনো আছে কিনা! ভূদেব মুখুজ্যের লেখা থেকে ডিকটেশান দিয়ে হাতের লেখা দেখব, জিজ্ঞেস করব নেপোলিয়ানের ছোট ছেলের জন্মসাল। কলেজে ডিবেট-করা মেয়ে যখন বাপ-মায়ের কথাতেই বিয়ে করছে, তখন সে এসবও করতে বাধ্য।

সুবিমল আমার দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল আমার মতলব বোঝার জন্য। আমাকে তখন বক্তৃতায় পেয়ে বসেছে। আমি বললাম, 'তুই পণই-বা নিবিনা কেন? তুই ইস্কুলে 'পণপ্রথার কুফল' সম্পর্কে রচনা লিখে ফার্স্ট হয়েছিলি, তাতে কী হয়েছে? যে-ছেলে অসুখের সময় বার্লি খেতে একেবারেই পছন্দ করতনা,

সে যেমন পরে ডাক্তার হয়ে আবার সব ছোট ছেলেকে বার্লি খেতে বলে, কিংবা, প্রবীণ লেখকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে যে-নবীন লেখক—সেই যেমন এক সময় প্রবীণ হয়ে পরবর্তী নবীনদের দুচক্ষে দেখতে পারেনা, কিংবা ট্রেনের কামরায় খুব ভিড়—একজন লোক উঠতে পারছে না —কামরা শুদ্ধু লোক বলছে জায়গা নেই জায়গা নেই—খুব কাকুতি-মিনতি করে উঠে আসার পর—সেই লোকটাই যেমন পরের স্টেশনে লোকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওইরকম আরেকটা লোককে বলে জায়গা নেই, জায়গা নেই—সেই একই যুক্তিতে তুইও ঠিক করছিস।'

বলাই বাহুল্য, সেই রবিবার সুবিমল আমাকে সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, অরুণা রায় নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে সুবিমলের বিয়েও হয়নি। সুবিমল যে তাকে পছন্দ করেনি তা নয়। কিন্তু পাকা দেখার দু-একদিন আগে স্কটিশচার্চ কলেজের একটি ছেলের চিঠি আসে তার কাছে, সুবিমল যদি অরুণাকে বিয়ে করে, তবে সেই ছেলেটি নাকি আত্মহত্যা করবে! ফলে সুবিমল অরুণার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে, আর-একটি ম্যাট্রিক পাশ—কলেজে-না-পড়া মেয়েকে দ্রুত বিয়ে করে ফেলল। সেই বিয়েতে গতকাল আমি চানাচুর, কাটলেট এবং মুগের ডালের সন্দেশের নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম।

১০

সেলুনটাতে বেশ ভিড়, আটটি চেয়ারে আটখানা কাঁচি খচাখচ শব্দ তুলে ব্যস্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরও পাঁচ-ছয়জন মাথার খদ্দের প্রতীক্ষমাণ, আমিও তাদের মধ্যে একজন। সেলুনে চুল কাটার সময়টুকুই তেমন সুন্দর নয়, তার ওপর আবার অপেক্ষা করা—কিন্তু আমি বসেই রইলাম, কারণ আজ যখন ঠিক করে বেরিয়েছি, আজই চুকিয়ে ফেলব ঝামেলা।

ডাক্তারখানার মতন, আজকাল সেলুনেও পত্রপত্রিকা রাখা হয়। খান-কয়েক মেয়েদের ফ্যাশন পত্রিকা ও একটি ইংরেজি সচিত্র সাপ্তাহিক। যতদূর জানি, মেয়েদের চুল-কাটা বা দাড়ি কামাবার দরকার হয় না, এসব সেলুনে তারা কখনো আসবে না, তবু এখানে মেয়েদের ফ্যাশন পত্রিকা রাখার কী মানে হয় জানিনা। আর ঐ ইংরেজি সচিত্র সাপ্তাহিকটিও প্রায় মেয়েদেরই কাগজ। বেশ পুরোনো সংখ্যা, বোধহয় সের দরে কিনেছে।

ঐ পত্রিকাগুলো আমি স্পর্শ করলাম না, দুখানা ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ ছিল, সেই দুটোই আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করতে লাগলাম।

ছেলেবেলায় 'ইটালিয়ান' সেলুনে বসে খবরের কাগজের জামা পড়ে যখন চুল কাটতাম, তখন পরামানিকদের সঙ্গে বেশ মধুর সম্পর্ক ছিল। চুল কাটতে-কাটতে অনেক গল্প হতো, সময়টা এত লম্বা মনে হতোনা। সংস্কৃত সাহিত্যে নরসুন্দর বা পরামানিক বা নাপিতদের খুব ধূর্ত বলা হয়েছে বারবার। অন্তত বাকচতুর। এখনকার সেলুনে অবশ্য সে-পরিচয় পাওয়া যায়না। এখন যাঁরা ঝকঝকে-তকতকে সেলুন খুলে চুল কাটার ব্যাবসা নিয়েছেন, তারা ভদ্র ও গম্ভীর, খদ্দেরদের সঙ্গে শুধু 'ঘাড়টা তুলুন' কিংবা 'জুলপি কি লম্বা হবে স্যার?' এই ধরনের কথা ছাড়া আর কোন কথা হয়না। চুল কাটার সময়টা আজকাল তাই এত বিরক্তিকর।

অবশ্য নিজেদের মধ্যে কথা বলতে কোন বাধা নেই। কাঁচি খচখচ করতে-করতে কিংবা ক্ষুর ঘ্যাসঘ্যাস করতে-করতে একজন আর-একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারে, 'যদুদা, আজ তোমার ক'টা মাথা হল? আমার তো আজ শুধু ক্ষুরের কাজ, কেইচি ধরতেই পারলামনা' ইত্যাদি।

সেলুনের একজন কর্মচারীর বয়েস পনেরো-ষোলো। সে এখনও পুরোপুরি নরসুন্দর হয়ে ওঠেনি। সে ব্রাশে সাবান মাখিয়ে দেয়, ক্ষুর সাফ করে, কাটা চুল পরিষ্কার করে। অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট। তাকে তাব একজন সিনিয়ার কোলিগ জিজ্ঞেস করল, 'এই হরেন্দর আজ তোর দুপুরেও ডিউটি, খেয়ে এসেছিস তো?'

ক্লিপ থেকে ফুঁ দিয়ে চুল বার করতে-করতে হরেন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ। রোজই তো আমার ন'টার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়।'

—রোজ ন'টায় খাস? আর রাত্তিরে খাস কখন?

—ন'টা-দশটায়!

—দুপুরে কিংবা বিকেলে খিদে পায়না?

—চা খাই যে? চা খেলে আর খিদে পায়না।

—কে রান্না করে?

—বাবা।

—বাবা কেন? মা করেনা?

—মা কাজ করতে যায়—

কথাবার্তাগুলো একঘেয়ে ধরনের। অর্থাৎ কথার জন্যই কথা বলা। যে জিজ্ঞেস করছে এবং যে উত্তর দিচ্ছে, কারুরই বিশেষ মন নেই। কিন্তু আমাকে শুনতে হবেই, মানুষের কান তো আর বন্ধ করা যায়না।

—আজ কী খেয়েছিস?

—আলুসেদ্ধ আর ভাত।

—আর?

—কাঁচালঙ্কা।

—ডাল ছিলনা? মাখলি কী দিয়ে?

—ফ্যানাভাত তো, মাখব আবার কী?

হঠাৎ আমার একটু হাসি পেল, অকারণেই বলা যায়। হাসি লুকোবার জন্য আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখটা ফেরালাম। এক্ষুনি ইংরেজি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পড়ছিলাম। 'A course in Mughlai dishes for house-wives. Fee rupees 75/ contact Mrs...'

মিসেস অমুক গৃহস্থ বধূদের মোগলাই রান্না শেখাবেন পঁচাত্তর টাকা ফি নিয়ে। আমি ভাবতে লাগলাম, মোগলাই রান্না শেখানো হবে কী পদ্ধতিতে? রেডিওতে রান্না শেখাবার মতন, এবার মাখন দিয়ে মাংসগুলো ভাজুন, চাকাচাকা করে পেঁয়াজ কেটে আদার রসে ভিজিয়ে... একজন এরকম বলে যাবে আর গিন্নীরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনবে? নাকি সত্যি-সত্যি মাছ-মাংস—পোলাউয়ের চাল—ঘি-গরমমশলা এসব এনে হাতে-কলমে শেখানো হবে? কে আনবে সেগুলো, ছাত্রীরাই? নাকি মাস্টারনীই সেগুলো সরবরাহ করবেন! মাত্র পঁচাত্তর টাকা ফি-তে কি অতসব হয়? রান্না হয়ে গেলে কি নিজেরাই সেখানে বসে খাবে, না বাড়িতে নিয়ে যাবে? খাঁটি মোগলাই রান্নায় তো শুনেছি আসল জাফরান, মুক্তাভস্ম, একবারও ডিম পাড়েনি এমন মুর্গির মাংসটাংস লাগে, সেসব জোগাড় হবে কোথা থেকে?

হরেন্দ্র ছেলেটির স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ নয়, বেশ গড়াপেটা। কালো রং, কিন্তু তেলচকচকে। মুখখানা হাসিখুশি। আজকাল খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে অনেকেই খুব ভাবে। কারবোহাইড্রেট, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন—এসব মিলিয়ে একটা ব্যালানসড ডায়েট খাওয়া দরকার। আর হরেন্দ্র খাচ্ছে ফেনাভাত আর আলু—দুটোই তো স্টার্চ না কারবোহাইড্রেট কী যেন, প্রোটিন-ফ্রোটিনের নামগন্ধ নেই—কিন্তু ওর তো দিব্যি স্বাস্থ্য। বিজ্ঞানের অনেককথাই স্রেফ গাজাখুরি!

কথাবার্তা আরও অনেকদূর গড়িয়েছে। হরেন্দ্র চটপট করে কাজ সারছে আর কথার জবাব দিচ্ছে।

—তোরা এখনও সেই ঘরেই আছিস? কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছিলনা?

—ওখানে আর নেই। ও লোকটা বড্ড হারামি! (হারামি শব্দটা হরেন্দ্র উচ্চারণ করল অম্লান মুখে, গালাগাল বলে মনেই হলনা।) রোজ খিটিমিটি-খিটিমিটি—এখন আমরা রেললাইনের ওধারে বস্তিতে একটা ঘর নিয়েছি।

—কত ভাড়া?

—সতেরো—

—সতেরো? আগেরটা পনেরো ছিলনা? এই বাজারে দুটাকা খরচ বাড়ালি?

আবার আমার হাসি পেল। চোখের সামনেই ইংরেজি কাগজে আর-একটি বিজ্ঞাপন,

A luxurious western style ground-floor flat, three bed-rooms with attached bath-rooms, dining and launge space—rent Rs. 1,800/-.

এইসব ভালো-ভালো বিজ্ঞাপন দেখলে শুধু হাসি পায়না, সিটি দিতে ইচ্ছে করে। তিনখানা শয়নকক্ষের ভাড়া আঠারোশো টাকা! অফিসটফিস নয়, মনুষ্যবাসের জন্যই, কেননা, স্পষ্ট লেখা আছে 'বেডরুমস'। এই এক ধাঁধা। কাগজে এরকম বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখি। আঠারোশো টাকা দিয়ে যে-লোক ফ্ল্যাট ভাড়া নেবে, তার রোজগার কত? সে নিজেই একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলে-না কেন?

ইচ্ছে হল, ফ্ল্যাটটা একদিন দেখে আসব। ভাড়া নিই-না-নিই, দেখতে দেবে নিশ্চয়ই। দেখতে চাই, ঐ ফ্ল্যাটের মেঝেগুলো সোনারুপো দিয়ে তৈরি কিনা! এর আগে তিন হাজার টাকা ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল, সেই ফ্ল্যাটটা না-দেখে খুব মিস করেছি! 'ওয়েস্টার্ন স্টাইল'—সেটাও কী ব্যাপার দেখে আসা মন্দ কী?

গ্রাউন্ডফ্লোর ফ্ল্যাট যখন বলেছে, তখন বাড়িটার নিশ্চয়ই আরও দু-তিনটি তলা আছে। দোতলা-তিনতলার ফ্ল্যাটগুলোও কি ঐরকম, না আরও বেশি ভাড়া? যদি তিনখানা ফ্ল্যাট থাকে, তাহলে বাড়ির মালিকের আয় মাসে চুয়ান্নশো টাকা। আর ঐরকম বাড়ি যার, সে কি শুধু একটাই বাড়ি বানিয়েছে? যাকগে, ওসব বড়-বড় ভাবনা।

বাংলা কাগজে পড়লাম, কোথায় যেন একজন জোতদারকে খুন করা হয়েছে গতকাল। দেশটা প্রায় নাগাল্যান্ড হয়ে উঠল। দুশো বিঘে জমি বেআইনিভাবে দখলে রেখেছিল নাকি জোতদারটি। দুশো বিঘে জমি থেকে বছরে কত আয় হয়, আমি জানিনা। তবে জোতদারটিকে খুব বুদ্ধিমান বলা যায়না। ঐসব জমিজমা বিক্রি করে কলকাতায় একখানা এই বিজ্ঞাপনের মতন 'ওয়েস্টার্ন স্টাইল' ফ্ল্যাটবাড়ি হাঁকিয়ে বসলেই পারত! অবশ্য দুশো বিঘে জমি বেচে কলকাতায় ছোটখাটো বাড়িও হতো কিনা জানিনা।

চুল কেটে বেরুতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেল। একটা জায়গায় আমার খুব জরুরি যাওয়ার দরকার ছিল। ট্রামে-বাসে দারুণ ভিড়, তার ওপর এইরকম গরম। ধৈর্য রাখা গেলনা, ঝট করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফেললাম। পনেরো পয়সায় যেখানে যাওয়া চলত, সেখান চারটাকা খরচ হয়ে গেল। মনে পড়ল, মাসে দুটাকা

ঘর ভাড়া বেড়েছে বলে হরেন্দ্র ও তার সহকর্মী পনেরো মিনিট ধরে আফসোস করেছে। একটু খচমচ করল ভেতরটা, মনে হল, আমিও অপরাধী।

১১

কথার মাঝখানে যদি হঠাৎ টিকটিকি ডেকে ওঠে টিকটিক করে, তাহলে নাকি সে-কথাটা নির্ঘাৎ সত্যি হয়, ঠিক-ঠিক ফলে যায়। এই সংস্কারের মধ্যে যদি কিছুটাও সত্যি থাকে, তবে বলতে হবে, আমাদের বাড়িব সকলেই পরম সত্যবাদী। সকলেই প্রবক্তা। কারণ, আমাদের বাড়িতে যে-কোন কথার মধ্যেই অনবরত টিকটিকি ডেকে উঠছে টিকটিক-টিকটিক করে।

এত টিকটিকি কোথা থেকে এল কে জানে। যখনই তাকাই, দেখি দেওয়ালের কড়িকাঠে অন্তত পাঁচ-ছটা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ঠাণ্ডা চোখ মেলে যে কে কোনদিকে তাকিয়ে আছে, বোঝার উপায় নেই।

টিকটিকির মতো এমন রহস্যময় জীব আমি দেখিনি। আজকাল টিকটিকির ভাবনায় আমার বহু সময় কেটে যাচ্ছে। হুবহু কুমিরের মতো দেখতে, কিন্তু কুমিরের চেয়ে অনেক উঁচুজাতের জীব এরা। যেমন বিড়ালকে যদিও বাঘের মতোই দেখতে, কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, বিড়াল বাঘের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান জীব। প্রথমত এরা মানুষের সংস্পর্শে থাকে। যাইহোক, টিকটিকি বিষয়ে দুটো সমস্যার কোন মীমাংসা আমি আজ পর্যন্ত করতে পারিনি। কারণ ওদের শরীরে কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করেনা? খাড়া দেওয়ালে ওরা থাকে কী করে? যতই ছোট হোক, ওদেরও শরীরের তো ওজন আছে? এর উত্তরে আমার এক বন্ধু বললেন, ওদের চারহাতে (অথবা চারটেই পা) নাকি এক ধরনের আঠা মাখানো থাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হলনা। আঠা লাগানো থাকলে দেয়ালের গায় আটকে থাকতে পারে ঠিকই কিন্তু ছোটে কী করে? শুধু দেয়াল বেয়ে নয়, দেয়ালটা তবু মানা যায় —আমরা যেমন তালগাছে উঠি, কিন্তু ঘরের সিলিং-এ শরীরটা সম্পূর্ণ উল্টো করে কী করে ছোটে? আর কী বিদ্যুৎবেগে ছোটা, ঘন্টার পর ঘন্টা টিকটিকি যেমন চুপ করে পড়ে থাকে—সেই রকম ছুটতেও পারে প্রচণ্ড জোরে, গতিতে তখন হরিণকেও হার মানায়।

দ্বিতীয় সমস্যা টিকটিকিরা আসে কোথা থেকে? একথা কেউ ভেবে দেখেছেন? প্রত্যেকেরই বাড়িতে টিকটিকি আছে, টিকটিকি ছাড়া বাড়ি হয়না। কিন্তু একটা নতুন বাড়িতে কী করে আসে প্রথম টিকটিকিটা? পাশের বাড়ি থেকে?

কিন্তু মাঠের মধ্যে একটা নতুন বাড়ি হল, কয়েকদিন পরেই সেখানে টিকটিকি দেখতে পাওয়া যাবে। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই—তবু টিকটিকি আছে। ছারপোকা বা আরশোলার মতন তো ওরা মানুষের জামাকাপড় বা বাক্সে ভরে আসেনা, তবে কী করে আসে? এসপ্লানেডে যখন নতুন ল্যাট্রিন তৈরি হল, কয়েকদিন পরই সেখানে আমি টিকটিকি দেখেছি। বিস্ময়ে আমি কূলকিনারা পাইনি, আশেপাশের দুরন্ত গাড়িঘোড়ার রাস্তাঘাট পেরিয়ে টিকটিকিরা কি নিজে-নিজেই এসেছে এখানে? কতদূর থেকে ওরা দেখতে পায়? দূরের কোন বাড়ি বা হোটেল থেকে—একদিন নতুন বাড়ি ওঠার খবর পেয়ে, একটা টিকটিকি—না, একটা হলে বংশবৃদ্ধি হয়না, সুতরাং দুটো টিকটিকি একদিন যাত্রা করল। পথ দিয়ে বুকে হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে, —ওখানকার রাস্তা দিয়ে সবসময় গাড়ি যাচ্ছে, সুতরাং অপেক্ষা করে-করে ট্রাফিক লাইট দেখে—লোকের জুতো বাঁচিয়ে একজোড়া টিকটিকি এসে পৌঁছয় নতুন বাড়িতে? ভাবতেও আমার ভয় হয়!

যাইহোক, আমি আমার নিজের ঘরের টিকটিকিগুলোকে নিয়েই বিষম বিব্রত। ওরা আমার ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আমার ঘরে টিকটিকি আছে ছটা, অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা ছটি। এছাড়া দু-একটা আগন্তুক আসে মাঝে-মাঝে—এবং বিতাড়িত হয়ে যায়। রান্নাঘরের বা বাথরুমের টিকটিকি হয় কালচে রঙের বা ডোরাকাটা, শোবার ঘরের টিকটিকিরা ফর্সা, ছিমছাম সুতরাং অন্য টিকটিকি এলে আমি নিজেও চিনতে পারি। আমার ঘরের টিকটিকিগুলোকে আমি আলাদা করে চিনি—একথা বললে হয়তো অবিশ্বাস্য শোনাবে। চার্লি চ্যাপলিন মশা ও মাছিদের আলাদা করে চিনতে পারেন, ওঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'দিস ইজ নট ফিলিস,' কে না জানেন! আমার সে-ক্ষমতা নেই যদিও কিন্তু আমার টিকটিকিগুলোকে রোজ দেখতে-দেখতে এখন আমি ওদের সত্যিই চিনে গেছি। ওদের আলাদা নামও দিয়েছি। এই ছটার মধ্যে পাঁচটা প্রায় একই সাইজের আর-একটা বিশাল বড়। সেটার সাইজ গিরগিটির মতো —কিন্তু দেখলে কুমির ছাড়া আর কিছুই মনে পড়েনা—সারা গায়ে এবং ল্যাজে খাঁজ কাটা, বিকট ড্যাবডেবে চোখ মেলে যখন তাকায়, তখন আমারও বুক শিউরে ওঠে। কিন্তু যতদূর জানি, টিকটিকি কখনও মানুষকে কামড়ায়নি, ঘুমের ঘোরেও না! সুতরাং ভয় কাটিয়ে উঠি। কিন্তু প্রায়ই মনে হয় ওটা যখন আমার দিকে চেয়ে থাকে, তখন বোধহয় মনে-মনে ভাবে—ইস, আমার হাঁটা যদি আর-একটু বড় হতো তখন ঐ শুয়ে-থাকা নিরীহ, নরম চেহারার লোকটাকে কপ করে একেবারে গিলে ফেলতে পারতাম! —আমি ঐ বড়টার নাম দিয়েছি মাফিয়া। মাফিয়ার তাক অব্যর্থ। কখনও শিকার ফসকায়না, যতবড় পোকাই হোক—খপ করে এসে ধরবে।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা বাগান আছে। সেইজন্য অনেক পোকা ও পতঙ্গ আসে ঘরের মধ্যে। সবগুলিই নিরীহ পোকা—কী সুন্দর রং-বেরং প্রজাপতি ও মথ বা ফড়িং। সেগুলো নিয়ন আলোর রডের পাশে এসে বসে। আর টিকটিকির শিকার হয়। পাঁচটা সমান সাইজের টিকটিকি—আমি ওদের নাম দিয়েছি, কোনরকম যুক্তি না-ভেবে সজারু, মুসোলিনি, কিলফিল আর খাইবার। পঞ্চমটার নাম আর মনেই পড়েনা, তখন ওর নাম দিলাম তিন নম্বর। কেন এক নম্বর বা পাঁচ নম্বর নয়, তা ঠিক বলতে পারবনা —তিননম্বরই মনে পড়ল। ঐ তিননম্বরটাই পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে দুরন্ত ও দুঃসাহসী। অন্যগুলো যখন দূরে একটা পোকা দেখে হিশেব করে, আস্তে-আস্তে এগোয়—তিননম্বরটা তখন সোজা ছুটে আসে, খপ করে চেপে ধরে। এই স্বভাবের জন্য, ও অনেক পোকা ধরতে পারে না, উড়িয়ে দেয়, আবার যখন ধরে, খুব তাড়াতাড়ি, অন্যগুলোর মতো একঘন্টায় একটা নয়।

কিন্তু এইসব দেখতে-দেখতে আমার চোখ খারাপ হবার উপক্রম। রাত্রিবেলা শোবার পর যেই একবার চোখ পড়ে আলোর দিকে, আর চোখ সরতে চায়না, সেখানে তখন একটা ছোট্ট ফড়িংকে তাক করে আছে মুসোলিনি,—সুতরাং শেষ পর্যন্ত ধরতে পারে কিনা না-দেখে চোখ ফেবাতে পাবিনা, তখন টিকটিকির ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিতে হয়—ফড়িংটার ঠিক এক বিঘৎ দূরে মড়ার মতো পড়ে আছে টিকটিকিটা—কী যে ওর মতলব, কেনই বা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছেনা—কিছুই বোঝার উপায় নেই। সেই অবসরে আমি একটু চোখ ঘোরাতেই দেখি মাফিয়া হিংস্রভাবে গুটি-গুটি এগুচ্ছে একটা সবুজ মথের দিকে। সুতরাং আর চোখ ফেরানো যায়না। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়। আর ওরা সবগুলোই নিয়ন আলোর কাছাকাছি থাকে বলে—আমাকে ঐ উজ্জ্বল আলোব দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়, সুতরাং বুঝতে পারছি নিজের চোখেব ক্ষতি করছি। টিকটিকির চোখের কিন্তু অত চড়া আলোতেও কিছুই ক্ষতি হয়না।

ক্রমশ আমার এটা নেশার মতো হয়ে যায়। রাতের পর রাত আমি টিকটিকির পোকা ধরা দেখি। শুনেছি ডারউইন সাহেব ২৪ ঘন্টা একটা ফুলের কলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন —একটা ফুল আস্তে-আস্তে কীভাবে ফোটে দেখার জন্য। টিকটিকির শিকার ধরার দৃশ্যের মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই, একটা নিষ্ঠুর পাশবিকতা শুধু, তবু তাই দেখতে আমার নেশা ধরে যায়। টিকটিকিদের স্বভাব সম্পর্কে আমি অনেককিছু আবিষ্কার করে ফেলি। তার মধ্যে প্রধান হল, কোন টিকটিকি—অন্য টিকটিকিকে সহ্য করতে পারেনা। কাছাকাছি এলেই একজন আরেকজনকে তাড়া করে যায়। আমরা ছেলেবেলায় দেখতাম, টিকটিকি ধরতে গেলেই টিকটিকির

ল্যাজ খসে যেত, ল্যাজটা ফেলে আসল টিকটিকিটা পালাত। আর সেই কাটা ল্যাজটাও জীবন্তের মতো নড়াচড়া করত। কিন্তু এখন দেখছি একটা টিকটিকি আর-একটার ল্যাজ সুযোগ পেলেই কামড়ে ধরে। তখন কিন্তু সেটার ল্যাজ খসে যায়না। তখন মুখ ফিরিয়ে অন্যটাকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করে। একটা পোকার কাছাকাছি গিয়েও যে একটা টিকটিকি অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকে —সেটা কিন্তু শুধু উদাসীনতা বা প্রতীক্ষা নয়। আসলে তখন সে একচোখে দেখে পোকাটাকে, আর-এক চোখে দেখে দূরের আরেকটা টিকটিকিকে—একইসঙ্গে খাদ্য আহরণ ও আত্মরক্ষা—দুটোই চলতে থাকে। আরও বহু রহস্যময় স্বভাব আছে। একটা হয়তো আরেকটাকে তাড়া করে গেল, খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎ কেন সে যে ভয় পেয়ে ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে কে জানে? কোনটা হয়তো তাড়া করে যায় ঘরের শেষ পর্যন্ত, কোনটা হয়তো একটু দূর দিয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার একঘন্টা চুপচাপ। কার যে গায়ের জোর বেশি—তারও বোঝার উপায় নেই—এই একবার সজারু তাড়া করছে কিলফিলকে—সে ভয়ে পালাচ্ছে, আবার একটু পরেই কিলফিল তাড়া করছে সজারুকে—তখন ওর কী ভয়! তাড়া করার সময় ডাক হয় অন্যরকম, খিস-খিস খিস-খিস। আবার কেনই যে হঠাৎ একা-একা বুক ফুলিয়ে টিকটিক-টিকটিক করে—তারও কোন মানে পাওয়া যায়না।

সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগে, যখন কোন পোকা থাকেনা। অথচ ওদের পোকা ধরা দেখতে-দেখতে আমার নেশা লেগে গেছে। ঘুম আসছে না। তখন ইচ্ছে করে কোন জায়গা থেকে পোকা ধরে এনে ওদের সামনে ফেলে দিই। একদিন আমি এরকম করেছিলাম।

আমার বালিশের পাশে এসে বসল একটা মথ। বেশ বড়। দেখেই মনে হল আহা বড় সরল এই মথ বেচারা, জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমার মাথার এত পাশে এসে বসেছে, কোন ভয়-ডর নেই, ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলেই তো ওটা চাপা পড়ে মরবে। বেগুনে রঙের নরম তুলোট চেহারা, বোধহয় রাত্রে দেখতে পায় না—কেননা আমি এত কাছ থেকে ওকে দেখছিলাম, কোন ভয় পায়নি। তখন আমার মনে হল —এটা টিকটিকির সামনে পড়লে কী হয় দেখা যাক-না। ওদের সাধ্য নেই, এতবড় মথটাকে মারতে পারবে। একমাত্র মাফিয়ার কথা বলা যায়না, কিন্তু দেখলাম সেটা দেয়ালে নেই, বোধহয় ঘুলঘুলিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি মথটাকে আঙুল দিয়ে ঠেলে উঠিয়ে দিলাম। সেটা গিয়ে বসল উল্টোদিকের দেয়ালে। তখন আমি বিছানা থেকে উঠে আবার ওটাকে তাড়া দিলাম। তখন ওটা অন্ধের মতো কয়েক পাক ঘুরে এসে বসল আলোর কাছে! এমন ট্যালা, বসল প্রায় একটা টিকটিকির ঘাড়ের ওপর! সেটা তাড়াতাড়ি অমনি

ভয়ে সরে গেল!

তখন মথটা বিশাল ডানা মেলে ওখানে বসে—আর পাঁচদিকে পাঁচটা রকেটের মতো পাঁচটা টিকটিকি। কারুর সাধ্য নেই ওটার সামনে এগোয় অথচ তাকিয়ে আছে লোভীর মতো। আমার মজা লাগতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেখি সেই দুর্দান্ত তিন নম্বরটা এগিয়ে এল। দাঁড়াল একেবারে মথটার মুখোমুখি। মথটা তবুও ওড়েনা। তিন নম্বরটা খ্যাক করে কামড়ে ধরল মথটার মাথা। আরম্ভ হল ডানা ঝটাপটি। আমি অবাক হয়ে দেখছি। তারপর দেখলাম আস্তে-আস্তে ফুলের পাপড়ির মতো মথটার দুটো বেগুনি ডানা খসিয়ে দিয়ে গিলছে তিননম্বর। অবিলম্বে শেষ হয়ে গেল।

সেইসময় বিষম অনুতাপ হল আমার। ছি, ছি, আমিই তো মথটার হত্যাকারী। একটু আগে উড়ে বেড়াচ্ছিল, টিকটিকিগুলোর ওপর জিঘাংসা জেগে উঠল আমার। কুৎসিত জীবগুলো কোন কাজে লাগেনা—মশা-মাছি-আরশোলা খায়না—শুধু সুন্দর সুন্দর মথ-প্রজাপতি ধ্বংস করে। এগুলো থেকে লাভ কী! আমি একটা ফুলঝাড়ু নিয়ে দেয়ালে-দেয়ালে টিকটিকিগুলো পেটাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা বিষম চালাক। আমার নাগাল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দেখে—আমি অনবরত ঝাঁটা চালিয়ে একটাকেও মারতে না-পেরে নিবৃত্ত হলাম শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ দেখি, আমাব পায়ের কাছে একটা টিকটিকি। আরে, এ যে দেখি তিননম্বর। কী, আমাকেও কামড়াতে এসেছে নাকি? দেখি, নড়ে-চড়েনা। ঝাঁটা দিয়ে খোঁচা দিলাম, তবু নড়েনা। মরে গেছে! কোনবার হয়তো ওর গায়ে ফুলঝাড়ুর ঘা লেগেছিল। এত সহজে ওরা মরে যায়? কখন লেগেছে বুঝতেও পারিনি। যাক ভালোই হয়েছে, আসল আসামী মরেছে। আমি ওটার ওপর এক ঘা ঝাঁটা কষিয়ে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা ওসব ভুলে গেছি। চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ায় ডুবে গেছি। হঠাৎ মেঝেতে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। অসংখ্য পিঁপড়ে একটা টিকটিকির মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল আগের রাত্রের কথা। এই সেই তিননম্বর সেই দুর্দান্ত তিননম্বর, বিদ্যুতের মতো যার গতি, অতবড় মথটাকেও আক্রমণ করতে ভয় পায়নি—আজ সামান্য পিঁপড়েরা ওকে চিৎ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাল মথটার জন্য আমার দুঃখ হয়েছিল, আজ তিননম্বরের জন্যও আমার দুঃখ হল। খুবই দুঃখ, আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সকালবেলা আমি একটা টিকটিকির দুঃখে কাঁদছি—মা এটা দেখতে পেলে আমাকে পাগল মনে করবেন ভেবে—আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিলাম। ওটাকে আমার মারা উচিত

হয়নি। জীবজগতের ব্যাপার, আহার্যের জন্য একজন আর-একজনকে মারবে। কিন্তু আমি এতবড় প্রাণী হয়ে ঐটুকু প্রাণীকে কেন মারতে গেলাম! দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি, অন্য টিকটিকিগুলো দেয়ালের নানা কোণে লুকিয়ে থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, কেন, কেন, কেন তুমি ওকে মারলে? কেন?

১২

সেইদিন আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম, বাংলা সাহিত্যে সতীদাহের পরের অধ্যায় প্রায় কিছুই লেখা হয়নি।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক বুড়ি ভিক্ষের জন্য অনেকক্ষণ ধরে আমার কাছে পেড়াপিড়ি করছিল। আমি তাকে বারবার প্রত্যাখ্যান করতে-করতে রূঢ় হয়ে উঠছিলাম। কোথায় সিগারেট টানতে-টানতে গঙ্গার প্রথাগত সৌন্দর্য দেখব, তা নয় চোখের সামনে এক গলিত চেহারার বুড়ি। তাছাড়া ক্রমশ বিরক্ত ও রূঢ় হয়ে উঠছিলাম, অন্য একটি কারণে। আমার পকেটে কোন ছোট খুচরো ছিলনা, ছিল সিকি-আধুলি। ভিখিরি-টিখিরিদের মাঝে-মাঝে দু-চারটে পয়সা দিতে না-পারার মতো কৃপণ আমি নই, আবার টপ করে একটা সিকি দিয়ে দেবার মতো উদারও হতে পারিনা। আসলে এই বুড়িকে কিছু দেবার জন্যই পকেটে হাত দিয়েছিলাম, তারপর সিকির কম কিছু না-পেয়ে, আবার ওকে না-দেওয়া মনস্থ করেই ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু বুড়িটার একঘেয়ে নাকেকান্না থামেনা, সুতরাং আমি স্থানত্যাগ করার উপক্রম করছি, তখন হঠাৎ সে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'কালু না? ও কালু, চেয়ে দ্যাখ, আমায় চিনতে পারিসনা?'

বলাই বাহুল্য, আমার নাম কালু নয় এবং ঐ অশীতিপর বৃদ্ধাকে চিনতে পারার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু সে ততক্ষণে আমার হাত চেপে ধরেছে—ঠাণ্ডা, শিরা-ওঠা হাতের কেমন যেন হিলহিলে স্পর্শ। আমার শরীর শিউরে উঠলেও, আমি তৎক্ষণাৎ জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা না-করে সংযত-শান্ত গলায় বললাম, 'তোমার ভুল হচ্ছে বুড়ি, আমার নাম কালু নয়।'

—আমার ভুল হয়না। একেবারে কালুর মুখখানা বসানো। সেই ডাগর-ডাগর চোখ, কেষ্টপানা চুল—আমি কালুকে চিনিনা? তুই আমাকে চিনতে পারলিনা কালু?

—সত্যিই আমি কালু নই!

—বাড়ি কোথায়? ফরিদপুর না? মাইজপাড়ার দক্ষিণবাড়ির কালু না তুই?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাকি কথাগুলো সব সত্যি। পূর্ববঙ্গে ওখানেই

আমাদের বাড়ি ছিল—সে কতদিন আগে, আঠেরো বছর আর দেখিনি। খেজুর গাছ থেকে রস চুরি করতে গিয়ে মাঝরাত্রে পুকুরের মধ্যে পড়ে গেছি আমি —মনে পড়ল সেই বাল্যকাল। কিন্তু সেখানে কালু কে ছিল? আমার ও-নামের কোন শৈশবসাথীর কথাও মনে পড়েনা। সব বৃদ্ধাকেই প্রায় একরকম দেখতে —তবু, এই বুড়ির কোঁকড়ানো মুখেব দিকে তন্নতন্ন কবে তাকিয়েও আমি একে কখনো দেখেছি, কিছুতেই মনে হলনা।

তারপর আব-একটা কথা মনে পড়তেই আমাব মাথাব মধ্যে ঝনঝন করতে লাগল। জীবনানন্দের কবিতায় যেমন হঠাৎ ভয়াবহভাবে জলে পড়ে যাবার কথা আছে, আমিও যেন এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই অকস্মাৎ খেজুর গাছ থেকে পুকুরে পড়ে যাব।

কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি, ইনি কার কথা বলছেন। আমার বাবার ডাক নাম ছিল কালু। আমার চোখ ডাগর-ডাগর তো দূরের কথা—বরং মেয়েরা বলে হাতির চোখের মতন—দেখা যায় কী যায় না—কিন্তু সে যাই হোক—আমার সঙ্গে আমার বাবার চেহারার কোন সাদৃশ্য আমি কখনও দেখিনি, স্মরণকাল থেকেই আমি তাঁকে দেখেছি চকচকে টাকমাথার এক ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক। সুতরাং, আমার বাবার সঙ্গে যদি কোনকালে আমার চেহারার কোনরকম মিল থেকেই থাকে —সে নিশ্চয়ই অনেককাল আগের কথা, আমার জন্মেরও বহু আগে, অন্তত চল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমার বাবার মৃত্যুই হয়েছে অনেকদিন।

আমি চকিতে কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রম এনে বললাম, 'আপনি কি আমার বাবার কথা বলছেন? আমার বাবার ভালো নাম ছিল এই...।'

বৃদ্ধা এক গাল হেসে বললেন, 'তুই কালুর ছেলে? পেন্নাম কব, পেন্নাম কব—আমি তোর সম্পর্কে ঠাকুমা হই। দূর সম্পর্কের না, আমাব মরার খবর শুনলে তোদের তিনরাত্তির অশৌচ হবে। আমার কথা শুনিস্‌নি তুই? আমি হলাম গে চিন্তামণি, লোকে বলত চিন্তে ঠাকরুন, তোর বাবার আপন কাকিমা হই। হা কপাল, আমি কালুর বিয়ের খবরই শুনিনি, আজ তার কতবড জোয়ানমদ্দ ছেলে। কেমন আছে রে কালু?'

—তিনি মারা গেছেন।

সেই ভিখারিণী, অর্থাৎ আমার ঠাকুমা খুব চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সবাই মরে, শুধু চিন্তে বামনিই মরেনা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এখানে কতদিন আছেন?'

—কী জানি বাবা, সেসব কি আমার মনে আছে। সেই যে-বছর প্রথম যুদ্ধ বাধল—

কথাটা আমার পক্ষে হজম করা শক্ত। সে তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর আর যাননি?'

—নাঃ! লোকে যেমন বেড়াল পার করে, তেমনি আমার ছোট দেওর ভবানী আমাকে কাশীতে পার করে দিয়ে গেল। তা বাবা বিশ্বনাথ আমাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন —ভবানীকে তুই চিনিস?

না, আমি চিনিনা। আমরা কুলীনের বংশ—আমার বাবার সময় থেকে সবাই মডার্ন হওয়া শুরু করেছে, কিন্তু আমার ঠাকুর্দারই ছিল মাত্র চারটি বউ। তাঁরও বাবা-কাকাদের ক'টা করে বউ ছিল—সেসব কথা ইতিহাসে আছে, আমি জানিনা। সারা বিশ্বে আমার কতজন অসাক্ষাৎ কাকা-জ্যাঠা ছড়িয়ে আছে, আমার পক্ষে জানা সম্ভবও নয়।

যাইহোক, আমার চিন্তামণি ঠাকুমার সঙ্গে আমি কাশীতে তাঁর বাড়িও গিয়েছিলাম। সেটাকে বাড়ি বলা যায়না, মণিকর্ণিকা ঘাটের পিছনদিকে একটা বাড়ির একতলায়—কাশীতে যেসব বাড়ির একতলা অব্যবহার্য—ঠাণ্ডা ও অন্ধকারে ষাঁড় ও কুকুরের রাত্রি-নিবাস, সেইখানে তিনি থাকেন। কী করে বা কী সাধে যে এতদিন বেঁচে আছেন—জানিনা। ওঁর মুখ থেকে সেকালের কিছু গল্প শুনলাম —সেইসঙ্গে ওঁর জীবনের ইতিহাস। আমি এখনও সেসব কথা বিস্তৃতভাবে লেখার যোগ্য হয়ে উঠিনি। আমার মন অস্থির, আমি 'আধুনিকতা' নামের এক দুঃস্বপ্নে ডুবে আছি। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করে খুবই মহৎ কাজ করেছিলেন নিশ্চিত। কিন্তু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য—পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে, বাংলাদেশের গ্রাম থেকে একটি যুবতী বিধবাকে—বিয়ে হয়েছিল মাত্র ছ'বছর আগে—স্বামী সন্দর্শন হয়েছে মাত্র চারদিন--সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে —একা নির্বান্ধব অবস্থায় রেখে গিয়েছিল কাশীতে। বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল এই, যুবতী বিধবা গ্রামে থেকে কখন কীভাবে বংশের নামে কালি দেয় কে জানে —তার চেয়ে দূর বিদেশে যা ইচ্ছে হোক। নির্বাসনে পাঠাবার আগে আমারই মামাতো-খুড়তুতো ঠাকুর্দারা এঁর গা থেকে শেষ টুকরো সোনার গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। আমি একজন নবীন যুবা, ওল্টানো চুল, প্যান্টালুন ও টেরিলিনের শার্ট পরে, সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে গঙ্গার বিখ্যাত সৌন্দর্য দেখায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যে-কুচ্ছিৎ চেহারার বুড়ি ভিখিরিকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, তিনি আমারই রক্ত-সম্পর্কের ঠাকুমা।

তিনি কিন্তু কাশীতে আসার পর থেকেই ভিখারিণী হননি। আমারই কোন এক পিসতুতো ঠাকুর্দা না কী যেন, যাঁর নাম ছিল তারিণীশঙ্কর—তিনি ছিলেন

মহানুভব—প্রথম পনেরো বছর নিয়মিত প্রতিমাসে চিন্তামণি ঠাকুমাকে সাতটাকা করে মনি অর্ডারে পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেক মাসে, কখনো ভুল হয়নি। তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে হরগোবিন্দও কয়েক মাস পাঠিয়েছিল। একবার চিন্তামণি ঠাকুমা এখানকারই একজন লোককে ধরে-করে হরগোবিন্দকে একটা চিঠি লেখান —তাতে লিখেছিলেন, বাবা হরগোবিন্দ, আজকাল তৈজসপত্রের দর আগুন, তুমি আমাকে এখন থেকে যদি দশটা টাকা পাঠাও, বড় ভালো হয়। অত না পারো, অন্তত ন'টা টাকা পাঠিয়ো। আমি চিরকাল তোমার ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করব। এই চিঠি পেয়ে হরগোবিন্দর কী মতিভ্রম হয় কে জানে—সে হঠাৎ টাকা পাঠানোই বন্ধ করে দেয়! এরপর আরও তিনখানা চিঠি লিখেও উত্তর বা টাকা আসেনি। তখন চিন্তামণি ঠাকুরুনের বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে—তখন আর অন্যপথে যাবারও উপায় নেই, সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি। 'হরগোবিন্দ কি বেঁচে আছে?' —তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

পৃথিবীর কোথায় কোন হরগোবিন্দ বেঁচে আছে কি মরে গেছে—তার আমি কী জানি! আমি চুপ করে রইলাম। নিজের কথা শেষ হবার পর তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমাদের কুলীন বংশের নানা শাখা-প্রশাখা ধরে এর-ওর কথা। আমি যে-কজন সম্পর্কে জানি বলতে লাগলাম। অর্ধ শতাব্দী আগে যে জায়গা ছেড়ে চলে এসেছেন, পাকিস্তান হয়ে যেসব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সে-খবরও রাখেননা—যেসব আত্মীয়স্বজন ওঁকে চরম অবহেলা করেছে,—তাদের সম্পর্কে ওঁর কতখানি ব্যগ্রতা! ঠাকুমার দেওয়া বাতাসা ও কলার টুকরো খেতে-খেতে হঠাৎ আমার এক জ্যাঠতুতো দাদার কথা মনে পড়ল। তিনি কিছুদিন আগে এক শুদ্দুরের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সে-খবর শুনে ওঁর কী অবস্থা হয় আমার দেখতে ইচ্ছে হল। আমি জানিয়ে দিলাম।

ভেবেছিলাম, উনি আঁৎকে উঠবেন। অথবা কাঁদবেন। আমাদের অত বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে সে-ছেলেটা কালি লেপে দিয়েছে শুনে ওঁর দীর্ঘ জীবনের নির্যাতিত সতীত্বেও যেন কালি পড়বে। উনি তাকে শাপ-শাপান্ত করবেন।

কিন্তু সেই বলি-জর্জর বৃদ্ধা মুখের চামড়া আরও কুঁচকে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা ছেলেমানুষ, না-বুঝে কী না কী করেছে। আমি কাল বিশ্বনাথের মন্দিরে ওর নামে পুজো দেব—যাতে ছেলেটা জীবনে সুখ পায়!'

১৩

বাস থেকে নেমে, সিগারেট কেনার জন্য পকেটে হাত দিয়েছি, অমনি বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। পকেট একেবারে ফাঁকা।

না, পকেটমার নয়। কিছুটা দোষ আমারই। বাসে ওঠার সময় খুচরো পয়সা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, পকেটে ছিল শুধু একখানা দশ টাকার নোট। ট্রামে-বাসে সাধারণত দশটাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে চায়না। তাই বিনীতভাবে কন্ডাক্টারকে বলেছিলাম, খুচরো পয়সা নেই, এই দশ টাকার নোটটা যদি—। কন্ডাক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে নোটটা নিয়ে আঙুলের ফাঁকে গুঁজে বলেছিলেন, টিকিটটা রাখুন চেঞ্জ পরে দেব।...

তৎক্ষণাৎ আমি মনে-মনে দুবার বলেছিলাম—ভুললে চলবেনা, কন্ডাক্টারের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে। ভুললে চলবে না...। আমার কীরকম সন্দেহ হয়েছিল, কন্ডাক্টর আমার চেয়েও ভুলো মন। সুতরাং মিনিট পাঁচেক বাদেই আমি বললাম, এই যে দাদা আমার টাকাটা। কন্ডাক্টব বরাভয় দিয়ে বললেন, 'দিচ্ছি দিচ্ছি, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি এসপ্লানেড অবধি যাবেন তো!' এরপর আর চাওয়া যায়না।

তাও আমি ভুলতামনা, যদি বসার জায়গা না-পেতাম। ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া আর জানালার পাশে বসে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। জানালার পাশে বসে আমি তুচ্ছ টাকাপয়সার কথা একেবারে ভুলে গেলাম, দেখতে লাগলাম কল্লোলিনী কলকাতাকে। নরম রোদের বেলা তিনটের দুপুর—এসময় লম্বা মিছিল, স্কুলের মেয়েদের বাস, ট্রাফিক পুলিশের হাত—সবকিছুই দেখতে ভালো লাগে। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, নিজের স্টপ পেরিয়ে যেতেই হুড়ুস-ধাড়ুস করে কন্ডাক্টরের পাশ দিয়েই ঝুপ করে নেমে পড়লাম।

টাকার কথাটা তক্ষুনি মনে পড়ত না হয়তো, কিন্তু সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছিল বলেই দোকানের সামনে পকেটে হাত দিয়ে চৈতন্য হল। তখনও বাসটা চোখের আড়ালে যায়নি, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম রোককে, রোককে!

কেউ শুনতে পেলনা। বাসটা আস্তে-আস্তে চলছে, সামনের ট্রাফিকের আলোয় যদি থামে, আমি ছুটে আবার ধরে ফেলতে পারি। ছুটে বাস থেকে যখন কয়েক গজ দূরে পৌঁছেছি, সেই সময়ই সবুজ আলো জ্বলল, বাসটা হুস করে বেরিয়ে গেল। ইস, এইটুকুর জন্য টাকাটা ফসকে যাবে! পরের স্টপে বাসটাকে ধরা যায়না! পরের স্টপ বেশি দূর নয়, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের অফিসের সামনে। অনেক সময় মেয়েরা যদি ওঠে কিংবা নামে, তাহলে এক-একটা স্টপে বাস

অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। কিন্তু আমাকে ঠকাবার জন্যই, ঐ স্টপ থেকে কেউ উঠল-নামলনা, আমি পৌঁছুবার ঢের আগে বাস ছেড়ে দিল।

তখনও বাসটাকে দেখতে পাচ্ছি, ঐ বাসে আমার টাকা। আমার গোঁ চেপে গেল। যে-করেই হোক বাসটাকে ধরতেই হবে। প্রথমেই মনে পড়ল ট্যাক্সির কথা। দরকারের সময় খালি ট্যাক্সি পাওয়া কীরকম অসম্ভব, তা সবাই জানে। দু-তিনটে ট্যাক্সিকে হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করলাম, তারা অগ্রাহ্য করে চলে গেল। একটি ট্যাক্সিওয়ালা মুখের কাছে হাত দিয়ে বোঝাল, সে এখন খেতে যাচ্ছে, থামবেনা।

তারপর আমার মনে পড়ল, আমি ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করছি কোন সাহসে? আমার কাছে তো আর টাকা নেই। বাস থেকে টাকা নিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া মেটাব —সেটা একটা গোলমেলে ব্যাপার; যদি কিছু এদিক-ওদিক হয়ে যায়! তাহলে আর-এক কেলেঙ্কারি হবে।

কিন্তু তখন আমি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য, খালি মনে হচ্ছে, একটুর জন্য বাসটা চলে যাচ্ছে, ওটাকে ধরতে পারলেই টাকাগুলো ফিরে পাব—শুধু টাকার জন্য নয়, কন্ডাক্টরটি যদি আমাকে ঠকাবার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁর একটু শিক্ষা পাওয়া দরকার!

পুলিশের হাতের সামনে বহু গাড়ি থেমে আছে, আমি তার মধ্যে গিয়ে এক-একজনকে অনুনয় করতে লাগলাম, 'আপনি কি সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে যাবেন? আমাকে একটা লিফট দেবেন?' সুবেশ, ভদ্র, গম্ভীর অধিকাংশ যাত্রী আমার কথায় কোন উত্তরই দিলনা, দু-একজন হাত নেড়ে কী যেন বলল। সাত-আটজনকে চেষ্টা করার পর যখন প্রায় নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেব ভাবছি তখন একটি ট্যাক্সির যাত্রী আমাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন!'

ভদ্রলোকটি প্রৌঢ়, পোশাক দেখলে উকিল বা ব্যারিস্টার মনে হয়। প্রৌঢ় বলেই হয়তো তিনি মানুষের উপকার করা কিংবা বিপদে সাহায্য করার মতন পুরোনো ব্যাপারে এখনো বিশ্বাসী। সস্নেহে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে কী? বাড়িতে কোন বিপদ-টিপদ? আপনার মুখ দেখে মনে হল—'

আমি বললাম, 'না, ঐ বাসে...আমার টাকা...একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে যদি ধরতে পারি...'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী?'

আমি ব্যাপারটা আবার খুলে বললাম। তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি সেদিকে লক্ষ না-করে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললাম, 'থোড়া জলদি চলিয়ে ওহি বাসঠো পাকড়না—!'

পাঞ্জাবি ট্যাক্সি-ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে কর্কশভাবে ভাঙা হিন্দিতে যা বলল,

তার মানে এই দাঁড়ায় : তোমার দরকার তো আমি তাড়াতাড়ি চালাব কেন? তোমার জন্য আমি অ্যাকসিডেন্ট করব? অতই যদি গরজ, নিজে ট্যাক্সি ভাড়া করলে না কেন?

—ট্যাক্সি খুঁজে পাইনি।

—এই দুপুরবেলা বিশ-পঞ্চাশখানা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। এ আমি কী ভুল করেছি। কলকাতায় ট্রাফিকের আলোর সামনে গাড়ি থামলে কত রাজ্যের ভিখিরি, চাঁদা আদায়কারী, ঠক জোচ্চোররা এসে ভিড় করে, এরা কি আমাকেও তাদের একজন ভেবেছে? কত প্রতারক বানিয়ে-বানিয়ে কত গল্প বলে, আমার ঘটনাও তাই সন্দেহ করেছে? নেহাৎ ক'টা টাকার জন্য একী পাগলামি আমার! আসলে টাকার জন্যও নয়, টাকা তো মানুষের হারিয়েও যায়, কিন্তু আমার ঝোঁক চেপে গিয়েছিল বলেই...!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে আগাগোড়া চেয়ে দেখলেন। আমার পোশাক বা চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অনেক প্রতারকের চেহারা আমার চেয়ে ঢের চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

—অফিসে যাচ্ছিলাম।

—এই দুপুরবেলা অফিস?

—হ্যাঁ, আমাদের এরকমই, শিফট ডিউটি থাকে—

—কোন অফিস?

নাম বললাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু কী ভেবে বললেন, 'ও আচ্ছা আপনাদের অফিসেই তো ভবতোষ কাজ করে, চেনেন তাকে?'

—ভবতোষ কী? কোন সেকশান?

উনি যে-নাম বললেন, সে-নামের কারুকে আমি চিনিনা। বলে দিতে পারতাম, হ্যাঁ চিনি, কিন্তু তারপর যদি আবার জিজ্ঞেস করেন, কীরকম দেখতে বলুন তো। বুঝতেই পারলাম, উনি আমাকে উকিলি জেরা করে যাচাই করে নিতে চান। আমি যে জোচ্চোর নই, আমি যে আমিই এটা কী করে বোঝাব? একমাত্র উপায় যদি বাসটাকে তাড়াতাড়ি ধরা যায়। কিন্তু হয় ট্যাক্সিওয়ালা আস্তে চালাচ্ছে, কিংবা বাসটা জোরে ছুটছে, সেটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

আমি কাঁচুমাচু ভাবে বললাম, 'দেখুন, আমাদের অফিসে অনেক লোক, সবাইকে চেনা তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে নতুন লোক।'

—ভবতোষ অনেকদিন চাকরি করছে।

—কিন্তু আমি নতুন ঢুকেছি।

—ও, তা তো হবেই, ইয়াং ম্যান। আচ্ছা, অমুক রায়চৌধুরীকে চেনেন, উনি তো টপ অফিসার।

এবার আমি সোৎসাহে বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি। (সত্যিই চিনি।) উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। উনি এই মাস-ছয়েক হল রিটায়ার করেছেন।'

—রিটায়ার করেছেন? কই, আমার সঙ্গে গত সপ্তাহে দেখা হল, কিছু বললেন না তো।

কী মুশকিল তিনি যদি জনে-জনে ডেকে রিটায়ার করার কথা না শোনান, সেটা কি আমার দোষ। এদিকে, প্রায় বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, বাসটা এখনো আলেয়ার মতন খানিকটা দূরে। খুবই বোকামি হয়ে গেছে আমার, এরকমভাবে আসা। আমি বললাম, 'থাক, আর বেশি দূরে গিয়ে লাভ নেই। সামান্য কয়েকটা টাকা তো। অফিসেরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বরং এখানেই নেমে পড়ি।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, 'না, না, এখানে নামবেন কেন? এতদূর এসেছেন যখন, চলুন! চলুন!'

সর্বনাশ, ভদ্রলোক কী ভাবছেন, বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত বিনা পয়সায় ট্যাক্সিতে আসাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাই ঐ গল্পটা বানিয়ে বলেছি। কী ঝামেলায় যে পড়লাম। এত ট্রাফিক জ্যাম হয়, এখন একটা ট্র্যাফিক জ্যামে বাসটা আটকে যেতে পারেনা? ট্যাক্সিওয়ালা, তার সঙ্গী এবং এই প্রৌঢ় সহৃদয় লোকটির কাছে কী করে প্রমাণ করব, আমি একটা জোচ্চোর-বদমাস নই, আমার অন্য কোন মতলব নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দারুণ অস্বস্তিকর নীরবতা। কী জানি, ওঁরা হয়তো ভাবছেন, আমি যে-কোন মুহূর্তে ছুরি-টুরি বার করতে পারি। আমি আগে ভেবেছিলাম এটা খুবই সামান্য ব্যাপার। ভদ্রলোক হয়তো মুহূর্তের দুর্বলতায় আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে এখন অনুতাপ করছেন।

হঠাৎ তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি তো গ্রে স্ট্রিট দিয়ে ডানদিকে বেঁকব, ওর মধ্যে যদি আপনার বাস না-ধরা যায়—'

টাকার চিন্তা আমার তখন চুলোয় গেছে। আমি তখন অবিশ্বাসী দৃষ্টি থেকে ছাড়া পেতে পারলে বাঁচি। বিগলিতভাবে বললাম, 'অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে, আমি গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে নেমে পড়ব, আর যাবনা—চেষ্টা করেও যখন পাওয়া গেলনা।'

—না, না, বাসের ডিপোতে চলে যান। সত্যিই যদি আপনার টাকা নিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়বেন কেন।

সত্যিই যদি? কী সর্বনাশ! এ যে পুরোপুরি অবিশ্বাস! *অবিশ্বাস হবেই-বা* না কেন, সবারই তো ধারণা কলকাতার পথঘাট এখন ঠগ-বদমাসে ভরা।

ঠিক গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে বাসটাকে ধরে ফেলল ট্যাক্সিটা। আমি ভদ্রলোককে দ্রুত ধন্যবাদ জানিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটে চলন্ত বাসে উঠে পড়লাম। কন্ডাক্টর আমাকে দেখে অবাক, হয়তো বিশেষ দোষ নেই তাঁর তবু খুব চোটপাট করলাম ওঁর ওপরে। কন্ডাক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে টাকা গুণে দিলেন।

ততক্ষণে বাস আরও দু'স্টপ এগিয়ে গেছে। টাকাগুলো নিয়ে নামতেই দেখি পিছনে সেই ট্যাক্সি, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে। ওঁর না ডানদিকে বেঁকে যাবার কথা ছিল? আমাকে যাচাই করতে এসেছেন।

আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব। অনেককিছু নির্ভর করছিল আমার ওপর। ঐ ভদ্রলোকের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার রাস্তায় সবাই প্রতারক-জোচ্চোর-বদমাইস নয়। এখনও লোকে সত্যিকারের বিপদে পড়ে সাহায্য চায়। বাড়িতে ফিরে ওঁকে 'খুব জোর বেঁচে গেছি' ধরনের একটা রোমহর্ষক গল্প বলতে হবেনা।

আমি সগর্বে টাকাগুলো প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললাম, 'এই যে, পেয়েছি! পেয়েছি!'—তারপর ঐ ট্যাক্সিওয়ালাকেও শিক্ষা দেবার জন্য উল্টোদিকের আর-একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম!

১৪

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনেই হেসে লুটোপুটি। এক-একটা কথা আদ্ধেক উচ্চারণ করছি আর হাসির দমকে আমাদের শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। রাস্তার লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে অবাক। অমিতাভ বলল, 'জিনিয়াস! ওফ, জিনিয়াসই বটে, হা-হা, হো-হো-হি-হি!'

খানিকটা বাদে, একটু সামলে নিয়ে আমরা দুজনেই খুব দুঃখিত হয়ে পড়লাম। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'বুঝলি অমিত, হেমন্তদার বাড়িতে আর আসা যাবেনা!'

অমিতাভ বলল, 'মাথা খারাপ। অন্তত পাঁচ-ছ বছর না-কাটলে আমি আর এ-বাড়ির ধারে কাছে আসছিনা!'

হেমন্তদা কানপুরে মাস আষ্টেক ছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসেছেন শুনে আমি আর অমিতাভ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কানপুরে গেলে

মানুষ এমন বদলে যায়?

হেমন্তদা আমাদের ছেলেবেলার হীরো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গিয়ে আমি যখন অধঃপতনের দিকে বেশ দ্রুত গড়াতে শুরু করেছিলাম, হেমন্তদা সেই সময় আমাকে উদ্ধার করলেন। হেমন্তদা তখন অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি নিয়ে রিসার্চ করছেন, উন্নত দীপ্তিমান চেহারা, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—ভিড়ের মধ্যে থাকলেও হেমন্তদার দিকে সহজেই চোখ পড়ে। হেমন্তদা তাঁর বাড়িতে একটা সার্কল করেছিলেন, সেখানে আমাদের ডেকে নিলেন। হেমন্তদার সান্নিধ্যে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সবকিছুই হেমন্তদা কত ভালো জানেন, আর কী সরলভাবে আমাদের বুঝিয়ে বলতেন। শিশু ও কিশোরদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে হেমন্তদার নিজস্ব কতকগুলো ধারণা ছিল, সেই অনুযায়ী তিনি আমাদের বিনামূল্যে শিক্ষা দিতেন। সত্যি বলতে কী, আমি অন্তত যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলাম। হেমন্তদাই আমাদের শিখিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করবে। নিজের যুক্তি দিয়ে যা শেষ পর্যন্ত মানতে পারবে না তা আর কারুর কথাতেই মানবেনা—সে তোমার ঠাকুর্দাই বলুক, বা মাস্টারমশাই বলুক বা হেমন্তদাই বলুক!

দু-একবছর বাদে অবশ্য হেমন্তদার বাড়ির স্টাডি সার্কল বন্ধ হয়ে গেল, হেমন্তদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন, কিন্তু আমরা কয়েকজন ওঁর অন্তরঙ্গ রয়ে গেলাম। হেমন্তদা বিয়ে করলেন, লতিকা বৌদিকেও আমাদের অসম্ভব ভালো লাগত। চেহারায় যেমন মানিয়েছে দুজনকে, তেমনি স্বভাবেও, লতিকা বৌদির ব্যবহার মধুর কিন্তু ন্যাকামি নেই। প্রায়ই সন্ধেবেলা আমরা হেমন্তদার বাড়িতে আড্ডা জমাতাম। লতিকা বৌদি কড়াইশুঁটি বেটে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে একরকম চপ বানাতেন, তার অপূর্ব স্বাদ ঘন-ঘন কফি কিংবা চা, এবং ততদিনে আমরা হেমন্তদার সামনে সিগারেট খেতে শুরু করেছি। অমিতাভ বেশ ভালো রসিকতা করতে পারে—পৃথিবীর যে-কোন বস্তুই তার রসিকতার উপলক্ষ হতে পারে—আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে অমিতাভর রসিকতা শুনে হেমন্তদা আর লতিকা বৌদির বিশুদ্ধ উচ্চহাস্যধ্বনি এখনো আমার কানে বাজে। লতিকা বৌদির যখন সন্তান হল, নার্সিংহোমে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে হেমন্তদা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স-এর বড় চাকরি নিলেন। সেই সূত্রেই ওঁকে কানপুরে গিয়ে আটমাস থাকতে হল। কলকাতা ছেড়ে যখন যান, তখন ওঁদের বাচ্চাটির বয়েস ন-মাস।

ফিরে আসার পর আমি আর অমিতাভ দেখা করতে গেলাম। কানপুরে হেমন্তদার বোধহয় তেমন বন্ধু জোটেনি, আড্ডা মারার সুযোগ ছিলনা, অফিসের সময় ছাড়া সারাক্ষণ বাড়িতেই কাটাতেন। তার ফলে কী সাংঘাতিক পরিবর্তন!

হেমন্তদার ছেলের বয়স এখন বছর দেড়েক, বেশ স্বাস্থ্যবান, কিন্তু ভয়ানক একরোখা। অমিতাভ একটু গালটিপে আদর করতে গেছে অমনি প্যাঁ করে শানাই-এর সুরে কেঁদে উঠল। হেমন্তদা তাড়াতাড়ি যেই কোলে তুলে নিলেন, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চুপ। হেমন্তদা বাথরুমে ছিলেন একটু আগে, পাজামার দড়িটা ভালো করে আঁটেননি, সেই অবস্থায় ছেলেকে কাঁধে করে ঘুরতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেলের কী নাম রাখলেন হেমন্তদা?' হেমন্তদা মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেন, 'নাম রেখেছি শ্রুতিধর। এমন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি তোমায় কী বলব। যে-কোন কথা একবার শুনলেই মনে রাখে। দেখবে? বুলবুল, মুংকু, রিংকু, সোনা-সোনা, বলো তো সেই ছড়াটা? জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ দি হিল। বলো, বলো? বলো মিন্টু সোনা—'

ছেলেটা গোলগোল চোখ করে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমরাও উদগ্রীব, দেড়বছরের ছেলে ইংরেজি ছড়া শোনাবে এ-এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। ছেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বিনা নোটিশে আবার শানাই-এর প্যাঁ ধরল। হেমন্তদা দমলেননা। 'থাক, থাক্, আচ্ছা সেই বাংলাটা বলো, ওপারেতে লঙ্কাগাছ রাঙা টুকটুক করে—এইটা বলো, আজ সকালেও তো বললে, কাকু, কাকুরা এসেছেন, শোনাও, কই?'

ছেলে আবার প্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ—

আমার মনে হল ছেলে শ্রুতিধর হতে পারে, কিন্তু কান্নার ব্যাপারটাই তার স্মৃতিতে প্রধান হয়ে গেঁথে আছে। অমিতাভ বলল, 'থাক হেমন্তদা, ওর বোধহয় এখন মুড ভালো নেই।' হেমন্তদা বললেন, 'না না, এই তো একটু আগে হেসে-হেসে কত খেলা করছিল। আচ্ছা এই দ্যাখো।'

হেমন্তদা টাইপরাইটারের ঢাকনাটা খুললেন, ছেলেকে বললেন, 'শ্রুতিধর, বলো তো 'বি' কোনটা?' ছেলে এবার কোল থেকে ঝুঁকে খটাখট টাইপরাইটারের চার-পাঁচটা চাবি টিপল তার মধ্যে 'বি' অক্ষরটাও আছে। আমরা বিস্ময়ে হতবাক। হেমন্তদা উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'দেখলে? আশ্চর্য না? খোকন বলো তো বেড়ালের ছবি কোথায়?'

ছেলে দেয়ালের দিকে বেড়াল আঁকা ক্যালেন্ডারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে উং গিং বুম বাম লাল্লাল—এই ধরনের কী-একটা বলল। আমরা বললাম, 'সত্যি, কী আশ্চর্য! ভাবাই যায়না!'

হেমন্তদা পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে-হাসতে বললেন, 'ওর মামা একজন বিরাট ডাক্তার, তিনি তো বলেন,এ-ছেলের মধ্যে জিনিয়াসের চিহ্ন আছে। আমি অবশ্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দি। কিন্তু ছেলেটা এমন সব আশ্চর্য-আশ্চর্য কাণ্ড করে,

এই বয়েসের ছেলের পক্ষে ভাবাই যায়না সত্যি! দেখবে আর-একটা?'

এরপর আমরা দেড়ঘণ্টা ছিলাম, অনবরত চলল এইসব, হেমন্তদা ছেলেকে এক-একটা অসম্ভব সব ব্যাপার করে দেখাতে বলছেন, এ-বি-সি-ডি বলা থেকে শুরু করে ভারতনাট্যমের মুদ্রা পর্যন্ত, আর ছেলে কখনো মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ বার করছে শুধু, কখনো কেঁদে উঠছে তারস্বরে, কখনো এটাসেটা ভাঙছে। কোমরের পায়জামার দড়ি আলগা করে বাঁধা, কাঁধে ছেলে—হেমন্তদাকে হাস্যকর দেখাচ্ছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য—এসব প্রসঙ্গ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ শুধু ছেলের কথা। যে-হেমন্তদা শিশু মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, যিনি আমাদের যুক্তিবাদী হতে শিখিয়েছিলেন, সেই হেমন্তদাই দেড় বছরের ছেলেকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা করছেন—যা দেখে যে-কোন লোকের হাসি পাবে। আমরা অতি কষ্টে হাসি চেপে বসে রইলাম।

লতিকা বৌদিরই অনেক বদল হয়েছে। আমাদের আর চপ-টপ কিছুই খাওয়ালেননা। চেহারা এবং কথাবার্তা সবই ভোঁতা হয়েছে একটু, উনিও হেমন্তদাকে তাল দিতে লাগলেন, ছেলেকে দিয়ে ছড়া বলাবার চেষ্টায় নাজেহাল হলেন ছেলের যখন কান্না ওঁর মুখখানাও তখন কাঁদো-কাঁদো।

বাইরে বেরিয়ে অমিতাভ আর আমি প্রাণ খুলে হেসে নিলাম। দুজনে ঠিক করলাম, ছেলেটা বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর হেমন্তদার বাড়িতে আসব না।

সত্যিই চার-পাঁচবছর আর যাইনি। কিন্তু এর মধ্যে অমিতাভর সঙ্গে আবার আমার ঝগড়া হয়ে গেল। প্রায় মুখ দেখাদেখিই বন্ধ। অর্পিতা ছিল আমার বান্ধবী, বেশ ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, একসঙ্গে সিনেমা দেখা, লেকে বেড়ানো-টেড়ানো বেশ চলছিল—এই সময় অমিতাভর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলাম। অমিতাভ চমৎকার রসিকতা করতে পারে, পোশাক পরে সবসময় আধুনিকতম, চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নেমে পড়া ওর স্বভাব। সুতরাং আমার যা নিয়তি —সবসময় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া, ব্যর্থ হওয়া—তাই হল, অমিতাভ ঝপ করে অর্পিতাকে বিয়ে করে ফেলল! ব্যাপারটাকে হাসিমুখে মেনে নেব—এতখানি স্পোর্টিং স্পিরিট সত্যিই আমার নেই। সেই অমিতাভ বিশেষ করে অর্পিতার ব্যবহারে আমি সত্যিই দুঃখ পেয়েছিলাম। দিনকতক সিরিয়াসলি দাড়ি রাখার কথাও ভেবেছি।

কিন্তু সব দুঃখই একসময় পুরোনো হয়ে ফিকে হয়ে যায়। হৃদয়ে সেইসব পুরোনো দিনের কথা আর ঢেউ তোলেনা। সুতরাং একটা মিউজিক কনফারেন্সে যখন আমার সঙ্গে অমিতাভ আর অর্পিতার চোখাচোখি হয়ে গেল, তখন আর

রক্তে ঝড় উঠল না। এবং ওরা দুজনে যখন এসে কথা বলতে এল, আমি মুখ ফেরাতে পারলামনা। এমনকী ওদের বাড়িতে যাবার নেমন্তন্নও গ্রহণ করে ফেললাম।

ফিটফাট সাজানো সংসার ওদের, স্বামী-স্ত্রী আর একটি আড়াই বছরের মেয়ে। বিয়ের আগে অমিতাভর ঘরটা কী অগোছালোই থাকত—এখন দেখলে চেনাই যায়না। আরও অনেককিছু চেনা যায়না। মেয়ের নাম রেখেছে পূর্বা, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, ঠাণ্ডা, কাঁদেনা, মুখখানা অর্পিতার মতনই মিষ্টি। অমিতাভ আর আমি অনেক পুরোনো দিনের কথা ঝালিয়ে নিলাম। প্রায় চারবছর দেখা হয়নি।

কথার মাঝে-মাঝে মেয়েটি এসে বাধা দিচ্ছিল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কতরকম প্রশ্ন, কতরকম কৌতূহল—সেগুলোর জবাব না দিলে চলেনা—সুতরাং বারবার আমাদের কথা বাধা পাচ্ছিল। নিজের মেয়ের এসব প্রশ্নে বাবা হয়তো বিরক্ত হয়না—কিন্তু আমি আর কতক্ষণ সহ্য করব। বুঝতে পারলাম, ঐ মেয়েকে বাদ দিয়ে কোন কথা বলা যাবেনা। অর্পিতা কয়েকবার ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল—কিন্তু মেয়ে কিছুতেই যাবে না, বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারেনা। সুতরাং কথার কথা হিসেবে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে অমিত, মেয়েকে কোন স্কুলে ভর্তি করবি?'

অমিতাভ বলল, 'এখুনি কী, মোটে তো আড়াই বছর বয়েস।'

—বাড়িতে কিছু শেখাচ্ছিস-টেখাচ্ছিস?

—অমিতাভ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'না ভাই। ছড়া শেখানো কিংবা নাচ শেখানো—তারপর বাড়িতে লোকজন এলে জোর করে তাদের সেইসব শোনানো? এসব আমার ধাতে নেই।'

আমি বললাম, 'বেঁচেছিস।'

—দ্যাখ-দ্যাখ মেয়েটা কী করছে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে। একটা ফাঁক পেলেই মেয়েটা আপন মনে ছবি আঁকে।

আমি হাই তুলে বললাম, 'তাই তো দেখছি।'

অমিতাভ বলল, 'আনন্দবাজারে যেসব 'আঁকা বাঁকা' বেরোয়, তার থেকে পূর্বা অনেক ভালো আঁকে। সম্পাদকের কাছে পাঠালে লুফে নেবেন।'

আমি উদাসীনভাবে বললাম, 'পাঠালেই পারিস।'

—তুই দেখবি ওর আঁকা কয়েকটা ছবি?

—না, আমি আর দেখে কী করব? আমি আর্ট ক্রিটিকও নই, ছবি ছাপার ব্যাপারেও আমার বিন্দুমাত্র হাত নেই।

—সেজন্য নয় এমনিই দ্যাখ-না—বিশ্বাসই করা যায়না, ঐটুকু মেয়ে...

অর্পিতা কাছেই দাঁড়িয়ে চা তৈরি করছিল, বলল, 'ওর এক মামা তো বড় আর্টিস্ট, তারই ছোঁয়া লেগেছে বোধহয় মেয়েটার।'

শুনেছিলাম বটে অমিতাভর এক মামা বোম্বেতে হিন্দি সিনেমার আর্ট ডিরেক্টার। তিনি হলেন গিয়ে বড় আর্টিস্ট। ঢোঁক গিলে আমি বললাম, 'বাচ্চাদের অনেকসময় আঁকিবুকি ছবি আঁকার ঝোঁক দেখা যায় বটে—কিন্তু বড় হলে আর ওসব কিছু থাকেনা।'

অমিতাভ অত্যন্ত বিরক্তির মুখ করে বলল, 'না রে, পূর্বার মধ্যে খুব অল্পবয়েস থেকেই ছবির দিকে একটা টান...মানে যখন ওর মাত্র ছ'মাস বয়েস—তখন ওর দিকে একটা পুতুল আর একটা লালরঙের পেনসিল বাড়িয়ে দিতে দেখা গেল —ও কিছুতেই পুতুলটা নেবেনা, লাল পেনসিলটাই নেবে!'

আমি স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'বাচ্চাদের সঙ্গে ষাঁড়ের খুব মিল আছে জানিস? ওরাও লাল রং খুব ভালোবাসে। তোর মেয়ে লাল রং বলেই পেনসিলটা ধরতে গিয়েছিল, শুধু পেনসিল বলেই নয়।'

অর্পিতা বঙ্কিম হাস্যে বলল, 'আপনার কথাবার্তা ঠিক আগের মতোই আছে দেখছি।'—অর্পিতার এই মন্তব্যের ঠিক কী মানে তা বোঝা না-গেলেও এটুকু বুঝতে পারলাম, ও আমার কথাটা মোটেই পছন্দ করেনি। কেননা আমার চায়ে ও চিনি দিতে ভুলে গেছে এবং অতি ট্যালটেলে বিস্বাদ লিকার।

এরপর দেড়ঘন্টা ধরে অমিতাভ আর অর্পিতা আমাকে ওদের মেয়ের শিল্প-প্রতিভা বোঝাবার চেষ্টা করল। দুটো লম্বা আর একটা গোল দাগ দেখিয়ে অর্পিতা বলল, 'দেখেছেন কী চমৎকার মানুষ এঁকেছে—অনেকটা ওর বড় মামার মতো। আর এই দেখুন এই একটা হরিণ। আর কী আশ্চর্য দেখুন, ও কখনো পাহাড় দেখেনি—অথচ কী সুন্দর পাহাড়ের ছবি এঁকেছে।' অমিতাভ বলল, 'পূর্বা জন্তু-জানোয়ার আঁকতে খুব ভালোবাসে—পূর্বা, কাকামণিকে একটা বাঁদর কিংবা হনুমান এঁকে দেখাও তো। এই নাও পেনসিল, নাও আঁকো।'—আমি বললাম, 'কী রে অমিত, ও বাঁদর আঁকার জন্য তোর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে কেন?'—এত রসিকতাজ্ঞান ছিল অমিতের, কিন্তু তখন হাসলনা গ্রাহ্যই করলনা, বলল, 'আঁকো মামণি, এঁকে দেখাও।'

টেকনিকটাই শুধু বদলেছে। ব্যাপারটা সেই একই আছে। দেড় ঘন্টায় আমি ক্লান্ত বিরক্ত, গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম। বাইরে বেরিয়ে মনে পড়ল, হেমন্তদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আর অমিত কীরকম হেসেছিলাম। আজ অমিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি হাসতেও পারছিনা।

সেদিন আমার দুটি বিষয়ে উপলব্ধি হল। এক অর্পিতাকে বিয়ে না-করে আমি খুব জোর বেঁচে গেছি। আর দ্বিতীয়ত, বিয়ে করলেই যদি বাবা হতে হয়—এবং বাবা হলেই যদি হেমন্তদা কিংবা অমিতাভর মতন বোকা হয়ে যেতে হয়—তবে ইহজীবনে আমি সংসারধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করছিনা।

১৫

রূপকথার বইয়ের ছবিতে ছাড়া ছেলেবেলায় আমি একজন মাত্র রাজকুমারী দেখেছিলাম। রাজকুমারী বলতে এখনো আমার চোখে সেই তারই মুখ ভেসে ওঠে।

শোভাবাজারে একটি বাড়িতে আমরা ছেলেবেলায় খেলতে যেতাম। বাড়ির ছাদে বাতাবী লেবু নিয়ে ফুটবল খেলা কিংবা গলিতে ক্যাম্বিস বল দিয়ে ক্রিকেট কিংবা দুপুরবেলা ক্যারাম খেলার স্তর পেরিয়ে তখন আমরা ক্লাব করতে শিখেছি। প্রত্যেক বিকেলবেলা ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না-হলে এবং মাঝে-মাঝে ক্লাবের কার্য পরিচালনা সম্পর্কে মিটিং-এ না-বসতে পারলে তখন আর রাত্রে ঘুম আসতে চাইতনা। তখন আমরা ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ি, টিফিনের পয়সা জমিয়ে ক্লাবের জন্য ব্যাডমিন্টনের জন্য নেট আর চারখানা র‍্যাকেট কিনে ফেলেছি, ছোটকাকা যেদিন আমাদের ক্লাবকে একটা তিননম্বরের নতুন ফুটবল কিনে দিলেন সেদিন আর আমাদের আনন্দের শেষ নেই, ছোটকাকাকে বললাম, 'বল যখন দিয়েছ, তখন একটা পাম্পারও কিনে দিতে হবে। নিজেদের পাম্পার না-থাকলে ফুটবল খেলায় কোন সুখই থাকেনা।'

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমাদের পাড়াতে যে একটিমাত্র মাঠ, সেটা ছিল দাদাদের বয়েসীদের ক্লাবের দখলে। আমরা দুপুরের দিকে একটু-আধটু সেখানে খেলার সুযোগ পেলেও বিকেলের দিকে দাদারা এসে পড়ত হৈ-হৈ করে। গাঁট্টা মেরে আমাদের বিদায় করে দিত।

সুতরাং আমরা ঘুরতে-ঘুরতে শোভাবাজারের সেই বাড়িটা বার করেছিলাম। রাজা অমুকচন্দ্র সিংহের বাড়ি—সেকালের বিরাট প্রাসাদ, দরজার সামনে একজন অশ্বারোহীর পাথরের মূর্তি, দরজা পেরিয়ে প্রশস্ত ঢাকাবারান্দায় কীরকম যেন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, মাথার ওপর অগুন্তি ত্রিশিরা কাচ বসানো ঝাড়লণ্ঠন, একপাশে শ্বেতপাথরের ঠাকুর দালানে অস্পষ্ট অসংখ্য তেলরঙের ছবি, লোকে বলত সেটা সেজো রাজার বাড়ি। বড় রাজা কিংবা মেজো রাজার বাড়িতে কখনো আমার ঢোকার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু সেই তেরো বছর বয়েসে—ঐ সেজো রাজার বাড়িই

আমার চোখে অফুরন্ত বিস্ময়ের ভাণ্ডার, যত রাজ্যের রূপকথা আর ইতিহাসের কাহিনীর সব রাজবাড়ি আমি ঐ বাড়িটির মধ্যে প্রত্যক্ষ করতাম, প্রত্যেক দিনই সেই বাড়িতে ঢুকতে আমার গা ছমছম করত।

সেই বাড়ির মধ্যে বিশাল উঠোন, একটা প্রমাণ সাইজের ফুটবল গ্রাউন্ডের প্রায়-সমান, সবুজ তকতকে ঘাসে ঢাকা। আমাদের দলের অবনী ছিল খুব তুখোড় ছেলে, সে নাকি স্বয়ং সেজো রাজার পিসতুতো শালার কাছ থেকে আমাদের খেলার অনুমতি নিয়ে এসেছিল। সেইসব দিনে আমরা কারুর স্ত্রীর ভাইকেও শালা বলে উচ্চারণ করতাম না, ঐ কথাটা ছিল খারাপ কথা, আমার মেজোমামা সম্পর্কে একজন পাড়ার লোক একদিন আমার মুখের ওপর 'তোর বাবার শালা' বলায় আমি একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, সেই রাজবাড়িতে লোকজন ছিল খুবই কম, অবনীর কথা শুনে আমরা ভেতরে ঢুকেছিলাম, কেউ কোন আপত্তি করেনি। মাঝে-মাঝে শুধু একজন বাবরি চুলওয়ালা বুড়ো এসে আমাদের খেলা দেখত, আর আমাদের কারুকে ডেকে বলত, 'খোকা, বেশ তো তোমার মুখখানা, বেশ তো ছুটতে পার তুমি, যাও তো ছুটে মোড়ের পানের দোকানে বলে এসো তো একডজন সোডা দিয়ে যেতে!' তিনিই ছিলেন পিসতুতো শালাবাবু। আমার বাবাকে দেখেছি মাঝে-মাঝে হজমের গণ্ডগোল হলে একটা সোডা আনিয়ে খেতেন। ভাবতাম, ওরা তো রাজবাড়ির লোক—ওদের বোধহয় হজমের গণ্ডগোল সারতে একডজন সোডা লাগে।

সেই বাড়িতেই আমি আমার জীবনের প্রথম রাজকুমারীকে দেখি। উঠোনের দক্ষিণ দিকে একটা কারুকার্য-করা ঝুলবারান্দা ছিল—সেইখানে তিনি মাঝে-মাঝে পড়ন্ত বিকেলবেলা এসে দাঁড়াতেন। আরও অন্যদিকেও বারান্দা ছিল, কিন্তু তিনি শুধু ঐখানেই দাঁড়াতেন, ঐ দক্ষিণদিকে—যেখানে শেষসূর্যের বাঁকা রশ্মি পড়ে। রূপকথায় পড়েছিলাম—সেই এক মায়া রাজপুরী আছে—যার সব ঘরে যাওয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণদিকে যাওয়া নিষেধ। আমি ঐ রাজকুমারীকে শুধু সেই দক্ষিণদিকেই দাঁড়ানো দেখে এক অদ্ভুত ভয়-মেশানো রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। পুরোনো শঙ্খের মতন গায়ের রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, তাঁর বয়েস তখন সতেরো-আঠেরোর বেশি নয়, পৃথিবীর সব রূপকথার নায়িকার মুখে আমি ঐ রাজকুমারীর মুখ বসিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি শুধু বারান্দায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যেতেন।

প্রথমদিন তাকে দেখে আমি অবশ্য ভয়ই পেয়েছিলাম। খুব বেশি সুন্দর জিনিশ দেখলে প্রথমটায় আমার বরাবরই ভয় করে। তাছাড়া অন্য ভয়ও ছিল। আমি অবনীকে ফিসফিস করে বলেছিলাম, 'অবনী, আমরা খেলছি বলে কিছু

বলবে না তো?'

অবনী বলত, 'ভ্যাট। ও তো নন্দিনী, ও আবার কী বলবে রে?'

—যদি ওর বাবাকে বলে দেন?

—ওর বাবা তো মরে ভূত হয়ে গেছে! ও তো সেজোবাবুর ভাইয়ের মেয়ে! আর সেজোবাবু, তিনি কত রাত্তিরে ফেরেন তার ঠিক আছে! যা-যা অবনীটা যেন কী, কথায় কোন রসকষ নেই। রাজা না-বলে বলত বাবু।

অবনীর ভাবভঙ্গি যেন সবজান্তার মতো। অবনী যখন এসব কথা বলত তখন ওর গলার আওয়াজ ঠিক ওর বাবার মতন শোনাত। অবনীই একদিন বলেছিল ওসব রাজা-ফাজা আজকাল আর চলে না, ধারের চোটে তো সব বন্ধক পড়ে আছে।

যাই হোক, রাজার মেয়ে না হোক তবু তো রাজবাড়ির মেয়ে, আমার চোখে তবু তো রাজবাড়ির মেয়ে, আমার চোখে তবু নন্দিনী ছিলেন রাজকুমারী। অমন রূপসী আমি আর কখনো দেখিনি, রাজকুমারী ছাড়া ওরকম রূপ হয়না। দক্ষিণের কারুকার্য-করা বারান্দায় ওঁকে দেখলেই আমি পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকতাম খেলাটেলা ভুলে। ওঁর রূপের মধ্যে একটা অপরূপ গাম্ভীর্য ছিল। আমাদের ক্লাবের সবাই যে তখন কচিছেলে তাও নয়, দু-একজনের বেশ গোঁপ উঠেছে, এবং আমি চিরকালই একটা ভীতু-ভীতু হলেও আমাদের অনেকেই তখন রাস্তায় স্কুলের মেয়েদের দেখে সিটি মারতে শিখেছে। তবে নন্দিনীর দিকে সেরকম করার সাহস আর কারুর ছিলনা। একমাত্র আমারই সাহস ছিল নন্দিনীর দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকার।

নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগও আমিই পেয়েছিলাম। সেদিন দুরন্ত হাওয়ায় আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলা একবারে পণ্ড, পালকের বলটি এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে—আমরা হাসাহাসি করছি। এমন সময় দক্ষিণের বারান্দা থেকে একটা ব্লাউজ উড়ে এসে মাঠে পড়ল। নন্দিনী এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, রাজকুমারী তো, তাই আমাদের বললেননা সেটা দিয়ে আসতে, শুধু কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলে ডাকলেন, শ্রীমন্ত! বুঝলাম চাকরকে ডাকছেন। অবনী আমায় বলল, 'এই নীলু, যা না, জামাটা দিয়ে আয়-না! ঐ যে পাশ দিয়ে সিঁড়ি।'

কী বোকা অবনীটা, অমন সুযোগ পেয়েও নিজে না নিয়ে আমাকে দিয়ে দিল। আমি তৎক্ষণাৎ জামাটা তুলে সিঁড়ির দিকে ছুটলাম।

সিঁড়িটা অন্ধকার, দেয়ালের গায়ে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। উঠোনের আলো থেকে হঠাৎ সেই অন্ধকার সিঁড়িতে আসায় আমার যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল, আমার চারপাশে শুধু অন্ধকার। তখন আমি ভাবলাম, আমায় তো কেউ দেখতে পাচ্ছে

না। সেইজন্য খুব সাবধানে গোপনে আমি ব্লাউজটা নাকের কাছে এনে গন্ধ নিয়েছিলাম—রাজকুমারীর শরীরের ঘ্রাণ। জানিনা, সেই ব্লাউজে শুধু সাবানের গন্ধ ছাড়া আর-কিছু গন্ধ ছিল কি না। কিন্তু আমি স্পষ্ট রাজকুমারীর ঘ্রাণই পেয়েছিলাম, সে ঘ্রাণ আজও নাকে লেগে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখেই নন্দিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি হাত বাড়িয়ে জামাটা দিলাম। তিনি সেটা নেবার পর তবুও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতন। ভেতরের ঘরে একটি পুরুষ কণ্ঠ কাকে যেন ধমকাচ্ছে, একটি নারীকণ্ঠ কাঁদছে। আমি তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। নন্দিনী এবার আমার দিকে অল্প হেসে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ঐ তো একটিবার আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলেন, ঐ তো একটিমাত্র কথা বলেছিলেন—সেজন্য নন্দিনীর আমাকে মনে থাকবে কেন? কিন্তু আমার মনে আছে, আমার মনে আছে নন্দিনীর মুখ, তাঁর কণ্ঠস্বর। তাই অতবছর পরও আমি একপলক দেখেই একটা কথা শুনেই চিনতে পেরেছিলাম। চিনতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

পনেরো-কুড়িবছর কেটে গেছে, আমাদের সেসব ছেলেবেলার জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে, পুরোনো পাড়া ছেড়ে চলে গেছি অনেকদিন। একবার যেন দেখেছিলাম সেই রাজবাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, কোন এক মারোয়াড়ি সেটা কিনে নিয়ে হলদে-সবুজ ক্যাটকেটে বং লাগিযেছে, সিংহদ্বারে লাগিয়েছে কোলাপসিবল গেট কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? এখন পৃথিবীর বড়-বড় সমস্যা নিযে ব্যস্ত হয়ে আছি তাহলেও অতদিন পব নন্দিনীকে ঐ অবস্থায় দেখে আঁৎকে না-উঠে পারলামনা।

নীলবতন হাসপাতালেব সামনে নন্দিনীকে দেখলাম একটা বিক্সাওয়ালাব সঙ্গে ঝগড়া করতে। বিক্সাওয়ালা চেঁচাচ্ছে—না মাইজী ষাট নয়া বোলা হ্যায়—। নন্দিনী তাকে ধমকে বলছেন, নেই আট আনা দিয়া। আমি একমুহূর্তেই চিনতে পাবলাম। নন্দিনীর পরনে একখানা সাধাবণ শাড়ি সন্ধেবেলায় পড়ন্ত বোদ্দুরের রেখায় ওঁকে যেমন দেখেছি—তার তুলনায় এখন দুপুরের কটকটে রোদ্দুরে ওঁর মুখ অনেক সাধারণ, কিছুটা ম্লান ও কর্কশ, নাকের ওপর সামান্য মেছেতা হয়েছে, তবু সেই রাজকুমারী, সেই নন্দিনী, কোন ভুল নেই। আমার খুব মন খারাপ লাগল।

পরক্ষণেই ভাবলাম খাবাপ কী আছে, রাজকুমারী পথে নেমে এসেছেন আর-পাঁচজনের মতন। আর-পাঁচজনের মতনই তাঁকে দুপুরের রোদ্দুর সইতে হচ্ছে —এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু নন্দিনীদের বাড়িতে জুড়িগাড়ি ছিল, এখন তাঁকে রিক্সা চড়তে দেখে দুঃখ পাইনি, দুঃখ পেয়েছি সামান্য দশনয়া পয়সা নিয়ে দরাদরি করতে

দেখে। মোহর ছুঁড়ে দেবার কথা ছিল ওঁর তার বদলে—নন্দিনী তখনও নাছোড়, তিনি রিক্সাওয়ালাকে ভাঙা হিন্দিতে বলছেন এই তো থোড়া দূর এর জন্য ষাট নয়া? না, আট আনাসে যাস্তি নেই দেগা। রিক্সাওয়ালা ক্রমশ গলা চড়াচ্ছে—তাতে বোঝা যায়, ঝগড়া অনেকক্ষণ চলছে—।

আমার মনের মধ্যে একমাত্র একজন রাজকুমারীর মুখ ছিল, তাকেও এরকম ভেঙে দেওয়া তোমার উচিত না নন্দিনী। আমি এখন আর রূপকথার জগতে নেই, তবু হৃদয় থেকে সব রাজকুমারীদের নির্বাসনও তো দিতে পারি না। নন্দিনী, এরচেয়ে ছেলেবেলায় তোমাকে না-দেখলেই ভালো হতো। তাহলে অদেখা রাজকুমারীরা কোনদিন রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আমার সামনে দরাদরি করতনা।

এইসময় একটা ছোট ঘটনা ঘটল। ট্রামকে পাশ কাটাতে গিয়ে একটা বিশাল মোটর গাড়ি রাস্তার ধার ঘেষে এসে সেই দাঁড়ানো রিক্সাটাকে আস্তে ছুঁয়ে গেল। রিক্সাটা, সঙ্গে-সঙ্গে এসে পড়ল নন্দিনীর গায়। আমি সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলাম। তার আগেই মোটরগাড়িটা থেমেছে, টুপি মাথায় একজন মারোয়াড়ি নেমে এসে রিক্সাওয়ালার দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে নন্দিনীর দিকে সোনা বাঁধানো দাঁতে হেসে বলল, 'এক্সকুজ মি, আই আম স্যারি, মাফ কিজিয়ে আই আম ওফুলি স্যারি, আপকো চোঠ লাগা?'

নন্দিনী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'না।' মারোয়াড়িটি তবুও বিগলিত হেসে বলল, 'আপনাকে বাড়ি পৌঁছায়ে দিসি চলেন না? এসব রিক্সাওয়ালারা হয়েছে এমন হারামি—।' নন্দিনী আবার বলল, 'না, থাক দরকার নেই, আমি এখানেই এসেছি।' লোকটি তবু বললে, 'হামি গিল্টি ফিল করসি। আপনি কাজ সারিয়ে লিন, হামি আপনাকে বাড়িমে পৌঁসায়ে।'

হঠাৎ নন্দিনী সোজা হয়ে উঠল, তীব্র গলায় বলল, 'আপনি অত কাছে এসে কথা বলছেন কেন? সরে যান—। ঐ রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা বলুন আপনি।'

মারোয়াড়িটি সঙ্গে-সঙ্গে নুনের ছিটে-লাগা কেঁচোর মতন গুটিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে, ক্ষীণ হলেও, আমি আর-একবার নন্দিনীর মুখে রাজকুমারীর মহিমান্বিত রূপের ঝিলিক দেখতে পেলাম।

১৬

—আপনি আপনার ছেলেকে ভালোবাসেন?

টিকিট চেকারটি সচকিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ আবার

কী প্রশ্ন? নিজের ছেলেকে কে না ভালোবাসে?'

—আপনার ছেলে আপনাকে খুব ভালোবাসে?

—ঐ যে বললাম আপনাকে, ছেলেটা হয়েছে এমন, মায়ের চেয়ে বাপের ওপরেই বেশি টান—কিছুতেই ছাড়তে চায়না, নাইটডিউটির সময় তো ওকে এড়িয়ে আসাই মুশকিল আমার। শেষকালটায় বাথরুমে যাবার নাম করে—একরকম পালিয়েই আসতে হয়— বুঝলেন না, চারমেয়ের পর একছেলে তো, আদরটা একটু বেশিই।'

—ছেলের নাম কী?

—দেবব্রত। ডাক নাম কিন্তু দেবু নয়। দেবু যেন একটু বুড়ো বুড়ো—ওর ডাকনাম মানিক, আমার বউ তো মশাই চেয়েছিল ছেলের নামের জন্য তারাশঙ্কর বাঁড়ুজ্যে কিংবা বনফুলকে চিঠি লিখবে, তা আমি বললাম ওঁরা ব্যস্ত মানুষ—

ভদ্রলোক গড়গড় করে অনেককথা বলতে লাগলেন। বহুদিন বোধহয় আমার মতন এরকম নিরীহ শ্রোতা পাননি। মধ্যরাত্রে ট্রেন ছুটছে প্রচণ্ড বেগে, দারুণ শীত, কামরায় বেশি লোক নেই—বেশ হাত-পা মেলে ছড়িয়ে শোওয়া যায়, শরীরটা চাইছিলও শুয়ে পড়তে, কিন্তু ইচ্ছে করেই বসে আছি। আমাকে রাত তিনটের সময় নামতে হবে রাজখারসোয়ানে। এখন একবার ঘুমিয়ে পড়লে—রাত তিনটেয় ঘুম ভাঙা অসম্ভব—স্টেশন পেরিয়ে যাবে। টিকিট চেকারটি নিজের কাজ সেরে আমার পাশেই বসেছিলেন —সুতরাং আমিই নিজের থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করেছি। আর এরকম মাঝবয়সী লোকদের সঙ্গে আলাপ জমাবার সবচেয়ে সহজ উপায় তাদের ছেলেমেয়ের গল্প বলার সুযোগ দেওয়া।

লোকটি ছেলের কথায় একেবারে গদগদ। এক ছেলে ছাড়া তার যে আরও চারটি মেয়েসন্তান আছে—তাদের কথা ভুলেই গেছেন, শুধু ছেলে কী করে, কেমন করে খায়, তার কত বুদ্ধি—এই নিয়ে সাতকাহন।

আমি মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করছিলাম। মাছ ধরে তুলবার আগে যেমন বঁড়শিতে অনেকখানি সুতো ছাড়তে হয়—আমিও তেমনি লোকটিকে কিছুক্ষণ সুযোগ দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেকে কী পড়াবেন ঠিক করেছেন?'

—এখন কী পড়াশুনোর কথা? মোটে তো সাড়ে-তিনবছর বয়েস।

—তবুও আগে থেকে প্ল্যান না-করলে আজকাল ছেলেমেয়েদের...

—ভাবছি, হাজারিবাগে মিশনারি স্কুলে দেব—ওখানে আবার বোর্ডিং তো —আমার ওয়াইফ কি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবে... আমারও হেঁ—হেঁ—

—আর্টস পড়াবেন, না সায়েন্স?

—আর্টস পড়ে আজকাল কী হয়? কিছু না! সায়েন্সেই দেব—তারপর যদি

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে...আজকাল অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেও বেকার—

—ছেলেকে আপনার মতন রেলের চাকরিতে ঢোকাবেননা?

—রেলের চাকরি? ছ্যা-ছ্যা—এরকম ছ্যাঁচড়া কাজ—আমার তেইশবছর সার্ভিস হয়ে গেল, তবু তো প্রমোশন পেলামনা সেরকম, না মশাই ছেলেকে আর এ-লাইনে দেবনা।

—কেন, রেলের চাকরিতে তো আয় কম নয়। আপনি তো আজ এইরাত্রেই অন্তত তিরিশ টাকা রোজগার করলেন দেখলাম। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি এর চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করতে পারবে?

লোকটি তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমিও সোজাসুজি তাকিয়ে রইলাম, চোখ সরিয়ে নিলামনা। তখন থেকে রাগে আমার শরীর জ্বলছিল। লোকটিকে চরম আঘাত দেবার জন্য আমি মনে-মনে তৈরি হচ্ছিলাম। ডালটনগঞ্জ থেকে আসার পথে পুরো রাস্তাতেই জোচ্চুরির একটা বিরাট জাল আমার চোখে পড়েছিল। এ-লাইনে থার্ডক্লাসে অধিকাংশ যাত্রীই আদিবাসী ওরাওঁ-সাঁওতাল কিংবা দরিদ্র বিহারী—গোটা কামরায় আমার মতন তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর লোক মাত্র পাঁচ-সাতজন, এবং আমরাই শুধু টিকিট কেটেছি। বাকি আর একজনও টিকিট কাটেনি! টিকিট কাটার কোন রেওয়াজই নেই মনে হল ওদের মধ্যে। রাত্তিরবেলা টিকিট কাউন্টারে লোক থাকেনা সবসময়—থাকলেও একজনকে টিকিট দিতেই অনাবশ্যক দেরি করে—খুচরো পয়সা না-থাকার ওজর তুলে টিকিটকাটা বন্ধ রাখে, ইতিমধ্যে ট্রেন এসে যায়—সবাই তখন টিকিটের লাইন ছেড়ে দৌড়ে ট্রেনে উঠতে যায়—গেটের কাছে একজন চেকার দাঁড়িয়ে থাকে হাত পেতে—সবাই তার হাতে সিকি-আধুলি গুঁজে দিয়ে যায়। এখন কামরার মধ্যে ওরা মড়ার মতো পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে—একটু আগে এই টিকিট-চেকার ভদ্রলোকটি যখন সবাইকে ধাক্কা মেরে টিকিট চাইছিলেন, প্রত্যেকেই চোখ না-খুলেই হাত বাড়িয়ে একটি করে আধুলি বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমিই শুধু বোকার মতন সাড়ে-পাঁচটাকা খরচ করে টিকিট কিনেছি। অন্তত সত্তর-আশিটি আধুলি এই চেকার ভদ্রলোকের পকেটে ঝনঝন করছে।

ভদ্রলোক একটু কঠোরভাবে বললেন, 'তার মানে?'

আমি হেসে বললাম, 'মানে তো আপনিও জানেন, আমিও জানি। রাগ করছেন কেন? আমি তো পুলিশ নই, আপনার কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু আমার কৌতূহল মেটাচ্ছি! আপনার যা রোজগার দেখলাম, তাতে মনে হয়—আপনার ছেলেকে এই লাইনে ঢোকানোই তো স্বাভাবিক।'

ছেলের প্রসঙ্গ তুলে অনেকক্ষণ কথা বলায় ভদ্রলোকের মনটা নরম হয়ে

গিয়েছিল। আমার কাছে তিনি আর লুকোলেন না। খানিকটা অনুতাপের সঙ্গে বললেন, 'এইজন্যই তো ছেলেকে আর এ-লাইনে আনবনা। আমরা এ-জীবনটা অধর্ম করে গেলাম, পেটের দায়ে অনেকরকম কাজ করেছি—কিন্তু ওকে আর এসব পাপের মধ্যে আনবনা। ও যাতে সৎভাবেই নিজেরটা নিজে, মানে বুঝলেন না, দিনকাল কি আর চিরদিন এক থাকবে? ওরা যখন বড় হবে তখন অবস্থা অনেক পালটে যাবে—তখন রেলেও কি আর এসব চলবে ভাবেন?'

—তাহলে আপনার মনে হয় দিনকাল বদলাবে?

—বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে!

—কিন্তু আপনার এই বাইশবছর সার্ভিসে কিছু বদলেছে দেখলেন? নাকি অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে! ব্রিটিশ আমলে কি এত বিনাটিকিটে লোক যেত?

—সেকথা ছাড়ুন, কিন্তু অবস্থা এরকম থাকবেনা। আমি বলে রাখছি, দেখবেন, আপনারও তো বয়েস বেশি না ; দেখে যাবেন দেশের অবস্থা এরকম থাকবেনা —পরবর্তী যুগের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ইয়ে, মানে তারা অন্যায় সহ্য করবেনা—

খুব আশাবাদীর মতন ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাফলারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে তিনি ভবিষ্যতের একখানা মহান ছবি আঁকতে লাগলেন। আমি এবার ওঁকে চরম অস্ত্রখানা দিয়ে আঘাত করার জন্য শান দিতে লাগলাম।

আমি খুব বিনীত কাচুমাচু ভাবে বললাম, 'দেখুন, অনেকদিন থেকেই আমার একটা কৌতূহল আছে, যদি কিছু মনে না-করেন, একটা প্রশ্ন করব?'

—করুন-না। যা খুশি আপনার বলুন, আমাদের আর মনে করা না-করা।

—আচ্ছা আপনার কি মাঝে-মাঝে এরকম ভয় হয়না—যে, আপনার ছেলে বড় হয়ে উঠে আপনাকে আর একটুও ভালোবাসবে না, একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা করবেনা?

—সে তো আজকাল অনেক ছেলেমেয়েই—সেকথা কে বলতে পারে? তবে ঠিক মতন যদি শিক্ষা দেওয়া যায়—ভদ্র-সভ্য ছেলে কি আর একেবারেই নেই বা থাকবে না বলতে চান?

—না, আমি তা বলতে চাইনা। ঠিক মতন শিক্ষা পাওয়া ছেলেদের কথাই আমি বলছি। ঠিক মতন শিক্ষা পেলে আপনার ছেলে কি আপনাকে ঘেন্না করতে শুরু করবেনা?

—ঘেন্না করবে? নিজের বাবাকে? শিক্ষা মানে এই?

—শিক্ষা পেলেই সে ন্যায়-অন্যায় স্পষ্ট বুঝতে পারবে। তখন কি সে বুঝতে পারবেনা যে, তার বাবা একজন চোর? তার বাবা এইসব গরিব-দুঃখী সাঁওতালদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। ঐ যারা লেংটি পরে থাকে, শীতের রাত্রেও একটুকরো ন্যাতা জড়িয়ে থাকে—তাদের হাত থেকে আধুলি নিয়ে আপনি আপনার ছেলেকে জামাকাপড় কিনে দিয়েছেন! এতে কি তার প্রচণ্ড একটা রাগ হবেনা? কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু আপনার একার কথাই বলছিনা—অনেকদিন থেকেই আমার জানার কৌতূহল—যারা চুরি কিংবা ব্ল্যাকমার্কেট করে, যারা ঘুষ নেয়, যারা মানুষকে ঠকিয়ে নিজের বাড়ি-গাড়ি বানায়, তারা আর সবকিছু অগ্রাহ্য করতে পারে—তারা দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথাও হয়তো ভাবে কিন্তু একথাও কি তারা একবারও ভাবেনা—যে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরাই একদিন তাদের ঘেন্না করবে! নিজের ছেলেমেয়ের ভালোবাসা পেতেও তারা চায়না? নাকি এইসব চোরদের ছেলেমেয়েরাও চোর হয়? তাদের আরও বড় চোর করে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনার ছেলেকেও কি আপনি চোর করবেন!

—না, না নিষ্পাপ শিশু, তাকে আমি...আমি ওকে সুশিক্ষাই দেব। তাতে যদি ও আমাকে ঘেন্না করে তো করুক! আপনি বুঝবেন না, এখানে এ-লাইনে আমি যা করছি —তা না-করেও উপায় নেই, অনেকেই এটা করছে, আমি একা যদি ভালো হবার চেষ্টা করি—তাতে আমিই শুধু ঠকব, সবাই আমাকে বলবে বোকা —আমি একা বেশি বাড়াবাড়ি করলে, একা-একা সৎ হবার চেষ্টা করলে হয়তো তারাই আমার বিরুদ্ধে...তবু একজন রুখে দাঁড়ানো উচিত ছিল, আমি পারিনি, সংসর্গ দোষে আমিও অসৎ হয়েছি—কিন্তু আগামীকালের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই এ-সবকিছু ভেঙে ফেলবে—আমি আমার ছেলেকে সেই শিক্ষাই দেব—তার ফলে যদি ওর বাবার প্রতিও ওর ঘেন্না আসে তো আসুক—তবু ও তো সৎ হবে—এই আমার সান্ত্বনা।

১৭

অনাদিবাবুকে দেখতাম ভোর সাড়ে-চারটায় উঠে বাগানে যেতেন। দেখতাম অথবা শুনতামও বলা যায়। আমি তো জীবনে সূর্যোদয়ই দেখেছি কয়েকবারমাত্র। বস্তুত চড়া লাল রং আমার সহ্য হয়না বলেই ভোরের সূর্য আমি পছন্দ করিনা, ঘুম ভেঙে চোখ খুলে তাকাই সেই তখন, যখন ভোরের লাল সূর্য বেশ হলদেটে হয়ে

এসেছে। এবং শেষ বিকেলেও আমি সাধারণত অফিসে বা চায়ের দোকানে বন্দী থাকি বলে—গাঢ় সূর্যাস্তও আমার জীবনে খুব বেশি দেখা হয়ে ওঠেনি। আমার দিন কাটে ফ্যাকাসে—ঝাপসা রঙের মধ্যে। কিন্তু রিটায়ার্ড উকিল অনাদি সেনগুপ্ত গত পঞ্চাশ বছর ধরে নাকি ভোর সাড়ে-চারটার সময় ঘুম ভেঙে বাইরে আসেন।

বছর দুয়েক আগে আমি কিছুদিন বর্ধমানে ছিলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই অনাদিবাবুর বাড়ি, আমার শোবার ঘরের পিছনেই তাঁর বাগান। প্রত্যেক দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তের আগে বাগানে অনাদিবাবুর গান ও নাচে আমার ঘুম ভাঙে। অনাদিবাবু যখন বাগানে আসেন, তখন তাঁর হাতে জলের ঝারি ও খুরপি, পরনে হাফপ্যান্ট ও পায়ে ঘুঙুর। গলায় রামপ্রসাদী গান, গানের সঙ্গে তাল ঠোকেন ঘুঙুর বাজিয়ে। এক-একদিন ঘুম ভেঙে, তখনও সূর্য ওঠেনি, শিয়রের জানালা দিয়ে আমি তাকিয়ে দেখেছি, বাগানের প্রত্যেকটি ফুলগাছের পাশে ঘুরে-ঘুরে অনাদিবাবু নেচে-নেচে গান করছেন, আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী—। তখন হয়তো কোন স্বপ্ন দেখতে-দেখতে আমার ঘুম ভেঙেছে সেই অপ্রাকৃত আলোয়। অনাদিবাবুর অস্তিত্বও আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হয়, কিছুক্ষণ দুর্বোধ্যতার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আবার আমি বিছানায় পাশ ফিরে ভাঙা ঘুম মেরামত করার চেষ্টা করেছি।

অনাদিবাবু কিন্তু পাগল বা বাতিকগ্রস্ত নন। গান বা নাচের সঙ্গে গাছপালার ফলন বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে—এরকম বিশ্বাসও তাঁর নেই। আসলে তাঁর খুব সাপের ভয়, বাগানে যদি সাপ থাকে এই আশঙ্কায় তাঁর গান ও নাচ—শব্দ পেলেই নাকি সাপ দূরে চলে যায়। এবং ওঁর ঘুঙুর পরার খবর ওঁর বাড়ির বাইরে আমি ছাড়া আর তো কেউ জানেনা। বাগানের সম্পূর্ণ পরিচর্যা সেরে সাতটা আন্দাজ তিনি আমার জানলার পাশে এসে গলা খাকারি দিয়ে ডাকতেন, 'কী, ঘুম ভাঙল? ইয়ংম্যানের পক্ষে এত ঘুম—আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ—এই হচ্ছে গিয়ে...।' তখন আমি গভীর ঘুমে মগ্ন এবং সকালের ঘুম একডাকে ভাঙেনা।

অনাদিবাবুকে আমার গোড়ার দিকে বেশ ভালোই লাগত। রিটায়ার্ড লোকেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলেন, এবং উনিও সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে রাজ্যের কথা শোনাতেন, কিন্তু ওঁর কথা শুনতে প্রথম-প্রথম আমার মোটেই খারাপ লাগতনা। লোকটির পুষ্পপ্রীতি ছিল অসাধারণ। স্বাস্থ্যবাতিক কিংবা অন্যকিছুর জন্যই ভোরে ওঠা নয়, শুধুই বাগানের জন্য। শুধু সকাল নয়, সারাদিনই প্রায় বাগানে কাটে তাঁর। এবং রিটায়ার করার বহু আগে থেকেই এই শখ। বেশ বড় বাগান, অনেক ফুল ফোটে— যদিও অনাদিবাবু ফুল বিক্রিটিক্রি করার কথা ভাবেননা, ফুলের আর কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি ফুলগুলোকে নিষ্কামভাবে ভালোবাসেন। নতুন গোলাপের চারা লাগাবার পর ওর ধৈর্য ডারুইনকেও হার

মানায়। যতক্ষণ-না সেই গাছে ফুল ফুটছে—তিনি একাগ্রভাবে সেদিকে চেয়ে থাকেন। সকালবেলা যেদিন এসে বলেন, 'জানেন এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলামনা'—তখন ওঁর দীর্ঘশ্বাস ও করুণ মুখচোখে ফুটে ওঠে পুত্রশোক, কিন্তু আসলে মারা গেছে একটা চন্দ্রমল্লিকার চারা। মফস্বল আদালতের উকিল ছিলেন, জীবন কেটেছে নোংরা আদালতঘরে, চোর জোচ্চোর আর বদমাসদের সঙ্গে, তবু কী করে ওঁর এমন সৌন্দর্যবোধ রয়ে গেছে ভেবে আমি আশ্চর্য হতাম। উনি আমাকে বিভোর হয়ে বলতেন, 'ক্যালিফোর্নিয়ান পপি যখন প্রথম ফোটে—ফুলের ভেতরটায় তাকিয়ে দেখবেন, কী নরম রং, ওরকম রং আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখবেননা!... ঐ ক্যামেলিয়াটা আজ ফুটল, দেখুন, দেখুন, যেন ঠিক রাজকন্যার মতন তাকিয়ে আছে।... ওটা কী ফুল বলুন তো? চিনতে পারলেননা? কাঞ্চন! ওকি, আপনি অতসীও চেনেননা? অবশ্য এরকম ডবলঅতসী আমিও আগে দেখিনি! ওটা? ওটা বিদেশি ফুল—ওর নাম নাসটেসিয়ান। আহা, এই বেলফুলগুলো দেখুন, বড় অভিমানী ওরা, একটু যত্নের ত্রুটি হলেই, কিন্তু কী রূপ, আহা, চক্ষু সার্থক!'

ফুল সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন কোন ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু ফুল সম্পর্কে অনাদিবাবুর ওরকম আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে আমার ভালোই লাগত। তাছাড়া, আমার শিয়রের জানলা দিয়ে যখন তাঁর বাগানের নানান ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধ ভেসে আসত— তখন আমি বিনাপয়সায় আনন্দ উপভোগের স্বাদ পেতাম। অনাদিবাবুর তেমনকিছু শিক্ষাদীক্ষা ছিলনা, কথা বলে দেখেছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওর কোন জ্ঞানই নেই। বেশির ভাগ লোকই যেরকম হয়, ইস্কুল-কলেজে পড়েছেন ডিগ্রি নেবার জন্য, বাকি জীবনটা খরচ করেছেন জীবিকার জন্য; এর বাইরে আর-কিছু নেই—তবু এই অপ্রয়োজনীয় পুষ্পপ্রীতি ওঁর মধ্যে এল কী করে? তবে কি ওঁর ভিতরে কোন আলাদা সৌন্দর্যবোধ আছে—যা শিক্ষা কিংবা প্রেরণার অপেক্ষা রাখেনা? কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধটাই বা কী করে একতরফা হয়। অনাদিবাবুর বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আমি খুবই দমে গেছি!

অনাদিবাবুর বাগান ঝকমকে তকতকে সাজানো, কোথাও একটু অনাবশ্যক আগাছা বা ময়লা নেই, ছবির মতন। কিন্তু ওর বাড়িটা যাচ্ছেতাই। অনাদিবাবুর তিন ছেলে—দুই মেয়ে, বড় ছেলে অসবর্ণ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। খুব একটা অভাবের সংসার নয় কিন্তু বাকি ছেলেমেয়েগুলোর বিশ্রী জামাকাপড়, সারা বাড়িটা অগোছালো ছন্নছাড়া। বারান্দায় বসার জায়গা, কয়েকখানা বাজে ক্যালেন্ডার ঝুলছে, কাপড়ের ওপর সুচের শেলাই-করা পুকুরপাড়ে তালগাছের একটা বিকট ছবি বাঁধানো। অনাদিবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন 'গোবিন্দর মা' ব'লে, বললেন, 'আমাদের

ইয়েকে চা দাও এক কাপ—আবার চোদ্দঘণ্টা লাগিয়ো না!'—চা নিয়ে এল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, যথারীতি কাপের কানাগুলো ভাঙা। মেয়েটি বলল, 'বাবা, তোমাকেও চা দেব?' অনাদিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'দিবি না তো কী! আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে।' মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, অনাদিবাবু আবার ডেকে বললেন, 'এই ভুন্টি (বেশ দেখতে মেয়েটিকে, অথচ তার নাম ভুন্টি) তুই আবার ব্যাঁকা সিঁথি করেছিস! ইস্কুলে গিয়ে এইসব বিবিয়ানা শিখছিস—ছাড়িয়ে দেব—।' মেয়েটি থতমত খেয়ে বলল, 'কই না তো! দিদি তো চুল বেঁধে দিয়েছে!' আমি তাকিয়ে মেয়েটির চেহারায় কোন বিবিয়ানার চিহ্ন দেখতে পেলামনা। ঐটুকু মেয়ের রঙিন ফ্রক পরাই উচিত ছিল, বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করলেই ওকে মানাত বেশি, কিন্তু সেসব বোধহয় ওর বাবার পছন্দ নয়, মেয়েটি একটা সাদা রঙের (সুতরাং আধময়লা) শাড়ি-পরা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, আজকালকার মেয়েদের ধরনে সিঁথিটা বুঝি একটু বাঁপাশে। বাবার সামনে ভয়ে মেয়েটির মুখ আড়ষ্ট। অনাদিবাবু ফের বললেন, 'দিদি? দিদি তো সিনেমা দেখে ওসব শিখছে! দাঁড়া আজ আসুক হারামজাদী!' বলেই অনাদিবাবু ফড়াৎ করে সিকনি ঝেড়ে চেয়ারের গায়েই হাত মুছলেন। ঘেন্নায় আমার গা বমি-বমি করছিল, কোনক্রমে বিদায় নিয়ে ওর ফুলবাগানে মধ্য দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

এ কী ধরনের সৌন্দর্যবোধ? ভাষায় রুচিজ্ঞান নেই, আচার-ব্যবহার অসুন্দর, অথচ ফুলের সৌন্দর্যকে ভালোবাসার কী যুক্তি? এখনো কানে ভাসে অনাদিবাবুর কথা : সব সাদাফুলই কিন্তু একরকম সাদা নয় বুঝলেন, রজনীগন্ধা আর গন্ধরাজ —এ-দুটো হাতে নিয়ে দেখুন, দুটো দুরকম সাদা। পপি ফুলের ভেতরে তাকিয়ে দেখবেন, আহা কী নরম রং!— এই অনাদিবাবুকেই দূর থেকে চিৎকার করতে শুনেছি : এই লেটো (ছেলের নাম) আবার রেডিও খুলেছিস! দিনরাত খালি গান-বাজনা—হারামজাদা ছেলে, জুতিয়ে তোমার—। দুর্বোধ্য মানুষ!

এরকম মানুষ আমি আরও অনেক দেখেছি। সেজো মাসিমাকে দেখেছি, গল্প-উপন্যাস পড়ার কী দারুণ নেশা। রোজ লাইব্রেরি থেকে বই আনা চাই-ই। শিকার কী অ্যাডভেঞ্চার তাঁর ভালো লাগেনা, তাঁর চাই শুধু প্রেমের কাহিনী। এবং সে-প্রেমও ব্যর্থ হলে চলবেনা। প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'দূর, দূর, এ-কী বই এনেছিস! একেবারে বাজে বই। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা-মেয়েটাব ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল!'—সেই সেজো মাসিমাকেই দেখেছি, কোথাও চেনাশুনো কেউ প্রেম করে বিয়ে করলেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন! বলতেন, 'ছি ছি, বাবা-মার কথা একবার ভাবল না, ছি ছি—।' আমার মামাতো ভাই এম-এ পড়ার সময় ক্লাসের একটি মেয়েকে বিয়ে করল বলে মাসিমা সে-বিয়েতে নেমন্তন্নই খেতে গেলেননা!

—এরও না হয় মানে বুঝি, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর চরিত্রর কী মানে হয়?

শশাঙ্কবাবু একজন প্রৌঢ় শিক্ষক, আমাদের প্রতিবেশী। জোয়ান দশাসই চেহারা, শিক্ষক হবার বদলে মিলিটারি অফিসার হলেই তাঁকে মানাত। সকালে-দুপুরে মাস্টারি, তারপরও টিউশানি—দিনরাত অর্থোপার্জনের নেশায় কাটছে। কিন্তু ওঁরও একটা অদ্ভুত নেশা আছে। বাড়ি ফেরার পথে তিনি প্রায়ই একটা কুকুরছানা কিংবা বিড়ালছানা নিয়ে আসেন। রাস্তার পাশে যদি দেখেন কোন অসহায় বিড়ালছানা কিংবা কুকুরছানা মিঁউ-মিঁউ বা কেঁউ-কেঁউ করছে, তিনি জলকাদা-মাখা অবস্থাতেও তাকে বুকে তুলে আনবেন। এই দুর্মূল্যের দিনেও খেয়ে ওঠার পর তিনি আট-দশটা কুকুরকে রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাওয়ান। অনেকে বাড়ির বেড়াল পার করার জন্য শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে আসে। ওঁর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক শস্তায় পেয়ে চারটি মুরগি কিনেছিলেন একবার, প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে খাবেন—এই মতলবে। তার মধ্যে দুটো মুরগি সকালবেলা শশাঙ্কবাবুর পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন, দুটো মুড়ি ছড়িয়ে দিলেন ওদের জন্য। সেগুলো মুহূর্তে শেষ করে মুরগি দুটো আবার মুখ তুলে চাইল। শশাঙ্কবাবু হাসতে-হাসতে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, দ্যাখ, মুরগিদুটো আমার কীরকম পোষা হয়ে গেল, হাত থেকে নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে!—তারপরই শশাঙ্কবাবু চলে গেলেন তার প্রতিবেশীর কাছে, ও মুরগিদুটো মারা চলবেনা। অনেক ঝুলোঝুলি করে তিনি সে-দুটোকে কিনে নিলেন, সে-দুটো বাড়িতেই থেকে গেল। ছাগলের বাচ্চা কোলে নিয়ে শশাঙ্কবাবুকে ছুটির দিনে মর্নিং ওয়াক করতেও আমি দেখেছি। পিছনে চলেছে কুকুরের পাল।

শশাঙ্কবাবুকে কি দয়ালু লোক বলব? ইস্কুলে ছাত্ররা ওঁর নাম দিয়েছে যমরাজ। ছেলেরা ওঁকে যমের মতোই ভয় করে এবং ওর হাতের থাপ্পড় খায়নি —এমন ছেলে একটিও নেই। ঐ বিশাল পুরুষের হাতের থাপ্পড় যে কী ভয়াবহ তাও অনুমান করা যায়। শুনেছি ঐ ইস্কুলের ভোজপুরী দারোয়ানকে কী যেন কারণে তিনি একবার চড় কষিয়েছিলেন, সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে চাকরি ছেড়ে দেয়।

আমি শশাঙ্কবাবুর ছাত্র ছিলামনা, কিন্তু ওঁর নিষ্ঠুরতার কিছু কিছু কথা জানি। এক রবিবার সকালে আমি কোন কারণে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা বলছি, এমন সময় একটা বাচ্চা ভিখারি মেয়ে ভিক্ষা চাইতে ওঁর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কথা থামিয়ে শশাঙ্কবাবু ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'একেবারে বারান্দার ওপর উঠে এসেছে? অ্যাঁ? যত রাজ্যের অজাত-কুজাত ছোটলোক—একেবারে ঘরের মধ্যে, সাহস বেড়ে গেছে, না?' বলতে-

বলতেই উঠে গিয়ে শশাঙ্কবাবু সেই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মেয়েটির কান ধরে মুচড়ে দিলেন। ঐ বিশাল পুরুষের হাত এবং রোগা-পাতলা মেয়েটির কান, মেয়েটা তীব্রভাবে কেঁদে উঠল আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কানের গোড়া থেকে রক্ত পড়তে লাগল। শশাঙ্কবাবু বললেন, 'দূর হ!' শশাঙ্কবাবুর ঘরে-বারান্দায় কুকুর-বেড়াল-ছাগল মুরগি যথেষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পাশেই পড়ল মেয়েটির কয়েক ফোঁটা রক্ত। আমি আবার গাঢ় লাল রং দেখতে পারিনা—তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম, শশাঙ্কবাবুর ছোট ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেটা যখন খেতে বসেছিল, একটা কুকুর বাচ্চা এসে একেবারে ওর ভাতের থালায় মুখ দেয়। রাগের চোটে ছেলেটা, মোটে এগারো বছর বয়েস, গেলাশ ছুঁড়ে মারে কুকুরটার দিকে। কুকুরটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে সমস্ত পোষা জন্তু-জানোয়ারের একবার খবর নেওয়া শশাঙ্কবাবুর অভ্যেস। সেদিন ফিরে ঐ ব্যাপার দেখে তিনি ছেলেকে তুলে প্রবল আছাড় দিয়েছেন। ছেলেটা সেই থেকে রক্তবমি করছে, বাঁচবে কি না সন্দেহ। কী বলব একে? দয়া?

১৮

মাত্র চারজন যুবক, তারা প্রায় আড়াইশো নারী-পুরুষকে দমন করে রেখেছে।

দেখলে বেশ আনন্দ হবারই কথা। যৌবনের এই প্রচণ্ড শক্তি ও তেজই তো কাম্য। হোক-না একটু অসভ্য, একটু উগ্র, কিন্তু দুঃসাহস জিনিশটা সবসময়ই দেখতে ভালো লাগে। মাত্র চারজনে মিলে তো এতজন মানুষকে ভয় পাইয়ে রেখেছে।

শহরতলী। একদিকে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। তার পাশে একটা চওড়া খাল। খালের ওপর ছবির মতন একটা কাঠের ব্রিজ, তার ওপারে ধানক্ষেত। খালপাড়ে কিছুটা জায়গা সিমেন্ট বাধানো, আশেপাশে কিছু ঘাসও পুরু হয়ে আছে। সারাদিন অসহ্য গরমের পর অনেকে ঐ জায়গাটায় বসতে আসে। দক্ষিণদিকটা বহুদূর উন্মুক্ত, তাই হু হু করে হাওয়া ছুটে আসে —বঙ্গোপসাগর থেকে একশো মাইল ছুটে এসেও সে-হাওয়া ক্লান্ত নয়, কলকাতায় এসে সে-হাওয়া একেবারে নীরস হয়ে যায়নি।

পার্ক নয়, তবু এ-অঞ্চলে বেড়াবার পক্ষে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ঐ

খালধারের সিমেন্ট বাঁধানো পাড়, ঘাসের আসন আর কাঠের ব্রিজ। কাঠের ব্রিজের গায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালে বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। স্রোতে কচুরিপানার ভেসে যাওয়া দেখলে এক ধরনের বুক-মোচড়ানো উদাসীনতা আসে।

প্র্যামে বাচ্চা বসিয়ে মায়েরা এখানে একটু হাঁপ ফেলতে আসে। ছুটোছুটি করতে আসে বাচ্চার দল, ফ্রক-পরা কিশোরীরা ফড়িং ধরার জন্য দৌড়ায়। প্রেমিক-প্রেমিকার হাত মাটি থেকে ঘাস ছেঁড়ে, জলের ছায়ায় তাদের ঘন-ঘন মুখের ভাব বদলায়। দু-চারজন বৃদ্ধ কনুই চুলকোতে-চুলকোতে কথার ফোয়ারা ছোটায়। আর হাওয়া সবাইকে বারবার ছুঁয়ে যায়। সারাদিন গরমের পর এরকম মখমলের মতন মোলায়েম বাতাস ভারি বিস্ময়কর লাগে, মনে হয়, পৃথিবীতে এখন এই মুহূর্তে, যে জিনিশটা সবচেয়ে আরামের—সেটাই বিনামূল্যে এমন অপর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে কী করে?

এই দঙ্গলটার অধিপতি সেই চারজন যুবা। তাদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য আছে, পোশাক দেখলেই বোঝা যাবে— তারা আর-সবার আলাদা। কালোরঙের খুব সরু প্যান্ট, কোমরে বেলটের বাকলসে জোড়া তলোয়ার কিংবা বাঘের মুণ্ডু মনোগ্রাম করা, লাল-কালো-সবুজে এমন অদ্ভুত বিকট কম্বিনেশানের জামাকাপড়, মিলগুলো ঐ ধরনের জামার কাপড় শুধু এইরকমের যুবাদের জন্যই তৈরি করে মনে হয়, বাঙালি হলেও এদের হাতে লোহার বালা, মাথার চুল তেল চুকচুকে এবং বিচিত্র কায়দায় আঁচড়ানো।

এই যুবক চারজন কোন-একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসেনা, এরা টহল দিয়ে বেড়ায়। এদের দেখামাত্রই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। প্রেমিক-প্রেমিকারাও চুপ করে গিয়ে সরে বসে, বাচ্চারা খেলা থামায়, বুড়োরা কথা বন্ধ করে।

এরা আড়ে-আড়ে চায়। বাচ্চারা হয়তো একটা বল নিয়ে খেলছে—এরা মাঝখানে এসে একটা শট দিয়ে বলটা বহুদূরে পাঠিয়ে দেয়, খলখল করে হাসে। বাচ্চাদের মায়েরা কিছু বলতে গিয়েও থেমে যান। প্রেমিক-প্রেমিকাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় এরা গলা খাঁকারি দেয়, চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওকি হচ্ছে? ওকি হচ্ছে? মাকে বলে দেব!' জলের ধারে ঝুঁকে-বসা প্রেমিক-প্রেমিকা মরা গাছের মতো কাঠ হয়ে যায় তখন। বুড়োদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ও এরা বলে, 'এই যে দাদু, একটা সিগ্রেট হবে? ছাড়ুন-না একটা।' বৃদ্ধরা থুতনি নাড়া বন্ধ করে নিথর হয়ে যান, বোঝা যায় ভিতরে-ভিতরে তাঁরা জিভ দিয়ে দাঁতের মাড়ি চেপে আছেন, দু-একজন বৃদ্ধ আবার এদের খাতির করে সিগারেট বাড়িয়েও দেন।

একদিন একজন প্রেমিক বুঝি প্রতিবাদ করেছিল। ঠিক প্রেমিক না, দুটি মেয়ের সঙ্গে তাদের দূর সম্পর্কের মাসতুতো দাদা। দূর সম্পর্কের মাসতুতো দাদাকে অর্ধেক প্রেমিক বলা যায়। সে দুটি যুবতীকে দুপাশে বসিয়ে কোন

বীররসের গল্প বলছিল, এই সময় এই চারজন যুবক পিছন থেকে আওয়াজ দেয়। সে তখন তেড়ে আসে—চেঁচিয়ে বলে, 'কী ভেবেছেন কী আপনারা? লোকে ভাইবোনদের নিয়েও বেড়াতে আসতে পারবেনা? যা খুশি তাই করবেন? কুচ্ছিৎ অসভ্য কথা এইসব ছোটি ছেলেমেয়েদের সামনে—'

তার ফলে সেই চারজন, সেই মাসতুতো দাদা প্রেমিককে চ্যাংদোলা করে তুলে জলে ফেলে দেয়। সে সাঁতার জানতনা, জলে নাকানি-চোবানি খেয়ে যখন প্রায় ডুবতে বসছিল, মেয়ে দুটি চেঁচাচ্ছিল অক্লান্তভাবে—তখন সেই চারজনই তাকে জল থেকে তুলে দিল! তার কলার ধরে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, 'কী চাঁদু, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে? নাকি আর-একটু মধ্যমনারায়ণ লাগবে?'

প্রতিবাদ করেছিল একজন বৃদ্ধও। ওরা সিগারেট চাওয়ায় বৃদ্ধটি খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, 'কী, তোমার ঠাকুর্দার বয়েসী আমি, আমার কাছে সিগারেট চাইছ? কী ভেবেছ কী! হাওয়াটাকেই নোংরা করে দিলে এরা—'

এ-কথা শুনে সেই চারজন হাসতে আরম্ভ করে। বৃদ্ধ গাড়ি চেপে এসেছিলেন, ওরা হাসতে-হাসতে গাড়িব চাকার হাওয়া খুলে দিল, বৃদ্ধের ছড়িখানা পাশে পড়েছিল--সেখানা তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে-করতে ভেঙেই ফেলল। ওদের একজন বৃদ্ধের কাছে এসে হাসতে-হাসতে ভাঙা টুকরো দুটো ফেরত দিয়ে বলল, 'স্যরি দাদু, ছোট ছেলে তো আমরা—খেলা করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছি।'

আর-কেউ এখন প্রতিবাদ করে না। ওরা যখন পাশ দিয়ে যায়—সবাই বিনয়াবনতভাবে চুপ করে থাকে। যেন সম্রাটের সামনে বাধ্য প্রজা। না, এ-উপমাটা ঠিক হলনা, এই আড়াইশো নারী-পুরুষ যেন ওদের ক্রীতদাস—স্প্যানিশ দস্যুরা যখন ক্রীতদাসের ঝাঁক নিয়ে যেত—তখন তাদের চাবুকের সামনে ক্রীতদাসরা যেমন ভয়ে নিথর হয়ে থাকত—দৃশ্যটা সেইরকম।

ঐ চারজন যুবককে আমি অপছন্দ করতে পারিনি। ওদের ঔদ্ধত্য ও অসভ্যতা সীমাহীন, কুশিক্ষা ও কুরুচির ফলে ওরা সৌন্দর্য কিংবা সম্মান—কোনটারই মূল্য জানেনা। কিন্তু ওদের দুঃসাহসও তারিফ করার মতন—বাংলাদেশে দুঃসাহসও তো খুব সুলভ দৃশ্য নয়। ওরা নিজেদের কব্জির জোরের ওপর বিশ্বাসী, ওরা বেপরোয়া, ওরা কারুক্কে ভয় করেনা। ওরা জেনে গেছে, এই আড়াইশো লোক কখনো একতাবদ্ধ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেনা। সে উপাদান এদেশে নেই। ওরা তাই জনতাকে ভয় করেনা। ওরা পুলিশ কিংবা মৃত্যুকেও ভয় করেনা। ওদেরই মতন যুবকরা তো প্রায়ই গুণ্ডামি-বদমায়েসীর অভিযোগে পুলিশে ধরা পড়ছে, জেল-ফাঁসি হচ্ছে, তবু তো ওদের স্রোত ও তেজ কমেনি, ওরা দমে যায়নি। এই দুঃসাহসটুকুর প্রশংসা করতেই হয়। এত লোকের মধ্যে ঐ চারজনই

যথার্থ শক্তিমান ও সাহসী।

কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। সেই ঘটনাটাই বলি। একদিন ওখানে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে তার বাচ্চা ভাইকে নিয়ে বেড়াতে এল। মেয়েটির ফুটফুটে গায়ের রং, একমাথা কোকড়া চুল, শাড়ি পরার ধরন দেখলে মনে হয়, সে অল্পকিছুদিন আগেও ফ্রক পরত। মেয়েটি হাতে একটা লালরঙের বল নিয়ে লোফালুফি করছে।

সেই যুবক চারজনের দৃষ্টি মেয়েটির ওপর পড়ল। তারা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করল। মেয়েটির সঙ্গে কোন বয়স্ক অভিভাবক নেই দেখে পুলকিত হয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'আজ নতুন জিনিশ এসেছে রে!'

মেয়েটি ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলনা। ছোটভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে হাল্কা পায়ে এগিয়ে গেল। বারবার এদিক-ওদিক পিছন ফিরে দেখছে, মেয়েটি কাকে যেন খুঁজছে। মেয়েটি ছোটভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'টুটু, গোরা কোথায় গেল? গোরা?' ভাই বলল, 'ডাকো না। তুমি ওকে ডাকো—'

মেয়েটি শূন্য উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা! গোরা! এদিকে এসো!' এই বলে মেয়েটি হাতের লাল বলটা ছুঁড়ে দিল কোনাকুনি ভাবে রাস্তার দিকে।

বলটা যেভাবে ছোঁড়া হয়েছিল—তাতে সেটা বহুদূর গড়িয়ে যেত—কিন্তু তার আগে যুবক চারটি ছুটে এসে পা দিয়ে বলটা আটকাল—হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'বাঃ, মাইরি, বেশ বলটা তো।'

এতক্ষণ কেউ লক্ষ করেনি, পাশের অসমাপ্ত রাস্তাটার ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে গোরা প্রাকৃতিক কর্ম সারছিল। হঠাৎ এবার সে ছুটে এল। ভালো করে বোঝা যায়নি প্রথমে, উল্কার মতন প্রচণ্ডগতিতে বাঘের মতন একটা বিশাল জানোয়ার ছুটে দৌড়ে এল, এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বল-হাতে যুবকটির উপর। না, বাঘ নয়, একটা প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুর। যুবকটি আর্ত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল, কুকুরটা তার বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এই গোরা! কাম হিয়ার!' সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতন কুকুরটা বল মুখে ফিরে এল মেয়েটির কাছে। আহ্লাদে ল্যাজ নাড়তে লাগল!

যুবকটি মাটি থেকে উঠেছে, সঙ্গীরা তার পোশাকের ধুলো ঝেড়ে দিল। তারপর চারজনেই এগিয়ে এসে পা ব্যাঁকা করে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশী মেয়েটিকে বলল, 'এই যে, শুনছেন! আপনার কুকুর মানুষকে অ্যাটাক করছে—আর-একটু হলে জানে মেরে দিত...'

মেয়েটি তার পাতলা ঠোঁট উল্টে হাসির ভঙ্গিতে বলল, 'গোরা এমনিতে

কারুকে কিছু বলেনা। আপনারা ওর বল ধরলেন কেন?'

যুবক চারজন আর-কিছু বলার আগে—অ্যালসেশিয়ানটা গম্ভীরভাবে দুবার ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। যুবক চারজন আর-কিছু বললনা।

তারপর আমি সেখানে আর আধঘন্টা ছিলাম। সেদিন সেখানে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল। যেন বহুদিন পর 'স্বার্থপর দৈত্য'র বাগানে বসন্ত এসেছে। মেয়েটি বল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কুকুরটিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল—কুকুরটা ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটির ডাক শুনে সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে আসছে। ছোট ছেলেমেয়ের দলও সেই খেলায় যোগ দিল। আনন্দের কলরোলে খেলা জমে উঠল। সেদিন বুড়োরা নিশ্চিন্ত হয়ে বকবকানি চালিয়ে গেল, সেদিন প্রেমিক-প্রেমিকারা ঘন হয়ে বসে হাতে-হাত রাখল। একমাত্র সেই চারজন যুবকই স্থির হয়ে সেদিন বসেছে জলের ধারে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে—কুকুরটা তাদের পাশ দিয়ে যখন ছুটে যাচ্ছে—তখন তারা আড়ষ্টভাবে চুপ।

আমি ভুল করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ঐ আড়াইশো জনের জনতার মধ্যে ঐ চারজন যুবকই যথার্থ শক্তিমান। কিন্তু তাদের চেয়েও শক্তিমান একটা কুকুর।

১৯

আপনাদের এখান থেকে তো পাকিস্তানের বর্ডার খুব কাছে, তাই না?

—এই তো, মাইলখানেক! ঐ যে তালগাছগুলো দেখছ, ওর ওপাশেই।

—লোকজন বর্ডার পেরিয়ে যাতায়াত করেনা ?

—হরদম হরদম! পাঁচটা টাকা দিলেই দালালরা ওপারে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দেয়। এপারেও সেই সিস্টেম। আর স্মাগলিং‌ও হচ্ছে প্রচুর। হবেনাই-বা কেন, সারা বর্ডার জুড়ে তো আর পুলিশ বসিয়ে রাখতে পারেনা! পুলিশ থাকলেই-বা কী, ডানহাত বাঁহাতের ব্যাপার—

—এদিকে রিফিউজি আসেনি?

—আসেনি আবার!

হালদারমশাই চোখ ছোট করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে গোপন কথা বলার মতন বললেন, 'আরে ভাই, কী বলব তোমাকে! কী সুন্দর নিরিবিলি ছিল জায়গাটা আগে। এই বাঙালরা আসবার পর একেবারে ছারখার করে দিল! জায়গাটা নোংরা করেছে কী রকম, ওদের একগাদা কাচ্চাবাচ্চা,

তার ওপর আবার দল পাকানো–'

আমি একটুও দমে না-নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ সত্যি, বাঙালরা আসবার পর পপুলেশন এমন বেড়ে গেছে হঠাৎ এক-একটা জায়গায়।'

—শুধু পপুলেশন বেড়েছে নাকি? দ্যাখো তো পাঞ্জাবে, ওখানকার রেফুজিরা কীরকম অ্যাকটিভ! গায়ে খেটে দুদিনের মধ্যে কীরকম দাঁড়িয়ে গেছে সবাই! আর বাঙালরা, কাজকর্ম করার দিকে মন নেই, খালি বাকতাল্লা আর চেঁচামেচি! এক-একজনের আবার তেজ কী! এসেছিস আমাদের গাঁয়ে—কোথায় একটু ভদ্র হয়ে থাকবি, তা না—এইজন্যই তো বাঙালদের—

অর্থাৎ কিনা এখানকার বাঙালদের চেয়ে পাঞ্জাবের বাঙালরা অনেক ভালো!

—পাঞ্জাবের বাঙাল? হাঃ, হাঃ, হাঃ—রেফুজি মানেই বাঙাল বলছ? তা মন্দ নয়।

কথা হচ্ছিল মালদার এক গ্রামে। আমার মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক আছে। এদিকটায় কখনো আসিনি শুনে আমার এক বন্ধু তার কাকাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে।

হালদারমশাই অতি সজ্জন লোক, একসময় ছোটখাটো জমিদার ছিলেন, এখন সব জমিজমা গেছে. এখন চিনির ব্যাবসা করছেন। মাঝারি অবস্থা কিন্তু অতিথি-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি নেই। আমি ওঁর ভাইপোর বন্ধু এবং শহুরে লেখাপড়া শেখা ছেলে হয়েও গ্রামে এসেছি—আমাকে এমন বেশি খাতির করতে লাগলেন যে রীতিমতন অস্বস্তি বোধ করতে হয়। আমার স্নান করার জন্য গরম জলও দিতে চান—আমার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

হালদারমশাই প্রায় সারাটা জীবন গ্রামে কাটালেও এমনিতে বিশেষ গোঁড়ামি নেই। আমি ওঁর ছেলের বয়সী হওয়া সত্ত্বেও বললেন, সিগারেট-টিগারেট খাওয়া যদি অভ্যেস থাকে আমার সামনে লজ্জা কোরোনা। লজ্জা করে শুধু-শুধু দম আটকে থাকবে কেন? আমার নিজের তো একদিন বিড়ি না-হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়না। উনি নিজে ব্রাহ্মণ কিন্তু জাতের বিচার তেমন নেই, গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান অনেকেই তাঁকে মানে।

কিন্তু মুশকিল হল এই বাঙালদের বিষয়ে। বাঙালদের ওপর ওঁর বেশ একটা চাপা রাগ আছে। আমার কাছে এক গণ্ডা বাঙালদের নিন্দে করে ফেললেন। আমি হুঁ হাঁ দিয়ে গেলাম। হালদারমশাই আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করেননি—ধরেই নিয়েছিলেন আমিও একজন ঘটি। এখন আমি মহাফ্যাসাদে পড়লাম। নিজে বাঙাল হয়ে অন্য বাঙালদের নিন্দে অনবরত শোনা যায়না। কিন্তু মাঝে-মাঝে আমাকে একটা অদ্ভুত ভদ্রতাবোধ পেয়ে বসে। আমার মনে হল, এখন যদি হালদার-

মশাইয়ের কাছে আমি আত্মপরিচয় দিই, তাহলে উনি দারুণ লজ্জায় পড়ে যাবেন —আমার দিকে আর তাকাতে পারবেননা। সেই লজ্জায় ওঁকে ফেলতে আমার ইচ্ছে হলনা। আবার ওঁর কথায় সায় দিয়ে গেলে মনে হবে, আমি বাঙালত্ব অস্বীকার করে ঘটিদের দলে ভিড়তে চাইছি। যদিও আমি প্রকৃত অর্থেই বাঙাল এবং রেফিউজি। আমার বাবা-ঠাকুর্দা ছিলেন পূর্ববঙ্গে—আমিও বাল্যকালে ছিলাম। এবং ওখানে আমাদের বাড়ি ছিল, এখানে এক টুকরো জমিও নেই।

হালদারমশাই আমার কাছে খুব অন্তরঙ্গভাবে গোপনে বাঙালদের নিন্দে করেছিলেন, বাড়ির বাইরে অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে আর বাঙাল বলেননা। বলেন ইস্টবেঙ্গলের লোক। একটু রেগে গেলে রেফিউজিগুলো!

হালদারমশাইয়ের সাত-আটবছরের ছেলেকে একজন যুবক বাড়িতে পড়াতে আসে। রোগা চেহারার লাজুক ছেলেটি। সে একদিন পড়িয়ে চলে যাচ্ছে, হালদারমশাই আমাকে বললেন, 'ঐ যে ছেলেটি দেখলে, খুব ভালো ছেলে, মন দিয়ে পড়ায় রতনকে। ছেলেটি বাঙাল হলেও খুব সিনসিয়ার—পড়াশুনায় খুব আগ্রহ। বাঙালদের মধ্যে এরকম ভালো ছেলেও দুটো-একটা আছে, আই মাস্ট অ্যাডমিট—'

হালদারমশাইয়ের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তাঁর মা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি এসে হালদারমশাইকে বললেন, 'ও খোকন, দুটো বাঙাল ছোঁড়াকে ডেকে নে আয়, নারকোলগুলো পেড়ে দেবে। ওরা এমন তড়বড়িয়ে গাছে উঠতে পারে—'

হালদারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত হাস্যে বললেন, 'লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে, ল্যাজ নাই কিন্তু!' আমি হাসব না কী করব বুঝতে পারলামনা।

এইরকম অবস্থা আমার আগে আরও দু-একবার হয়েছে। অন্য ধরনেরও। কফি হাউসে একবার এক মারোয়াড়ি বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম। মারোয়াড়ি মাত্রেই তো আর কুটিল ব্যবসায়ী নয়। আমার সেই বন্ধুটি সেবার বি. এ. পরীক্ষায় ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, বেশ গরিব এবং জলের মতন বাংলা বলে। হঠাৎ আর-এক বন্ধু আমাদের টেবিলে উপস্থিত হয়েই বলা শুরু করল, 'আরে ভাই মারোয়াড়িদের জ্বালায় আর পারা গেলনা। আজ বড়বাজারে গিয়েছিলাম, এক ব্যাটা ভুঁড়ি দাস—।' আমি বন্ধুটিকে যতই চোখ টিপছি, সে কিছুতেই বোঝেনা। মারোয়াড়ি বন্ধুটি মিটিমিটি হাসতে লাগল আর বলল, 'যা বলেছেন! মারোয়াড়ির জাতটাই দেশটাকে...'

হালদারমশাইয়ের মেয়ে কলেজে পড়ে, ছুটিতে এই সময়েই গ্রামের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটির নাম অর্চনা, নেহাত মন্দ নয় গোছের চেহারা—তবে শহরের

কলেজে পড়ে বেশ স্মার্ট হয়েছে। আমাকে দেখে অন্তঃপুরিকা হয়ে রইলনা, সপ্রতিভভাবে গল্প করতে লাগল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, অর্চনাকে আমার ভালোই লাগছিল। মালদার কলেজে পড়ে অর্চনা, কলকাতা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল, আমাকে বারবার কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

এদিকে হালদারমশাইয়ের বাঙাল ফিক্সেশন—যে-কোন কথাতেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি বাঙালদের কথা আনবেনই। গভর্নমেন্ট তাঁর কিছু জমিজায়গা কেড়ে নিয়ে রেফিউজিদের দিয়েছে, এই হল প্রথম রাগের বিষয়। রেফিউজিদের দিতে না-হলেও যে গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিতই—সেটা ভুলে যান। বাঙালদের সম্পর্কে তাঁর আর-একটা রাগের কারণ, বাঙালরা নাকি বড্ড বেশি রগচটা, কথায়-কথায় ঝগড়া করতে আসে। আর খাইছি-শুইছি ধরনের ভাষা তাঁর দুকানের বিষ।

অর্চনা বলল, 'জানো বাবা, আমাদের ক্লাসে দুটো বাঙাল মেয়ে আছে, তাদের কথা শুনে কিন্তু একদম বোঝা যায়না। আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি। তারপর ওবা ওদের বাড়িতে একদিন আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল—প্রত্যেকটা খাবারেই এত ঝাল না, উঃ, জিভ জ্বলে গিয়েছিল, তখনই বুঝলাম—! তার ওপর আবার শুঁটকি মাছ, আমাব তো এমন বমি পেয়ে গেল...'

হালদারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও কথা শুনলে ঠিকই বোঝা যায়, যতই লুকোবার চেষ্টা করুক, বাঙালদের চিনতে...কী চেনা যায়না?'

আমি কাঁটা হয়ে বসে রইলাম। হালদারমশাই আমাকে বুঝতে পারেননি। এখন বুঝতে পারলে চোর ধরা পড়ার অবস্থা হবে। আমি আর আমার আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ কিছুতেই পাচ্ছিনা। এমনকী একথাও আমার মনে হল, আহা ওরা নিজেদের বাড়িতে বসে নিরিবিলিতে একটু বাঙালদের নিন্দে করছে—তাতে আমি বাগড়া দিই কেন। পরনিন্দার মতন মুখরোচক জিনিশ আর নেই—ক'জনই-বা এ জিনিশ করেনা?

অর্চনা আমাকে বলল, 'আমাদের গ্রামটা ঘুরে দেখছেন সব? চলুন, নদীর পাড়টায় যাবেন?'

—নদীর পাড় খুব সুন্দর বুঝি?

—আগে খুব সুন্দর ছিল—ফাঁকা মাঠ, ঝপঝপ করে পাড় ভেঙে পড়ত—এখন আর বেশি যাইনা—এখন ওদিকটা রিফুজি কলোনি হয়েছে তো! বাঙাল ছেলেগুলো এমন প্যাট-প্যাট করে তাকায়—যেন কোনোদিন মেয়ে দেখেনি—

আমি আমার চোখে হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, আমারও দৃষ্টি প্যাটপেটে কিনা।

হালদারমশাইকে আমি বললাম, 'কাকাবাবু, কাল তো চলে যাব, আমাকে একটু পাকিস্তানের বর্ডারটা দেখিয়ে দিন!'

তিনি বললেন, 'ও আর দেখার কী আছে? দেখে কি কিছু বোঝা যাবে?'

—তবু চলুন।

ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'ঐ যে ঐ তালগাছের লাইন ওখানেই পাকিস্তানের শুরু।'

আমি চুপ।

উনি আবার বললেন, 'ঐ একটা খড়ের বাড়ি দেখছ? বাড়িটা পড়েছে পাকিস্তানে, আর উঠোনটা ইন্ডিয়ায়। হেঃ, হেঃ হেঃ—'

আমি চুপ।

—এরকম ভাগাভাগির কোন মানে হয়? সাহেবরা একটা দাগ টেনে দিল—আর অমনি দেশটা দুভাগ হয়ে গেল! আর আমাদের ন্যাতারাও সব যেমন!

আমি চুপ।

—কী হে চুপ করে আছ যে?

—এমনি, মনটা খারাপ লাগছে।

—কেন?

—এমনিই আর কী! আচ্ছা কাকাবাবু, যদি মনে করেন, পার্টিশানের দাগটা আরও দেড়-দুমাইল এদিকে পড়ত তাহলে আপনার বাড়িটাও পাকিস্তানে পড়ে যেত। আপনিও তাহলে রিফিউজি হয়ে—লোকে আপনাকে বাঙাল বলত—

—ইঃ, বললেই হল? আমার এখানে সাতপুরুষের বাস—

—ওখানেও অনেক বাঙালের—

হঠাৎ হালদারমশাই একটু চুপসে গেলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন, 'ওরে বাবা, বুঝি, বুঝি, ঠিকই বুঝি। ভিটেমাটি ছেড়ে এতগুলো লোক এসে কত দুঃখে পড়েছে—আমাদেরই মতন তো সবকিছু—তবু মাঝে-মাঝে মনে থাকেনা। বুঝলে না, মানুষ ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই বেশির ভাগ সময়— তবু মনের ভেতরে—'

আমি আর-কিছু বললামনা। চুপ করে গেলাম আবার।

২০

সেই যে, একটা বাচ্চা ছেলে পড়া করতে-করতে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা, "মাই হেড" মানে কী?'—বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই হেড মানে আমার মাথা', ছেলেটি তখন পড়তে শুরু করেছিল, 'মাই হেড মানে বাবার মাথা'—সেই গল্পটা আমার মনে পড়ল। এইরকম আর-একটা বহু পরিচিত গল্পও মনে পড়ল, আর-একটি খুব ছোট ছেলে পড়তে-পড়তে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা "প্রবোধ" মানে কী?' —খবরের কাগজ পাঠরত অন্যমনস্ক বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'প্রবোধ? —প্রবোধ মানে ইয়ে, মানে, প্রবোধ দেওয়া মানে সান্ত্বনা—ভালো করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়ো!' পাশের ঘর থেকে ছেলেটির মা এসে স্বামীকে বললেন, 'খবরের কাগজ পড়ে কী এমন জগৎসংসার উদ্ধার করছ! ছেলেটাকে একটু পড়াতে পারো না? হ্যা রে খোকা, প্রবোধ মানে কী বুঝলি?' ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, 'প্রবোধ মানে ছোঁটমাসি!'

গল্পদুটি মনে পড়ায় আমি সামান্য হাসলাম।

বন্ধুর বাড়িতে বসে গল্প করছিলাম। বন্ধুর আটবছরের ছেলে টুবলু কী যেন দুষ্টুমি করেছে, নালিশ শুনে বন্ধুটি আমার সঙ্গে গল্প থামিয়ে ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'টুবলু এদিকে এসো!' সেই আওয়াজ শুনে টুবলু তো দূরের কথা, আমি পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠলাম। দিব্যি হাসিখুশি স্বভাবের মলয়কে কখনো এমন গর্জন করতে আগে শুনিনি। টুবলুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। বন্ধুটি তাঁর বিশাল একহাত রাখলেন ছেলের কাঁধে, অন্যহাত শূন্যে উত্তোলিত, টুবলুর ঠোঁট কাঁপছে, যে-কোন মুহূর্তে সে প্রবল একখানা চড় খাবার প্রতীক্ষা করছে, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু আজকাল বাবারা ওরকম কর্কশ শাস্তি দেওয়া মোটেই পছন্দ করেননা। বন্ধুটি তার ছেলেকে চড় মারলেননা, শুধু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সেই রোষকশায়িত দৃষ্টি টুবলু বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলনা, তার চোখ ছলছল করে উঠল, বন্ধুটি তখন তাকে এক ঝাকুনি দিয়ে বললেন, 'আর করবে কোনদিন?' টুবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'না, না'—বন্ধু তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, আর কোনদিন যেন এরকম না-শুনি, সবসময় ভালো হয়ে থাকবে, কক্ষনো এমনকিছু করবেনা, যাতে অন্যলোক কষ্ট পায়, যাও, পড়তে বসো—'

এইসময় আমার এ-গল্পদুটি মনে পড়ায় আমি মনে-মনে ফিক করে একটু হাসলাম। তারপর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যারে মলয়, সবসময় ভালো হয়ে থাকা মানে কী রে? টুবলু কী বুঝল?'

বন্ধু আমার দিকে ফিরে নিম্নস্বরে ইংরেজিতে বললেন, 'ছোটদের শাসন করার সময় তা নিয়ে ওদের সামনে ইয়ার্কি করতে নেই। তাতে ওরা কুশিক্ষা পায়!' —তারপর ছেলের দিকে ফিরে, 'টুবলু যাও, পাশের ঘরে গিয়ে পড়তে বসো —এখানে আমি নীলুকাকার সঙ্গে গল্প করছি, বড়দের কথা বলার সময় ছোটদের থাকতে নেই।'

টুবলু চলে যেতে, আমি বললাম, 'জানিস, একদিন বাসে একটা পকেটমার আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল—'

মলয় আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই তো গতসপ্তাহেই মৌলালির মুখটায়, একটা পকেটমার আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েই আবার টেনে বার করে নিয়েছে, আমি টের পেয়ে গেছি, তাকিয়েছি লোকটার মুখের দিকে—লোকটার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের তাচ্ছিল্য আর হতাশা, লোকটার জন্য আমার এমন মায়া হল—'

মলয় বললেন, 'ব্যাপারটা কী, তুই কী বলতে চাইছিস?'

—ব্যাপারটা এই, আমার পকেটে টাকাকড়ি কিছু ছিল না। খুচরো পয়সাও ছিলনা। পকেট ছিল শুধু কয়েকটা বাজে ঠিকানা লেখা কাগজ মাত্র। এখন ঐ পকেটমারটা, অনেক বেছে-টেছে আমার পকেটেই হাত ঢুকিয়েছে—সেখানে লবডঙ্কা। এক বাসে তো আর দুবার পকেট মারা যায়না, তাই লোকটা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে নেমে গেল। তখন আমার মনে হল, আহা বেচারা! ওকে শুধু-শুধু কষ্ট দিলাম। ওকে খুশি করার জন্য আমার পকেটে অন্তত কয়েকটা খুচরো টাকা অসাবধানে ফেলে রাখা উচিত ছিল। তাহলেই আমি ওর কাছে ভালো লোক হতে পারতাম। ও আমার দিকে অমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকাতনা! তুই কি টুবলুকে এইকথাই বোঝাতে চাইছিলি?

মলয় শুকনো হেসে বললেন, 'তোর সবতাতেই চ্যাংড়ামি। সংসারের ঝক্কি তো এখনো কাঁধে চাপেনি, তাহলে বুঝতি, আজকাল ছেলেপুলে মানুষ করা কত শক্ত।'

সে-কথায় কান না-দিয়ে আমি বললাম, 'সত্যিই 'সবসময় ভালো হয়ে থাকবি'—এ-কথার মানে টুবলু কী বুঝল সেটা খুব চিন্তার বিষয়। তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ ভালো হওয়ার কি শেষ আছে? তোর নিজের বাবার কাছে তোকে হতে হবে আদর্শ ছেলে, আবার তোর ছেলের সামনে তোকে আদর্শ বাবা, মায়ের কাছে সুপুত্র, স্ত্রীর কাছে সুযোগ্য স্বামী, অফিসে ওপরওয়ালাকে খুশি করার জন্য নিচতলার লোকদের ধাতানি দিতে হবে, নিচতলার লোকদের খুশি করার জন্য গাইতে হবে ওপরওয়ালার কেচ্ছা, বাসকন্ডাকটারকে খুশি করার জন্য রোগা হতে

হবে, ভিখিরিকে খুশি করার জন্য পকেট ভরতি খুচরো পয়সা, পকেটমারের জন্য লুজ নোট, তুই বাড়িওয়ালা হলে ভাড়াটের সঙ্গে যে-ব্যবহার করবি, তুই ভাড়াটে হলে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাইবি ঠিক উলটো ব্যবহার...অন্তত আড়াইশো রকমের উলটোপালটা আছে, এর মধ্যে'—

—আর বাজে বকবক করিসনা। এবার চুপ কর তো!

—তুই এসব কিছু ভাবিসনা, না-ভেবেই তুই ছেলেটাকে বলে দিলি সবসময় ভালো হয়ে থাকতে?

—আমি ঠিক ভাবি। তোর মতন বাজে ব্যাপার ভেবে সময় নষ্ট করিনা। পৃথিবীতে মানুষের ভালো ব্যবহারের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে--সেই অনুযায়ী—

—টুবলু সেই স্ট্যান্ডার্ডের কী বুঝবে?

- ঠিকই বুঝবে, আস্তে-আস্তে বোঝাতে হবে।

এবার আমার গম্ভীর হবার পালা। আমি আস্তে-আস্তে বললাম, 'আমার কিন্তু খুব ভয় হয় একটা কথা ভেবে। আমার মনে হয় একদিন যখন এইসব ছেলেরা বড় হয়ে উঠবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, ওদের আমরা কত মিথ্যে কথা শিখিয়েছি, আমরা ওদের তাই হতে বলেছি, যা আমরা নিজেরা বিশ্বাস করিনা, আমাদের নিজেদেরই ব্যবহারের কোন স্ট্যান্ডার্ড নেই, আমরাই সুবিধা এবং সুযোগ অনুযায়ী—'

মলয় আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাঝপথে ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'তুই এসব হঠাৎ কী করে টের পেলি? তুই কি আজকাল সোস্যাল সাইকলজি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস নাকি?'

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, 'না, সে-বিদ্যে আমার নেই। আমি বুঝতে পারি আমার নিজের জীবন দিয়ে। আজ আমাকে তুই এরকম দেখছিস, কিন্তু আমি একসময় ভালো হবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা অনেকেই তো গুরুজনদের উপদেশ অনুযায়ী পায়ে-পায়ে এগিয়েছি। কিন্তু কী দেখছি এখন? এখন দেখছি আমাদের অভিভাবক বা মাস্টারমশাই বা দেশ-নেতারা আমাদের যা উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই নিজেদের জীবনে তা অনুসরণ করেননি! আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে দেখেছি, তিনি গরিব লোকদের লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি কম টাকায় কিনে নেন! এই কি ইতিহাসের শিক্ষা? আমার দাদামশাইকে আমি কত মহৎ মানুষ বলে ভাবতাম, কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম—'

—থাক থাক, ওসব কথা এখন থাক! কী সিনেমা দেখলি এর মধ্যে?

—এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন? আমরা এইগুলো টের পেয়ে গেছি বলে আমাদের জেনারেশনে এত হতাশা, আমাদের সামনে কোন আদর্শ নেই। এসব জেনেশুনেও

আমরা চুপচাপ রয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ টুবলুরা যখন বড় হবে, তখন আর ওরা পরোয়া করবেনা! এসব উপদেশের ভণ্ডামি ওরা ধরে ফেলবে। ওরা আমাদের মুখের সামনে অবজ্ঞার সঙ্গে বলে উঠবে, 'খুব তো বড়-বড় লেকচার ঝেড়েছিলে একসময়! তোমরা নিজেরা কী, তা আমাদের জানা আছে! এখন ফোটো!'—তাই আমার মনে হয়, উপদেশ না-দিয়ে আগে থেকেই ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখা ভালো।

—তাহলে তুই কী বলতে চাস, ছোট ছেলেদের কিছুই শেখাবার নেই আমাদের?

—আছে। শুধু, কী করে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই যুযুৎসু!

২১

সুবিমল বলল, 'লোকটাকে আমি তিনহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলাম। ও নিতে চায়নি।'

আমি বললাম, 'তাতে কী প্রমাণ হয়? লোকটা বোকা না ভীতু না সৎ লোক?'

—সেটাই তো প্রশ্ন। আমার ধারণা লোকটা সৎ-ই ছিল, একটু ভীতুও। সৎ লোকেরা সাধারণত একটু ভীতুই হয়। কথায় বলে না, ধর্মভীরু?

—আমি তা মনে করিনা। 'ধর্মভীরু' কথাটার মানে অন্য। আমার ধারণা, অসৎ লোকেরাই ভীতু—তাদের সৎ হবার সাহস নেই। অসৎ হওয়াই সোজা।

—যাক গে ও-কথা। এখন কী করা যায়?

যে লোকটি সম্পর্কে কথা বলছিলাম, সে আমাদের সামনেই শুয়ে আছে। তার সামনে যে-কোন কথা বলা যায়, কারণ সে কানে শোনেনা, চোখেও খুব কম দেখে, তাছাড়া এখন বোধ হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

আমি আর সুবিমল দুটো বিড়ি ধরিয়ে টানছি। অনভ্যাসে বারবার নিবে যাচ্ছে বিড়ি। একটু আগে ঐ লোকটির কাছ থেকে দুবাণ্ডিল বিড়ি কিনেছি। সুবিমল ওকে পাঁচটা টাকা সাহায্য হিশেবে দিতে চেয়েছিল, ও নেয়নি। ও ভিক্ষে নেবেনা। ওর বিড়ির দোকান, ও আমাদের বিড়ি কিনে সাহায্য করতে বলেছিল।

কথা বলতে-বলতে কাশতে-কাশতে লোকটি নিঝুম হয়ে পড়েছে, জ্ঞান আছে কিনা জানিনা। সুবিমল ভয়ে-ভয়ে দুবার নিচু হয়ে ডাকল, 'ইরফান, ইরফান!'

কোন সাড়া নেই। সুবিমল গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছেনা। একটা লুঙ্গি-পরা, খালি গা—শরীরটা যে একটা খাঁচা তা ওকে দেখলে বোঝা যায়—একটা হাড়ের খাঁচা ছাড়া শরীরে আর-কিছু নেই।

পাশেই একটা বেশ বড় মনোহারী দোকান—আমি সেই দোকানে গিয়ে বললাম, 'দেখুন, ঐ যে বিড়ি বিক্রি করে বুড়ো, ও হঠাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওর বাড়ির লোককে কী করে খবর দেওয়া যায়? কিংবা কাছাকাছি কোন ডাক্তার-টাক্তার—'

আমাকে শহুরে লোক বুঝেই বোধহয় দোকানদারটি একটু অপ্রসন্নভাবে তাকাল। তারপর বলল, 'ঐ ইরফান আলি তো? ওর এরকম প্রায়ই হয়—কিছু ভাবতে হবেনা, এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। বারোটার সময় ওর ছেলে আসবে—'

—একটু জল দিতে পারেন? ওর মাথায় ছিটিয়ে দিতাম—

—ঐ টিউকল থেকে নিন।

টিউবওয়েল একটা আছে বটে, কিন্তু হাতে করে তো আর জল নেওয়া যায়না! দোকানদারটির কাছ থেকে কোন পাত্রটাত্র চাইতে সাহস হচ্ছেনা। লোকটি আমার ব্যস্ততাকে নিশ্চিত আদিখ্যেতা মনে করছে। আমি ওর কাছ থেকে একটা কাচের গেলাস কিনে ফেললাম। সেই গেলাসে জল নিয়ে দিলাম সুবিমলকে। সুবিমল জলের ছিটে দিতেই বুড়ো ইরফান চোখ মেলে চাইল।

মুর্শিদাবাদ শহরে অনেক খুঁজে-খুঁজে আমরা ইরফানের দোকানে এসেছি। ইরফান আগে যে-বাড়িতে থাকত, সে-বাড়ি সুবিমলের চেনা ছিল, এখন ও-বাড়িতে থাকেনা। ইরফান আগে চাকরি করত নবাব সাহেবের লাইব্রেরিতে—এখন সে-চাকরিও গেছে, বলাই বাহুল্য।

এই ধরনের লোকদের সুবিমল ঠিক খুঁজে বার করে। পুরোনো, দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে সুবিমল, তারপর গবেষকদের কাছে, সারা ভারতের বড়-বড় লাইব্রেরির কাছে বিক্রি করে। কোথায় কোন দুষ্প্রাপ্য বই আছে, সুবিমল তার সন্ধান রাখে, সেগুলো জোগাড় করার জন্য ও যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত। এমনকী চুরিও। এ-সম্পর্কে সুবিমলের বিবেক খুব পরিষ্কার। ও বলে, শুয়োরের খোয়াড়ে যদি তুমি একটা মুক্তো পড়ে থাকতে দ্যাখো, তাহলে সেটা সেখান থেকে তুলে এনে কোন সুন্দরী মেয়ের আংটিতে বসিয়ে দেওয়া কি অপরাধ? কতসব, ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারের উই-ধরা আলমারিতে দুর্লভ সব বই নষ্ট হচ্ছে, সেগুলো-যে-কোন উপায়ে গবেষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ায় কোন অন্যায় নেই। কথাতেই আছে ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।

মুর্শিদাবাদের নবাববংশেরই একটি শাখা পরিবারের আছে বহুপ্রাচীন বই ও

পুঁথির কালেকশন। তার মধ্যে আছে একটি ফারসিবইয়ের পাণ্ডুলিপি, যেটি পাবার জন্য বহু ইতিহাসের গবেষক উদগ্রীব। সুবিমল প্রথমে বইটা কেনার চেষ্টা করেছিল। সে-বাড়ির বর্তমান বংশধররা সবাই মূর্খ, বইটই সম্পর্কে কোন আগ্রহই নেই, অযত্নে অবহেলায় বইগুলো নষ্ট হচ্ছে। নানান শরিকে ঝগড়ার ফলে আদালতে মামলা চলছে কয়েকবছর ধরে, কোনকিছুই এখন বিক্রির অধিকার নেই কারুর।

সেই বাড়িতে চাকরি করত ইরফান। লাইব্রেরি ঘর ঝাড়পোছ করত—সে নিরক্ষর, সেও বইয়ের মর্ম বোঝেনা—কিন্তু যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তার ওপর, সেটা ভালো করে করাতে চাইত। সুবিমল ইরফানের বাড়িতে দেখা করে বলেছিল, সে যদি সেই ফারসি বইখানা গোপনে সরিয়ে আনতে পারে, তাহলে একহাজার টাকা পাবে।

ইরফান মাইনে পেত মোটে ছত্রিশ টাকা। অত্যন্ত গরিব মানুষ, বাড়িতে একগাদা ছেলেপুলে। বইখানা সরিয়ে আনা তার পক্ষে খুবই সহজ ছিল, জামার তলায় পেটের কাছে গুজে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত। দু-চারবছরের মধ্যে কিংবা কোনদিনই বোধহয় সে-বইয়ের খোঁজ কেউ করত না। সে-বাড়ির লোকেরা কোনদিন লাইব্রেরি ঘরে ঢোকেনা, ভুলেও একটা বই উল্টে দেখেনা।

কিন্তু ইরফান তবু রাজি হয়নি। এ-কাজ তার চোখে হারাম। মালিকরা বিশ্বাস করে তার ওপর যে-ভার দিয়েছে, সেই বিশ্বাস সে নষ্ট করবে কী করে।

সুবিমল বারবার এসে লোভ দেখিয়েছে ওকে। সেবার ওকে তিনহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল, সামান্য একখানা বইয়ের জন্য। বইখানা সত্যিই মূল্যবান, তার বাজার দর এখন পাঁচ হাজার টাকার মতন—ভারতবর্ষে ঐ পাণ্ডুলিপির দুটি মাত্র কপি আছে, আর একখানা হায়দ্রাবাদে নিজামের কাছে। এ তথ্য অবশ্য শুধু গবেষকরা জানে, মুর্শিদাবাদে ঐ নবাব পরিবারের ফাকড়ারা এর খোঁজও রাখেনা।

এবার এসে ইরফানের এই অবস্থা দেখলাম। হঠাৎ চোখের অসুখ হয়ে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ইরফানের চাকরি গেছে। নিষ্ঠুরভাবে এককথায় বরখাস্ত—মালিকরা একটা পয়সাও অতিরিক্ত দেয়নি। মালিকরা তো আর তার সততা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অথচ স্যার যদুনাথ সরকার যখন ঐ বাড়িতে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন, তখন ইরফান তাঁর কত সেবা করেছে। স্যার যদুনাথের সার্টিফিকেট আছে তার কাছে।

এখন ইরফানের এই সামান্য দোকান— কয়েক বাণ্ডিল বিড়ি, আর কাগজের প্যাকেটে কী একটা জিনিশ—শুনলাম স্বপ্নাদ্য—হাঁপানির ওষুধ। সারাদিনে এক টাকার বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ। চোখে দেখতে পায় না, সারাক্ষণ অনবরত কাশছে,

বোঝা যায় ইরফানের মৃত্যুর আর বেশি দিন-দেরি নেই।

চোখ মেলার পর সুবিমল জিজ্ঞেস করল, 'কী, এখন কী রকম লাগছে? একটু ভালো তো?'

দৃষ্টিহীন চোখে ইরফান কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। বলল, 'বাবু সবই আমার নসীব। তিন-তিনহাজার টাকা আপনি দিতে চেয়েছিলেন। সেই টাকা আমি পায়ে ঠেলেছি! এখন আমার ওষুধ জোটেনা, খাওয়া জোটেনা।'

—বুড়ো, তখন তো তোমায় কতবার বলেছি। ও-বই আনলে মালিকদের কোন ক্ষতি হতোনা। অন্যদের উপকার হতো অনেক। এখন আর-কোন নতুন লোককে রেখেছে?

—না, বাবু! এখন ঘর তালাবন্ধ থাকে। অ্যাদ্দিনি উইতে বোধহয় সব বই কেটে দিয়েছে।

ইস! ঐ বই যদি নষ্ট নয়, তাহলে যা ক্ষতি হবে!

ইরফান বইয়ের মর্ম বোঝে না। কিন্তু তিনহাজার টাকার জন্য কী আফসোস। তিনহাজার টাকা পেলে সে পাশের মনোহারী দোকানের মতন বড় একটা দোকান খুলতে পারত। হায়, হায়, কী যে তার বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল! কেন যে সে তখন বাবুর কথা শোনেনি। এখন তার উচিত মাথায় কুড়ুলের কোপ দিয়ে মরা।

বেশিদিন আর বাঁচবেনা ইরফান, কিন্তু মৃত্যুর আগে সে তার সততার জন্য আফসোস করে যাচ্ছে, এ-দৃশ্যটা আমার দেখতে ভালো লাগলনা। পৃথিবীতে কত চোর-বদমাস তো বেশ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়, কোনদিন অনুতাপ করেনা। আর এই লোকটি সৎ ছিল বলে অনুতাপ করছে। শীর্ণ হাতে কপাল চাপড়াচ্ছে আর হায়-হায় করছে ইরফান।

এখানে আমাদের আর কোন দরকার নেই। আমি সুবিমলকে এবার যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলাম। সুবিমল বলল, 'চলি, বুড়ো মিঞা।' ইরফান কী বলতে গিয়ে আবার ঘং-ঘং করে এমন কাশতে লাগল যে ভয় হল, আবার না অজ্ঞান হয়ে যায়। অতি কষ্টে সামলে বলল, 'আর তো আসবেননা আমার কাছে, না? আর তো কেতাব আনার ক্ষমতা নেই। তবু ফি বছর একবার আসবেন! আবার এলে দেখবেন, আমি মরে গেছি!'

বিদায় নেবার মুহূর্তটি সত্যি অস্বস্তিকর। সত্যি কথাই তো, আমরা ওর কাছে আর কেন আসব, আর তো ওকে কাজে লাগাবার কোন সম্ভাবনা নেই! সুবিমল একটা দশটাকার নোট বার করে বলল, 'এই নাও বুড়ো মিঞা, এটা দিয়ে ছেলেমেয়েদের কিছু কিনে দিয়ো।'

ছানিপড়া বিবর্ণ চোখে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

—বিশেষ কিছু না। এই দশটা টাকা রাখো—দুহাত দিয়ে না করল ইরফান। বলল, 'আপনার কাছ থেকে তিনহাজারই নিইনি, আর দশ টাকা নেব? মরার পর খোদাতাল্লাকে তবু বলতে পারব, আমি কোনদিন চুরিও করিনি, ভিক্ষেও করিনি।'

না, এ-লোককে কিছুতেই ভীতু বলা যায়না।

২২

আমি আর আমার বন্ধু চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, উত্তর কি দক্ষিণ কোনদিক যাব মনঃস্থির করতে পাচ্ছি না—সেই সময় একজন মহিলা রাস্তা পার হয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তপনকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'কী খবর তপন?' তপন তখন পথের অন্য মহিলাদের দেখায় ব্যস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আরেঃ রেবাদি? কেমন আছেন?'

মহিলাটি বলল, 'ভালো আছি।'

তারপর আবার তিনি বললেন, 'খুব ভালো আছি। রিজেন্ট পার্কে একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়েছি। তোমার বউদিকে একদিন আসতে বোলো—'

তপন বলল, 'বউদি তো এখন দিল্লিতে—'

আমি একটু সরে গিয়ে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। তপন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মহিলাটির বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য, হাল্কা গোলাপি রঙা শাড়ি পরেছেন। সবচেয়ে নজরে পড়ে ওঁর কপালে আগেকার তামার পয়সার সাইজের সিঁদুরের টিপ। হ্যান্ডব্যাগটি বেশ বড়, তার মধ্য থেকে একটা বাচ্চাদের খেলার এরোপ্লেন উঁকি মারছে।

দু-তিন মিনিট তপনের সঙ্গে গল্প করে মহিলা একটি লেডিজ ট্রাম দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তপন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কোনদিকে যাওয়া যায়?'

আমি কোন উত্তর দিলামনা।

তপন বলল, 'তুই রেবাদিকে আগে দেখিসনি?'

—না।

—বউদির খুব বন্ধু। আগে আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন—

—না, দেখিনি—

লাল আলোর সামনে ট্রামটা তখনও দাঁড়িয়ে। ট্রামভর্তি নানা রঙের মহিলা—সেদিকে তাকানো যায় না। ট্রাম বা বাসের জানালায় একটি-দুটি মহিলাদের দেখে অনেকসময় বহুক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পুরো

গাড়িটাই মহিলাতে ভর্তি, লেডিজ ট্রামের দিকে দু-এক পলকের বেশি চোখ রাখতে খুবই লজ্জা লাগে।

তপনের বউদি জানালার পাশেই বসেছিলেন. ট্রাম ছাড়তে তপন আবার সেদিকে চেয়ে হাসিমুখে হাত নাড়ল। তারপর তপন আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রেবাদিকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন? উনি বললেন, ভালো আছি। বলতে পারিস, 'ভালো' কথাটার কতরকম মানে হয়?' আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, 'কে জানে!'

—রেবাদিকে দেখে তোর কী মনে হল?

—কী আবার মনে হবে? আমি তো ভালো করে দেখিইনি!

—যা দেখেছিস তাই যথেষ্ট। ঐটুকু দেখে রেবাদি সম্পর্কে তোর কী ধারণা হল বল তো! দেখি, তোর অবজারভেশনের ক্ষমতা কী রকম! রেবাদি দুবার বলেছেন, 'ভালো আছি', সেটা খেয়াল রাখিস!

—ভদ্রমহিলা চাকরি করেন, সম্প্রতি বোধহয় প্রমোশন হয়েছে, তাই অত খুশি-খুশি মুখ। কটি সন্তান তা বলতে পারবনা. তবে একটি ছেলে আছেই—মেয়ে থাকলে এরোপ্লেন না-কিনে পুতুল কিনতেন, উচ্চারণ শুনে মনে হল ভদ্রমহিলা বি-এ. পাস, খুব সম্ভবত সংস্কৃত কিংবা ফিলসফিতে অনার্স ছিল। ভদ্রমহিলার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার—না, না, সরকারি কর্মচারী, একটু কুঁড়ে—তবে খুব পত্নীঅনুগত, ভদ্রমহিলার শাশুড়িও একসঙ্গে থাকেন—শাশুড়ি-বউ-এর মধ্যে ঝগড়ার বদলে কে কতটা ভালো ব্যবহার করতে পারে—তার প্রতিযোগিতা চলে, ভদ্রমহিলার শখ বেড়াল পোষার—কিন্তু স্বামীর ইচ্ছে কুকুর, ইনস্টলমেণ্টে রেফ্রিজারেটার কিনবেন প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন—তপন হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'তুই আজকাল শখের গোয়েন্দাগিরি করছিস নাকি?'

আমি ঈষৎ গর্বের সুরে বললাম, 'কী, সব মেলেনি? অন্তত সেভেণ্টি ফাইভ পারসেণ্ট?'

—তুই কী করে জানলি?

—মানুষ দেখে স্টাডি করার অভ্যেস করতে হয়!

তপন পুনশ্চ হাসতে-হাসতে বলল, 'খুব মানুষ চিনেছিস! একটাও মেলেনি! ঐ যে রেবাদি পর-পর দুবার 'ভালো আছি' বললেন, সেটা লক্ষ্যই করিসনি। কেউ যখন প্রশ্নের উত্তরে শুধু একবার বলে 'ভালো আছি' তাহলে হয়তো সে সত্যি ভালো নাও থাকতে পারে—সবাই তো আর দুঃখের গল্প সবসময় শোনাতে চায়না। কিন্তু দুবার ভালো আছি বললে বুঝবি পিছনে অনেককিছুই আছে, সুখ-দুঃখের একটা জটিল ইতিহাস, তার মধ্যে কোনটা বেশি কোনটা কম—সে-বিষয়ে মনঃস্থির

করা যায়না। মানুষ কতরকমে ভালো থাকে জানিস? তোরা সবসময়ে মানুষকে ছকে ফেলতে চাস। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা। রেবাদির জীবনের গল্প শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি! শুনবি?'

রেস্টুরেন্টে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'রেবাদি আমার বউদির সঙ্গে বরাবর স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন, আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন। বউদি চেষ্টা করেছিলেন, রেবাদির সঙ্গে চানুদার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। (চানুদাকে চিনিস তো? দাদার বন্ধু দুর্গাপুরে...।) চানুদার পছন্দও হয়েছিল রেবাদিকে, কিন্তু সেই সময় রেবাদি হঠাৎ একটা প্রেম করে ফেললেন। রেবাদি নিউ সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করেন—একদিন বৃষ্টির দিনে এক ভদ্রলোক ওঁকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইলেন, সেই থেকে আলাপ আর প্রেম, দুমাসের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল। রেবাদির স্বামীকে দেখতে খুব সুপুরুষ, চানুদার চেয়ে অনেক ভালো ঠিকই, কিন্তু বৌদি দুঃখিত হলেন। চানুদা কত বড় চাকরি করেন, আর কী ভালো মানুষ—তার তুলনায় প্রায় একটা অচেনা-অজানা লোককে বিয়ে করা—কিন্তু প্রেম ইজ প্রেম—কে আর কী বলবে। বিয়ের পর রেবাদি আমাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দিলেন। একদিন আমার সঙ্গে ডালহৌসিতে দেখা —রেবাদির একগাদা গয়না গায়—দামি শাড়ি, সেদিনও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, রেবাদি কেমন আছেন? রেবাদি হাসি-হাসি মুখে বলেছিলেন, ভালো আছি ভাই (একবারই 'ভালো আছি' বলেছিলেন সেদিন, দুবার নয়), তোমার বউদিকে বোলো যাব একদিন—একদম সময়ই পাচ্ছিনা—

বউদি বলতেন, রেবা একেবারে বিয়ে করে গদগদ—ওর স্বামী নাকি ওকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারেনা।—সবসময় মাথায় করে রেখেছে—রেবা বাপের বাড়ি যাবার সময় পায়না।

তপন সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরপর পর-পর চমকাবার জন্য তৈরি থাক। রেবাদির জীবনে সত্যি ঘটনাগুলোই এমন অবিশ্বাস্য যে একটুও বানাতে হয়না। ...কিছুদিন পর রেবাদিকে দেখলাম, আবার আমাদের বাড়িতে আসছেন, বউদির সঙ্গে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথা বলছেন, খুব মুখ শুকনো। বউদি তখন আমাদের কিছু বলেননি, তারপর কোর্টে মামলা ওঠার পর জানতে পারলাম'—

—কোর্টে?

—হ্যাঁ। ঘটনাটা এই, রেবাদির বিয়ের আট-ন'মাস পর একদিন একজন অপরিচিত মহিলা ওঁকে টেলিফোন করেন। তিনি বলেন যে, তিনি অনেক কষ্টে রেবাদির অফিসের ঠিকানা জোগাড় করেছেন, রেবাদির সঙ্গে তাঁর দেখা করার বিশেষ দরকার—রেবাদিরই উপকারের জন্য। দেখা করে ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি

রেবাদির স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রেবাদির স্বামী একজন অত্যন্ত লম্পট এবং বদমাইশ লোক। রেবাদির সাবধান হওয়া উচিত। রেবাদি বিশ্বাস করলেননা। তিনি জোর দিয়ে বললেন, না, তাঁর স্বামী খুব ভালো লোক, তাঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন—ভদ্রমহিলার কথার প্রমাণ কী?—ভদ্রমহিলা কী চান?

ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি কিছুই চাননা। কিন্তু রেবাদির স্বামী ভালো ব্যবহার করেন—এটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। লোকটি কি সত্যিই তাহলে বদলে গেছে?

লোকটি কি দাড়ি কামাবার আগে খুর ধার দেবার জন্য স্ত্রীর পিঠে খুর ঘষে রসিকতা করেনা? লোকটি কি সারারাত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাড়িতে মদ খেয়ে হল্লা করার জন্য স্ত্রীকে রান্না ঘরে শুতে বাধ্য করেনা? লোকটি কি স্ত্রীর টাকা নিয়ে মাঝে-মাঝেই চার-পাঁচদিনের জন্য বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকেনা? লোকটি কি চাবুক দিয়ে কোনদিন...

ভদ্রমহিলা রেবাদির হাত চেপে ধরে বললেন, আপনি বলুন সে ভালো হয়ে গেছে, তাহলেই আমি খুশি হব। আমি তবে কিছু চাইনা, আমার কোন স্বার্থ নেই। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—একবছর আগে ওর সঙ্গে আমার সেপারেশন হয়ে গেছে।

রেবাদি তখন আর কী করবেন? ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। বিয়ের একমাস পর থেকেই লোকটি ওর থেকেও আরও ঢের বেশি অত্যাচার করেছে। রেবাদি একথা কারুকে বলতে পারেননা।—কারণ তিনি নিজেই জোর করে বিয়ে করেছেন—সেইজন্য তিনি বাইরে হাসিখুশি থাকতেন। সবার সামনে নিজেকে সুখী দেখাতে চাইতেন।

তপনের গল্প শুনতে-শুনতে আমার মনে পড়ল, ভদ্রমহিলার মুখ। বেশ উৎফুল্ল মুখে তিনি বলেছিলেন, 'ভালো আছি'। সেটা সবটাই অভিনয়? তাহলে তো তিনি কাননবালা কিংবা ইনগ্রিড বার্গমানের চেয়েও বড় অভিনেত্রী। না, সবটাই অভিনয় হতে পারেনা! কিন্তু দুবার বলেছিলেন—সে বোধহয় অন্যরকম ভালো থাকা। তপনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রেবাদি তখন কোর্টে মামলা করলেন?'

তপন বলল, 'শোন-না! জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকরা নভেলে যত স্টান্ট দেন—অনেক সত্যি ঘটনায় তার চেয়ে অনেক বেশি চমক থাকে। অদ্ভুত ধরনের সামাজিক গণ্ডগোল শুধু বিলেত-আমেরিকাতেই হয়না—কলকাতাতেও অহরহ ঘটছে। রেবাদি কোর্টে কেস করতে বাধ্য—কারণ লিগাল সেপারেশনের পর দুবছরের মধ্যে বিয়ে করা এদেশে বেআইনি। লোকটা তাই করেছে। কোর্টেও জজ

রায় দিলেন, বিয়েটা সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। আইনত, লোকটির সঙ্গে রেবাদির যে-বিয়ে হয়েছে—সেটা মানা হবেনা। কিন্তু—'

তপন আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কিন্তু রেবাদি তখন পাঁচ মাসের প্রেগনেন্ট। সেই অজাত শিশুটির জন্য আদালত থেকে কোন নির্দেশই দেওয়া হলনা। তাহলে সেই সন্তানটির পিতৃ-পরিচয় কী হবে? এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক সবাই সেই পরামর্শটি দিয়েছিল রেবাদিকে, কিন্তু রেবাদি তা কিছুতেই মানতে চাইলেননা। তোর একটা অনুমান ঠিক, রেবাদির মেয়ে হয়নি ছেলেই হয়েছে, রেবাদির ছেলের বয়স এখন চারবছর—ভারি সুন্দর ছেলেটা। কিন্তু এরপর তোকে যা বলব, শুনলে তোর সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হবে, ভাবছি হয়তো রূপকথা কিংবা আরব্যোপন্যাস—কিন্তু এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি। আমি নিজে সাক্ষী আছি, আমি রেবাদির ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। বিরাট ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন হয়েছিল—

রেবাদির স্বামীর সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, তার নাম অনসূয়া, তিনি কিন্তু ঐ লোকটিকে প্রেম করে বিয়ে করেননি। তাঁর বাবা দেখেশুনেই—অমন চমৎকার চেহারার ছেলে, তখন ইনকামট্যাক্স অফিসে ভালো চাকরিও করত—ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে চাকরি গেছে—বেশ জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলেন। অতিকষ্টে পাঁচবছর অনসূয়াদি থাকতে পেরেছিলেন স্বামীর সঙ্গে—তারপর তাঁর মন ও শরীর দুই-ই ভেঙে পড়ে। রেবাদির ছেলে হবার পর তিনি হঠাৎ এসে একদিন বললেন, 'তোমার ছেলেকে আমায় দিয়ে দাও, আমি ওকে নিয়েই থাকব। তোমার তো বয়েস কম—তোমার হয়তো আবার কারুর সঙ্গে ভাবটাব হতে পারে—কিন্তু আমার জীবনে আর কিছুই নেই, আমি ঐ ছেলেটাকে নিয়ে তবু বাঁচতে পারি।' রেবাদি ছেলেকে একেবারে দিয়ে দিতে কিছুতেই রাজি নন। অনেক লজ্জা অপমান সত্ত্বেও তিনি ঐ ছেলেকে পৃথিবীতে এনেছেন। সুতরাং একটা অন্য ব্যবস্থা হল। অনসূয়াদি বেশ বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তিনি বাড়ি ছেড়ে রেবাদির সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন এখন—ছেলেকে সবসময় দেখতে পাবার জন্য। আমি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম —অনসূয়াদি আর রেবাদি অবিকল দুবোন কিংবা দুই সখীর মতো চমৎকার মিলেমিশে আছেন—খুব ভাব ওঁদের, কখনো মতের অমিল হয়না—অনসূয়াদি তাঁর বাড়ি থেকে মাসে আড়াইশো টাকা পান—রেবাদি চাকরি করেন—সুতরাং বেশ সচ্ছল সংসার ওঁদের—ছেলেটির যদিও পিতৃপরিচয় নেই—কিন্তু তাকে ওঁরা রাজপুত্রের মতন যত্নে রেখেছেন। রেবাদি সধবা সেজে থাকেন—লোকে জানে ওঁর স্বামী বিদেশে আছে। এখন ওঁরা যেভাবে আছেন—তাকেও সব মিলিয়ে বেশ ভালো থাকাই বলে—তবে দুবার 'ভালো আছি' বলার মতন ভালো থাকা, তাই না?

২৩

কোরাস গান শুনতে-শুনতে একটা গলাই সাধারণত প্রধান হয়ে কানে আসে। বোঝা যায় দশ-বারো জন গাইছে, কিন্তু একটা গলা তার মধ্যে আলাদা, বেশি সুরেলা বেশি জোরালো, অন্যরা যখন পরের লাইনটা গাইবে কিংবা আগের লাইন রিপিট করবে—এই নিয়ে দ্বিধা করে, তখন সেই একটি গলা গানটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তাকিয়ে থাকলে কিন্তু বোঝা যায়না, কোরাসের গায়ক-গায়িকাদের সেই আলাদা গলাটা কার। মানুষের চেহারা দেখে আর যাই বোঝা যাক গানের গলা কিছুতেই অনুমান করা যায়না। তবু আমি উৎসুক চোখে সেই মেয়েটিকে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানানোর। যাত্রা সুগম হচ্ছিল ওর জন্য। কিন্তু খুঁজে পাইনি, ধন্যবাদ জানানো হয়নি।

উত্তরবঙ্গের সরকারি বাস, ছেড়েছে মনুমেন্টের কাছ থেকে, সকালবেলা। শীত চলে গেছে, অথচ গরম পড়েনি—এমন সুন্দর সময়। বাসে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন যাত্রীর মধ্যে যদি আঠারো-কুড়িজন একবয়েসী মেয়ে থাকে, যদি তারা একই কলেজের, একই ক্লাসের ছাত্রী হয়, তবে তারাই সে আবহাওয়া অধিকার করে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। বেথুন বা ভিক্টোরিয়া বা ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রীরা এক্সকারশানে চলেছে।

প্যাসেজের দুপাশে সীট, বাঁদিকের সীটগুলো সবই নিয়েছে ঐ মেয়েরা, ডানপাশে অন্য যাত্রীরা, আমি জায়গা পেয়েছি একেবারে শেষের দিকে, ঝাঁকুনি-এলাকায়। এ ঝাঁকুনিতে খবরের কাগজ পড়া যায়না, বেশিক্ষণ জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখতেও ভালো লাগেনা। ঐ মেয়েরা মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার মতন ঘন-ঘন পরস্পর জায়গা বদল করছিল, যে-যার বেশি সখী সে বসছিল তার পাশে, চাপা রসিকতা, সম্মিলিত হাসি। হঠাৎ শুরু হল কোরাস গান।

আগে থেকে গান গাইবে ঠিক করেনি, রিহার্সাল দিয়ে আসেনি, সুতরাং তাদের মধ্যে, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন কেউ, প্রথম তুলেছিল গানের প্রস্তাব, সেই শুরু করেছিল এবং তার গলাই গানের গতি নিয়ন্ত্রণ করছিল। সে কে, আমি দেখিনি। যারা গাইছিল, তাদের প্রায় সবারই সুরেলা গলা—তবু একজনের গলা সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।

আজকাল সব মেয়েই রবীন্দ্রসংগীত গায়, সবাই মোটামুটি নির্ভুল গায়, এইজন্য অধিকাংশ সময়ই রবীন্দ্রসংগীত শুনতে ভালো লাগেনা, একঘেয়ে মনে হয় আমার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশখানা

গানই সবাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গায়। কিন্তু চলতি বাসে, একটু উঁচু স্কেলে উৎসাহভরা সতেজ গলায় বারো-চোদ্দজন মেয়ের গান, তার চার্ম আলাদা। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু সুর-ছুট, লাইন ভুলে গিয়ে সবাই মিলে দমকা হাসি—এসবই সেই গানের সার্থকতার অঙ্গ।

মন দিয়ে শুনছিলাম। পথ এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে, দূরত্বের বিরক্তি টের পাচ্ছিনা। মেয়েগুলির রবীন্দ্রসংগীতের স্টক কম নয়, একটা শেষ হলেই থেমে যাচ্ছেনা, কেউ জিজ্ঞেস করছেনা, তুই এটা জানিস? একজন কেউ ধরছে অন্য গানের প্রথম লাইন, আর কয়েকজন ঠিক গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠছে।

চা খাবার জন্য বাস থামল। মেয়েরা তখনও গানের ঝোঁকে আছে, নেমে ঘুরতে লাগল সাবলীলভাবে, প্রায় সবাই সুশ্রী ও স্বচ্ছন্দ। হুড়োহুড়ি করে চা-সিঙ্গাড়া খেয়ে বাসে উঠল, বাস চলা শুরু করতেই ওদের গান আবার শুরু হলো! লক্ষ করলাম যে-কয়েকটি মেয়ে টকাস-টকাস করে ইংরেজিতে কথা বলছিল, তারাও রবীন্দ্রসংগীত জানে।

বেলা বেড়েছে, প্রত্যেক যাত্রীই নিজেদের সীট গরম করে ফেলেছে, কেটে গেছে আড়ষ্টতা, সবাই নিজেদের হাত-পা ও ব্যক্তিত্ব ছড়াবার জন্য উসখুস করছে। সামনে ডানদিকের সীটগুলোতে বসেছে সেই জাতের কয়েকজন লোক, যারা টাকা দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ কিনে ফেলতে চায়। তবে নিজেদের গাড়িতে না-গিয়ে সরকারি বাসে চেপে যাচ্ছে কেন তারা, সেটা একটা সমস্যা। হয়তো নতুনত্বের জন্য। তাদের একজন গলা খাকারি দিয়ে বলল, 'আপলোগ হিন্দী গানা জানেননা? থোড়া হিন্দী গানা করুন-না!'

হিন্দী গান সম্পর্কে আপত্তি করার কিছুই নেই। এক-একটা ব্যাপার সম্পর্কে এমন একটা স্তর এসে যায়, যখন আর আপত্তি করার কোন মানে হয়না। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সস্তা কুরুচিপূর্ণ হিন্দী গান গেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে—এরকম একটা অভিযোগ কিছুদিন আগেও অনেকের মনে ছিল। কিন্তু এখন প্রতি পাড়ায় হিন্দী সিনেমায় বরাবর ভিড়, রেডিওতে বিবিধভারতীর সারাদিন চিৎকার, প্রতি পূজা প্যান্ডেলে হিন্দী গানের কান ফাটানো আওয়াজের পর এখন আর আপত্তি জানানো অর্থহীন! মশা, মাছি ধুলোর মতন বাংলাদেশে হিন্দী সিনেমার গান মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পিকনিকে, চলতি বাসে সবরকম গানই চলতে পারে। পিকনিক-টিকনিকে গেয়ে আনন্দ করাব মতন হালকা জমাট গান বাংলাতে বেশি নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত থামিয়ে হিন্দী গান গাইতে বললে বাঙালির সেন্টিমেন্টে এখনও সুড়সুড়ি লাগে। কারুর শালিকের ডাক শুনতে ভালো লাগে বলেই দোয়েল

পাখিকে শালিকের মতন গান গাইতে বলার কোন মানে হয়না। আমি ব্যাপারটা পছন্দ করলাম না। অবশ্য, আমি বসে আছি একেবারে শেষদিকে, আমার আপত্তি করার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। মনে পড়ল আর-একটা ঘটনা, একবার ট্রেনে চেপে ওয়ালটেয়ার যাচ্ছিলাম, দুজন বাচ্চা ভিখিরি কায়দায় পাথরের টুকরো বাজিয়ে চমৎকার গান করছিল। গানের ভাষা বুঝিনি এক বর্ণ, তামিল বা তেলুগু হয়তো, কিন্তু ভারি সুন্দর দুলকিচালের সুর। বাচ্চাদুটোকে দাঁড় করিয়ে গান শুনছিলাম, পাশে বসা দুজন কাপড়-ব্যবসায়ী একসময় বলে উঠেছিল, এই, হিন্দী গানা নেহি জানতে হো? বাচ্চাদুটো তখন নিজস্ব গান থামিয়ে অক্ষম বেসুরো গলায় হিন্দী সিনেমার দুখানা চলতি গান গাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। হিন্দী গানের অনুরোধে আমি চটিনি, কিন্তু ভিখিরি দুজন যখন পয়সা চাইল, কাপড়ের ব্যবসায়ী দুজন তখন হাত গুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল, আমি ঈষৎ ঝাঁঝালোভাবে বললাম, ওদের গান গাইতে বললেন, আর পয়সা দিলেননা? ব্যবসায়ী দুজন বাঁকাভাবে উত্তর দিল, কাকে ভিক্ষে দেব-না-দেব, তাও কি আপনার কাছে জেনে নিতে হবে নাকি? আমি মনে-মনে বলেছিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাবে! একটু রাত্তির হতেই কাপড়ের ব্যবসায়ী দুজন যখন ঘুমে ঢলতে লাগল, আমি সিগারেটের আগুনে তাদের কাপড় পুড়িয়ে গোল-গোল গর্ত করে দিতে লাগলাম। এমন কিছু অন্যায় করিনি, কাপড়ের ব্যবসায়ী তো ওরা, একটা কাপড় নষ্ট হলে আর কী যাবে- আসবে!

এখন অবশ্য ঐ ধরনের কাণ্ড কম করি। চুপচাপ বসে লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম শুধু। মেয়েগুলো বোধহয় অনুরোধ শুনতে পায়নি, গান গেয়েই চলেছে। আবার তারা, টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে চায়, একটু বিগলিতভাবে বলল, 'ইয়ে, শুনিয়ে, আপ লোগ বহুৎ আচ্ছা গানা করেন, লেকিন একটো হিন্দী গান যদি শুনায়ে দেন—'

মেয়েগুলো থামল, ভ্রূভঙ্গি করল, হেসে উঠল কলস্বরে। আবার একটা রবীন্দ্রসংগীত শুরু করল।

টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে চায়, তারা একটু দমে গেল। কিন্তু নিরাশ হলনা। হিন্দী গান শোনার ইচ্ছে তখন তাদের প্রবল। এবার তারা অস্ত্র বার করল।

সুটকেস থেকে বেরুলো ট্রানজিসটার রেডিও। নব ঘোরাতেই ঝনঝন করে উঠল হিন্দী সিনেমার গান। তীব্র, ধাতব, শ্রিল। মেয়েগুলি একমুহূর্তের জন্য থামল, তারপরই আবার দ্বিগুণ জোরে গাইতে লাগল। সুরের জগতে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সম্পূর্ণ দুরকম গান মারামারি করতে লাগল বাসের মধ্যে। মেয়েরা গাইছে 'ওগো, নদী আপন বেগে পাগল পারা, আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু...' আর

ট্রানজিস্টার গাইছে, 'তুম বিন যাউ কাঁহা!...' প্রতিযোগিতায় মেয়েরাই জিতছে, তারা ঢেকে দিচ্ছে ট্রানজিস্টারের আওয়াজ, কিন্তু তারা একটু দম নিতে থামলেই ফুঁড়ে উঠছে সেই ধাতব সুর! মেয়েরা পরের গান ধরল আরও তালের, আরও দ্রুত লয়ে 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!' আর ট্রানজিস্টারও ধরল ডুয়েট, 'শাওন কি মহিনে, পবন কিয়ে তোড়ো (আরে বাবা, তোড়ো নেহি, তো—ড়ো, তো—ড়ো)।'

টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে চায় তারা একটু হেরে গেলেও নিবৃত্ত হলনা। এবার তারা আরও দুটো ট্রানজিস্টার বার করল। তিনটেতেই টপ স্পীডে চালাল একই হিন্দী গান। এবার আর মেয়েরা পারবে কেন? তিনজন লতা মুঙ্গেশকারের সঙ্গে কি আর বারো-চোদ্দজন কলেজের মেয়ে পারে? তাদের গলা ছাপিয়ে ট্রানজিস্টারের সরু আওয়াজ সারা বাসে ক্যান-ক্যান করতে লাগল।

এবার মেয়েরা একটু থামল, তারপর তারা অন্য পন্থা ধরল। দেখা গেল, তারা হিন্দী গানও ভালো জানে, জানবেই, স্বাভাবিক। রবীন্দ্রসংগীত থামিয়ে ট্রানজিস্টারকে হারাবার জন্য, ওতে যে হিন্দী গান হচ্ছিল, তারাও সেটাই গাইতে লাগল। তখন আর গানটা বড় কথা নয়, ট্রানজিস্টারকে হারানোই যেন প্রধান। একমুহূর্ত থামছেনা তারা, গানের ফাঁকে-ফাঁকে যে-বিজ্ঞাপন অন্ধকারে পথ দেখাবে অমুক ব্যাটারি কিংবা 'সত্যিকারের কফির স্বাদ অমুক কফিতেও' তা-ও গাইতে ছাড়বেনা।

গান ছেড়ে চেঁচামেচিটাই প্রধান হয়ে পড়ায় একটুবাদেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারা চুপ করল, ট্রানজিস্টার চেঁচাতে লাগল অবিশ্রান্তভাবে। কোরাসে যে-মেয়েটির গলা প্রধান শোনা যাচ্ছিল, তার পরাজয়ের জনাই আমি একটু দুঃখ বোধ করছিলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটি মেয়ে বলল, 'ঐ ট্রানজিস্টারটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর, না রে?'

টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সুখ কিনতে চায়, তারা তা পেয়ে অত্যন্ত তৃপ্ত এখন। গদগদভাবে মেয়েটির উদ্দেশে বলল, 'দেখবেন? নিন-না।'

মেয়েরা তারপর থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে ট্রানজিস্টারে হিন্দী গান শুনতে লাগল। ভাব হয়ে গেল ডানপাশের লোকদের সঙ্গে।

২৪

এমনিতে আমার কোন চোখের দোষ নেই, কিন্তু মাঝে-মাঝে লোকে আমাকে ট্যারা বলে। মাঝে-মাঝে অর্থাৎ আমার চোখের দিকে কেউ চোখ রেখে তাকালে কোন খুঁত পাবেনা, বেশ গোল-গোল নিরীহ ধরনের চোখ, চোখের মণি যেখানে থাকার কথা সেইখানেই থাকে, ট্যারা বলে চেনার কোন উপায় নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে, একটু অমনোযোগী হলেই আমার চোখের তারাদুটো পাশের দিকে অদ্ভুতভাবে বেঁকে যায়, ঘাড়টাও একটু কাৎ হয়ে আসে। কোন অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখে যে আমার চোখ ট্যারা হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়, যে-কোন সময়েই এরকম হতে পারে। অর্থাৎ আমার সামনে হয়তো কোন রূপসী যুবতী, কিন্তু আমার মুখ দেখলে মনে হবে, আমি তখন দেয়ালের পোস্টার পড়ছি মন দিয়ে। কিংবা রাস্তা পার হবার সময় পাশ দিয়ে ছুটে আসা ভয়ংকর ট্রাকটিকে লক্ষ্য করছি মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু লোকের ধারণা, আমি নাকি তখন রাস্তার ওপারের কোন গজেন্দ্রগামিনীর দিকে তাকিয়ে বিমোহিত হয়ে আছি। অনেকসময় পাশের কোন লোক আমার হাত চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে সাবধান করেছেন, 'কী করছেন! মরবেন নাকি' কী অর্থে তাঁরা মরার কথা বলেন, আমি বুঝতেই পারিনা।

মোট কথা, আমার চোখের তারার এইরকম খেয়ালী পাগলামি নিয়ে আমি ছেলেবেলা থেকেই মনঃকষ্টে আছি। বন্ধুবান্ধবরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, ও কিছু নয়, তুই একটু লক্ষ্মীট্যারা! লক্ষ্মীট্যারা কথাটা শুনতে খারাপ নয়, ওটা আমার খুব অপছন্দ নয়, কিন্তু অচেনা লোকেরা ভাবে, ওরকম করা আমার বদমাইসী! কেননা, ট্যারা লোকদের চোখ দেখলেই বোঝা যায়, আমার চোখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই, আমার চোখ দেখে বড়জোর কেউ বলতে পারে গোরুর মতন ড্যাবডেবে কিংবা ইঁদুরের মতন কুচো-কুচো কিংবা ভেড়ার মতন বোকা-বোকা (আকালে নিভৃতে যে-দু-একজন একেবারেই প্রশংসা করেনি, তাও অবশ্য নয়) —কিন্তু ট্যারা কেউ বলবেনা। কিন্তু সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেই, মাঝে-মাঝে হঠাৎ আমার চোখের তারা দুটো কোণের দিকে চলে যায়, ঘাড়টা বেঁকে যায়, তখন আমার কিছুই খেয়াল থাকেনা, কিন্তু অন্য লোকে ভাবে আমি টেরিয়ে তাকাচ্ছি। হয়তো গভীর মনোযোগ দিয়ে সিনেমা দেখছি, হঠাৎ অন্ধকারে পাশের দম্পতির কাছ থেকে কথা ভেসে আসে আমার উদ্দেশ্যে, লোকটা কী অসভ্য, সিনেমা না-দেখে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে! আমি লজ্জিত হয়ে চমকে সোজা হয়ে বসি, ওঁদের তো বোঝানো যায়না যে, আমার ঘাড়টা ওঁদের দিকে বেঁকে গেলেও চোখের মণি দুটো আছে সিনেমার পর্দাতেই! একথা মুখে বলা

যায়না, সেইসঙ্গে অবশ্য একথাও বুঝতে পারিনা, ওঁরাই-বা সিনেমার পর্দার দিকে না-তাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন কেন! অথবা কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়তো আমাকে কোন উপদেশ দিচ্ছেন, আমি খুবই আন্তরিকভাবে শুনছি, হঠাৎ তিনি ধমকে উঠলেন, কী, কথা গ্রাহ্যই হচ্ছেনা! অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা হচ্ছে!— কলেজে পড়ার সময় যে এইরকম বকুনি কত খেয়েছি। বিনাদোষে আমার এই বকুনি খাওয়া।

আমার এই দোষের কারণ সম্পর্কে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। ডাক্তাররা কিছু বলতে পারেননা। আমার বাড়িতে একটা কথা শুনেছি, জানিনা সেটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য। শুনেছি, আমার জন্মের পর, আমার যিনি ধাত্রী বা ধাইমা ছিলেন, তিনি ছিলেন ট্যারা। জন্মের পর বেশ কয়েকবছর আমি তাঁর কোলেই মানুষ হয়েছি এবং আমি তাঁর মতন নকল করে তাকাবার চেষ্টা করতাম। ছেলেবেলা সেই ট্যারা ধাইমাকে নকল করা থেকেই নাকি আমার এই সাময়িক ট্যারা-দৃষ্টির অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেক শিশু যেমন লম্বা কবিতা আবৃত্তি করে কিংবা দাঁত ওঠার আগেই রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে কিংবা ভালো করে দাঁড়াতে শেখার আগেই টুইস্ট নেচে কিংবা বেড়ালের ইংরেজি বলতে পেরে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটায় ও বাপ-মায়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত করে, আমারও তেমনি প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল—তিনবছর বয়েসেই আমি ট্যারা ধাইমার নকল করতে পারতাম, অবিকল তার মতন তাকাতে পারতাম লোকজনের অনুরোধে, সবাই তাই দেখে হাততালি দিতেন।

কিন্তু ছেলেবেলায় যা ছিল আমার প্রতিভার প্রকাশ, এখন সেই জিনিশই আমার প্রতিভার সমস্ত পথ আটকে রেখেছে। সোজাভাবে দেখতে না-পারা, সামনে তাকিয়ে পাশের জিনিশ দেখা, কিংবা পাশে তাকিয়ে সামনে দেখা—এই গোলমালই মনে হয়, আমার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। সে-কথা যাকগে, আমার এই সাময়িক ট্যারাত্ব কাটাবার আমি বহু চেষ্টা করেছি, পারিনি, একটু অন্যমনস্ক হলেই দেখেছি—সব ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার। সুতরাং ভেবেছিলাম, চোখ দুটোকে ঢেকে রাখলে কেমন হয়। অর্থাৎ চশমা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এমনই প্রবল যে, হাজার চেষ্টা করেও চশমা নিতে পারিনি। চোখ দুটো আমার যতই দেখতে খারাপ হোক, আমার দৃষ্টিশক্তি সত্যিই খুব জোরালো। রাস্তায় বাস আসতে দেরি হলে শ্যামবাজারে দাঁড়িয়ে বন্ধুবান্ধবরা আমাকে অনুরোধ করে দ্যাখ তো, বালিগঞ্জ থেকে বাস ছাড়ল কিনা!—রামায়ণের যুগে জন্মালে আমার ধারণা, হনুমানের দরকার হতোনা, কন্যাকুমারিকায় দাঁড়িয়েই আমি অনায়াসে লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে দেখতে পেতাম। সুতরাং চোখের ডাক্তারের কাছে আমার কোন সুবিধে হয়নি, উল্টোপাল্টা এ বি সি ডি চার্টের একেবারে নিচে লেখা প্রিন্টেড অ্যাট

ক্যালকাটা—তাও পড়ে দিয়েছিলাম বলে তিনি চোখ রাঙিয়ে আমাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, যাতে আর কোনদিন তাঁর মূল্যবান সময় আমি নষ্ট না-করি!

হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এসে গেল। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, আমার মায়ের কাছে একজন বেশ বুড়ি মতন মহিলা বসে আছেন। বেশ পুষ্ট চেহারার বিধবা, নির্ভেজাল বাঙাল ভাষায় ঘর ভর্তি করে রেখেছেন। মা বললেন, একে চিনতে পারিস! এ হচ্ছে বিলুর মা, এ তোকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছিল। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই সেই, এই সেই আমার ছেলেবেলার ধাত্রী? আমার ওঁকে চিনতে পারার কথা নয়। আমি ওঁকে দেখছি অন্তত পঁচিশ বছব বাদে। জন্মেছিলাম পূববাংলার এক গ্রামে, সেই গ্রামের, মাটির কথা এখনো মনে আছে, কিন্তু মানুষজন সব আবছা হয়ে গেছে।

শুনলাম, আমার ধাত্রী, অর্থাৎ, বিলুর মা, পাকিস্তান হবার পরও পুববাংলায় ছিলেন, বছর পাঁচেক আগে মাত্র রিফিউজি হয়ে এসেছেন, আছেন রানাঘাটের এক কলোনিতে। সত্তরের বেশি বয়েস, শরীর এখনো ভাঙেনি, কিন্তু চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়, চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাননা।

চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে শুনে আমি দমে গেলাম। ওর কথা শোনা মাত্রই আমাব মনে হয়েছিল ওঁর ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে একবার মিলিয়ে নিতে হবে তো! ছেলেবেলার সেইসব কথা সত্যি কিনা! কিংবা ওঁর চোখের সামনে যদি আবার নকল করা শুরু কবি, তবে এবার উল্টো ফলও হতে পারে এখন, আমাব দোষ কেটে যেতে পারে। কিন্তু বিলুর মা এখন অন্ধ। ওঁব চোখের দিকে তাকিয়ে এখন আমার চোখ কী দেখবে?

বিলুর মা এসেছেন সাহায্য চাইতে। বাচ্চা নাতিব হাত ধরে, খোঁজ কবতে-করতে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। মা একটা কাপড় আর কয়েকটা টাকা দিয়ে দায় মেটালেন।

বিলুব মা আমাকে একেবারে আদরে-আদরে অস্থির করে তুললেন। আমার গায়েমাথায় হাত বুলিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'সেই দুধের বাচ্চা এখন এত বড় হয়ে গেছে? অ্যাঁ? এ যে ডাঙর জোয়ান! অ্যাঁ? আমার বুকের দুধ খাইয়েছি ওকে, সেই দুধের শিশু আজ এত বড়? অ্যাঁ?' আমি খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম বটে, কিন্তু একজন শহুরে আধুনিক যুবকের পক্ষে এইরকম নোংরা কাপড়-পরা বুড়ির হাত ছোঁয়া আদরে যতখানি অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত, তাও করছিলাম।

বিলুর মা আমাকে একটা অনুরোধ করে বসলেন। বললেন, 'তোদের এত চেনাশুনো, আমার চোখের একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারিস? গত

পাঁচবছর ধরে চোখের এই অবস্থা। কলকাতা শহরে এলাম, অথচ কলকাতা শহর যে কী জিনিশ, চোখ মেলে দেখতে পারলামনা। ও আমার সোনা, ও আমার মণি, একটু ব্যবস্থা করে দিবি? বড় ইচ্ছে করে মরার আগে একবার চোখ মেলে দেখে যাই। দিবি?'

এই বৃদ্ধা সম্পর্কে কোন স্মৃতিই আমার মনে নেই, একেবারেই অচেনা লাগছে। কিন্তু, ওঁর বুকের দুধ খেয়েছিলাম—সেই কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে একবার মুচড়ে উঠল। চোখের চিকিৎসা করা কি সহজ কথা? কত টাকা খরচ হবে, কোথায় কী ব্যবস্থা করতে হবে কিছু জানিনা, তবু মুখে না উচ্চারণ করতে পারলামনা, বললাম, 'আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করে দেব, তোমার চোখ ভালো হয়ে যাবে!' বিলুর মা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

কোথায় আমার নিজের চোখ ভালো করার কথা, তার বদলে যাঁর কাছ থেকে আমি চোখ-ট্যারা রোগ পেয়েছি, তাঁর চোখ ভালো করার চেষ্টাতেই আমাকে ব্যস্ত হতে হল। বিলুর মা মাঝে-মাঝেই নাতির হাত ধরে আমাদের বাড়ি আসা শুরু করলেন। আমিও বন্ধুর মামা, কলিগের কাকা, প্রতিবেশীর শ্বশুর—ইত্যাদিদের ধরাধরি করে এক চোখের হাসপাতালে সীট জোগাড় করে ফেললাম, প্রায় বিনাপয়সাতেই বিলুর মার চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ওঁর স্বাস্থ্য তখনো ভালো, চিকিৎসায় সুফলের আশাও পাওয়া গেল। প্রথমে ডাক্তাররা ওর দাঁতগুলো তুলে ফেললেন, মুখখানা তো ফোকলা হয়ে চুপসে গেল, তারপর চোখ অপারেশন হবে!

সেই সময় বিশেষ কাজে আমাকে যেতে হয় উড়িষ্যায়। মাসখানেক বাদে ফিরলাম, যথারীতি এই মাসখানেক আমার অন্যান্য বিষয় নিয়ে এত কিছু ভাবার ছিল যে, বিলুর মার বিষয়ে ভাবার সময় পাইনি। হঠাৎ একদিন বিলুর মা-কে আমাদের বাড়িতে দেখলাম। বুড়ি নিষ্পলক এক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, অন্য চোখটি তুলোর প্যাড দিয়ে ঢাকা। অপারেশন সার্থক হয়নি, আগে তিনি দুটি চোখেই সামান্য ঝাপসা দেখতে পেতেন, একটা চোখ অপারেশন করার পর সে-চোখটা একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। বাকি চোখটা ডাক্তাররা আর অপারেশন করতে ভরসা পাননি। দয়াবশত ডাক্তাররা ওঁর অন্ধ চোখটায় একটা পাথরের চোখ বসিয়ে দিয়েছেন। সেই পাথরের চোখ নিষ্পলক।

বাকি চোখটা থেকে তুলোর প্যাড সরিয়ে অতিশয় ঝাপসাভাবে তাকিয়ে বুড়ি বললেন, 'আমার আর কলকাতা শহর দেখা হলনা। তাতে কী! তুই তো চেষ্টা করিছিলি! বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, রাজা হও, মানিক আমার, আহা, সেই দুধের ছেলে আজ কত বড়, আহা'—বুড়ির ঝাপসা চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

খেয়াল করিনি, কখন আমার চোখের মণি দুটো কোণের দিকে সরে গেছে, ঘাড় বেঁকে গেছে। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে আছি, আমারও চোখে জল এল হঠাৎ। এখনো সেই অনুকরণ! বুড়ির চোখের জল দেখে আমার অমনি চোখের জল!

২৫

কলেজ স্ট্রিটের রেলিং-দোকান থেকে একটা বই কিনে ফেললাম। অনেক দরাদরি করেও ষাট পয়সার কমে নামাতে পারলামনা, একটা আধুলি ও দশ পয়সার বিনিময়ে বইটি আমার হস্তগত হল।

বইটার আসল দামই বারোআনা। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরে বইটা নাড়াচাড়া করছিলাম বলে দোকানদার আমার উৎসাহ টের পেয়ে গিয়েছে। বইটার মলাট ছেঁড়া, পাতাগুলো হলদে আর মুড়মুড়ে, ছাপা হয়েছে আঠারোশ' একাশি সালে।

বইটার নাম মাধব ও ললিতা, লেখকের নাম নিত্যানন্দ শাস্ত্রী। এ-বইয়ের নাম আমি আগে কখনো শুনিনি। গবেষক-টবেষক হবার মতন বিদ্যে আমার নেই, পুরোনো বইয়ের সাল-তারিখ আর ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার স্বভাব নয়। তবে মাঝে-মাঝে জীবনটা একঘেয়ে লাগলে দু-একটা বেশ পুরোনো ধরনের বই পড়ে খানিকটা মুখ বদলাতে ভালো লাগে। সে-বইয়ের সাহিত্যমূল্যের জন্যে নয়—পুরোনো কালের আবহাওয়া, মানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা বেশ আকর্ষণ করে।

কিন্তু এ-বইটা আমি কিনলাম আর-একটি কারণে। বইটাতে বহুকাল আগের বিবর্ণ কালিতে নানারকম মন্তব্য লেখা আছে—সেগুলো থেকেও আর-একটা কাহিনীর আভাস ফুটে ওঠে। আগেকার দিনে গয়নার বাক্সে যেমন একটা বাক্সের মধ্যে আর-একটা বাক্স থাকত—এটাও সেরকম, উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাস।

বইখানা একটা গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী। এই বইখানা যে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভাষা খুবই দুর্বল, বঙ্কিমবাবুর ব্যর্থ অনুকরণ। কিন্তু উননব্বই বছর আগে প্রকাশিত বই তো আর সাহিত্য-সমালোচকের মন দিয়ে পড়া যায়না। কাঁচা-কাঁচা ভাষায় সেকালের জীবনের কথা পড়তে বেশ ভালোই লাগে, ঘটনাগুলো সত্যিই মনে হয়। লেখক নিত্যানন্দ শাস্ত্রীমশাই স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও সেকালের পক্ষে রীতিমতন সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বামুনের ছেলে আর তাঁতির মেয়ের প্রেম।

পরম শাস্ত্রজ্ঞ বংশের ছেলে মাধবকুমার ছেলেবেলা থেকেই খুব দুরন্ত ; নদীর পারে, শ্মশানে, সে একা-একা ঘুরে বেড়ায়, তাঁতি-জেলে-কামার-কুমোরদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। তাঁতির বাড়ির মেয়ে ললিতার সঙ্গে সে খেলা করে, ঝগড়া করে —দুজনের বয়েস তখন যথাক্রমে এগারো ও নয়। তারপর মাধবকুমারকে পাঠানো হল বারাণসীতে—কিন্তু সেখানে গিয়ে শাস্ত্রপাঠে তার মন বসেনা, সর্বক্ষণ মনে পড়ে ললিতার কথা 'বারাণসীর গঙ্গার তরঙ্গেও সে শুনিতে পায় ললিতার হাস্যধ্বনি। এই গঙ্গাই তো তাহাদের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বাহিয়া যাইতেছে।'

যাইহোক, মাধবকুমার তো একদিন খুব পণ্ডিত হয়ে অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করে গ্রামে ফিরে এল—কিন্তু ততদিনে ললিতার বিয়ে হয়ে গেছে এবং বিধবা হয়েছে। মাধবকুমার তখন যেদিকে তাকায় সেদিকেই শ্মশান দেখে। কোন শাস্ত্রই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনা! সমাজের এইসব বন্ধন যারা সৃষ্টি করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হয়!

লেখক এই পর্যন্ত খুব সাহস দেখিয়েছেন অবশ্য। কিন্তু সেসময় বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ করালেও মাধব আর ললিতার বিয়ে দিতে সাহস পাননি! কারণ, তখন বিধবা বিয়ে হলেও—ব্রাহ্মণী বিধবার সঙ্গেই ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ে হতো। লেখক শেষপর্যন্ত ললিতাকে খ্রিস্টানী করে দিলেন, সে চলে গেল আসামে—আর মাধবকুমার বিবাগী হয়ে গেল। শেষের দিকে খুব একটা দার্শনিক তত্ত্ব দেওয়া আছে।

এই তো গেল আসল বইয়ের গল্প। বইখানা আঠারোশ' বিরাশি সালে একজন কেউ কিনে আর-একজনকে উপহার দিয়েছিল। একজন পুরুষ যে একজন নারীকে উপহার দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন সন্দেহ নেই, তা পরে বলছি। শুধু লেখা আছে হে-কে বি। অর্থাৎ হে-নাম্নী কারুকে উপহার দিয়েছেন বি। রবীন্দ্রনাথও হে-নাম্নী নারীকে তাঁর বই উৎসর্গ করেছিলেন। এখানে 'হে' হয়তো হেমাঙ্গিনী বা হেমনলিনী বা হেমপ্রভা—এর থেকে বেশি আধুনিক নাম তখনকার পক্ষে ভাবা যায়না! আর 'বি' নিশ্চয়ই বিনোদবিহারী বা বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর। বিকাশকান্তি বা বিভাসকুমার যদি হয় তো খুবই আধুনিক বলতে হবে! যাইহোক, আমি নারীটির নাম মনে-মনে বেছে নিলাম হেমপ্রভা এবং পুরুষটি বিশ্বেশ্বর!

উপহারের তলায় পুরুষ হস্তাক্ষরে লেখা, 'এই বইটি শুধু তুমিই পড়িবে। ইহা শুধু তোমার একার।' একথা লেখার মানে কী? বই কি কখনো একার জন্য হয়! তাছাড়া 'মাধব ও ললিতা' এমন কিছু একটা আহামরি বই নয়, কবিতার বইও নয় যে সেটাকে যত্ন করে লুকিয়ে রাখতে হবে।

আমি গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। প্রথমেই লক্ষ করলাম, টাইটল পেজের এক কোণে লেখা আছে, 'পৃষ্ঠা ৯৭'। বইটি মোট দেড়শো পাতা, তাহলে ৯৭ পৃষ্ঠাটির বিশেষত্ব কী? খুললাম। ৯৭ পৃষ্ঠায় পাঁচ-ছটি লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া! মার্জিনে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'লেখকরা যাদুকর!' লাইনগুলি এই :

'কোন বাক্য বিনিময় হইল না! মাধব ললিতার দিকে কয়েক পলক নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল। ললিতা তখন অলিন্দে একটি রক্তবর্ণ ভিজা শাড়ি মেলিতেছিল, মাধবের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল, আবার চাহিল। সেই দু-এক পলকেই বহু কথা নিঃশব্দে উড়িয়া গেল বাতাসে—সেই কথা শুধু হৃদয় হইতে হৃদয়ে পৌঁছায়। আশ্বিন মাসের সেই সকালটি অনন্ত মুহূর্ত হইয়া দাগিয়া রহিল মাধবের বুকে।'

ও হরি, এটা আসলে একটা অভিনব প্রেমপত্র। আমাদের এই বিশ্বেশ্বরবাবু ১৮৮২ সালে হেমপ্রভাকে চিঠি লেখার বদলে বইয়ের কয়েকটা লাইনে দাগ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই কোন আশ্বিনের সকালে তিনি হেমপ্রভাকে দেখেছিলেন লাল শাড়ি শুকোতে দিতে। চোখাচোখিও হয়েছিল—এবং দৈবাৎ এই বইতে সেরকম বর্ণনা পেয়ে চিঠির বদলে বইটাই দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই দুজনের জাতের মিল ছিলনা। তবে অতকাল আগে হেমপ্রভা বই পড়তে জানতেন—এটা বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্রাহ্ম মেয়ে ছিলেন বোধহয়।

আরও আছে। হেমপ্রভা শুধু পড়তে জানতেননা লিখতেও পারতেন। মুক্তোর মতন ঝকঝকে হাতের লেখা। বইয়ের একেবারে শেষে। সাদা পাতায় স্পষ্ট মেয়েলি হাতের লেখা রয়েছে কয়েক লাইন। নিশ্চয়ই হেমপ্রভার লেখা। সম্ভবত বইটি তিনি বিশ্বেশ্বরকে ফেরত দিয়েছিলেন। চিঠি চালাচালির বদলে বই আদানপ্রদান অনেক সুবিধেজনক, অন্তত সেকালে ছিল! হেমপ্রভা লিখেছেন :

'না, পুরুষ লেখকরা নারীর অন্তরের সমস্ত দুঃখ বেদনার কথা সম্যক বুঝিতে পারেনা। মাধব যেদিন উন্মাদের মতন ললিতার পিতার গৃহে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সেদিন ললিতা তাহার দরজা খোলে নাই, ঘরের বাহির হয় নাই। মাধব তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী ভাবিয়া ফিরিয়া গেল। ছাই বুঝিয়াছ লেখক! তাহার কলমের মুখে চুনকালি! জানে না যে প্রাণের বিনিময়েও নারী তাহার দয়িতের সম্মান নষ্ট হইতে দেয়না। আমি শত দুঃখ সহিতে পারি—দুঃখ সহ্যের ক্ষমতা নারীর জন্মগত—কিন্তু তোমাকে কোনো দুঃখ বা অসম্মান ভোগ করিতে দিবনা!'

বাঃ, হেমপ্রভার কলমের তো বেশ ধার ছিল! অনায়াসেই লেখিকা হতে পারতেন। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বেশ্বরবাবু একদিন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হেমপ্রভাদের বাড়িতে এসেছিলেন—সেদিন হেমপ্রভা তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

সেই কি শেষ দেখা? শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল ওদের! সেটা আর জানা গেলনা। ৫৫ পৃষ্ঠাতেও দুটি লাইনের তলায় দাগদেওয়া। সেটা ওদের দুজনের মধ্যে কে দাগ দিয়েছে ঠিক নেই। 'একবার ভাবিল মরিব। পরক্ষণেই আবার ভাবিল, না। মরিলে তো আর ও মুখ ধ্যান করিতে পারিবনা!'

বয়েসের হিশেব করলে বিশ্বেশ্বর আর হেমপ্রভা আমার ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার চেয়েও বয়েসে বড়। এতদিন তাদের বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু তাদের যৌবন কালের প্রণয়ের সৌরভ আমাকে ছুঁয়ে গেল। এরকম বইখানা ওদের কোন বংশধর সের দরে বেচে দিয়েছে! কী খেয়াল হল, বইটার শেষে আমি লিখলাম, 'হে মাধব ও ললিতা, হে বিশ্বেশ্বর ও হেমপ্রভা, স্বর্গে কি তোমাদের দেখা হয়েছে? অমরলোকে কি মিলন হয়েছে, মিটেছে অতৃপ্ত বাসনা? ভালোবাসার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটাই বড় সাংঘাতিক। আশা করি স্বর্গে ভুল বোঝাবুঝি নেই! জাতিভেদও নেই সেখানে।'

লেখকরা লেখে ভবিষ্যৎকালের পাঠকদের জন্য, আমি লিখলাম অতীতকালের উদ্দেশ্যে।

২৬

এখন মেয়েদের যে গোল চশমা বেরিয়েছে, সেগুলো আমার পছন্দ হয়না। মস্ত বড় গোল-গোল ফ্রেমের সানগ্লাস আজকাল পথেঘাটে অনেকমেয়ের চোখে দেখতে পাই, সেগুলো দেখলেই আমার নাক কুঁচকে যায়।

স্বপ্না বলল, 'ওরকম বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

আমি বললাম, 'কী করব বলো! আমার মুখখানাই যে বিশ্রী দেখতে। আমি তো আর চেষ্টা করলেও সুন্দর হতে পারিনা! কিন্তু তোমার মুখখানা তো সুন্দর, তুমি অমন বিচ্ছিরি চেহারা করেছ কেন মুখের?'

—কোথায়, বিচ্ছিরিটা আবার কোথায় দেখলেন?

—ঐ যে চোখে বিকট গোল সানগ্লাস পরেছ! খুলে ফ্যালো!

—এই চশমাটা বিচ্ছিরি! এটাই হচ্ছে লেটেস্ট গো-গো ব্যাপার। আপনার কোন টেস্ট নেই!

—এটা শুধু আমার টেস্টের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর যাবতীয় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের টেস্টের ঠিক উল্টো! চিরকাল টানা-টানা চোখ বলতেই সুন্দর চোখ বুঝিয়েছে, যেমন পটল-চেরা চোখ কিংবা নদীর বাঁকের মতন ভুরু! তার বদলে

ভুরু-টুরু সব ঢেকে একি বিশ্রী চশমা! কথাতেই বলে গোল-গোল চোখ মানেই বোকা-বোকা ব্যাপার, কিংবা শাকচুন্নীরা চোখ গোল-গোল করে তাকায়। ছবিতে দ্যাখনি, যত ভূত কিংবা শাকচুন্নী, আঁকা হয় সবারই চোখ গোল? আর তোমরা ইচ্ছে করে...

—যান যান, আপনি তো ভারি বোঝেন! আজকাল অন্যসব স্মার্ট ছেলেরা এইরকম সানগ্লাসই পছন্দ করে।

—আমি অবশ্য তেমন স্মার্ট নই। তবে ডুবে-ডুবে জল খেতে জানি ঠিকই, বুঝলে! আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের খুব ভয় করে—মুখের ওপর একদম নিন্দে করতে পারেনা, মেয়েদের যা দেখে তাই প্রশংসা করে। কিন্তু ছেলেরা যখন আলাদাভাবে নিজেদেব মধ্যে গল্প করে, তখন তোমাদের সম্পর্কে যা বলে, তা যদি কখনো শুনতে—

—কী বলে, কী বলে, বলুন-না!

—ইস্, বলব কেন? ছেলেদের গোপন কথা তোমাদের জানিয়ে দেব কেন?

—যান বলতে হবেনা। আমরাও নিজেদের মধ্যে গল্প করার সময় ছেলেদের সম্পর্কে কী বলি, তাও আপনাকে বলবনা!

—সে তুমি না-বললেও আমি জানি।

—কী করে জানবেন? মেয়েরা কক্ষনো সেসব কথা ছেলেদের সামনে বলবেনা!

—না-বললেই-বা। লেখকরা তবু সব জেনে যায়। লেখকরা অন্তর্যামীর ছোট ভাই কিনা।

—আহা—হা, ভারি তো লেখক আপনি! সম্পাদকদের খোসামোদ করে-করে একটা-দুটো লেখা ছাপান! তাও কেউ পড়েনা!

—এই স্বপ্না, বাজে কথা বলবেনা! আচ্ছা দ্যাখো, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ছেলেদের সম্পর্কে কী রকম আলোচনা করে। আমি সব বলে দিচ্ছি! দ্যাখো, মেলে কিনা!

স্বপ্না পা থেকে চটিটা একবার খুলে আবার পরল। টেবিলের ওপর ছড়ানো আঁচলটা গুছিয়ে পিঠে রাখল, কালো চশমাটা খুলে ঝকঝকে চোখে তাকাল, একটা আঙুল থুতনিতে কায়দা করে ছুঁইয়ে বলল, 'বলুন, শুনি!'

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'মনে করো, তুমি আর গায়ত্রী হাজরা মোড় দিয়ে আসছিলে, এমন সময় বরুণ সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তোমরা দুজনেই আগে বরুণকে দেখেছ, কিন্তু তোমরা ওকে ডাকলেনা—তুমি গায়ত্রীকে বললে, ঐ ছেলেটাকে দ্যাখ, পাশ থেকে বরুণের মতন দেখতে। গায়ত্রী বলল,

মতন আবার কী, ও তো বরুণই! (তুমিও সেটা ভালোই জানো!) তুমি বললে, ও বোধহয় অমলের বাড়িতে গিয়েছিল—অমল তো এইদিকেই থাকে! গায়ত্রী বললে, তাই নাকি, অমলের বাড়ি বুঝি এখানে?

(গায়ত্রীও খুব ভালোভাবেই জানে যে অমলের বাড়ি মনোহরপুকুরে!) তারপর বরুণ ঠিক যেই তোমাদের দিকে তাকিয়েছে, অমনি তোমরা একটা হিন্দী সিনেমার পোস্টার খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলে।

বরুণ তখন কাছে এগিয়ে এসে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

তোমরা উদাসীনভাবে বললে, এখানেই আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম! আপনি বুঝি এদিকেই থাকেন?

বরুণ হেসে বলল, না, আমিও আমার এক বন্ধুর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। যাক, আর যাবনা!

তোমাদের দুজনেরই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, কোন বন্ধুর বাড়ি? অমলের? কেননা তোমাদের দুজনেরই অমল সম্পর্কে বেশ ইন্টারেস্ট আছে! অমল দারুণ ব্রাইট ছেলে। যাইহোক, তোমরা মুখে সে-কথা বললেনা। গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, কেন, যাবেননা কেন?

বরুণ একটা মনোমতো কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেল। সে পল নিউম্যানের মতন কাধ ঝাঁকিয়ে বলল, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এখন আর বন্ধুর বাড়িতে কে যায়! আপনারা এখন কোথায় যাবেন?

এরপর বরুণ অতি ব্যস্ততায় বেশ কয়েকটা উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলল। সে বলল যে, তোমরা যদি গড়িয়াহাটার দিকে যাও, তাহলে ও পৌঁছে দিতে পারে ওর গাড়িতে—ওদিকে ওর একটা দরকার আছে। তোমরা সেদিকে যেতে চাও না শুনে ও তোমাদের পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে—ওখানে আরেক কোন বন্ধুর সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, একটা রেস্তোরাঁয়—তোমরা গেলে ও খুবই খুশি হবে।

গায়ত্রী সে-প্রস্তাবেও রাজি হলনা। যদিও পার্ক স্ট্রিট যাবার খুব অনিচ্ছা ছিলনা, কিন্তু ওর ধারণা প্রস্তাবটা দেবার সময় ও শুধু স্বপ্নার দিকে তাকিয়েই বলছিল। আর স্বপ্নাও রাজি হলনা। যদিও অনিচ্ছা ছিলনা তারও, কিন্তু সে ভাবল, আহা, অন্যসময় তো ছন্দাকে দেখলেই বরুণ একেবারে গদগদ হয়ে পড়ে। আর এখন—।

খানিকটা নিরাশ হয়ে গেলেও বরুণ হাল ছাড়লনা। আরও কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলি করল, আর তোমরা দুজনেই খুব হাসতে-হাসতে ওকে প্রত্যাখ্যান করলে। তারপর

বরুণ তোমাদের কোকাকোলা খাইয়ে বিদায় নিল—তোমরা দুজনেই লক্ষ রাখলে, ও অমলের বাড়ি যায় কিনা। কারণ, বরুণ যদি তোমাদের অমলের বাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলত, তোমরা তক্ষুণি রাজি হতে।

বরুণ চলে যাবার পর, গায়ত্রী বলল, শুধু-শুধু অনেকটা, দেরি হয়ে গেল!

তুমি বললে, সত্যিই, মা আজ বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরতে। আসলে, তোমাদের দুজনের কারুরই বরুণের সঙ্গে কথা বলতে এবং ওর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে খারাপ লাগেনি। বরুণ যদি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করত, তাও তোমরা বিরক্ত হতে না। ছেলেদের অনুরোধ কিংবা আবেদন উপেক্ষা করতে মেয়েরা খুব ভালোবাসে। আবার ছেলেরা সবসময় নানা অনুরোধ না-করলেও মেয়েরা চটে যায়।

যাইহোক, একটুক্ষণ তোমরা দুজনেই অন্যকথা বলার পর, গায়ত্রী বলল, বরুণ, ছেলেটা কিন্তু এমনিতে বেশ স্মার্ট, না-রে?

তুমি তখন বললে, হ্যাঁ, কাঁধ দুটো বেশ চওড়া। ক্রিকেট খেলে তো—

অর্থাৎ, গায়ত্রী বরুণের দুটো প্রশংসা করার পর তুমিও দুটো প্রশংসা করলে! তারপর যখন তোমার মনে হল, গায়ত্রী একটু বেশি বেশি প্রশংসা করছে, তখন তুমি বললে, তবে যাই বলিস, ওর হাসিটা একটু ক্যাবলা-ক্যাবলা।

(বরুণের ধারণা, তাকে পল নিউম্যানের মতন দেখতে।)

গায়ত্রী তখন বলল, তাকানোটাও কীরকম কীরকম যেন! মাঝে-মাঝে বড্ড ন্যাকা হয়ে যায়!

অর্থাৎ ওর দুটো নিন্দে করার পর গায়ত্রীও দুটো নিন্দে করে ফেলল। এবং কী করে যেন অমলের সঙ্গে ওর একটা তুলনা এসেই গেল। আর অমলের তুলনায় বরুণ যে কিছুইনা—'

স্বপ্না অনেকক্ষণ ধরেই আমার কথায় ফুলে-ফুলে হাসছিল, এবার হো-হো করে হেসে বলল, 'একদম গল্প! কিছু মেলেনা। মেয়েরা কক্ষনো এরকম করে কথা বলেনা। আপনারা কিছু জানেননা, শোনেননা, শুধু বানিয়ে-বানিয়ে লেখেন।'

আমি বললাম, 'মেয়েদের আর-একটা দুর্বলতা এই, তারা নিজেদের সম্পর্কে সত্যি কথা শুনলে একদম মানতে চায়না! যাক গে, এবার শোনো, ছেলেরা যখন নিজেরা শুধু থাকে, তখন কী রকম কথা বলে।'

—থাক, সে আর বলতে হবেনা। সে আমাদের ভালোই জানা আছে। ছেলেরা খুব অসভ্য হয়।

—সব ছেলেই অসভ্য? তুমিও কিছু জানোনা। তোমাকে একটা সত্যি কথা

বলি, ছেলেরা যখন শুধু নিজেরা থাকে, তখন মেয়েদের কথা একদম বলেইনা! তাদের নিজস্ব কত কথা আছে, রাজনীতি, স্পোর্টস, দেশের অবস্থা, শিল্প-সাহিত্য —এইসব, মেয়েদের কথা বলে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন?

—থামুন, থামুন! ঢের জানা আছে! সব হ্যাংলা এক-একটা—

—সত্যি বলেছি, ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মেয়েদের কথা একদম বলেনা। গোপন রাখে। যদি-বা বলে, তাও এলিজাবেথ টেলর কিংবা ইন্দিরা গান্ধী কিংবা ভার্জিনিয়া উলফ—এইসব বিখ্যাত নারীদের কথা—অথবা রাস্তায় সম্পূর্ণ কোন অচেনা মেয়ে দেখলে তার সম্পর্কে—কিন্তু নিজেদের চেনা মেয়েদের সম্পর্কে কোন কথাই বলে না কখনো। নেহাত দু-চারটে বোকা ছেলে আছে অবশ্য, তারা ছাড়া—

—আপনি নিজেকে খুব চালাক ভাবেন, না?

—আর-একটা কথা শোনো। ছেলেদের বান্ধবীরা যখন খুব সাজগোজ করে আসে, লেটেস্ট ফ্যাশান নিয়ে আলোচনা করে—তখন তারা একটা খুশির ভাব দেখায় বটে, কিন্তু মনে-মনে তারা অন্য একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখে। প্রত্যেক ছেলেই সেইরকম একটি মেয়েকে ভালোবাসতে চায়—যে মোটামুটি সুন্দরী তো হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যার মধ্যে কোন ন্যাকামি থাকবেনা, যে কখনো শাড়ি-গয়নার জন্যে লোভ করবেনা, যে ছেলেদের সঙ্গে সবরকম অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারবে, যদি কখনো দুঃখ-কষ্ট আসে, রোদ-ঝড়-জলেও সেই মেয়েটি হাসিমুখে তার পাশে থাকবে—আবার আনন্দ কিংবা সুখের সময়েও—। অবশ্য এরকম মেয়ের দেখা সে কখনো পাবেনা, তাও জানে। তোমরা মেয়েরা নানারকম শাড়ি-গয়নার ডিজাইন আর গোল কালো চশমা আর লেটেস্ট হেয়ার ডু করে, পুরুষদের ভোলাতে চাইছ, অথচ পুরুষরা মনে-মনে ভালোবাসে একটি নিরাভরণ, নিরভিমান সুন্দরী মেয়েকে।

স্বপ্না দর্পের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ করব, এই গোল চশমা পরব। আপনাদের পছন্দে-অপছন্দে আমাদের কিছু যায়-আসেনা।'

———

সংযোজন ক

১

বিয়েবাড়িতে দেখা ছবির সঙ্গে। বেশি সাজগোজ করেনি, তার শাড়ি-গয়না চোখ ধাঁধায়না, তবে খোঁপাটি খুব সুন্দর ক'রে বেঁধেছে, সেই সঙ্গে একটা মানানসই টিপ। হালকা ছিপছিপে শরীরটা নিয়ে বারবার সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করছে। আমার দিকে একবার চোখাচোখি হতেই ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করল, কখন এলেন।

আর বেশি কথা বলার সময় নেই। কনে রয়েছে তিনতলায়, একতলায় বরযাত্রীরা হাসিঠাট্টা করছে, উঠোনে সাজানো হচ্ছে ছাঁদনাতলা। দোতলায় ব'সে আছে অন্য মেয়েরা—সব জায়গাতেই তাকে একবার ক'রে যেতে হবে তো! বরের নাম অনিন্দ্য, সে আবার আগে থেকেই ছবির চেনা—সুতরাং তার সঙ্গেও মাঝে-মাঝে এসে রসিকতা ক'রে যেতে হয়।

আমি প্রথম ব্যাচেই খেয়ে নিয়ে পালাবার মতলবে ছিলাম, ধরা প'ড়ে গেলাম ছবির হাতে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে তার মুখোমুখি। চোখ পাকিয়ে বলল, এই তো আপনি এক্ষুনি খেতে যাচ্ছেন কি? লজ্জা করেনা? যান নিচে গিয়ে বসুন!

আমতা-আমতা ক'রে কিছু বলতে গেলাম, শুনলনা। আমাকে আবার ফিরে আসতে হ'ল।

অনিন্দ্য আমাকে ইসারায় ডেকে পাশে বসালো। আজকের আসরে বরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি—সবাই তাকে একবার ক'রে দেখে যাচ্ছে—আমি তার পাশে বসার জন্য আমার ওপরেও পড়ছে তাদের চোখ। এত চোখের দৃষ্টি একসঙ্গে আমার ওপর পড়লে আমার খুব অস্বস্তি হয়। সবাই হয়ত ভাবছে, এ আবার কে?

অন্যদের দিকে পিছন ফিরে আমি অনিন্দ্যকে জিজ্ঞেস করলাম, কি নার্ভাস লাগছে একটু-একটু?

অনিন্দ্য বলল, বুকে হাত দিয়ে দেখুন। বুকটা টিপ-টিপ করছে?

অনিন্দ্যর সঙ্গে মমতার বহু দিনের চেনা-পরিচয়। মমতা আমার পিসতুতো বোন। দু-পক্ষের বাড়ি থেকেই বিয়ের ব্যাপারে ঘোর আপত্তি—কারণ জাতের অমিল। এদিকে ওরা বিয়ে করবেই। প্রায় চার-পাঁচ বছর টালবাহানা করার পর শেষ পর্যন্ত দুটি পরিবারই মত দিয়েছে। আসলে কিন্তু এই আজকের বিয়ের ব্যাপারটা নিছক লোক-দেখানো—অনিন্দ্য আর মমতার গোপনে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেছে ছ-মাস আগেই। সেই বিয়েতে আমি সাক্ষী ছিলাম—আর সাক্ষী ছিল অনিন্দ্যর বন্ধু সুকোমল এবং ছবি। এরকম দুটো গোপন বিয়েতে তিন মাসের

মধ্যে দুবার আমাকে সাক্ষী দিতে হয়েছে।

অনিন্দ্যর অন্যান্য বন্ধুদের আমি চিনিনা—আজ যারা বরযাত্রী এসেছে। এইসব দিনে সবারই একটু হাস্য-পরিহাসের দিকে মন যায়, মাঝে-মাঝে মুখ-আলগা কথাও বেরিয়ে আসে। আমি আর অনিন্দ্য অন্য কথা বলছিলাম।

এইসময় ফটোগ্রাফার এল অনিন্দ্যর ছবি তুলতে—সেই সঙ্গে কৌতূহলী মেয়ের দঙ্গল। তাদের মধ্যে ছবিও আছে। ছবি আমাকে দেখে বলল, এই আপনি ওখানে ব'সে আছেন কেন? আপনারও বুঝি ছবি তোলার শখ?

আমি উঠে এসে ছবিকে বললাম, বাঃ, খেতে বসবনা, বরের পাশেও বসবনা —তাহ'লে আমি যাব কোথায়?

—কিছু কাজ করতে পারছেননা?

আমি হাসলাম। এটা যদিও আমার পিসিমার বাড়ি—কিন্তু সবাই জানে আমি একটা অপদার্থ। সারা বাড়ি ছুটোছুটি কিংবা কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পরিবেশন করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। বিয়েবাড়িতে এসে শুধু খাওয়া ছাড়া আমার আর-কোন যোগ্যতা নেই।

জিজ্ঞেস করলাম, ছবি তুমি এখন কী করছ?

ছবি বললো, আপনাকে যে একদিন বললাম, মনে নেই? আমি একটা স্কুলে পড়াচ্ছি। মিশনরি স্কুল।

—তাহ'লে তো মাইনে ভালোই পাচ্ছ। একদিন খাওয়াবেনা?

—যে কোনদিন।

—তোমার একটা খাওয়া তো ফস্কে গেছে।

ছবি এবার আমার দিকে গাঢ় চোখে তাকাল। তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারলুম, ও-কথাটা আমার বলা উচিত হয়নি। সবসময় আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা। আবার হাওয়া হালকা করার জন্য বললাম, তোমাকে আজ দারুণ দেখাচ্ছে। কত ছেলে যে আজ তোমার প্রেমে প'ড়ে যাচ্ছে।

ছবি এ-কথাতেও খুশি হ'লনা। তীক্ষ্ণচোখে চেয়ে রইল আমার দিকে। তখন ওর পিঠে হাত রেখে বললাম, যাও মমতা বোধহয় তোমাকে এতক্ষণ না-দেখে ছটফট করছে।

ছবি চ'লে যাবার পর আমার আর কিছুই করার নেই দেখে আমিও চুপি-চুপি ছাদে চ'লে গেলাম খাওয়াটা সেরে নেবার জন্য। বিয়েবাড়িতে আজ এত আনন্দ, এত সাজপোশাক, সানাইয়ের বাজনা ও ফুলের গন্ধ—কিন্তু আমি আজ এসবের মধ্যে যোগ দিতে পারছিনা। আমার একা থাকতে ইচ্ছে করছে।

খেয়েদেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় কনের ঘরে একবার উঁকি মারলাম।

ছবি সেখানে নেই। এক গুচ্ছ মেয়ে ঘিরে আছে মমতাকে। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হ'ল—মমতার চোখে একটা ম্লান ছায়া। আমি জানি ওর মানে।

নিচে বরের আসর অনেকটা ফাঁকা। অনেকেই খেতে গেছে। অনিন্দ্য তার এক বন্ধুর সঙ্গে কী নিয়ে যেন রাগারাগি করছে। বিয়ের দিন বরের রাগারাগি করা বড়োই বেমানান। আমি কাছে গিয়ে বললাম, অনিন্দ্য এক্ষুনি তোমাকে ডাকতে আসবে। একটা সিগারেট খেয়ে নেবে নাকি। এরপর কিন্তু অনেকক্ষণ আর সিগারেট টানার সময় পাবেনা।

অনিন্দ্য উঠে এল। জিজ্ঞেস করলাম, ওরকম রাগারাগি করছ কেন? আজ হাসিখুশি থাকার দিন।

ঘটনাটা এই। ইতিমধ্যে ছবি আর-একবার এসেছিল। তখন বরযাত্রীদের মধ্যে অনিন্দ্যর এক বন্ধু নিচু গলায় ছবির রূপ-যৌবন সম্পর্কে একটা মুখ-আলগা মন্তব্য করেছে। আমি অনিন্দ্যকে বললাম, ওতে কিছু যায়-আসেনা। ছবি তো শুনতে পায়নি।

অনিন্দ্য বলল ছবি যে আজ এসেছে, এতে আমি এত খুশি হয়েছি!

আমি বললাম, খুব খাটাখাটনি করছে ছবি। বেশ আনন্দেই তো আছে।

—আপনি ভালো ক'রেই জানেন, আমার মন আজ একটুও ভালো নেই। আমার কান্না পাচ্ছে বারবার।

—ছিঃ এখন ও-কথা বলতে নেই।

অনিন্দ্যর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল সুকোমল। রেজিস্ট্রি বিয়ের দিন সে সাক্ষী ছিল —সে আজ বেঁচে নেই। উগ্রপন্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে সে হঠাৎ মারা গেল। সেইসঙ্গে সে ছবিকেও নিঃস্ব ক'রে গেছে। ছবির সঙ্গে সুকোমলের গোপনে বিয়ে হয়ে গিয়েছিল—সে-বিয়েতেও আমরা উপস্থিত ছিলাম। আজ বারবার মনে পড়বেই সুকোমলের কথা। ছবির সেই কথা আর কেউ জানেনা। ছবির বাবা-মা উঠে প'ড়ে লেগেছেন ওর বিয়ের জন্য।

অনিন্দ্যর ডাক এসে গেল। আমি চুপি-চুপি পালিয়ে আসছিলাম—হঠাৎ দরজার পাশ থেকে ছবি আমার হাত ধ'রে বলল, দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—সে কি, তুমি এখন যাবে কি? খাবেনা?

—দই মিষ্টি খেয়ে নিয়েছি। আমার শরীর ভালো নেই।

—বিয়ে দেখবেনা? এক্ষুণি আরম্ভ হচ্ছে।

—না।

—কেন? মেয়েরা কখন বিয়ে না-দেখে বাড়ি যায়?

ছবি আমার চোখ থেকে চোখ নামিয়ে নিল। তারপর খুব আস্তে-আস্তে বলল, বিয়ের সময় বিধবাদের উপস্থিত থাকতে নেই।

আমি বললাম, কী বলছ আজেবাজে কথা। ও তো আর কেউ জানেনা।

ছবি বলল, আমি তো জানি! চলুন।

২

অনেকের ধারণা, আমিই নেহাৎ-ই একটা বেচারা টাইপের, হাতে হ্যারিকেন মার্কা ছেলে। আমার যে জীবনে কোনই উন্নতি হ'ল না, তা-ই নয়, কেউ কোনদিন আমাকে পাত্তা দেয়না, আর মেয়েরা তো আমাকে গ্রাহ্যই করেনা! আর সবারই প্রেমিকা-ট্রেমিকা আছে, শুধু আমারই কেউ নেই। খুব ভুল ধারণা। এমনকি আমারও বেশ কয়েকজন প্রেমিকা আছে, এবার তাদেরই একজনের কথা বলছি।

আজকাল অনেক ছেলেই সকালবেলা বাজার থেকে মাছ-তরকারি কেনার ব্যাপারটাকে নিতান্ত হেয় জ্ঞান করে। বাজারের থলে হাতে নিয়ে যাচ্ছে বা ফিরছে, এটা দেখে ফেললেই প্রেস্টিজ পাংকচার।

আমাকে অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই বাজারে যেতে হয়। বাজার করার ব্যাপারে আমি রীতিমত ট্রেনিংপ্রাপ্ত পাশ-করা বাজার-সরকার বলা যায়। বেশ-কিছুদিন আমি এই ব্যাপারে অ্যাপ্রেন্টিস ছিলাম পর্যন্ত।

আমার বাবা খুব ব্যস্ত মানুষ ছিলেন! সকালবেলা বাজার করার পুরো ফুরসৎ পেতেননা। ছেলেবেলায় আমার নির্দিষ্ট ডিউটি ছিলো রোজ সকালে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাজারের একটা নির্দিষ্ট পানের দোকানের কাছে বাজারের থলি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা। বাবা দুটো টিউশনির ফাঁকে এসে আমার কাছ থেকে থলিদুটো নিয়ে ঝাঁ ক'রে বাজার ক'রে এনে আবার আমার হাতে সেগুলো দিয়ে চ'লে যেতেন। আমি সেগুলো বাড়িতে নিয়ে আসতাম। অর্থাৎ, প্রথম পর্বে আমার ছিল দাঁড়িয়ে থাকার ধৈর্যপরীক্ষা ও ভরতি বাজারের থলি বয়ে আনার ট্রেনিং।

এতে পাশ করবার পর, বাবা বাজার করার সময়টুকুতেও আমাকে সঙ্গে-সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন। তখন আমার কাজ ছিল দরাদরির ব্যাপারে কোনরকম মন্তব্য না-ক'রে শুধু আলু-পটল ইত্যাদি ওজন করার পর থলিতে ঢালার সময় দু-একটা প'ড়ে যাচ্ছে কিনা সেদিকে লক্ষ রাখা। এ-পরীক্ষাতেও আমি পাশ ক'রে গেলুম। তারপর, একটু বড়ো হবার পর, বাবা আমার ওপর পুরোপুরি বাজার করার ভার ছেড়ে দিলেন

তখন থেকেই আমি ঠিক সাবালক হলুম বলা যায়। বাজারের পয়সা থেকে বেশ কিছু ইনকাম করা যায়, তাই দিয়ে সিগারেট ফোঁকা কিংবা বন্ধুবান্ধবদের চা খাওয়ানো চলে। আর এসব না-হ'লে আর সাবালক হওয়ার মানে কি? কে বলে বেকারদের স্বাধীন ব্যবসায়ের সুযোগ নেই? যেসব বেকারদের বাড়িতে এখনও বাজার হয়, তারা অনায়াসেই বাজার করার ভার নিয়ে টু-পাইস ম্যানেজ করতে পারে। সেদিন আমার এক বেকার বন্ধু খানিকটা লজ্জার সঙ্গে বলছিল, জানিস আজ বাজারে গিয়েছিলুম। উঃ কী ভিড়, লোকে পা মাড়িয়ে দেয়—কী ক'রে যে লোকে রোজ সকালবেলা...ইত্যাদি। আমি তো শুনে অবাক! শুধু কষ্টটাই দেখল, পয়সা উপায় করার সম্ভাবনাটা ওর চোখে পড়লনা? বিনা পরিশ্রমে কে কবে টাকা উপার্জন করতে পেরেছে? একমাত্র শুনেছি সরকারি চাকরিতেই কোন খাটুনি নেই —কিন্তু সে তো সহজে পাওয়া যায়না! ভবিষ্যতে আর কেউ পাবে কিনা তা ও সন্দেহ?

যাই হোক, এবার আমার প্রেমিকার কথা বলি। বাজার করতে গিয়েই আমি আমার এই প্রেমিকার দেখা পেয়েছিলাম। না, যা ভাবছেন তা নয়। কোন মেছুনির প্রেমে পড়ার সৌভাগ্য আমার এ-পর্যন্ত হয়নি। আমি যে-বাজারে যাই, সে-বাজারে মেছুনি কয়েকটি আছে বটে, কিন্তু তারা কেউই মৎস্যগন্ধা সত্যবতী-তুল্যা নয়, তাছাড়া আমি একপো আধসেরের বেশি মাছ কোনদিন কিনতে পারিনি ব'লে মেছুনীরা কোনদিন আমাকে ভালো ক'রে গ্রাহ্যই করেনি।

আমার এই প্রেমিকার নাম আমি জানিনা। ঝিঙেদি বা পটলরানী বললে কেমন হয়? কিন্তু এগুলো শুনতে খারাপ, তারচেয়ে সীমকুমারী বললে বরং মানায়। মেয়েটি সীম, পটল, ঝিঙে এইসব বিক্রি করত। চাষীর ঘরের মেয়ে, নিজের ক্ষেতের শব্জী-তরকারি এনে বিক্রি করে, সেটা তরকারিগুলোর টাটকা সতেজ রং দেখলেই বোঝা যায়। মেয়েটিরং রং মাজা-মাজা, বেশ লম্বা, খুব মুখরাধরনের, সহজে কেউ তাকে ঠকাতে পারেনা।

আমার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় এইভাবে। দু-তিনজন লোক তার তরকারির ঝুড়ির সামনে হাত দিয়ে এটা-সেটা ঘাঁটাঘাঁটি করছে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি গো সীম কত ক'রে?

—এক টাকা।

—দাও, হাফ কিলো।

মেয়েটি একটা ছোট্ট চুবড়ি আমার দিকে বাড়িয়ে বলল, বেছে নাও। আমি বললাম, না আমি বাছবনা! তুমি নিজের হাতে বেছে-বেছে বেশ পচা-পচা আর পোকায়-ধরা সীমগুলো আমায় দাও তো। ঐগুলোই আমি ভালোবাসি।

মেয়েটি চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে ফিক ক'রে হেসে ফেলল। সেই হ'ল প্রথম চার চোখের দর্শন।

পাঠক হয়ত ভাবছেন, আমি প্রথম প্রেমেই এমন গদগদ হয়ে গেছি যে, মেয়েটিকে দেখেই দরদাম করার কথা ভুলে গেছি আর নিজের হাতে বেছে নেবার বাসনাও পরিত্যাগ করেছি। এখানে তাহ'লে প্রেমের বদলে বাজার করা বিষয়ে দু-একটা কথা আগে বলা যাক।

সব জিনিস টিপে-টুপে বাছাই ক'রে কেনাই ভালো বাজার করার লক্ষণ নয়। দোকানে গিয়ে অত্যধিক দরদাম করলেই সুবিধে হয়না। ঐসব ওপরচালাক লোক বেশি ঠকে, সারা বাজারটা ঘুরে জিনিসপত্রের প্রকৃত দর জেনে নিলে আর দরাদরি করতে হয়না। যে বেশি দর চায়, তার কাছ থেকে না-কেনাই ভালো। আর যে লোক বেশি বাছাবাছি করে, দোকানদারও তাকে বেশি ঠকাবার চেষ্টা করে। এটা একধরনের খেলা। ক্রেতা ভাবছে পচা-টচা বাদ দিয়ে শুধু ভালোগুলো সে নেবে —আর দোকানদারও তাকে কিছু খারাপ জিনিস গছাবার চেষ্টা করবেই। দোকানদারকেই নিজের হাতে বাছাই করার ভার দিলে, সে খারাপ জিনিস দিতে পারেনা। (দু-একটা অতি-পাজী ছাড়া।) মানুষকে অবিশ্বাস করলে যত ঠকতে হয়, বিশ্বাস করলে ঠকতে হয় তার চেয়ে অনেক কম।

সেদিন তো চ'লে গেলুম। পরদিন আমি আবার বাজারে এসেছি, মেয়েটিব কথা আমার মনে নেই, হঠাৎ শুনতে পেলাম, ও বাবু, সীম লেবেনি?

তাকিয়ে দেখলাম সেই মেয়েটি। সে আমাকে মনে রেখেছে। জিজ্ঞেস করল, কি, কালকের সীম ভালো ছিল? আমার নিজের গাছের সীম।

যেরকমভাবে মেয়েদের রূপের প্রশংসা করতে হয়, সেই গলায় আমি বললাম, খুব ভালো। কত নরম আর কত কচি। চমৎকার স্বাদ। কিন্তু আজ তো আর নেবনা! কালকেরটা এখনও ফুরয়নি। তুমি বরং আজ আমাকে এক কিলো বেগুন দাও।

মেয়েটি বলল, না, বেগুন নিওনা।

—কেন? বেগুন নেবনা কেন?

—না, ও-বেগুন ভালো নয়।

—তোমার ওগুলো কি আগেই বিক্রী হয়ে গেছে নাকি?

মেয়েটি ঝংকার দিয়ে বলল, তুমি কিরকম ভালোমানুষের ছেলে গো? দেখছনি, বেগুনগুলোতে পোকা লেগেছে?

আজ আমি হাসলাম। বললাম, আজ তোমার ভালো কী আছে?

—আর কিছু নেই! ঐ-সীমই আছে।

—দাও, তাই-ই দাও আধ কিলো—

আমার তখন সদ্য গোঁফ উঠেছে, ফুল প্যান্ট পরি। বাজারে যাবার ব্যাপারে আমার একটা অতিরিক্ত আগ্রহ জ'ন্মে গেলো। সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হবে, দুটো কথা ও একটু হাসি। সেই বয়সের প্রেমে এর চেয়ে আর বেশি কি চাই? মেয়েটি আমার জন্য ভালো-ভালো তরিতরকারি বেছে রাখে, কোনদিন আমি দেরি ক'রে গেলে মৃদু বকুনি দেয়। আমার দরকার নেই—এমন তরকারিও সে জোর ক'রে গছিয়ে দেয় আমাকে। যেমন এই নারকোলটা তোমার জন্যে আলাদা ক'রে রেখে দিয়েছি—কত খদ্দের এসে ফিরে গেছে, দিইনি!

কোথাও কেউ আমার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে, এই ব্যাপারটাই মনে শিহরণ আনে। প্রেমের মূল লক্ষণও তো এটাই, না? সে তার সাধ্যমতন আমাকে দিলে, তার বাগানের সেরা ফসল, আমি বিনা দ্বিধায় নিয়ে নিচ্ছি, কেউ কোনদিন ঠকিনি।

আমি দু-একদিন বাজারে না-গেলে (বিশেষ ক'রে মাসের শেষ দিকে)—সে আমাকে জিজ্ঞেস করত। তারপর আমিই আর তাকে পরপর বেশ কয়েকদিন দেখতে পেলামনা। রীতিমতন চিন্তিত হয়ে উঠলাম। বাজার করতে আর ভালো লাগেনা।

আট-দশ দিন বাদে মেয়েটিকে আবার দেখলাম। সেই পুরোনো জায়গাতেই ব'সে আছে, পাশে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলে। জিজ্ঞেস করলাম, এই ক'দিন আসনি কেন?

সে এক গাল হেসে বলল, তার স্বামীর অসুখ হয়েছিল। স্বামীর অসুখটা মোটেই হাসির ব্যাপার নয়, বোধহয় স্বামী আবার সেরে উঠেছে ব'লেই ঐ হাসি। তারপর হানলো আমার বুকে শক্তিশেল।

মেয়েটি বলল, সে আর এখন থেকে রোজ আসতে পারবেনা। তার বড়ো ছেলে আসবে, আমি যেন অবশ্য অবশ্য তার ছেলের কাছ থেকে কিনি। বাজারের সেরা জিনিস এখানে পাওয়া যাবে, ইত্যাদি। মেয়েটি বিবাহিতা, এটা খুব অপ্রত্যাশিত নয়। আমার ধারণা ছিল, ওর বয়েস কুড়ি-বাইশ তার থেকে কিছু বেশি হ'লেও সহ্য করা যায়। কিন্তু অত বড়ো ছেলে এবং 'বড়ো ছেলে'—অর্থাৎ আরও ছেলেমেয়ে আছে। এটা টু মাচ! তারপর থেকে আমি ঐ-বাজারের বদলে অন্য বাজারে যাই।

তবুও এটাকে প্রেমের কাহিনীই বলব। প্রথম প্রেমে এরকম মোহভঙ্গ অনেকেরই হয়।

৩

অনেকদিন বাদে অনিমেষের সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করলাম, কি রে কেমন আছিস?

অনিমেষ চোখ-মুখ উদ্ভাসিত ক'রে হাসল। রীতিমতন উল্লাসের সঙ্গে বলল, বেশ ভালো আছি ভাই! দারুণ আছি!

একটু চমকে যেতে হয়। এই ডামাডোলের বাজারে কেউ খুব ভালো আছে, এটা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না। তাছাড়া কেউ একটু ভালো থাকলেও মুখে সে-কথা বলবে কেন?

আমাকে আর কিছু বলতে না-দিয়েই অনিমেষ আমার কাঁধে চাপড় মেরে বলল, বহুদিন পর দেখা হ'ল তুই কেমন আছিস বল?

আমি ওর মতন উল্লাস দেখাতে পারলুমনা। ঠোঁট ফাঁক ক'রে একটু হাসির অভিনয় করলুম।

অনিমেষ বিদ্রূপ ক'রে বললো কি রে, তুই এরকম মুখ-আমসি ক'রে রয়েছিস কেন? চল, চা-ফা খাওয়া যাক।

একটা বেশ বড়ো দোকানে ঢুকে অনিমেষ বলল, কী খাবি বল?

—শুধু চা!

—লিভারের বারোটা বাজাতে চাস? শুধু চা খেয়ে-খেয়েই তো জাতটা গেল। মাংস খাবি, বুঝেছিস, মাংস!

আমার কোন আপত্তি শুনলনা অনিমেষ, একগাদা খাবারের অর্ডার দিল। বিরিয়ানি, ফাউলকারি, শাম্মি কাবাব—

কলেজে পড়ার সময় অনিমেষ রীতিমত কৃপণই ছিল। বন্ধুবান্ধবদের পয়সায় চা খেতে ছিল ওস্তাদ। সিগারেট তো কক্ষনো কিনতনা, চিরকাল পরস্মৈপদী। একসময় আমি আর অনিমেষ এক পাড়ায় থাকতাম, কলেজ থেকে ফেরার পথে একসঙ্গে বাসে উঠলে অনিমেষ কিছুতেই ভাড়া দিতনা, পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা নিয়ে ঝুনঝুনু শব্দ করত, বার করতনা। আর সেই অনিমেষের এ-ধরনের পরিবর্তনে খুশি হবারই কথা।

ফাউল কারি চাখতে-চাখতে হঠাৎ সন্দেহ হ'ল, ছেলেটা ব্ল্যাক মার্কেট-ফার্কেট করছেনা তো? দিন-দিন সবার অবস্থা খারাপ হচ্ছে, ওর এ-ধরনের উন্নতি হয় কি ক'রে? একটু ঈর্ষাও বোধ হ'ল, সেই সঙ্গে ফাউল কারিও জিভে তেতো মনে হ'ল। মুর্গীর ঠ্যাংটা নামিয়ে রেখে জিজ্ঞেস করলাম, খুব বড়োলোক হয়েছিস মনে হচ্ছে? কী চাকরি করছিস এখন?

—আপাতত কিছু চাকরি করছিনা।

—তাহ'লে ব্যবসা করছিস? আজকাল তো ব্যবসাতেও তেমন লাভ হয়না শুনি?

অনিমেষ একগাল হেসে বলল হ্যাঁ, ব্যবসা-ট্যাবসা করলে মন্দ হয়না। আমার গত মাসে চাকরি গেছে—ভাবছি এবার কী করা যায়!

—চাকরি গেছে? কেন?

—আমার কোন দোষে না ভাই। কোম্পানি উঠে গেল!

চাকরি যাওয়াটা কি একটা হাসির খবর? অনিমেষ এরকম উপভোগ ক'রে খাচ্ছেই বা কী করে, হাসিই-বা আসে কোথা থেকে?

অনিমেষ আরাম ক'রে মুর্গীর মাংস গলাধঃকরণ করতে-করতে জিজ্ঞেস করল, বিয়ে-থা করেছিস? না কি সেইরকম পাগলই রয়ে গেলি?

—তুই বিয়ে ক'রেছিস নাকি?

—অনেকদিন, ছ-সাত বছর। তোকে নেমন্তন্ন করতে পারিনি। ধ'রে নে, আজ সেই নেমন্তন্ন খাওয়াচ্ছি।

—ছেলেমেয়ে হয়েছে?

—হয়নি মানে! তিন-তিনটে, দুটো মেয়ে একটা ছেলে—

—কী নাম রাখলি ছেলেমেয়ের?

—ছেলে তার নাম রাখার সুযোগই দেয়নি! মুখে-ভাতের আগেই মারা গেছে। মেয়ে দুটোর নাম আন্না আর চান্না—তার মধ্যে চান্না বড্ড অসুখে ভোগে—বেশিদিন বাঁচবেনা বোধহয়, টেঁশে যাবে!

এবার অনিমেষের দিকে সরু চোখে তাকাতে হ'ল। ছেলেটার মাথা টাথা খারাপ হয়নি তো! নিজের সন্তান বিষয়ে কেউ এরকম নিষ্ঠুরের মতন কথা বলতে পারে! এখনও দিব্যি খেয়ে যাচ্ছে—সেটা পর্যন্ত থামায়নি।—

—অনিমেষ, কী ব্যাপার বল তো? ছেলেমেয়ে সম্পর্কে তোর একটুও মায়া নেই?

—কে বললে মায়া নেই! ছেলেটা যখন মরল, কেঁদে ভাসিয়েছিলাম। চান্না ম'রে গেলেও কাঁদব, নিশ্চয়ই কাঁদব। কিন্তু ব্রাদার শুধু দয়া-মায়া দিয়ে তো আর বাঁচানো যায়না! যখন বেবি ফুডের খুব অভাব ছিল, নিজে লাইনে দাঁড়িয়ে কিনেছি, ব্ল্যাক মার্কেট থেকে বেশি দাম দিয়ে কিনেছি। সাধ্যমতন ডাক্তারও ডেকেছি। ডাক্তার ডাকলেই বা কী হবে। ডাক্তাররা যেসব ওষুধ লিখে দেয় প্রায় দোকানেই সেগুলো পাওয়া যায়না।—ঘুরে-ঘুরে সেগুলোও যোগাড় করি—এর পরেও যদি না-বাঁচে, কান্ট হেল্প।

—কোথায় থাকিস এখন?

—আজ পর্যন্ত তো ভবানীপুরে আছি। কাল কোথায় থাকব, তা জানিনা।

—তার মানে?

—বাড়িওয়ালা যদি তাড়িয়ে দেয়, তার দোষ দেওয়া যাবেনা। ভাড়া দিইনা। আমি মামলা-ফামলা করবনা, যেদিন গলাধাক্কা দেবে, বেরিয়ে যাব। আর কী খাবি বল! পুডিং?

—আর কিছু খাবনা! শোন অনিমেষ—

—তুই কী একঘেয়ে বাড়ি-ফাড়ির কথা জিজ্ঞেস করতে আরম্ভ করলি! কদ্দিন বাদে তোর সঙ্গে দেখা হ'ল, কোথায় দুটো রসের গল্প করব। হ্যাঁ রে, আমাদের সঙ্গে যে সুরূপা ব'লে মেয়েটা পড়ত তার সঙ্গে তোর আর দেখা-টেখা হয়? কোথায় আছে, জানিস?

—কী জানি, খবর রাখিনা!

—বাজে কথা ছাড়! তোর বেশ উইক্‌নেস ছিল ওর সম্পর্কে। আমারও ছিল, তবে তোর সঙ্গে কমপিটিশন হবে ব'লে—

—এসব বাজে কথা ছাড়! তোর কী হয়েছে, সত্যি ক'রে বল তো অনিমেষ?

—কী আবার হবে? কিচ্ছুনা! তুই আমার দিকে ওরকমভাবে তাকাচ্ছিস কেন?

—না, তুই আমাকে সব খুলে বল—

অনিমেষ হো-হো ক'রে হেসে উঠল। হাসির দমকে সারা শরীর কেঁপে উঠল ওর। তারপর বলল, তুই কি ভাবছিস, আমি পাগল-টাগল হয়ে গেছি! কি রে! কী করেছি আমি?

—না, মানে যা শুনেছি, তাতে তোর অবস্থা বিশেষ ভালো ব'লে মনে হচ্ছেনা! তুই হঠাৎ এরকম টাকা খরচ করছিস—

—তুই খুব লাকি। আজ বাইচান্স তোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! আজ আমার পুরোনো অফিস থেকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকাগুলো পেয়ে গেলাম। করকরে সাতশো টাকা—

কথাটা শুনে আমি বেশ দ'মে গেলাম। যার চাকরি গেছে, তার শেষ সম্বল এই সাতশো টাকা থেকে একটি পয়সাও বাজে খরচ করা উচিত নয়। আমি বললাম, অনিমেষ, আমার বিশেষ অনুরোধ, আজকের বিলটা আমরা ভাগাভাগি ক'রে দেব। আমার কাছে বিশেষ কিছু নেই, যা আছে—

অনিমেষ হাত নেড়ে আমার কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলল, ওসব ছাড়! আজ আমার আছে, আমি খরচ করব। তুই কি ভাবছিস, আমি বাড়ির লোককে ফাঁকি দিয়ে একা-একা খাচ্ছি! পাগল আজ বাড়ি ফেরার সময় জোড়া মুর্গী নিয়ে যাব!

—তারপর টাকা ফুরিয়ে গেলে?

—তখন দেখা যাবে! তুই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিস এখনও? তুই দেখছি আচ্ছা গাধা!

—এই অবস্থায় তুই হাসছিস কী ক'রে?

—হাসবনা? মরার সময় তো হাসতে পারবনা, তাই যেটুকু সময় বেঁচে আছি, নষ্ট করা কেন? ফুর্তি ক'রে নেওয়া যাক। হেসে নাও, দুদিন বৈ তো নয়।

আমি কোন কথা বললুমনা। চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

৪

আমি ছেলেটিকে বললুম যাও, যাও, কিছু হবে না। ছেলেটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। আমি ফের ধমকে উঠলুম, বলছি তো কিছু হবেনা। কেন বিরক্ত করছ? অন্য জায়গায় যাও।

ছেলেটি বকুনি খেয়েও নড়েনা, ধ্যাতা বেড়ালের মতন দাঁড়িয়ে থাকে। আমি খুবই বিরক্ত হয়ে তাকে আরও প্রচণ্ড ধমক লাগাতে যাচ্ছিলুম, সে তখন আদুরে-আদুরে গলায় বলল, আমাকে দিদিমণি দেবেন, দিদিমণি আমাকে রোজ দ্যান।

সুপর্ণা যে তখন ব্যাগ খুলে খুচরো পয়সা খুঁজছে, লক্ষ করিনি। আমাকে চুপ ক'রে যেতে হ'ল। সুপর্ণার হ্যাণ্ডব্যাগের ভেতর থেকে বেরুল আর-একটা ছোটো ব্যাগ, তার এক খোপ থেকে একটা পাঁচ পয়সা দুই লীলায়িত আঙুলে তুলে ভিখারী ছেলেটিকে দিয়ে মিষ্টি হেসে বলল, এবার যাও!

আমি বক্র হেসে ছেলেটিকে বললাম, যাও, এবার আর-একজনকে পাঠিয়ে দাও।

সুপর্ণা বলল, আর কেউ এলে দেবনা। এই ছেলেটা রোজ আমার কাছ থেকে পাঁচ পয়সা নেবেই, কিছুতেই ছাড়বেনা।

আমি বললাম, তুমি শুধু ওকেই ভিক্ষে দাও, আর কারুকে দাওনা। তোমার এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

—যখন বেশি খুচরো থাকে তখন অন্যদেরও দিই। দেওয়াই তো উচিত সবার। সবসময় অবশ্য পারা যায়না।

বহুক্ষণ সুপর্ণার সঙ্গে বাস স্টপে দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তা ফাঁকা। মনে হচ্ছে যেন ট্রাম-বাসেরা এ-রাস্তার কথা ভুলেই গেছে। কিংবা হঠাৎ বাস-ট্রাম ধর্মঘট শুরু হয়ে গেছে কিনা কে জানে!

সুপর্ণা জিজ্ঞেস করল, আপনি ও-ছেলেটাকে ওরকম ধমকালেন কেন? ও তো কোন দোষ করেনি, শুধু ভিক্ষে চাইছিল।

—আমি কমপিটিশন সহ্য করতে পারিনা।

—কি? তার মানে?

—কিছুনা। এ-কথা এখন থাক।

বাসের জন্য অপেক্ষা করতে-করতে অধৈর্য হয়ে পড়েছি। মেজাজ ঠিক থাকছেনা। ভিখারি বালক নিয়ে আলোচনা করার উৎসাহ নেই। সুপর্ণা কিন্তু মুখে বেশ মিষ্টি হাসিটা ফুটিয়ে রেখেছে। পড়ন্ত বিকেলের আলোয় ওকে ওর নিজের চেহারার চেয়েও বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।

সুপর্ণা বলল, গরীব দুঃখীদের সঙ্গে যদি কেউ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে তাহ'লে আমার খুব খারাপ লাগে। এমনিতেই তো সবসময় নিজেকে স্বার্থপর মনে হয়। আমি খেতে পাচ্ছি, থাকার জায়গা পেয়েছি, ইচ্ছেমতন শাড়ি-টাড়ি কিনতে পারি —আর কত হাজার-হাজার মানুষ এখনও দুবেলা খেতে পায়না—

আমি মুগ্ধভাবে তাকিয়ে বললুম এইজন্যই তো তোমাকে আমার এত বেশি ভালো লাগে। তোমার মনটা একেবারে হীরের টুকরো—

—যাঃ। এ তো খুব সাধারণ কথা। কিন্তু আপনি যে আজ ছেলেটার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করলেন, তাতে আমি অবাক হয়ে গেছি।

—কেন?

—নিষ্ঠুরতা আপনাকে মানায়না।

—আমাকে কোন ভূমিকায় মানায়?

—আপনিই একদিন অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে একটা বুড়ো ভিখারিকে এক সঙ্গে অনেকগুলো খুচরো পয়সা দিয়ে দিয়েছিলেন।

আমি অবাক হয়ে বললাম, যাঃ। কবে? মোটেইনা।

—হ্যাঁ, দিয়েছিলেন।

—হতেই পারেনা।

আমার ঠিক মনে আছে। মাস দেড়েক আগে। সেদিনও আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

একটু-একটু যেন মনে পড়ল। বললাম, তা হতেও পারে। বুড়োটা গাছতলায় দাঁড়িয়েছিল হাত পেতে। কারুর কাছ থেকে কিছু চায়নি। শুধু হাতখানা বাড়ানো ছিল—তার মুখখানা আঁকিবুকিতে ভরা—পুরনো দলিলের মতন হয়েছিল, একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

—সেদিন মায়া হয়েছিল, আর আজ...

—সুপর্ণা, আমাকে কি প্রত্যেকদিন এক ভূমিকায় মানায়? আমি তো সাধারণ মানুষ। মহৎ মানুষেরাই অনবরত দয়ালু হয়। আমি তো নই, আমার শরীরে খানিকটা দয়ামায়া আছে বটে, আবার রাগ ঈর্ষা, বিরক্তি—এসবও আছে। আমি কখন সামান্য দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ি, কখন কঠোর নির্মম হতেই আমার ভালো লাগে। একই মানুষ বিভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্নরকম।

—আপনি বড্ড বড়ো-বড়ো কথা বলছেন। আমি যা বললুম, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী? দীন দুঃখীদের সাধ্যমতন দু-চারটে পয়সা দিতে সবারই ভালো লাগে—

—চলো বাস এসে গেছে।

এ-বাসে বড্ড ভিড়। এটাতে উঠবনা।

—তাহ'লে হেঁটেই যাওয়া যাক। কিংবা ট্যাক্সিতে উঠবে?

—ট্যাক্সি? একটু আগে আপনি একটা ভিখিরিকে দুটো পয়সা দেননি—এখন ট্যাক্সিতে যেতে চাইছেন!

—আরেঃ যাঃ। তুমি খালি ঐ ভিখিরি ছেলেটার কথা তুলছ কেন?

—ভিখিরিদের কেউ মুখঝামটা দিলে আমার বড্ড কষ্ট হয়। ঐ-ছেলেটিকে দেখে আপনার মায়া হ'লনা?

—না?

না। কিরকম করুণ আর মিষ্টি মুখটা—ওকে দেখে আপনার মায়া হ'লোনা?

না। কারণ পাশাপাশি দুজন ভিখারি থাকলে একজন আর-একজনকে সহ্য করতে পারেনা। ওর সঙ্গে আমার বিরাট প্রতিযোগিতা—আমি তো চেষ্টা করবই ওকে হটিয়ে দিতে।

—এ আবার কী কথা?

—ও চাইছিল দু-চারটে পয়সা, আর আমি তোমার করুণার ভিখারি। তোমার একটু কৃপা পাবার জন্য—আমি কতক্ষণ ধ'রে ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমার দিকে চেয়ে যদি একটু হেসে—

সুপর্ণা কুলকুল ক'রে হাসল। তবে এ-হাসি অন্যরকম। আমি ঠিক এর কথা বলিনি, এর মধ্যে খানিকটা ঠাট্টা মিশে আছে। বলল, যাঃ, আপনি যে কী পাগলের মতো উল্টোপাল্টা বলেন?

আমি বললাম, আজ ঐ ভিখির ছেলেটাই জিতে গেছে। ও শুধু তোমার কাছ থেকে পয়সাই পায়নি—ও তোমার মনোযোগও পেয়েছে। তুমি সর্বক্ষণ ওর কথাই বলছ।

—আপনার জন্যই তো। আপনি যদি ওকে দু-চারটে পয়সা দিয়ে বিদায়

করতেন, ও আর দাঁড়াতনা। এ নিয়ে কোন কথাই বলতনা।

আমি বললাম, আমার কী রকম লজ্জা করে।

—লজ্জা করে মানে?

—লজ্জা করে তো কী করব? অধিকাংশ লোকই ভিখিরিকে ভিক্ষে দেয় —তার প্রতি মায়াবশত নয়। তাকে বিদায় করবার জন্য। ভিখিরিরা পাশে দাঁড়িয়ে ঘ্যান-ঘ্যান করে—তাদের তাড়াতাড়ি বিদায় করার জন্য দু-চারটে পয়সা দিতে হয়। সেরকম দিতে আমার লজ্জা করে। একটা মানুষের আত্মাকে অবহেলা করতে কিংবা অপমান করতে আমার লজ্জা হয়। কিংবা ধরো, কখন কোন ভিখিরিকে দেখে মনটা উদার হয়ে গেল, পকেট থেকে খুচরো পয়সা তুলে তাকে দিয়ে দিলাম —সে আমাকে আশীর্বাদ করল। সেই আশীর্বাদটা পেয়ে আমার লজ্জা হয়। মনে হয়, ওটা আমার প্রাপ্য নয়। আমি তো সত্যিই দাতা নই!

—বাবারে বাবা! ভিখিরিকে দুটো পয়সা দেবেন, তার জন্য আবার এত কথা! এর জন্য এত ভাবতে হবে কেন?

—সেই তো, তার থেকে না-দিলেই চুকে যায়।

—আসলে আপনি কিপ্টে, সেই কথা বলুন!

—কে বলেছে কিপ্টে! চলো, তুমি কোন রেস্টুরেন্টে খাবে—তোমাকে সেখানে ট্যাক্সিতে—

দর্পিত ভ্রূভঙ্গি ক'রে সুপর্ণা বলল, মোটেই আমি যাবনা কোথাও! শুধু-শুধু ঐভাবে পয়সা নষ্ট করা—আর কত মানুষ খেতে পাচ্ছেনা, কত মানুষ ফুটপাথে...

সুপর্ণা যে পার্ক স্ট্রিটের রেস্তরাঁয় খেতে ভালবাসেনা, তা নয়। ট্যাক্সি চড়তেও পছন্দ করে। অন্য মেয়েদের মতোই। কিন্তু আজ কথা প্রসঙ্গে সে মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় বড়ো কাতব হয়ে পড়েছে, এত কাতরতার ছায়ায় তাব মুখখানি উদ্ভাসিত। এখন তার সৌন্দর্য অন্যরকম। এটা দেখার জন্যই আমি ওকে খোঁচাচ্ছিলুম। মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করার জন্য কেউই সঠিক পথে ভাবছেননা মনে হয় —প্রায় সকলেই শৌখিন মনে হয়। তবু, কখন-কখন মুখে এই কাতরতার ছায়া দেখাতে ভালো লাগে।

আমি বললুম এসো, তাহ'লে আজ সন্ধেটা অন্যভাবে কাটানো যাক। আমার কাছে টাকা দশেক আছে আর তোমার কাছে যা আছে, সব মিলিয়ে খুচরো ক'রে রাস্তার সব ভিখিরিদের বেলানো যাক।

সুপর্ণার মুখে তখনও হাসি ফিরে আসেনি। সন্দেহের সঙ্গে আমাব দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি বুঝি এটাকে এখনও ঠাট্টা মনে করছেন?

আমি বললুম, না, ঠাট্টা নয়। আমি জানি এতে একজনেরও খিদে মেটানো

যাবেনা। কিন্তু এক সন্ধের জন্য আমরাও ভিখিরি হয়ে যাই। আমি তো জন্মভিখারি, আমার কাছে এর নতুনত্ব খুব নেই, কিন্তু তোমাকে ভিখারিনী হিসেবে কেমন মানায়—সেটা দেখতে ইচ্ছে করছে।

৫

চায়ের দোকানে তুমুল আড্ডা চালাচ্ছিলুম, হঠাৎ লক্ষ করলুম, দোকানের একটি বেয়ারা অনেকক্ষণ ধ'রে আমাদের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। শঙ্কিত হয়ে উঠলুম, মনে-মনে। নিশ্চয়ই আমাদের উঠে যাবার নোটিশ দিতে এসেছে।

আমরা ছজনে মিলে চার কাপ চা অর্ডার দিই, দুটো ফলস কাপ চেয়ে নিই! তাতেই ঘণ্টা-দেড়েক চালাবার পর দোকানের মালিক তাড়া দিলে, আবার অর্ডার দিই দু-কাপ চা। আবার ঘণ্টাখানেক। আড্ডার সময় যে কী ক'রে ডানা মেলে উড়ে যায়, কে জানে।

আমরা বসি দোকানের একেবারে শেষের দিকের কোণের টেবিলে। মালিকের চোখ থেকে যত দূরে সম্ভব। মালিক অবশ্য অমায়িক, আমাদের মুখে কিছু বলেনা, বরং চোখাচোখি হলেই একপ্রকার দেখন-হাসি ছুঁড়ে দেয়, তবে, বেয়ারার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বিল।

আমাদের গণ্ডারের চামড়া। বেয়ারা পাশে এসে দাঁড়ালেও আমরা না-দেখার ভান করি, এমনকি চক্ষুলজ্জার মাথা খেয়ে ব'লে ফেলি, দেখি ভাই, এক গেলাস জল! আড্ডা মাঝপথে ভেঙে উঠে যাওয়া, আর খাবার টেবিল থেকে আধপেটা খেয়ে চ'লে যাওয়া একই কথা।

তবে, আমাদের আজকালকার আড্ডায় দু-একটি মেয়ে এসে যোগ দিয়েছে, তাদের মান-সম্মানবোধ বড্ড আবার প্রবল। মেয়েরা ঠিক এখনও আড্ডার মর্ম বুঝলনা। কিংবা সেরকম আড্ডাবাজ মেয়েকে আমরা এখনও দেখিনি!

বেয়ারাটি অনেকক্ষণ ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে, আমরা না-দেখার ভান করছি, নন্দিতা বলল, এই, তোমরা চা খাবে তো আবার বলো! শুধু-শুধু কতক্ষণ আর—!

আজ আট কাপ চা নিয়েছি, তার ওপর আবার বাবুয়ানি ক'রে সিঙ্গাড়া খাওয়া হয়েছে, যার এক-একটার দাম কুড়ি পয়সা! পয়সা কোথায় আর, পকেট ঢনঢন—! নন্দিতাকে বললাম, আরও চা খাব, তুই পয়সা দিবি?

নন্দিতা বলল, বারে, আমার যা ছিল সবই তো দিয়ে দিলাম।

অভিজিৎ রঙ্গ ক'রে বলল, তোর যা ছিল, তা কি এত সহজেই ফুরিয়ে যায়? ব্যাগটা বার কর, আরও কিছু ছাড়!

নন্দিতার কাছে সত্যিই আর পয়সা নেই। বাধ্য হয়েই আমি বিরস মুখে বেয়ারাটিকে বললুম, আর কিছু খাবনা, বিল নিয়ে এসো। চোখ রেখেছিলুম কুমকুমের দিকে। কুমকুমের সঙ্গে নতুন আলাপ, ওর কাছে মুখ ফুটে চাইতে পারিনা। তবে, কুমকুমের কাছে পয়সা আছে নিশ্চয়ই যতদূর জানি, কুমকুমের সহজে ফুরোয়না!

কুমকুম স্মিত হেসে বলল, আরও চা খাবে তো ব'লে দাওনা। আমার কাছে পয়সা আছে কিছু।

এবার আমি নবাবী স্টাইলে ঢালাও অর্ডার দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে বিনীতভাবে বেয়ারাটি বলল, আমি স্যার, আপনাদের তাড়া দিতে আসিনি। আমি আপনাদের কথা শুনছিলুম!

আমরা সবাই হাঁ ক'রে তাকালুম বেয়ারাটির দিকে। আমাদেরই বয়েসী একটি ছোকরা, একে আগে বিশেষ দেখিনি, বোধহয় নতুন এসেছে। কিন্তু কাস্টমারদের কথা তো কোন বেয়ারার পক্ষে শোনা উচিত নয়, শুনলেও সেটা মুখে প্রকাশ করবে কেন?

ছেলেটি আবার নম্রভাবে বলল, আপনারা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করছিলেন তো, আমার শুনতে খুব ভালো লাগছিল। আমিও একজন লেখক, আমার বই আছে। কারুর সঙ্গে এ নিয়ে কথা বলতে পারিনা—!

আমরা টেবিলের সবাই পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। এ-যে রূপকথার মতন। কিংবা বিলেত-টিলেত। কোন বিখ্যাত লেখক, কিংবা এখন উদীয়মান; পরে বিখ্যাত হবে এমন লেখক চায়ের দোকানের বেয়ারার ছদ্মবেশে আছে। জীবন থেকে অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করছে। চমৎকৃত হবার মতনই ব্যাপার।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার নাম কি ভাই?

—সাধনকুমার দাস।

অভিজিৎ আমাকে বলল, এই নীলে, স'রে বোস ওকে বসতে দে। তুমি ব'সো ভাই আমাদের সঙ্গে। তোমার সঙ্গে গল্প করি। আমাদের মধ্যে লেখক কেউ নেই, আমরা শুধু আলোচনাই করি—এক ঐ নীলেটা মাঝে-মাঝে দু-একটা রাবিশ লেখে, সম্পাদকদের তেল দিয়ে কাগজে ছাপায়—তোমার মতন একজন সত্যিকারের লেখককে যখন পাওয়া গেছে—

বিলেতে-টিলেতে এই অবস্থায় বেয়ারার ছদ্মবেশী লেখক নিশ্চয়ই আমাদের মতন লোকের সঙ্গে এক টেবিলে আড্ডায় ব'সে পড়ত—কিন্তু এখানে অন্য

ব্যাপার। দোকানের মালিক যদিও এখন কাউন্টারে নেই, বোধহয় বাইরে গেছে, দোকানেও আর খদ্দের বিশেষ নেই—তবু আমাদের সঙ্গে বসার প্রস্তাবে ছেলেটি কুঁকড়ে উঠল একেবারে! সারা শরীর মুচড়িয়ে বিগলিত লাজুক হাস্যে বলতে লাগল, না না, বসব কি আপনাদের সঙ্গে। কী যে বলেন, আমি কি তার যোগ্য হেঁ-হেঁ—

ছেলেটি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই কথা বলতে লাগল আমাদের সঙ্গে।

নন্দিতা আর কুমকুম বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে ছেলেটিকে। এতক্ষণ ওরা চুটিয়ে আমার লেখার নিন্দে করছিল। আমার লেখার নিন্দে ক'রে ওরা অনবদ্য আনন্দ পায়, আমিও পাই। এখন ওরা দেখছে একজন সত্যিকারের লেখককে।

গায়ের রং মাজা-মাজা, দোহারা চেহারা, মাথর চুল কোঁকড়া, তবে সব মিলিয়ে তাকে রেস্টুরেন্টের বেয়ারা হিসেবে বেমানান দেখায়না, ছদ্মবেশ ধরলেও ঠিক তা বোঝা যাচ্ছেনা।

শরৎ জিজ্ঞেস করল, তুমি বই লিখেছ বললে, কী নাম তোমার বইয়ের? আছে এখানে?

কাল আসবেন আপনারা? কাল দেখাব। আমার বইয়ের নাম, 'নদীর মায়া'।

আমরা ভেবেছিলাম, পনেরো-কুড়ি পাতার লিফলেট জাতীয় কোন বই হবে। কিন্তু ছেলেটি বলল, তার বইখানি রীতিমতন একটি উপন্যাস, একশো পনেরো পৃষ্ঠা, শক্ত মলাটে বাঁধানো, দাম তিন টাকা।

যদিও সাধনকুমার দাস রচিত 'নদীর মায়া' নামের কোন উপন্যাসের নাম আমরা কখন শুনিনি, কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসেনা! কে না-জানে, বাংলাদেশের সম্পাদক-প্রকাশক মহলে রীতিমতন একটা র‍্যাকেট আছে, কিছুতেই তারা নতুন লেখকদের কোন সুযোগ দেয়না—আমি নিজেই তো একজন ভুক্তভোগী! আজকাল যেমন নতুন চাকরিতে ঢুকতে হ'লেও পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা চাই, তেমনি লেখক হতে হ'লেও আগে বিখ্যাত হতে হবে, তারপর লেখা ছাপানো। তাই আমাদের সবসময়ই মনে হয়, কোন বিরাট সম্ভাবনাময় প্রতিভাবান লেখক অবজ্ঞাত হয়ে চাপা প'ড়ে আছে।

অভিজিৎ জিজ্ঞেশ করল, তোমাকে তো ভাই আগে এখানে দেখিনি মনে হচ্ছে। আগে কোথায় ছিলে?

সাধনকুমার জানাল যে, সে আগেও দু-তিনটে দোকানে এই কাজ করেছে! চার বছর ধ'রে এই কাজে আছে, তবে আশা আছে, একদিন সে ঐ-কাজ ছেড়ে দিতে পারবে।

—এখনও লেখো তুমি?

—হ্যাঁ, যখনই সময় পাই একটু-একটু লিখি।

—তোমার বাড়ি কোথায়?

সাধন জানাল যে তার বাড়ি হুগলী জেলার একটি গ্রামে। ওঁর বাবা সেই গ্রামেই একজন পিওন। ওরা অনেকগুলি ভাইবোন, একবোন বিধবা। সাধন গ্রামের স্কুলে ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছে, তারপর আর পড়ার খরচ চালাতে পারেনি। খুব ইচ্ছে ছিল লেখাপড়া শেখার, তবে এখনও কোনও বই পেলেই পড়ে।

আমাদের আড্ডার মহিলা সদস্যাদ্বয়ের চোখ প্রায় সজল হয়ে এসেছে ওর দুঃখের কথা শুনে। আমাদের মনে হ'ল, এই দুঃখের অভিজ্ঞতা ওর লেখকজীবনকে সমৃদ্ধ করবে। পরের দিন ওর বইখানা দেখবার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলাম। যে-আছে মাটির কাছাকাছি, সেইরকম একজন লোককে আমরা আবিষ্কার করতে চলেছি। লজ্জায় সেদিন আমরা বিল মেটাবার পর সাধনকে টিপস দিতে পারলামনা।

পরদিন আমরা এসে বসার পরই সাধন এসে তার বইখানা দেখাল। সত্যিই শক্ত মলাটে বাঁধানো একখানা বটতলায় ছাপা উপন্যাস। প্রকাশক সাধন নিজেই। মলাটে কাঠের ব্লকে এক নদীর তীরে হৃষ্টপুষ্ট চেহারার, মালকোচা মেরে ধুতি পরা যুবক ও এক কলসী কাঁখে যুবতীর ছবি।

সাধনের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই অবশ্য। কেননা, ওর ঐ-বইখানার জন্য আমরা দাম দিতে চাইলাম, ও কিছুতেই নিলনা। অত্যন্ত বিনীতভাবে বলল, অনেক কষ্ট ক'রে টাকা জমিয়ে বইটা ছাপিয়েছি, আপনারা যদি প'ড়ে এতটু মতামত জানান, তাহ'লেই আমি কৃতার্থ হব। সাধন বেশ শুদ্ধ ভাষায় কথা বলে!

বইখানা খানিকটা উল্টেপাল্টে আমরা সবাই একটা জরুরী কাজ আছে ব'লে সেদিনকাব মতন উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে আমরা ঠিক সমস্বরে হেসে উঠিনি, বরং দুঃখিতই বোধ করেছি।

ঐ চায়ের দোকানে আড্ডাটা আমাদের ছাড়তে হবে। সাধনকুমারের মুখোমুখি আর হওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। বইখানা অতিশয়ই খারাপ। একে তো অসংখ্য বানান ভুলে অতি নিকৃষ্ট ছাপা, তার ওপব ভাষার মা-বাপ নেই। ভাষার ওপর কোন দখলই নেই সাধনের। তাছাড়াও, গল্পটাই-বা কি! সে বাংলাদেশের গ্রামের ছেলে হয়েও যে-গ্রামের কথা লিখেছে, সেরকম কোন গ্রাম কোথাও নেই। এরকম নদীও কোথাও নেই যার দু-পাড়ে সোনা রঙের বালি ছড়ানো। কৃত্রিম অকিঞ্চিৎকর কাহিনী। তার হীরো এম. এ. তে 'ফার্স্ট ডিভিশনে' পাশ-করা এক অসমসাহসী যুবক, যে মানুষের বিপদ দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে, দীন দুঃখীদের বড়োলোক ক'রে দেয়—নদীতে নৌকোয় ক'রে ডাকতরা এক সুন্দবী যুবতীকে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল,

হীরো সাঁতরে গিয়ে একাই পনেরোজন ডাকাতকে কুপোকাৎ ক'রে দিল!

এর চেয়ে, সাধন আমাদের কাছে ওর নিজের জীবনের কথা যেরকমভাবে বলেছিল, তা লিখলেও যথেষ্ট পাঠ্য হ'ত। কিন্তু সবচেয়ে শক্ত বোধহয় নিজের জীবনের কথা লেখা।

ওরকম বই বটতলায় রাশি-রাশি বেরোয়। কিন্তু সাধনকে দেখার পর, একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে অনবরত ঘোরে। গ্রাম্য পিওনের ছেলে সে, দুঃখের সংসার, নিজেও বেয়ারার চাকরি করছে—এরই মধ্যেই এত কষ্ট করে পাঁচ-ছশো টাকা জমিয়ে বই ছাপাতে গেল কেন? লেখক হবার জন্য কে তাকে মাথার দিব্যি দিয়েছিল?

একটাই শুধু উত্তর আছে, এতে সে আনন্দ পায়। আর বাংলাদেশের জল হাওয়াই, বোধহয় শুধু এই আনন্দের খোঁজ দেয়। নইলে, এ-দেশে এত লেখক কেন?

৬

ট্রেন ছেড়েছে সাড়ে-আটটায়, নটা বাজতে-না-বাজতেই ওঁরা দুজন পাজামা প'রে বাঙ্কে উঠে পড়লেন। 'শীতটা বেশ জমিয়ে পড়েছে'—বললেন একজন। শীত আমার একদম সহ্য হয়না, তবে শীতকালে ফুলকপি বেশ পেট ভ'রে খাওয়া যায়—ওটা আমাব খুব ফেভারিট, বললেন আরেকজন। দুজনেই কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে সিগারেট ধরালেন, ছাই ঝবে পড়তে লাগল আমার সামনে।

আমি নীচের বাঙ্ক পেয়েছি, আব-একটি তলার বাঙ্কে এক ভদ্রমহিলা। যেতে হবে কানপুর পর্যন্ত সহযাত্রীদের প্রতি খবচোখে চেয়ে তাদের রীতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা ক'রে নিতেই হয়। সুতরাং মুখের সামনে বই রেখে আসনে আড়চোখে দেখছি বাকি তিনজনকে। ভদ্রমহিলার ব'সে থাকার ভঙ্গি খানিকটা যেন আড়ষ্ট। একটু আড়ষ্ট হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কামরায় আর তিনজন অপরিচিত পুরুষ। কিন্তু একা ট্রেনে এতখানি পথ ভ্রমণ করার সাহস থাকলেও ভঙ্গিটাকে সহজ করতে পারেননি। এখনও বিছানা পাতেননি, একটা ছোট বাক্স ও টিফিন কেরিয়ার পায়ের কাছে—ওগুলো গুছিয়ে রাখা দরকার। হাতের পাশে একটা সিনেমা ম্যাগাজিন, সেটাও খোলেননি এখনও—এমনি তাকিয়ে আছেন জানলার দিকে। মহিলার বয়েস দেখে মনে হয় সাতাশ, প্রসাধনে যদি খুব বেশি বয়েস লুকিয়ে থাকেন, তাহ'লেও বত্রিশের বেশি না। ভদ্রমহিলাকে মাঝারিধরনের সুন্দরী

বলা যায়—অর্থাৎ মেট্রো-লাইট হাউসের সন্ধের শো ভাঙার পর যে-ভিড়—তার মাঝখানে এই মহিলাকে তেমন রূপসী বলা যাবেনা, কিন্তু কোন বাড়িতে কারুকে ডাকতে গেলে এইরকম একজন নারী যদি দরজা খুলে দেয়—তখন বেশ লাগবে, ট্রেনের কামরার কক্ষে তো যথেষ্ট সুন্দরীই বলতে হবে।

ওপর থেকে সিগারেটের ছাইয়ের সঙ্গে সংলাপ ভেসে এল, ‘ফুলকপি বেশি খেলে আপনার অম্বল হয়না?

—হ্যাঁ, হয় একটু-একটু, ওষুধও খাই। কিন্তু ব্যাসন দিয়ে ফুলকপি গরম-গরম ভাজা—বুঝলেননা, একেবারে অমৃত।

—আমার তো শীতকাল এলেই অম্বলে এত জ্বালায়—তরিতরকারি শাকসব্জী কিছু খেতে পারিনা।

—অম্বলের একটা খুব ভালো ওষুধ আমাকে দত্তচৌধুরী বাৎলে দিয়েছিলেন।

—কোন দত্তচৌধুরী?

—পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টসের ডেপুটি সেক্রেটারি। চেনেননা?

—হ্যাঁ চিনি। টপাটপ দুটো প্রমোশন পেয়ে গেল।

—ইউ নো ভেরি ওয়েল, প্রমোশন পাবার জন্য কীরকম—

গোড়া থেকেই লোকদুটির ওপর আমি বিলক্ষণ চ'টে আছি। চ'টে যাবার বিশেষ কোন যুক্তি নেই, কিন্তু অনেকগুলো কারণ মিলিয়ে। প্রথমত, ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝেছি, ওঁরা দুজনই সরকারি অফিসার—সুতরাং ফার্স্ট ক্লাসে যাওয়ার জন্য নিজের টাকায় টিকিট কাটতে হয়নি—সেইজন্যই একটা হেলাফেলা ভাব। আমিও অবশ্য নিজের টাকায় টিকিট কাটিনি—মাসীমাকে আনতে যাচ্ছি কানপুর থেকে, মেশোমশাই জোর ক'রে গছিয়েছেন ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া। মনের মধ্যে অবশ্য খচখচ করছিল, থার্ড ক্লাসেই গিয়ে বাকি টাকাটা ম্যানেজ করব কিনা—শেষ পর্যন্ত মেশোমশাইয়ের সম্মানের কথা ভেবে পারিনি। কতসব ঠুনকো সম্মানবোধ যে থাকে মানুষের! যাই হোক, ফার্স্ট ক্লাসেই যখন যাচ্ছি, তখন তার আরামের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে চাই। সঙ্গী হিসেবে, ঐ দুজন লোককে ভালোলাগার কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, আমি ভাবছিলাম, ঐ লোকদুটি যদি না-থাকত—তাহ'লে এই মহিলার সঙ্গে আমি বেশ ভাব জমিয়ে ফেলতে পারতাম। অবশ্য, ওঁরা না-থাকলেই যে বাঙ্কদুটি খালি থাকত—তার কোন মানে নেই। কিন্তু সেখানে কোন সদ্যবিবাহিত দম্পতি এলে—তারা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকত—আর আমি সেই সুযোগে—।

তৃতীয় কারণটিই হয়ত আসল। ওঁরা দুজনেই বাঙালি, এবং সরকারি অফিসার যখন—তখন মোটামুটি শিক্ষিত হওয়া উচিত, কিন্তু অনবরত কী বিরক্তিকর ও

অর্থহীন কথা ব'লে যেতে লাগলেন। দুজন প্রায় প্রৌঢ় সুস্থ মানুষ—আগাগোড়া শুধু অম্বলের অসুখ আর চাকরির উন্নতি—বিভিন্ন অফিসারদের চরিত্র, পে কমিশন আর আর্ন লীভ—কাজুয়েল লীভ ব্যবহারের কায়দা—এই আলোচনায় ম'জে রইলেন। আশা করিনি, ওঁরা শিল্প-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবেন, কিন্তু ট্রেনে যাওয়ার সময় অন্য ভ্রমণের গল্পও মনে এলনা, জানালার বাইরে হিম আকাশের নীচে পৃথিবীর অজস্র টুকরো—সেদিকে স্তব্ধ হয়ে এক পলক তাকাতে ইচ্ছে হ'লনা! এমনকি নারী সম্পর্কেও কোন-কোন কৌতূহল নেই, তাঁদের সমগ্র আলোচনা মহিলা-বর্জিত তো বটেই এই কামরায় উপস্থিত মহিলা সম্পর্কেও ভ্রূক্ষেপ করলেননা, দুজনের কেউই একবার চেয়েও দেখেননি, বরং পাজামার দড়িতে গিঁট বাঁধলেন ভদ্রমহিলার সামনেই। এধরনের মানুষ আমার সহ্য হয়না।

ওপর থেকে সংলাপ ভেসে এল, হু-হু ক'রে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে কোথা থেকে?

নীচের জানলা বোধহয় খোলা আছে।

জানলাটা বন্ধ করলে হয়না?

জানলা বন্ধ ক'রে আলো নিভিয়ে দিলেই তো হয়।

কথাগুলো আমার উদ্দেশ্যেই বলা। কেননা, মহিলার দিকের জানলায় কাচ ফেলা। আমার হাওয়া খেতে বেশ ভালো লাগছে, একটু শীত করলেও ; কলকাতার বাইরে এলেই হাওয়ায় একটা পরিচ্ছন্নতার গন্ধ পাওয়া যায়। আমি ওপরের দুজনের কথায় ভ্রূক্ষেপ করলামনা। কিন্তু এই সুযোগে, আমি মহিলার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, জানলা বন্ধ ক'রে দেব? আপনার কি অসুবিধে হচ্ছে?

মহিলা একটু সচকিত হয়ে উঠলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ, মানে জানলাটা।

—আপনার যা সুবিধে।

—না, যদি আপনার অসুবিধে হয়।

—না, না, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছেনা।

এর ফলে আমি ঠিক বুঝতে পারলুমনা, জানলাটা খোলা রাখা কিংবা বন্ধ করা কোনটা ঠিক কাজ হবে। এরপর আর কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যায়, আমার মাথায় এলনা। আর-কিছু জিজ্ঞেস করলেই যদি গায়ে-পড়া মনে করেন? এরপরই কি দুম ক'রে জিজ্ঞেস করা যায়, আপনার নাম কি! কিংবা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? মহিলা কিন্তু উত্তর দেবার সময় মুখখানা খুব গম্ভীর করেননি, একটু হেসেছিলেন—তার মানে আমাকে হয়ত একেবারে অপছন্দ করেননি! ওপরের

দুজন একটু নিচু গলায় নিজেদের মধ্যে কী যেন বললেন।

ভদ্রমহিলা বিবাহিতা কিনা বোঝা গেলনা। অনেক মেয়েরই সিঁথির সিঁদুর এমন লুকিয়ে থাকে যে চোখেই পড়েনা সাধারণত। যাই হোক, আমি আমার সুবিধে মতন কল্পনা ক'রে নিলুম যে ওঁর বিয়ে হয়নি। কানপুরে যাচ্ছেন কেন? একা-একা মেয়েরা চট ক'রে অতদূর বেড়াতে যায়না। তা ছাড়া, আর কী কাজ থাকতে পারে? এমন হতে পারে, এই মহিলার দিদি কিংবা মাসী পিসী কেউ থাকেন —সেখানে যাচ্ছেন। কিন্তু এটা কোন ছুটির সময় নয়। কিংবা কানপুরেরই মেয়ে, কলকাতায় এসেছিলেন কোন কাজে? কি কাজ? এখন, কলকাতার মেয়ে আর কানপুরের মেয়ের চেহারার মধ্যে আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য আছে কিনা, আমি জানিনা — পোশাকের সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও থাকতে পারে—সেটা মেয়েদের চোখে পড়ার কথা। তা ছাড়া, ভদ্রমহিলা সত্যিই যে কানপুরে যাচ্ছেন, তাই-বা আমি জানলুম কী ক'রে? আমি কানপুরে যাচ্ছি ব'লে উনিও সেখানে যাবেন, তার কি মানে আছে? এই ট্রেনে উনি তো দিল্লি, আগ্রা, এলাহাবাদ যে-কোন জায়গায় যেতে পারেন, কিংবা আবার ট্রেন পাল্টে অন্য কোথাও। কিন্তু আমার বদ্ধমূল ধারণা হ'ল মেয়েটি কানপুরেই যাচ্ছে—এবং ট্রেনে আমি যদি ওর সঙ্গে আলাপ জমাতে পারি তাহ'লে কানপুরেও দেখা হবে, এবং তারপর আস্তে-আস্তে একটা ইয়ে মানে...

আমি মেয়েটাকে আবার জিজ্ঞেস করলাম, আলো নিবিয়ে দেব?

মেয়েটি পূর্ববৎ স্মিতমুখে বলল, আমার কোন অসুবিধে হচ্ছেনা, আপনি যদি চান—

মুশকিল হচ্ছে এই, আমি একদম গল্প বানাতে পারিনা। ট্রেনের কামরায় একটি সুন্দরী নারীর সঙ্গে পরিচয়, রাত জেগে পাশাপাশি ব'সে গল্প করা—তারপর আপনি থেকে তুমি, আঙুলে-আঙুলে খেলা, কানপুর স্টেশনে নেমে দেখা গেল—মেয়েটিকে কেউ স্টেশনে নিতে আসেনি, সুতরাং তাকে পৌঁছে দেওয়া ও বাড়ি চ'লে আসা, আবার পরদিন দেখা, তারপর...। পাকা গল্প লেখকেরা এই পরিবেশটিকে কাজে লাগিয়ে নিশ্চয়ই একটা সুন্দর রোমান্টিক গল্প ফাঁদতে পারতেন। কিন্তু আমি যে শুধু গল্প বানাতে পারিনা তাই নয়, এইরকম একটা পরিবেশকে কাজেও লাগাতে পারিনা।

আসল ঘটনা হ'ল এই, আমি সর্বক্ষণ মেয়েটিকে কী বলা উচিত আর কী বলা উচিত নয়, এই ভেবে-ভেবেই সময় কাটিয়ে দিলুম। সারা রাত ভালো ক'রে ঘুম হ'লনা, সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল, মেয়েটি বোধহয় আমাকে ডাকবে কিংবা কিছু বলবে, মেয়েটি ঘুমের ঘোরে একবার পাশ ফিরলেও আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠছিলুম —কিন্তু কিছুই ঘটলনা। জীবনে সত্যি-সত্যি গল্পের মতন ঘটনা বেশি ঘটেনা। রাত

জেগে আমি শুধু ওপরের দুটি কুম্ভকর্ণের নাক-ডাকা শুনতে লাগলুম।

সকাল হতে সেই দুজন নেমে এলেন নীচে। চা খাওয়ার আগেই শুরু হয়ে গেল আবার অফিসের গল্প পে কমিশন আর অম্বলের ওষুধের কথা। অন্য বিষয়ের মধ্যে একবার শুধু তাঁরা বললেন, 'এদিকে কলা বেশ সস্তা' এবং ইউ. পি. সাইডে বেশ ভালো চাল পাওয়া যায়—কিন্তু এর থেকেই প্রসঙ্গ চ'লে এল কলকাতার রেশনের চালে কীরকম কাঁকর, তারপর দর এবং আবার মাইনে, ছুটি এবং অফিস। কানপুর পর্যন্ত তাই কামরায় আমার কিংবা একজন মহিলার উপস্থিতি সম্পর্কে ওঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন। জন্তু-জানোয়ার হ'লেও এতক্ষণ ভাব হয়ে যেত, কিন্তু চারজন সভ্য মানুষ, তাই কোন কথা হয়না। এদের সামনে আমি আলাদাভাবে মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করতে লজ্জা পেলাম, ভেতরে-ভেতরে ছটফট করতে লাগলাম শুধু! বই মুখে ক'রে ব'সে রইলাম, সে-বইয়ের একটি অক্ষরও মাথায় ঢুকলনা অবশ্য। মেয়েটি তাকিয়ে রইল জানলার বাইরে। কানপুর এসে গেল, একটা কথাও বলা হ'লনা।

এরপর যদি আমি বলি, পরদিন মেয়েটির সঙ্গে আমার কানপুরে দেখা হয়েছে, তাহ'লে কি সেটা অতিনাটকীয় শোনাবে? কিন্তু সত্যি-সত্যি দেখা হ'লে আমি কী করব। মেয়েটির নাম সুদীপ্তা এবং মেসোমশাইয়ের বিশেষ বন্ধুর মেয়ে। মাসীমাকে নিয়ে কলকাতায় রওনা হব, তার ঠিক আধ ঘন্টা আগে মেয়েটি মাসীমার সঙ্গে দেখা করতে এল। পরিচয় করিয়ে দেবার পর আমার দিকে তাকিয়ে স্মিতভাবে হাসল শুধু, আমিও হাসলাম। তারপর চ'লে গেলাম বেডিং বাঁধতে।

ট্রেনে ওঠার পর মাসীমা বললেন, তোর সঙ্গে আসবার সময় সুদীপ্তা এক কামরায় এসেছে?

আমি বললাম, কী জানি মনে পড়ছেনা তো। একটি মেয়ে ছিল বটে, অনেকটা ঐরকমই দেখতে—

মাসীমা হাসতে-হাসতে বললেন, সুদীপ্তা কী বললে জানিস? তুই ছিলি ব'লে ও বেশ নিশ্চিন্তে আসতে পেরেছে—আর দুটো ধুমসো মতন লোক নাকি বারবার ওর দিকে বিশ্রীভাবে তাকাচ্ছিল আর আজেবাজে বকবক করছিল। তুই ব'সেছিলি বই নিয়ে। সুদীপ্তা বলল, তোর এত বই পড়ার নেশা, তুই একবার তাকিয়েও দেখিসনি ওর দিকে—ও ভেবেছিল যদি আলাপ-পরিচয় হয়—নইলে অতক্ষণের রাস্তা কথা না-ব'লে মুখ বুঁজে থাকা! তোর আবার পড়াশুনায় এত মনোযোগ হ'ল কবে থেকে?

সংযোজন খ

১

এক নববিবাহিত দম্পতির কথা দিয়েই শুরু করি। দুজনের সংসার, দক্ষিণ কলকাতায় ছোট্ট ফ্ল্যাট। স্বামীটি রোজ সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে আসে, মার্চ মাসে অফিসের কাজ বেশি পড়ায় ফিরতে-ফিরতে আট-নটা হয়। একদিন রাত এগারোটা বেজে গেল। তারপর সাড়ে-এগারোটা, পৌনে-বারোটা। উদ্বেগে, দুশ্চিন্তায় তরুণী বধূটির পাগল হয়ে যাবার মতন অবস্থা। আত্মীয়স্বজন বিশেষ কেউ নেই, নিজেদের টেলিফোন নেই, পাশের ফ্ল্যাটের ফোনও খারাপ। বেপরোয়া হয়ে মেয়েটি বেরিয়ে প'ড়ে অত রাতে একটি ট্যাক্সি ধরল, তার স্বামীর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর বাড়িতে খোঁজ নিতে যাবার জন্য। স্বামীটিকে হঠাৎ এয়ারপোর্টে যেতে হয়েছিল, সে তখনই অফিসের গাড়িতে ব্যাকুল মুখে ফিরছে। নির্জন রাস্তায় বিপরীতমুখী ট্যাক্সিতে এক তরুণীকে দেখে সে দারুণভাবে চমকে উঠল। প্রথমে ভাবল চোখের ভুল, তারপর চেঁচিয়ে বলল, থামো, থামো! দুটি গাড়ি থামবার পর স্বামী-স্ত্রীতে মিলন। স্ত্রীটি যখন কাঁদছে, তখন ট্যাক্সিটির ড্রাইভার নেমে এসে বলল, দেখুন দাদা, ইনি আমার গাড়ি ধরতে এসে বললেন, শুনুন, আমি আমার স্বামীকে খুঁজতে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করবেননা! আচ্ছা বলুন দাদা, আমরা কি সবাই খারাপ লোক! এই দেখুন-না, দিদি ট্যাক্সিতে হ্যাণ্ডব্যাগ ফেলেই নেমে এসেছেন। আমি যদি দেখতে না-পেতুম...। স্বামীটির দুই চক্ষু বিস্ফারিত। দিনেরবেলা যে ট্যাক্সি ড্রাইভাররা ডাকলে সাড়া দেয়না, হাওড়া যেতে যাদবপুর যাবার প্রস্তাব দেয়, যাদের মুখের ভাব দেখলে গা জ্ব'লে যায়, রাত্তিরে সেই ট্যাক্সিওয়ালার কাছ থেকে এ কী অভাবনীয় ব্যবহার! তার সুন্দরী, যুবতী স্ত্রীকে দিদি ব'লে সম্বোধন করছে!

এটা কিন্তু কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কলকাতায় মেয়েরা সন্ধের পর একা স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে, একা ট্যাক্সি ব্যবহার করতে পারে। নারী-লাঞ্ছনার ঘটনা এ-শহরে খুবই বিরল, ঘটেনা বললেই চলে। নির্জন অন্ধকারে ছিনতাইকারীরা কোন মহিলার গলার হার ধ'রে টান মারতে পারে ঠিকই, কিন্তু স্বর্ণালঙ্কারের বদলে গোটা শরীরটাই অপহরণ করার রীতি এখানে নেই।

জীবন্ত শহর, ফ্লাই-ওভারে পরিপূর্ণ দিল্লিতে কিন্তু সন্ধের পর মেয়েদের এ-স্বাধীনতা অকল্পনীয়। কয়েক বছর আগে এক সরকারি বাসের ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর মিলে এক যাত্রিণীকে স্বস্থানে নামতে না-দিয়ে ডিপোতে নিয়ে গিয়ে শ্লীলতাহানি করেছিল। বাস স্টপে অপেক্ষমানা মেয়েদের চলন্ত সাইকেল-আরোহীরা চুল ধ'রে

টান মারে। কয়েকদিন আগে খুসবন্ত সিং লিখেছেন যে শক্ত সমর্থ জোয়ান পুরুষরাও ইদানীং সন্ধের পর দিল্লির রাস্তায় বেরুতে ভয় পায়। শিখ-দাঙ্গা ও দূতাবাসকর্মী খুনের পর অতি তৎপর পুলিশ যখন-তখন, যে-কোন লোককে ধ'রে তল্লাশী ও জেরা করে। একটু রাত হলেই রাজধানীর অধিকাংশ রাজপথ একেবারে শুনশান। কোনও প্রাণের স্পন্দন পাওয়া যায়না।

মাস দু-এক আগে বেলজিয়ামের এক কবি তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের ফরাসী স্ত্রী-কে নিয়ে এসেছিলেন কলকাতায়। নববধূকে নিয়ে মধুচন্দ্রিমা যাপনে। শুনে তো আমি থ। চতুর্দিকে আমি কলকাতার নিন্দে শুনতে পাই, সাহেবসুবোরা তো কলকাতার নামে নাক সিঁটকোয়। কেন্দ্রীয় পর্যটন দফতর বিদেশী ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করবার জন্য যে-প্রচার চালায়, তাতে কলকাতার নাম ভুলেও উচ্চারণ করেনা। তাহ'লে এই সাহেব-মেম মধুর রসে আকৃষ্ট হয়ে কলকাতায় চ'লে এল কী ক'রে?

কবির নাম ভেরনের লাম্বার্সী, তার নবোঢ়ার নাম প্যাট্রিসিয়া। কবিটি তাঁর দেশের শীর্ষস্থানীয়, ঘুরেছেন বহু দেশ, বাস করেছেন অনেক নগরীতে, এই নিয়ে কলকাতায় তাঁর তৃতীয়বার আগমন। কেন এই ফিরে ফিরে আসা? ভেরনের বললেন, মানুষ দেখতে। এই শহরে এত মানুষ, পথে-পথে গিসগিস করছে মানুষ, অট্টালিকায় মানুষ, বস্তিতে মানুষ, নদীর ধারে মানুষ, খেলার মাঠে মানুষ। এত মানুষ, তবু তাদের চোখে হিংস্রতা নেই। মুখের দিকে স্বচ্ছভাবে তাকায়। কারুর দিকে হেসে তাকালে হাসি দিয়ে তার জবাব আসে। মানুষের চেয়ে আর বেশি দর্শনীয় কী আছে? কলকাতাকে আমার সবসময় খুব জীবন্ত লাগে। নেভার এ ডাল মোমেন্ট, ইউ সি!

প্যাট্রিসিয়া তার পাগলাটে স্বামীর কথা শুনেই শুধু আসেনি। কলকাতা সম্পর্কে আগে সে পড়াশোনা ক'রে নিয়েছে। আন্তর্জাতিক গাইড বইগুলিতে কলকাতা বিষয়ে যে-সব ভীতিকর কথাগুলি আছে, তা-ও তার জানা। তবু কলকাতা সম্পর্কে তার কৌতূহল ছিল। সে খোলা মন নিয়ে এসেছে, তার কিছু-কিছু খারাপ লাগছে, কিছু-কিছু ভালো লাগছে। সে কৌতূহলীভাবে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, কী ব্যাপার বলো তো। দিল্লিতে ব'সে আমরা যখন কলকাতার সফরসূচি তৈরি করছিলুম, তখন পর্যটন দফতরের এক কর্তা ভুরু কুঁচকে বললেন, কলকাতায় যাবেন কেন? কী দেখবার আছে? কলকাতা তো বিচ্ছিরি আর ময়লা, আপনারা বরং মধ্যপ্রদেশে খাজুরাহো দেখতে যান।

আমি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললুম। তখনও রাজীব গান্ধী কলকাতা সম্পর্কে রাজ্যসভায় অশালীন মন্তব্যটি করেননি। কিন্তু দিল্লির তল্পীবাহক আর হুঁকোবরদারদের

মনোভাবও যে এইরকম তা আগে ভাসা-ভাসা শুনেছিলুম, সেদিন সঠিক জানলুম। ঐ-ব্যাটাচ্ছেলেরা বোঝেনা যে বিদেশীদের কাছে ওইসব কথা ব'লে তারা নিজেরাই অপমানিত হয়। অন্য কোন দেশের সরকারি ভারপ্রাপ্ত কর্মীরা দেশের এক অংশের নিন্দে করার কথা কল্পনাও করতে পারেনা। প্যাট্রিসিয়াকে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তোমার বর না-হয় কবি, সে অসুন্দরকেও সুন্দর হিসেবে দেখতে পারে। কিন্তু তুমি সত্যি ক'রে বলো তো, কেমন লাগছে আমাদের শহরটা।

প্যাট্রিসিয়া বলল, দ্যাখো, আমরা যখন প্যারিস ছেড়ে দূরের কোন দেশ দেখতে যাই, তখন তো আর ভালো হোটেল, নাইট ক্লাব বা সুন্দর-সুন্দর বাগান দেখতে চাইনা। সে সব তো প্যারিসেই আছে। আমরা দেখতে যাই সেই দেশের নিজস্ব চরিত্র সমেত সব-কিছু। সকলেরই তো ঐতিহাসিক স্তম্ভ, মন্দির বা দুর্গ দেখার দিকে ঝোঁক থাকেনা। আমিও মানুষজন দেখতেই ভালোবাসি। কলকাতায় বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষজন থাকে, তারা সারা পৃথিবীর খবর রাখে, এটাই ভালো লাগছে। ওরে বাবা, বইমেলায় এত ভিড়! গরিব সব মানুষজন, তবু তারা বই কেনে! একটা বস্তির পাশ দিয়ে যেতে-যেতে কী দেখলুম জানো? বাচ্চা ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করতে-করতে খলখল ক'রে হাসছে। এত দারিদ্র্যের মধ্যেও যে মানুষ হাসতে পারে, গান গায় এটা আমরা পশ্চিমী লোকেরা জানতুমইনা!

ভেরনের বললেন, এই শহরে শ-খানেক ছোট পত্রিকা বেরোয়, পাঠের আসরে ভিড় হয়, তুমি জানো? ইণ্ডিয়ার আর কোন শহরে এরকম নেই। আমাদের প্যারিসেও নেই।

প্যাট্রিসিয়া বললে, তবে, শহরের রাস্তাঘাট তোমরা পরিষ্কার রাখলে পার। তাতে তো বেশি পয়সা খরচ হয়না, ওটা মানসিকতার ব্যাপার। যখন-তখন আলো নিভে যায়, এটা কী? এখানকার মানুষ সত্যিই বড়ো সহনশীল। একদিন ওদের বেশ একটা মজার অভিজ্ঞতা হ'ল। যাওয়া হয়েছিল ডায়মণ্ড হারবার পেরিয়ে কাকদ্বীপের কাছাকাছি একটা জায়গায় গঙ্গা-সন্দর্শনে। একটা খোলা নৌকো নিয়ে নদীবক্ষে ভ্রমণ। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, আকাশটি বড়ো অপরূপ। কিন্তু সাহেবজাতির সৌন্দর্য উপভোগের ধরনধারনই অন্যরকম। নদী শুধু দেখার জিনিস নয়, অবগাহনের। ভেরনের নদীতে নেমে পড়তে চায়। প্যাট্রিসিয়ার মৃদু আপত্তি, অচেনা জল, কত গভীর বা স্রোত কে জানে, তা ছাড়া হাঙর-কুমীর থাকতে পারে। আমি বললুম না, জলজ জন্তু জানোয়ারের কোন ভয় নেই। সাঁতার জানো তো? ভেরনের তৎক্ষণাৎ শার্ট-প্যান্টালুন খুলে এক ডাইভ মারল। তারপর যখন মুখ তুলল, তার বেশ ভ্যাবাচ্যাকা ভাব। নিচের মাটিতে তার মাথা ঠুকে যাবার উপক্রম

হয়েছিল! মাঝ-গঙ্গায় মাত্র কোমর জল, সেখানে সাঁতার কাটবার কোন দরকারই নেই।

প্যাট্রিসিয়া বলল, এ কী, এত বিখ্যাত তোমাদের গঙ্গা নদী, তাতে এত কম জল? এ যে বিশ্বাসই হয়না।

আমি কাঁচুমাচুভাবে বললুম, কী করব বলো! আমাদের এই প্রিয় নদীটিকে নিয়ে আমাদের সরকার কী যে ছিনিমিনি খেলছে! হাজার গণ্ডা বাঁধ দিয়েছে এই নদীর বুকে, তারপর আবার জল ভাগাভাগি, কত কী! নদীগুলির আর স্বাধীনতা নেই!

বন্দরের কাল হ'ল শেষ! পুরোপুরি না-হ'লেও অনেকটা। কলকাতা বন্দরের বেশ-খানিকটা ভার নিয়ে নিয়েছে হলদিয়া, তারপর পারাদ্বীপ। বিমানবন্দরটিও খাঁ-খাঁ করে, এক-একটি বিদেশী বিমানসংস্থা শেষযাত্রায় উড়ে যাচ্ছে। তা যাকনা। তবু এক-একটা বিকেলে যখন জোর হাওয়া দেয়, আকাশের আলোর রকমফের হয়, তখন পথে-পথে অজস্র মানুষের মুখ ঝলমলিয়ে ওঠে। যৌবনের দীপ্তি টের পাওয়া যায়, বেঁচে থাকাটাকেই মনে হয় একটা উৎসবের মতন। আর-একটি বছর পেরিয়ে গেল। কলকাতার আয়ু কি এক বছর কমল না বাড়ল?

২

আমি বাইরের ঘরে ব'সে-ব'সে একটা বই পড়ছিলাম। দুপুরবেলা। চারদিক নিঝুম। আমি তখন বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ব'সে আছি, রেজাল্ট বেরোয়নি। সিনেমা দেখতে যাবার পয়সাও জোটেনা। প্রচণ্ড রোদ্দুর, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারারও উৎসাহ পাইনা। দুপুরে ঘুমোনো অভ্যেস নেই আমার—তাই গল্পের বই প'ড়ে সময় কাটাচ্ছিলাম।

দরজায় কড়া ন'ড়ে উঠল। দরজা না-খুলে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম একজন দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। গেরুয়া পরা, মাথায় জটা।

—কী চাই!

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বললেন, দরজা খোলো।

কথার টান শুনলে বোঝা যায় বাঙালি নন, তবে বাংলা জানেন। আমি ঠাকুর-দেবতা মানিনা। এমনকি, পরীক্ষা দিতে যাবার সময় কিংবা চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে যাবার সময়ও কখনো কালীমন্দিরে প্রণাম করিনি। কিন্তু সন্ন্যাসীদের আমার ভালো লাগে চিরকাল। ঘরছাড়া বিবাগী ভ্রাম্যমাণ মানুষরা আমাকে চিরকাল টানে।

দরজা খুলতেই সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে বললেন, আমার একটা সিকি চাই।

একটু অবাক হয়ে গেলাম। এরকম সুসজ্জিত পুরোপুরি সন্ন্যাসীকে কখনো ভিক্ষে করতে দেখিনি। আশ্রম ইত্যাদির চাঁদা চাইতে কেউ-কেউ আসে বটে, কিন্তু সোজাসুজি ভিক্ষে—

—কেন? আপনাকে সিকি দেবো কেন?

—আমার দরকার। যাও নিয়ে এসো—

—আমার কাছে পয়সা নেই।

সন্ন্যাসী একটুক্ষণ কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, কিন্তু আমাকে পয়সাটা তো এ-বাড়ি থেকেই নিতে হবে। অন্য কোন বাড়ি থেকে নিলে চলবেনা।

আমি হেসে বললাম, কেন, এখান থেকেই নিতে হবে কেন? আমাদের বাড়ির বিশেষত্ব কী?

—এটা ব্রাহ্মণের বাড়ি।

—কী ক'রে জানলেন?

—আমি এসব বুঝতে পারি।

—আপনি দরজার বাইরে নেমপ্লেট দেখেছেন তো? ওটা বাড়িওয়ালাদের। আমরা একতলার ভাড়াটে—ব্রাহ্মণ নই। সন্ন্যাসী আমার চোখের দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে বললেন, ছিঃ! মিথ্যে কথা বলতে নেই।

সন্ন্যাসীর ব্যবহারে বেশ-একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। নিছক ভিখিরী মনে হয়না তাঁকে। তবু চার আনা পয়সা চাইছেন কেন? আমি বললাম, আপনি হাত গুণতে জানেন? আমার হাতটা দেখে দিন, তাহ'লে চার আনা পয়সা দিতে পারি। নেহাৎ মজা করার জন্যই কথাটা বলেছিলাম। সন্ন্যাসী আমার ডান হাতটা টেনে নিলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি তো এবার বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছ?

—হ্যাঁ, বলুন তো আমি পাশ করব কিনা!

সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমার হাতের দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যাক!

তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে পেছন ফিরে হাঁটতে শুরু করলেন হঠাৎ। চমকে গিয়ে বললাম, কী হ'ল, চ'লে যাচ্ছেন কেন? দাঁড়ান! দাঁড়ান! নিয়ে যান পয়সা! সন্ন্যাসী কর্ণপাত না-ক'রে হনহন ক'রে হেঁটে চ'লে গেলেন।

সেবার সত্যিই আমি বি. এ. পাশ ক'রে গেলাম। ভালো রেজাল্ট হয়নি, কিন্তু মোটামুটি পাশ করতে কোন অসুবিধে হয়নি। আমি তো সন্ন্যাসীর কাছে পাশ করব না ফেল করব—এ-কথাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাহ'লে পয়সা না-নিয়ে চ'লে গেল কেন?

সেই সন্ন্যাসীর রহস্যের কথা আমি তারপর অনেক ভেবেছি। কোন কূলকিনারা পাইনি। অত ভাবতাম ব'লেই সন্ন্যাসীর মুখটা আমার মনে ছিল।

বছরদশেক বাদে হরিদ্বারে সেই সন্ন্যাসীকে দেখে তাই আমার চিনতে অসুবিধে হয়নি। চেহারা একইরকম আছে, বার্ধক্যের ছাপ পড়েনি। হর-কি-পারি ঘাটে অনেক ভক্ত পরিবৃত হয়ে ব'সে আছেন।

কৌতূহলী হয়ে আমিও ওঁর সামনে বসলাম। একবার একটু সুযোগ পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মহারাজ, আপনি কি বছরদশেক আগে কলকাতায় গিয়েছিলেন?

সন্ন্যাসী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তুমি তখন আমাকে দেখেছিলে? তারপর জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই?

আমি হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, আমার হাতটা একটু দেখে দেবেন?

--কী জানতে চাও!

--আমি কি কোনদিন কোনো প্রকৃত সন্ন্যাসীর দেখা পাব?

সন্ন্যাসীর মুখখানা বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। একটাও কথা না—ব'লে হনহন ক'রে হেঁটে গেলেন গঙ্গার দিকে। জলে পা ডুবিয়ে স্রোত থেকে বাঁচার জন্যে শিকলটা শক্ত ক'রে ধ'রে বললেন, না।

আমার দৃঢ় ধারণা হ'ল, উনি আর একবার ভুল বললেন।

৩

গত তিন বছর ধ'রে যে-মেয়েটি আমাদের বাড়িতে ঘর-মোছা, বাসন-মাজার কাজ করছিল, সে এই মাসে চাকরি ছেড়ে দিল। মেয়েটি সত্যিই খুব কাজের মেয়ে ছিল। আমার স্ত্রীর কাছ থেকে তার নামে কখনও কোন অভিযোগ শুনিনি। মেয়েটির বয়স কুড়ির নিচে। তার নাম সীতা। মেয়েটির সবচেয়ে বড়ো গুণ এই যে, সে কখনও চেঁচিয়ে কথা বলতনা। প্রায় নিঃশব্দে সে প্রতিদিন তার কাজ সেরে যেত।

আমি ওই মেয়েটির নাম ছাড়া তার সম্বন্ধে আর কিছুই জানিনা। 'কাজের-মেয়ে'দের সঙ্গে বাড়ির পুরুষমানুষদের বেশি কথা বলার নিয়ম নেই। অল্পবয়েসী ঝি-দের সঙ্গে কোনরকম কৌতূহল দেখানো তো পুরুষদের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। সুতরাং তিন বছর ধ'রে একটি মেয়ে আমাদের বাড়িতে যাতায়াত করলেও আমার কাছে সে প্রায় অপরিচিতই র'য়ে গেল।

মাঝে-মাঝেই ঝি-চাকর ছাড়িয়ে দেওয়া এবং নতুন ঝি-চাকর খোঁজা

আজকালকার মধ্যবিত্ত সংসারের গৃহকর্ত্রীদের বিলাসিতার অঙ্গ। সকালবেলা আমার স্ত্রী যে তিন-চারটি টেলিফোন করেন কিংবা তিন-চারটি টেলিফোনের ডাক পান, সেইসব কথাবার্তার অনেকখানিই থাকে ঝি-চাকর সংক্রান্ত আলোচনা। ঝি-চাকরদের জন্য কলকাতায় কোন এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ নেই, কিন্তু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের পরিবারগুলি মিলিয়ে এক-একটা গোষ্ঠির মধ্যে ঝি-চাকর বিনিময়ের চমৎকার ব্যবস্থা আছে। আমার এক বন্ধু একটি ব্রিটিশ মেয়েকে বিয়ে করেছে। সেই মেমসাহেবটিও কিছুদিনের মধ্যেই এমন বাঙালি হয়ে গেছে যে সে-ও সাহিত্য-শিল্প আলোচনার চেয়ে ঝি-চাকর বিষয়ে আলোচনায় বেশি উৎসাহী। দু-মাসের বেশি তার বাড়িতে কোন দাস দাসী টেঁকেনা। আমার স্ত্রীকেই তার বাড়িতে নতুন-নতুন দাস-দাসী সাপ্লাই করতে হয়।

সীতা নামের এই মেয়েটি অবশ্য নিজে থেকেই আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে দিল এবং তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে! এই মাসে তার বিয়ে হচ্ছে। কাজ ছেড়ে চ'লে যাবার দিন সে হঠাৎ আমাকে প্রণাম ক'রে সলজ্জ গলায় বলল, 'দাদাবাবু, যাচ্ছি!' এইসব ক্ষেত্রে কী বলতে হয় তা আমি জানিনা। তাই চুপ ক'রে রইলুম।

এ-পর্যন্ত আমাদের বাড়িতে যত মেয়ে কাজ ক'রে গেছে, তাদের মধ্যে ছ-সাতজনের নাম এবং মুখ আমি মনে রাখতে পারি। আমাদের ছেলেবেলায় ঝিদের কোনো নিজস্ব নাম থাকতনা। তাদের বলা হ'ত, পরেশের মা, পাঁচুর মা ইত্যাদি। এখন অবশ্য ঝিদের সকলেরই নাম থাকে, কয়েকজনের বেশ আধুনিক নাম, এমনকি রবি ঠাকুরের একটি উপন্যাসের নায়িকার নামের একটি ঝি-ও আমাদের বাড়িতে কাজ ক'রে গেছে।

সীতার ঠিক আগেই যে-মেয়েটি আমাদের বাড়িতে কাজ করত, তার নাম ছিল সুবালা। সে তিনদিনের ছুটি নিয়ে দেশে গিয়ে আর ফেরেনি। তখনই রাখা হয় সীতাকে। তার কাজ দেখে আমাদের বাড়ির সকলেই খুশি। কিন্তু তিন মাস পরে একটা গোলমাল লাগল। সুবালা একদিন ফিরে এসে প্রচুর কান্নাকাটি শুরু করল। তার সঙ্গে দুটি বাচ্চা ছেলেমেয়ে। সুবালার কথা শুনে আমি যা বুঝতে পারলুম তা হ'ল এই যে, তার স্বামী আর-একটি বিয়ে করেছে এবং বাচ্চাসমেত তাকে দেশের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে তার পিঠের কাপড় সরিয়ে দেখাল, তার স্বামী তাকে লাঠি দিয়ে মেরেছে, সেই দাগ।

সুবালার কাহিনী শুনে আমার মা যথেষ্ট দুঃখ বোধ করলেও তাকে আমাদের বাড়িতে আবার কাজ দেওয়া সম্ভব হ'লনা। কারণ, সীতাকে তখন ছাড়িয়ে দেবার কোন যুক্তি নেই। তাছাড়া, সুবালার সঙ্গে দুটি শিশু, এদের থাকবার কোন জায়গা

নেই, তাদের দায়িত্ব কে নেবে? সুতরাং ওদের কিছু টাকা দিয়ে বিদায় করা হ'ল। আমার স্ত্রী পুরোপুরি শহুরে মেয়ে, গ্রাম সম্পর্কে তাঁর কোন ধারণাই নেই। সেদিন দুপুরবেলা তিনি কাতরভাবে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুবালাকে ডির্ভোস না-ক'রেও তার স্বামী আবার বিয়ে করল কী ক'রে? এইরকমভাবে বাচ্চাসমেত বউকে কেউ ইচ্ছে করলেই মেরে তাড়িয়ে দিতে পারে? দেশে কি কোন আইন-কানুন নেই?

আমি হেসে বলেছিলুম, "আইনেব লম্বা হাত গ্রাম পর্যন্ত পৌছয়না। আইনের বিচার তো শুধু শিক্ষিত আর টাকা-পয়সাওয়ালা লোকদের জন্য। সুবালার মতন মেয়েদের পক্ষে কি কোর্টে গিয়ে মামলা করা সম্ভব?"

"কিন্তু পুলিশ কিছু করতে পারেনা?"

"সুবলাকে আগে প্রমাণ করতে হবে যে তার স্বামী সত্যিই দ্বিতীয় বিয়ে করেছে! এটা প্রমাণ করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের নয়। যে নির্যাতিত, তারই।"

"তা ব'লে পুরুষরাও মেয়েদের এখনও ঐভাবে মারবে? এই যুগেও?"

"আজকাল শুধু শিক্ষিত লোকরাই বৌদের ভয় পায়। শিক্ষার এই একটা কুফল। যারা লেখাপড়া শেখেনা, তারা এখনও মনের আনন্দে বৌকে মারে। যারা বৌকে পেটায় সেইসব পুরুষদের যদি শাস্তি দিতে হয় তাহ'লে সারা দেশের আধখানাই জেলখানা বানিয়ে ফেলতে হবে।"

এরপর আমাকেই সমস্ত পুরুষ জাতির প্রতিনিধি মনে ক'রে আমার স্ত্রী খুব বকাবকি শুরু করলেন।

সুবালার আগে যে কাজ করত আমাদের বাড়ি, তার নাম ছিল নলিনী। তার স্বামী ছিল এবং কলকাতায় একটা বস্তিতেই তারা থাকত। নলিনী কথা বলত খুব বেশি, সেই জন্য সরাসরি তাকে কোন প্রশ্ন না-ক'রেও তার জীবনের কিছু-কিছু ঘটনা আমি শুনতে পেতুম। নলিনীর স্বামী খুবই অসুস্থ, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনা। সেইজন্য নলিনী আর তার দুই মেয়ে বিভিন্ন বাড়িতে কাজ ক'রে সংসার চালায়। এই কাহিনীতে কোন নতুনত্ব নেই। অনেক ঝিয়ের স্বামীই অসুস্থ বা পঙ্গু ব'লে শোনা যায়। নলিনী নিজেই একবার অসুস্থ হয়ে পড়ায় তার স্বামী এসেছিল আমাদের কাছ থেকে নলিনীর বাকি মাইনে নিয়ে যেতে। লোকটিকে দেখে একটুও অসুস্থ বা পঙ্গু ব'লে মনে হয়নি আমার। বোঝাই যায় লোকটি অলস এবং অকর্মণ্য, সে তার স্ত্রী ও মেয়েদের কাজ করতে পাঠিয়ে নিজে বাড়িতে ব'সে থাকে।

নলিনীর আগে যে ছিল, তার নাম আমার মনে নেই। সে ছিল যথেষ্ট বুড়ি এবং খুব সম্ভবত তাকে বুড়িদি ব'লে ডাকা হ'ত। এই বুড়িদি ছিল বিধবা এবং রীতিমতন চোর। টাকাপয়সা চুরি করতনা অবশ্য! কিন্তু খাবারদাবার দেখলে সে

লোভ সামলাতে পারতনা। সংসারে শুধু এক নাতি আছে তার। সেই নাতির জন্যেই খাবারটাবার চুরি ক'রে নিয়ে যেত সে। তার নাতি স্কুলে পড়ে এবং সেই নাতির নানান্ গুণপনার কথা শুনতে হ'ত আমাদের।

দুধের বাটিতে গোপনে চুমুক দেবার অপরাধে সেই বুড়িদির চাকরি যায়। বুড়িদি খুবই তেজস্বিনী ছিল, নিজের অপরাধের জন্য একটুও অনুতপ্ত না-হয়ে সে প্রচুর চেঁচামেচি ও গালাগালি করতে লাগল। যাবার আগে সে সগর্বে ব'লে গেল যে আমাদের বাড়ির চেয়ে অনেক ভালো বাড়িতে, অনেক বেশি মাইনেতে কাজ তার বাঁধা আছে। এরকম কাজ সে আগেই পেতে পারত ইত্যাদি।

এটা প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। সেই বুড়িদি আমাদের বাড়িতে ইদানীং প্রায়ই আসে। এখন সে অনেক বেশি বুড়ি হয়ে গেছে। কাজ করার ক্ষমতাও চ'লে গেছে। তার সেই নাতিটি বড় হয়ে চাকরি পেয়েছে এবং বিয়ে করেছে এবং দিদিমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সে-বাড়িতে ঢুকতে গেলেই নাতি তাকে লাথি মারে।

বুড়িদি এখন প্রায় ভিখিরি। ঠিক রাস্তায় ব'সে ভিক্ষে করেনা বটে, তবে তার দীর্ঘজীবন ধ'রে যত বাড়িতে কাজ করেছে, সেইসব বাড়িতে মাসে একবার ক'রে যায়। দরজার কাছে ঘন্টার পর ঘন্টা ব'সে থাকে। কিছু চাল, ছেঁড়া কাপড় ও দু-একটা টাকা না-দিলে সে নড়েনা।

এইসব দুঃখী স্ত্রীলোকেরা আমাদের বাড়িতে এসে বাসন মাজে ঘর ঝাঁট দেয়, কাপড় কাচে। কিছু টাকার বিনিময়ে আমরা এদের কাজ থেকে স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম কিনি। এদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আমাদের কোন মাথাব্যথা নেই।

সীতা নামের মেয়েটি যখন কাজ ছেড়ে যাবার দিন আমায় প্রণাম করল, আমি তাকে মুখে কিছু বলতে না-পারলেও মনে-মনে বললুম, আহা, এ-মেয়েটির যেন ভালো বিয়ে হয়। একে যেন ফিরে আসতে না-হয়।

৪

ষাট-সত্তরটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম, এইরকম গ্রামের সংখ্যাই তো আমাদের দেশে বেশি। এইরকম গ্রাম এখন শহরের মধ্যেও গজিয়ে উঠছে। শহরের চৌহদ্দি মাপা হয় বিস্তৃতি দিয়ে আর এইসব শহুরে গ্রামের মাপ হয় উচ্চতায়। কোনটা দশতলা, কোনটা বারোতলা। এদের নাম মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং!

গ্রাম্য গ্রাম আর শহুরে গ্রামের মধ্যে অনেকরকম মিল আছে, প্রধান যা অমিল

সেটাই আগে বলি। ঝগড়া থাক বা ভাব থাক, গ্রামের মানুষ সবাই সবাইকে চেনে। শহুরে-গ্রামের মানুষরা একই ছাদের নিচে দিনের পর দিন বাস করলেও অনেকেই অনেকের নামও জানেনা। এইসব লম্বা শহরের ভূতল থেকে ওপরতলা পর্যন্ত একটা বৈদ্যুতিক টানা গাড়ি চলে, সেই গাড়িতে প্রতিবেশীদের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়। গ্রামের মানুষ অনেকসময় গরুর গাড়ি বা সাইকেল থামিয়ে অন্যদের সঙ্গে হেঁকে গল্পগুজব করে। আর শহুরে-গ্রামের টানা-গাড়িতে যাতায়াত করার সময় যাত্রীদের নিঃশব্দে, নিজের জুতোর দিকে তাকিয়ে থাকাই নিয়ম। দৈবাৎ কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে একটা ভুরু নাচাতে কিংবা ঠোঁট সামান্য ফাঁক ক'রে হাসির ভান করতে হয়।

জল যেমন জলকে চায়, মানুষও সেইরকম মানুষের সঙ্গে মিশতে চায়। কিন্তু শহরের কায়দাই হচ্ছে কেউ কারুকে চিনিনা এই ভাব ক'রে থাকা, মনে-মনে ইচ্ছে থাকলেও গায়ে প'ড়ে ভাব করার উপায় নেই। তারপর যখন শহরের মধ্যে এইরকম সব লম্বা-লম্বা গ্রাম তৈরি হ'ল অমনি গ্রাম্য স্বভাবটাও ফিরিয়ে আনার একটা সুযোগ পাওয়া গেল। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে মেলে কোন উৎসব উপলক্ষে। অতএব শহরের এইসব গ্রামেও লাগাও পুজো! কলকাতার মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিংগুলির একতলার আঙিনায় এখন দুর্গাপুজোর চল শুরু হয়েছে খুব।

এই পুজোতে ধর্মের জন্য ব্যাকুলতা নেই, কেননা এখানকার বাসিন্দারা আধা-সাহেব। এইসব বাড়িতে শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতীরা থাকেননা, থাকেন মিস্টার ও মিসেসরা। যদিও চাঁদা ক'রে পুজো, চাঁদার জোরজুলুম নেই, সব ফ্ল্যাটের একই নির্দিষ্ট চাঁদা। ধরা যাক, ফ্ল্যাট-প্রতি পঞ্চাশ টাকা। মনে করুন, এইরকম একখানা বাড়িতে রয়েছে সত্তরটি পবিবার, তাহ'লে মোট চাঁদা উঠল সাড়ে-তিন হাজার। তাতে কি চারদিন ধ'রে দুর্গাপুজো হয়? প্রতিমা চাই, আলোকসজ্জা চাই, পাত পেয়ে খাওয়া-দাওয়া চাই, এসব খরচ কে জোগাবে? তার জন্য তো রয়েছে স্যুভেনির! অন্যান্য বারোয়ারি পুজোর মতন ফ্ল্যাটবাড়ির পুজো উপলক্ষেও ছাপা হয় স্যুভেনির, তাতে দু-একটা এলেবেলে লেখার সঙ্গে থাকে বেশ কয়েক পাতা বিজ্ঞাপন। ফ্ল্যাটবাড়ির সাহেবদের মধ্যেই পাওয়া যায় কোন কোম্পানির জোনাল ম্যানেজার বা পি. আর. ও. বা সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, তাঁরা নিজেদের প্রতিপত্তি খাটিয়ে জোগাড় ক'রে দেন এইসব বিজ্ঞাপন। এছাড়াও যদি দেখা যায় ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোতে প্রসাদের সঙ্গে-সঙ্গে একটা ক'রে ভালো কোম্পানির আইসক্রিমও দেওয়া হচ্ছে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাহ'লে বুঝতে হবে, ঐ-বাড়িতে ঐ আইসক্রিম কোম্পানির সেলস ম্যানেজার থাকেন, তিনি তাঁর কোম্পানির কমপ্লিমেন্টসহ একশো-দুশো আইসক্রিমের বাক্স দাতব্য করেছেন।

মানুষের আচরণবিধি নিয়ে কয়েকখানা সহজপাঠ্য বই লিখেছেন যে ডেসমণ্ড মরিস তিনি ঠিকই অনুধাবন করেছেন যে, যে-মনোবৃত্তি নিয়ে একজন মানুষ একটা দেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য প্রতিযোগিতায় নামে, ঠিক সেই একই মনোবৃত্তি নিয়ে একজন মানুষ পাড়ার সাঁতার ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হ'তে চায়। অর্থাৎ ট্রাইবাল চিফ হবার বাসনা। ফ্ল্যাটবাড়ির পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি যাঁরা হন, তাঁরা প্রথমে খুব না-না-না-না বলেন, হাস্যময় বিবক্তি দেখিয়ে বলেন, আরে, আমার ওপর আবার এসব দায়িত্ব চাপানো কেন? আমার কত কাজ। কিন্তু মনে-মনে তাঁদের ঐ-পদাভিলাষ থাকে ঠিকই, কারণ প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি হবার পর তাঁদের গলার আওয়াজ বদলে যায়! অর্থাৎ গতকাল পর্যন্ত যিনি ছিলেন মিঃ ব্যানার্জি বা মিঃ দাশগুপ্ত, আজ থেকে তিনি হয়ে গেলেন এই গ্রামটির মোড়ল।

অবিশ্বাস্য ব্যাপার, এইসব সাহেবদের বাড়িতে এখনও ধুতি থাকে? ট্রাউজার্স ও হাওয়াই শার্ট এখন আমাদের জাতীয় পোশাক। আধা-সাহেবরা গরমকালেও অফিসে যান কোট-টাই প'রে। বাড়িতে হালকাভাবে থাকবার সময় পাজামা-পাঞ্জাবি। আজকাল পুজোমণ্ডপে পা-জামা ও প্যান্টের অবাধগতি, কেউ আপত্তি করেনা। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোয় কোন-কোন পাক্কা সাহেবকে দেখা যায় ধুতি প'রে ব'সে থাকতে। রীতিমতন কুঁচোনো ধুতি, ধাক্কা দেওয়া পাড়। মেমসাহেবরাও কেউ-কেউ গরদের শাড়ি বার ক'রে ফেলেন! মুখমণ্ডলে লিপস্টিকসহ প্রসাধন, অঙ্কিত ভুরু, শিঙ্গল ক'রে কাটা চুল এবং লালপেড়ে গবদের শাড়ি পরা এই নতুন ভক্তিমতীদের ভারি চমৎকার দেখায়!

আরও নতুন-নতুন বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটে। যে লেডি-ডাক্তারটিকে সারা বছর মনে হয় খুব গম্ভীর কিংবা অহংকারী, এই পুজোর সময় আবিষ্কৃত হ'ল, তিনি খুব সুন্দর আলপনা দিতে পারেন। কিংবা যে মহিলা জীবনে কোনদিন রান্নাঘরে ঢোকেননা, তিনি যে এমন নিখুঁতভাবে শসা কাটতে জানেন, তাই বা কে জানত। প্রদীপ জ্বালবার সলতে পাকিয়েছেন কে? যিনি মন দিযে চন্দন ঘষছেন, তিনিই কুকুর নিয়ে ঝগড়া করেছেন ক'দিন আগে?

পাড়ার বারোয়ারি পুজোয় পাতা পেড়ে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকেনা। কিন্তু ফ্ল্যাটবাড়ির পুজোয় চারদিন সব পরিবারে রান্না বন্ধ। ক্যাটেরার নয়, ভিয়েন বসিয়ে একতলাতেই হচ্ছে রান্নাবান্না তারপর সবাই মিলে পংক্তিভোজন। পুজোটা সারা হয়ে যায় খুব দ্রুত, কোনরকমে একজন রোগা পুরুতকে ধ'রে আনা হয় রাস্তা থেকে, সেই পুরুতরাও জানে, এইসব বাড়ির পুজো যত সংক্ষেপে সারা হবে, ততই উদ্যোক্তারা খুশি হবেন। এক বর্ণও সংস্কৃত মন্ত্র না-ব'লে শুধু অং-বং-চং ব'লে গেলেও এইসব ইঙ্গ-বাবুরা কোন ভুল ধরতে পারবেনা। পুজো উপলক্ষে

মেলামেশা আর খাওয়া-দাওয়াটাই আসল।

পাশাপাশি যাঁরা খেতে বসেন তাঁরা মনের দিক থেকেও একটু কাছাকাছি চ'লে আসেন। পুজোয় প্রথম দিনে মিঃ চ্যাটার্জি মিঃ দাশগুপ্তকে ডেকে কথা বলেন, মিসেস ভাদুড়ী যেচে আলাপ করেন মিসেস বোসের সঙ্গে। তারপর এইসব মিস্টার আর মিসেসের খোলস থেকে বেরিয়ে আসে এক-একটি নাম, অমলবাবু বা বিমলবাবু, শ্রাবণী বা কাবেরী। ক্রমে বাবুটাও খ'সে যায়, আপনি থেকে কেউ-কেউ নেমে আসে তুমিতে। গর্জন তেল মাখা মা দুর্গার হাসি-হাসি মুখখানি এইসব দেখে আর ভাবে, সব তো ঠিকঠাক আগের মতনই আছে।

৫

প্রেমের সঙ্গে ধূপকাঠির কী সম্পর্ক ? কলকাতার কোন প্রেমিক যদি তার প্রেমিকার সঙ্গে গঙ্গার ঘাট বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের মাঠে কিংবা বালিগঞ্জ লেকে নিভৃতে কিছুটা সময় কাটাতে চায়, তবে তাকে দু-এক প্যাকেট ধূপকাঠি কিনতে হবেই। প্রেমিকার বাহু ছুঁয়ে আবেগ জড়িত কোন কথার ঠিক মাঝখানে হঠাৎ একটি ছেলে এসে হাজির হবে। সে প্রথমে পাঁচ প্যাকেট ধূপকাঠি বিক্রি করবার চেষ্টা করবে। যদি তাকে বলা হয় যে ধূপকাঠির কোন দরকার নেই তাতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবেনা। তখন সেই ছেলেটি একটানা কথা ব'লে যাবে, সে একজন বেকার যুবক, তার বাড়িতে ছোটো-ছোটো ভাই-বোন আছে, বাবা অসুস্থ ইত্যাদি ! সন্ধেবেলা গঙ্গার ঘাটে কিংবা নিরিবিলি পার্কে বান্ধবীর পাশে ব'সে এইধরনের কথাবার্তা শুনতে কার ভালো লাগে ? সুতরাং এক প্যাকেট অন্তত ধূপকাঠি কিনে তাকে বিদায় দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

এর পরে আসবে অপেক্ষাকৃত একটি কম বয়সী ছেলে। সে বিক্রি করে টফি-লজেন্স-চিউইংগাম। সবসময় সবকিছু খাওয়ার মেজাজ থাকেনা মানুষের। ধরা যাক, প্রেমিকার সঙ্গে প্রেমিকের কোন এক তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি চলছে, এইসময় কি প্রেমিক তার প্রেমিকাকে বলতে পারে, এই নাও, একটা টফি খাও। চিউইংগাম চিবোবার সময় মানুষের মুখের ভঙ্গিটাই এমন হয়ে যায় যে তখন কোন সীরিয়াস কথা বলা যায়না। কিন্তু টফি-চিউইংগাম বিক্রেতা বালকটিকে প্রত্যাখ্যান করবার উপায় নেই। কারণ তারও একটা করুণ গল্প আছে। যতক্ষণ-না তার কাছ থেকে কিছু কেনা হবে, ততক্ষণ সে স্থান ত্যাগ করতে চাইবেনা।

সেই ছেলেটিকে বিদায় করবার পরেই আসবে বাদামওয়ালা। চিনেবাদাম খেতে কারুরই আপত্তি থাকার কথা নয়। কেনা হ'ল এক ঠোঙা বাদাম। কিন্তু সেই বাদাম ফুরোতে-না-ফুরোতেই এসে হাজির হবে আর-একজন বাদামওয়ালা। তাকে যদি বলা হয়, এই তো একটু আগেই বাদাম কিনেছি। তাতেও কিন্তু সে চ'লে যাবেনা। সে বলবে, ওর কাছ থেকে কিনেছেন, আমার কাছ থেকে কিনবেননা কেন? আমি খুব গরিব, চিনেবাদাম বিক্রি ক'রে কোনরকমে সংসার চালাচ্ছি...। এর গল্প অনেক বেশি লম্বা, সুতরাং এর কাছ থেকেও কিনতে হবে আর-এক ঠোঙা বাদাম।

এরপর একজন ঝাল-মুড়িওয়ালাও আসতে পারে। কয়েকজন ভিখিরি তো আসবেই। ভিখিরিরা জানে, প্রেমিক-প্রেমিকার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের কথা বলায় বাধা সৃষ্টি করলে ভিক্ষে পাওয়া যাবেই। অনেক প্রেমিক, অন্য সময় ভিক্ষে না-দিলেও, প্রেমিকার সামনে উদার সাজবার জন্য এক টাকা দু-টাকা ভিক্ষে দেয়।

কিছুই চায়না, এমন কিছু লোকও বিরক্ত করতে আসে। এরা হ'ল বেকার ছেলেদের দল, যাদের কোন মেয়ে-বন্ধু নেই। মেয়েরাও আজকাল অনেকেই বেকার হয় কিন্তু দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়না। বালিগঞ্জ লেকে, কলকাতার ময়দানে কিংবা গঙ্গার ধারে বেকার ছেলেরা ঘুরে বেড়ায়, কোথাও কোন প্রেমিক-প্রেমিকাকে ঘনিষ্ঠ ব'সে থাকতে দেখলেই তারা সেখানে গিয়ে দাঁড়ায়। তারা জোরে জোরে কথা বলতে শুরু করে। ক্রমেই ঈর্ষা ও লোভে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। মেয়েদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে তারা কুৎসিত আলোচনা শুরু করে। এমনকি তারা অনেকসময় কাছের মেয়েটিকে উদ্দেশ ক'রেই কদর্য ইঙ্গিত করতে আরম্ভ করে।

এইসব ক্ষেত্রে প্রেমিকটি রাগে ফুঁসতে থাকলেও বিনা প্রতিবাদে তার সঙ্গিনীকে নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। প্রতিবাদ করতে গেলেই ওরা সত্যিকারের বিপদে প'ড়ে যাবে। বেকার যুবক বা তথাকথিত মাস্তানরা তো ঐরকম কিছুই চায়। এদের শিভালরি জ্ঞান তো নেই-ই, এরা একসঙ্গে চার-পাঁচজন মিলে একজনকে আক্রমণ করতেও দ্বিধা করেনা। একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার সম্মান রক্ষা করার জন্য চার-পাঁচজন মাস্তানকে শায়েস্তা ক'রে দিচ্ছে, এরকম শুধু সিনেমাতেই দেখা যায়। বাস্তবে আমরা এরকম অসম সাহসী ও বলশালী প্রেমিকদের দেখতে পাইনা। কিংবা সেরকম বলশালী যুবকেরা পার্কে কিংবা গঙ্গার ঘাটে কোন মেয়ের সঙ্গে প্রেম করার মতন হালকা ব্যাপারে সময় নষ্ট করেনা।

অচেনা মেয়ের প্রতি খারাপ উক্তি ক'রে কিংবা দুজন প্রেমিক-প্রেমিকাকে বিরক্ত ক'রে এইসব মাস্তানরা কী আনন্দ পায়? এককালে যারা পাড়ার গুণ্ডা

বা মাস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল, পরে বিয়ে-টিয়ে ক'রে কোনরকম চাকরি পেয়ে ঘর-সংসারী হয়েছে, এরকম দু-একজনকে আমি চিনি। নিজের বাড়িতে এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল। এরা নিজেদের স্ত্রীদের কখনও একলা বাড়ি থেকে বেরুতে দেয়না। স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সিনেমা-থিয়েটারেও যায়না। পাড়ার কেউ এদের কারুর স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা বললেই এরা চ'টে যায়। মেয়েদের এরা নিছক গৃহপালিত প্রাণী ব'লে মনে করে। এখনও। এ-দেশের অধিকাংশ পুরুষেরই এইরকম মনোভাব।

কিছু-কিছু লোক আছে এই শহরে যাদের জীবিকাই হ'ল প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভয় দেখানো।

একটি যুবক ও যুবতী যদি মনের দিক থেকে কাছাকাছি আসে, তবে তারা শারীরিকভাবেও কাছাকাছি আসতে চাইবে, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কলকাতার অতি জনবহুল শহরে সেরকমভাবে মেলামেশার কোন জায়গাই নেই। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন লিভিং টুগেদার বহুল প্রচলিত। আর আমাদের এখানে কোন ছেলে তার ইচ্ছুক বান্ধবীকে একটা চুমু খাওয়ারও সুযোগ-সুবিধে পায়না। শুধু-যে নিরিবিলি জায়গার অভাব তাই-ই নয়, তার ওপর সবসময় প্রেমিক-প্রেমিকাদের ওপর বাজ পাখির মতন নজর রাখছে এই সমাজের রক্ষণশীল মানসিকতা।

নিরুপায় হয়েই কোন-কোন যুবক-যুবতী ময়দানের অন্ধকারে গিয়ে বসে। প্রেমে পড়ার পর এমন একটা সময় আসে, যখন পরস্পরের সান্নিধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তির দৃষ্টিও সহ্য হয়না। এই শহরের বেশিরভাগ ছেলেমেয়েই হোটেল-রেস্তোরার ব্যয় বহন করতে পারেনা। বাড়িতেও দেখা করার কোন সুযোগ নেই, সুতরাং ময়দানের অন্ধকার ছাড়া আর উপায় কী?

যখন তারা পরস্পরের প্রতি একেবারে বিভোর হয়ে থাকে ঠিক সেইসময় যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসবে একটা লোক। তার লম্বা-চওড়া চেহারা। নাকের নিচে পাকানো গোঁফ। এসেই সে প্রেমিকটির হাত শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে হুকুমের সুরে বলবে, থানায় চলো!

ছেলেটি ও মেয়েটি সহসা এই উৎপাত দেখে ঘাবড়ে যেতে পারেই। তারা জানতে চাইবে, কী তাদের অপরাধ? সেই লোকটি বলবে যে ছেলেটি ও মেয়েটি ঘাসের ওপর শুয়ে যে-কাজটি করছিল, সে-কাজটি বে-আইনী। সেইজন্য তাদের যেতে হবে থানায়। এই কথাটি শুনে মেয়েটি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করবে এবং ছেলেটি রেগে উঠে বলবে, মোটেই তারা সেরকম কিছু বে-আইনী কাজ করেনি। তারা শুয়ে থাকেনি। তারা পাশাপাশি ব'সে গল্প করছিল শুধু। লোকটি

তখন বলবে, ঠিক আছে, কী করছিলেন, তা থানার বড়বাবুর কাছে গিয়েই বলবেন। এখন চলুন ! বেশি গোলমাল করলে আমি হুইস্‌ল বাজাব, আরও পুলিশ আসবে।

এরপর লোকটি হুইসল মুখে দিয়ে ছেলেটির হাত ধ'রে টানাটানি শুরু করবে। মেয়েটির চোখে জল আসবে। তাদের চোখে ভেসে উঠবে থানা, জেল, রাতে বাড়ি না-ফেরা, খবরের কাগজে তাদের ঘটনা নিয়ে রসালো মন্তব্য ইত্যাদি। ছেলেটি তখন তেজ ভুলে গিয়ে অনুনয়বিনয় ক'রে বলবে, ভুল হয়ে গেছে, এবারকার মতন ছেড়ে দিন !

ছাড়া ওরা পাবে, তার আগে ছেলেটির পকেটের সব টাকা-পয়সা তুলে দিতে হবে ঐ-লোকটির হাতে।

আমার নিজেরই একবার এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সত্যি কথা বলতে কী, আমি ময়দানে ব'সে আমার বান্ধবীর পিঠে হাত রেখে তাঁকে একটি চুম্বন করার জন্য কাকুতি-মিনতি করছিলুম, তিনি রাজি হচ্ছিলেননা, সেই মুহূর্তে সেই যমদূতের আবির্ভাব। আমার বান্ধবীর সম্মান রক্ষা করার জন্যই আমার পকেটের সবকিছু তাকে দিয়ে নিষ্কৃতি পেতে হয়েছিল।

এর কয়েক বছর পরে কয়েকজন পুলিস অফিসারের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তাঁদের এই ঘটনাটা বলায় তাঁরা খুব হেসেছিলেন। তাঁরাও শুনেছেন যে ঐরকম কয়েকটি লোক পুলিস সেজে ময়দানে প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভয় দেখায়। ওদের জব্দ করার খুব সহজ রাস্তা আছে। ওরা এসে ধরলেই বলতে হয়, হ্যাঁ, চলো থানায়। এক্ষুণি চলো ! তখন ওরাই ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় !

এই কথা শোনার পর আমি আবার ময়দানে আমার বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসেছি সেই লোকটিকে ধরার জন্য। কিন্তু সে আমার কাছে আর কোনদিন আসেনি। ওরা ঠিক মানুষ চিনতে পারে।

৬

আমি মাঝে-মাঝে একটা বাড়িতে যাই, যে-বাড়িতে দাস-দাসীর সংখ্যা একশোর বেশি। গাড়ি আছে ষাট-সত্তরটা। ড্রাইভার হবে অন্তত পঞ্চাশজন। দারোয়ান পাঁচ-ছজন। সেই বাড়ির গেটে সারা রাত আলো জ্বলে।

না, এটা কোন বিরাট বড়লোকের বাড়ি নয়। শোনা যায়, ওয়ারেন হেস্টিংস কিংবা ফিলিপ ফ্র্যান্সিসের একশোর বেশি দাস-দাসীর প্রয়োজন হ'ত। সেরকম

বিলাসী বড়লোকদের আজকাল আর অস্তিত্ব নেই। আমি যে-বাড়িটাতে যাই সেটা একটা দশ তলা ফ্ল্যাট বাড়ি।

সেই বাড়িটিতে সত্তরটি অ্যাপার্টমেন্ট আছে। অর্থাৎ সত্তরটি পরিবার। আমাদের দেশের অনেক গ্রামেই এর চেয়ে জনসংখ্যা কম। অর্থাৎ এই বাড়িটিকেও একটি কংক্রিটের তৈরি গ্রাম বলা যায়। কিন্তু গ্রামের পরিবারগুলি থাকে অনেকখানি আকাশের নিচে। কলকাতার এইসব বাড়ির মানুষের সঙ্গে আকাশের কোন সম্পর্ক নেই।

কলকাতায় এরকম বড় বাড়ি আগে মাত্র কয়েকটি ছিল। গত দশ বছরে এরকম বাড়ি গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য। শুরু হয়েছে নতুন একধরনের জীবনযাত্রা।

লিফ্‌ট দিয়ে ওঠার সময় লক্ষ করি, ভেতরে যে পাঁচ-ছজন নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, তারা কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলেনা, প্রত্যেকে নিঃশব্দে নিজের-নিজের নাক দেখছে। মনে হয়না এটা কোন বসত বাড়ি, মনে হয় যেন অফিস।

একই ছাদের নিচে বাস করেও অনেকেই অনেকের নাম জানেনা। আটতলার একজন লোককে খুঁজতে গিয়ে আমি একবার ভুল ক'রে সাততলার একটি অ্যাপার্টমেন্টের দরজায় বেল দিয়েছিলুম। দরজা খুলে একজন ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে ইংরেজিতে আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কী চাই? আমি আমার বন্ধুর নাম ব'লে জিজ্ঞেস করলুম, উনি কোন ফ্লোরে থাকেন বলতে পারেন? ভদ্রলোক দরজা বন্ধ ক'রে দিতে-দিতে সংক্ষেপে জানালেন, লিফটম্যানকে জিজ্ঞেস করুন!

আমার বন্ধুটি একটি বেশ বড় কম্পানিতে চাকরি করে। সেই কম্পানি থেকে তাকে এই অ্যাপার্টমেন্ট দিয়েছে। আটতলার ওপর আলো হাওয়ায় চমৎকার। এত উঁচু থেকে কলকাতা শহরটাকেও বেশ ভালোই দেখায়। বিশেষত সন্ধের পর। মনে হয় নিউ ইয়র্ক, লণ্ডনের সঙ্গে কোন তফাৎ নেই। চারদিকে এরকম উঁচু-উঁচু বাড়ি, দূরের বাড়িগুলিকে মনে হয় ঝলমলে জাহাজের মতন। অন্তত একশোটা জানলায় আলো জ্বলছে। অবশ্য হঠাৎ লোডশেডিং হ'লে পুরো অঞ্চলটাই আবার গ্রাম হয়ে যায়।

কোন-এক ছুটির দিনের সকালে ঐ-অ্যাপার্টমেন্টে ব'সে চা খাচ্ছিলুম। বন্ধুপত্নী এই নতুন বাড়ি পেয়ে খুব খুশি। অনেকরকম প্রশংসা করছিলেন। দক্ষিণ খোলা বাড়িতে থাকলে নাকি স্বাস্থ্য ভালো হয়। হঠাৎ দরজার বেল বেজে উঠলে বন্ধুটিই দরজা খুলে দিল। চাঁদার খাতা হাতে তিন-চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে। বন্ধুটি হাসতে-হাসতে ফিরে এসে স্ত্রীকে বললেন, ছেলেরা এসে গেছে, ওদের চাঁদাটা দিয়ে দাও।

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, এত উঁচুতেও চাঁদা আদায়কারীরা ওঠে?

আমার ধারণা ছিল, মশা, মাছি, ভিখিরি আর চাঁদা আদায়কারীরা এত উঁচুতে উঠতে পারেনা!

বন্ধুটি বলল, তোমার ধারণা ভুল। মশারাও আধুনিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। অ্যাসট্রোনটদের কায়দায় তারাও লিফট দিয়ে উঠে আসে ওপরে। সাধারণ ভিখিরিরা আসতে পারেনা বটে, তবে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুর ছদ্মবেশে কিংবা ইংরেজিতে লেখা আবেদনপত্র নিয়ে মাদ্রাজি বোবা আসে। আর এই যে চাঁদা আদায় করতে এসেছে, এরাও সাধারণ, রাস্তার ছেলে নয়। এরা সব এ-বাড়িরই ছেলে, এ-বাড়িতেই পুজো হবে সেইজন্য সব ফ্ল্যাট থেকে চাঁদা তুলছে।

বন্ধু পত্নী জিজ্ঞেস করল, কত দেব?

বন্ধুটি বললো, দাও, তিরিশ টাকা দিয়ে দাও!

আমি আবার অবাক। আমার বন্ধুটি কট্টর মার্কসবাদী এবং নাস্তিক। কোন পুজো-টুজোর ব্যাপারে কোনদিন ওর উৎসাহ দেখিনি। সে দিচ্ছে তিরিশ টাকা চাঁদা?

পরের সপ্তাহে গিয়ে দেখলুম, আমার বন্ধুটির অ্যাপার্টমেন্টে একটা নতুন টি. ভি. সেট বসানো হচ্ছে। এর আগে আমার বন্ধুটির মুখে টি. ভি.র প্রচুর নিন্দে শুনেছি। সাহেবি কায়দায় সে টি. ভি.-কে বলত ইডিয়ট বক্স।

বোধহয় আমার মনের কথা বুঝতে পেরেই বন্ধুটি বললেন, এসব বাড়িতে থাকলে সবার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। এখানে যদি আমি আমার নিজস্ব মতামত ফলাতে যাই, তাহ'লে শান্তিতে থাকা কঠিন।

বন্ধুটি আমায় দেখে কাঁধ শ্রাগ ক'রে বলল, আমার একদম ইচ্ছে ছিলনা, কিন্তু আমার ছেলের জন্য। ও নিচের একটা ফ্ল্যাটে খেলাধুলোর প্রোগ্রামগুলো দেখতে যেত, ওদের কুকুরটা আমার ছেলেকে কামড়ে দিয়েছে। আর ওকে সেখানে পাঠানো যায়না—।

আমি বললুম, তাছাড়া আজকাল টি. ভি. না-থাকলে বাড়িতে কাজের লোক কিংবা রান্নার লোক টেঁকেনা। না-রাখলে চলে কী ক'রে—।

ঐ-বাড়িতে যাতায়াত ক'রে আমি এই নতুন জীবনযাত্রার ছবিটি ক্রমশ বেশ ভালো ক'রে বুঝতে পারলুম। এইসব বাড়িতে নানান জাতি ও নানান ভাষার লোকজন থাকে। কলকাতা শহরে বাঙালিরা এর আগে এমনভাবে অন্য প্রদেশের লোকদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকেনি। কলকাতায় বিভিন্ন পাড়ায় বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের আলাদা-আলাদা বসতি আছে বটে, কিন্তু সেখানে বাঙালিদের সঙ্গে তাদের বিশেষ মেলামেশা নেই।

এইসব বড় অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে বয়স্করা নিজেদের মধ্যে বেশি মেলামেশা

না-করলেও বাড়ির শিশুরা ঠিকই মেশে। বাচ্চারা পরস্পরের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের জন্য অন্য কারুর মুখাপেক্ষী নয়, তারা নিজেরাই ভাব ক'রে নেয়। বাড়ির সামনের জায়গাটায় কিংবা সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ আমি রোজই নানা বয়েসের বাচ্চা ছেলেমেয়েদের খেলা করতে দেখি। একটু বড়ো ছেলেমেয়েরা ইংরেজিতে কথা বলে, আর একেবারে বাচ্চারা যে নিজেদের মধ্যে কীভাবে ভাব বিনিময় করে তা তারাই জানে।

সিঁড়ি দিয়ে একটি যুবক ও যুবতীকে হাসতে-হাসতে নামতে দেখে আমার মনে হয়, এইরকম বাড়িতে তরুণ ও তরুণীদের মধ্যে প্রেম ও বিয়েও হ'তে পারে নিশ্চই। একই বাড়ির পাত্রপাত্রীর বিয়ে। তারপর যদি বিচ্ছেদ হয় কিংবা বিয়ের আগেই ভালোবাসা ভেঙে যায়, তাহ'লে তখনও ওদের একই বাড়িতে থাকা অসহ্য মনে হবেনা?

একদিন আমি আমার বন্ধুকে বললুম, তোমাদের বাড়ির জীবনযাত্রা দেখলে মনে হয় আধুনিক ইংরেজি নভেলের চরিত্র তোমরা। ভারতীয় মনে হয়না। ইংরেজ-আমেরিকার শহুরে মধ্যবিত্তদের সঙ্গে তোমাদের তফাৎ কী?

বন্ধুটি হেসে বলল, তফাৎ আছে হে! প্রত্যেকটি ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি মারো। সেখানে গিয়ে দেখবে সবাই ভারতীয় শুধু নয়, বিভিন্ন রাজ্যের আলাদা-আলাদা মানুষ র'য়ে গেছে এখনও।

৭

কিছুদিন আগে আমি একটি ধর্মসভায় যোগ দিয়েছিলুম, যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলুম বলা যায়, যদিও সবলে নয়। খুলে বলি।

এক মধ্যাহ্নে আমার কর্মস্থানে এক মুণ্ডিত মস্তক শ্বেতাঙ্গ, ইংরিজিভাষী সাধুর আবির্ভাব হয়। সঙ্গে একটি সপ্রতিভ চেহারার বাঙালি যুবক। যুবকটি হাসি মুখে আমাকে দাদা ব'লে সম্বোধন ক'রে এবং পরিচিতের ভঙ্গিতে, কী খবর, কেমন আছেন, অনেক দিন দেখা হয়নি ইত্যাদি দিয়ে কথা শুরু ক'রে এইসব ক্ষেত্রে আমিও কী খবর ভালো তো, হ্যাঁ, অনেকদিন পর দেখা এইসব আলগাভাবে বলতে-বলতে যুবকটির সঙ্গে কবে, কোথায় পরিচয় হয়েছিল এবং তার নাম কী মনে করবার চেষ্টা করি। কিছুই মনে পড়েনা। তার মুখমণ্ডলের সামান্য ছাপও আমার স্মৃতিতে খুঁজে পাইনা। তাতে অবশ্য কিছু আসে-যায়না। কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া যায়।

সাধুটিও তরুণ বয়স্ক, ইনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণচৈতন্য সংস্থার একজন ছোটোখাটো কর্মকর্তা। মায়াপুরে এদের হেড অফিস, কলকাতা সমেত পৃথিবীর কয়েকশো বড়ো-বড়ো শহরে এদের শাখা কার্যালয় ও ভজনালয় আছে। এই কৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি খুব বেশি কিছু জানিনা, আবার একেবারে অজ্ঞও নই, আমি মায়াপুর দর্শন করেছি, ভারতের বাইরে দু-একটি শহরে এদের কার্যকলাপ দূর থেকে লক্ষ করেছি। এঁদের সম্পর্কে আমার কিছুটা কৌতূহল, কিছুটা কৌতুক এবং খানিকটা শ্রদ্ধার ভাবও আছে। যদিও এঁদের সম্পর্কে কাঁধ ঘেঁষাঘেঁষির আকাঙ্ক্ষা আমার কখনও জাগেনি। যাই হোক, এঁরা আমার কাছে এসেছেন কেন?

সাধুটি বেশ বিনীত এবং নম্রভাষী। তিনি জানালেন যে কলকাতায় তাঁরা তিনদিন ব্যাপী এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছেন, তাতে আমাকে অংশ গ্রহণ করতে হবে। শুনে তো আমি আকাশ থেকে পড়লুম। ব্যাংক কর্মচারিদেব বার্ষিক জলসা। পাড়ার ক্লাবের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, মফস্বলের সংস্কৃতি উৎসব ইত্যাদিতে নৈবেদ্যর ওপর বাতাসা হবার জন্য মাঝে-মাঝে আমার কাছে উপরোধ আসে, আগে অনেকবার ঢোঁক গিলতে হয়েছে, ইদানিং পারতপক্ষে এড়িয়ে যাই কিংবা পলায়ন করি। কিন্তু ধর্মীয় সংস্থা থেকে আমার কাছে কোনদিন ডাক আসেনি। তাহ'লে কি আমার চরিত্রের এতই অধঃপতন হয়েছে যে পুণ্যাত্মারা আমাকে শেষে উদ্ধার করবার জন্য এগিয়ে আসছেন?

আমি হাত জোড় ক'রে আমার অক্ষমতা জানালুম। কিন্তু সাধুটি নম্র হ'লেও জেদি এবং নাছোড়বান্দা। তার উচ্চারণে আমেবিকার টান, অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেও তিনি জাতীয় চবিত্র হারাননি। কোন ব্যাপারেই এঁবা বিমুখ হতে জানেননা। সাধুটি আমাকে বোঝাতে চাইলেন যে আলোচনাসভাটি নিছক ধর্মীয় নয়। ভারতের দারিদ্র্য দূর করার উপায় খুঁজে বার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য, সমাজসেবায় একটি সার্থক পথ নির্ণয় এবং মানুষের আত্মিক মুক্তি ও ইহজাগতিক সুখের সমন্বয়কার্য সেদিনের বিষয়বস্তু, "মানুষের সেবাই কি ঈশ্বর সেবা?"

আমি বললুম, অনাথদের উদ্দেশ্য বেশ শুভ মনে হচ্ছে, কিন্তু আমায় ডাকছেন কেন? আমি সমাজসেবক নই, ধর্মবিশ্বাসী নই, ভালো বক্তাও নই, সুতরাং সব দিক থেকেই আমি অনুপযুক্ত। সাধুটি বললেন, তাঁরা সমাজের সব দিকেরই প্রতিনিধিদের মতামত চাইবে, মন্ত্রী, আমলা, উপাচার্য, চিকিৎসক, বিচারক, ব্যবসায়ী, সবাই থাকছেন, সাহিত্যজগৎ থেকেও একজন প্রতিনিধি চাই।

আমার চরিত্রের একটা প্রধান দোষ, আমি যথাসময়ে দৃঢ়ভাবে 'না' বলতে পারিনা। একটা অনাবশ্যক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি জেনেও আমার

প্রত্যাখ্যান যথেষ্ট জোরালো হ'লনা, আমাকে নিমরাজি অবস্থায় ফেলে রেখে ওঁরা বিদায় নিলেন, যাবার আগে বাঙালি যুবকটি আমাকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাতে ভুললেননা।

অন্তর্বর্তী দিনগুলিতে আমি বেশ ফাঁপরের মধ্যে রইলুম। আমাকেই ওরা বেছে নিলেন কেন ? সাহিত্যজগতে আমার চেয়ে যোগ্যতর প্রতিনিধি ভুরি-ভুরি। অনেক খ্যাতিমান লেখক ধর্মপ্রাণ, কেউ-কেউ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম প্র্যাকটিস করেন তা-ও আমি জানি। যে বাঙালি যুবকটি মধ্যবর্তী হয়ে এসেছিল তার পরিচয় আমার কিছুতেই মনে পড়ছেনা।

এযাবৎ আমি রামকৃষ্ণ মিশন সমেত সমস্ত ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে সসম্ভ্রমে দূরে থেকেছি। সাধারণভাবে সাধুদের সম্পর্কে আমার একটা সমীহের ভাব আছে, তাঁরা ঘরছাড়া বিবাগী ব'লে। প্রাতিষ্ঠানিক সাধুদের সম্পর্কে আমার কোন আগ্রহ নেই। বিদ্যাসাগর বেদান্তকে বলেছেন ভ্রান্ত দর্শন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বেদকে কোন ধর্মগ্রন্থ ব'লে স্বীকার করেননি, বলেছেন একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যসংকলন মাত্র, পলগ্রেভের 'গোল্ডেন ট্রেজারি'র মতন। আমিও এই ধারায় বিশ্বাসী। মহাভারত আমি একটি উৎকৃষ্ট উপন্যাস হিসেবে বারংবার পড়ি, শ্রীম লিখিত 'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' যেমন চমৎকার সুখপাঠ্য একটি বই, দু-একটি ভুল তথ্য ও পৌনঃপুনিকতা থাকা সত্ত্বেও। বাইবেলের দুটি খণ্ড, কোরান ও হাদিস কয়েকবার প'ড়ে আমি বেশ কিছু আকর্ষণীয়, কাব্যময় পরিচ্ছেদ পেয়েছি, কিন্তু কোন গভীর উপলব্ধি হয়নি। সবক'টি ধর্মীয় দর্শন আমার কাছে গ্রামীণ ও সংকীর্ণ মনে হয়, আধুনিক মানুষের জীবনযাপনে এইসব ধর্মের প্রাদেশিকতা টেনে আনা একেবারেই অবান্তর।

নির্দিষ্ট দিনে আমি অকুস্থলে উপস্থিত হলুম। সাধুরা গাড়ি পাঠাতে চেয়েছিলেন, আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, কারণ অপরের বাহনের ওপর নির্ভর করলে স্বাধীনভাবে প্রস্থান করা যায়না। একটি ভাড়া-করা মঞ্চ তখনও সাজানোর পালা চলছে। পশ্চাৎপটে দামি মখমলের ওপর লেখা সার্ভিস টু ম্যান ইজ সার্ভিস টু গড। চতুর্দিকে নানান বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, ভি. ডি. ও. ক্যামেরা স্থাপিত হচ্ছে, শোনা গেল পুরো অনুষ্ঠানটি চিত্রায়িত ক'রে তার ক্যাসেট পাঠানো হবে রাজীব গান্ধী সমেত শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছে।

শ্রোতাদের আসনে সাধুসন্ন্যাসীর বেলি, শাড়ী পরা বিদেশী ললনা ও মুণ্ডিত মস্তক, শিখাধারী মার্কিন যুবকরা রয়েছেন অভ্যর্থনায়। মাটির পাত্রে গরম-গরম হালুয়া বিতরিত হচ্ছে উদারভাবে।

কিছু-কিছু ভারতীয় মাথা কামিয়ে, গেরুয়া প'রে এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত

হয়েছেন। মঞ্চে ওঠার আগে এরকম একজন দিশি সাহেব-সাধুর সঙ্গে আমার কথাবার্তার সূত্রপাত হ'ল। ইনি অবাঙালি, ইংরেজি ভাষায় বেশ রপ্ত। নিজের থেকেই জানালেন যে চাকরি-বাকরি ছেড়ে এই ধর্ম আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য। আমি জিজ্ঞেস করলুম, খুঁজে পেয়েছেন? তিনি বললেন, খুঁজে চলেছি, এ-খোঁজার তো শেষ নেই।

জীবনের অর্থ খোঁজার জন্য নিরামিষ খাওয়া ও গেরুয়া ধারণের কী প্রয়োজন তা আমার বোধগম্য হয়না। আইনস্টাইন, বার্ট্রান্ড রাসেল কী জীবনের অর্থ খোঁজেননি? খোঁজেননি জীবনানন্দ দাশ কি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়? যে অভিজ্ঞ চাষী খরার সময় গাছতলায় দাঁড়িয়ে শূন্য মাঠের দিকে শূন্যতর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, সে-ও কি জীবনের অর্থ খোঁজেনা?

সাহেবদের অনুষ্ঠান হ'লেও কলকাতার মাটিতেই তো, তাই বাঙালি কায়দায় মিনিট পনেরো কুড়ি পরে শুরু হ'ল। সভাপতি একজন মার্কিনী অধ্যাপক, এঁরও মাথায় টিকি এবং গায়ে সিল্কের গেরুয়া। ইনি আন্তর্জাতিক এই সংস্থার বড়ো গোছের একজন চাঁই। পরিচিতের আরও জানানো হ'ল, ইনি একজন বেদান্ত-বিশেষজ্ঞ। আলোচকদের মধ্যে রয়েছেন হাইকোর্টের একজন প্রাক্তন বিচারপতি, ইনি উদারচেতা মুসলমান হিসেবে খ্যাত, আর লায়ন্স ক্লাবের দুজন কর্মকর্তা, পেশায় উচ্চশ্রেণীর ব্যবসায়ী, একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উপস্থিত এবং আমি। প্রথমে সভাপতির মূল ভাষণ, তারপর প্রশ্নোত্তর, সবকিছুই ইংরেজিতে।

সভাপতির ভাষণের প্রথম খণ্ডে নতুন কথা কিছুই শোনা গেলনা। পাকা অধ্যাপকের আ-ভাঙা বাক্য গড়গড়িয়ে অনেকক্ষণ ব'লে যেতে পারেন, তাতে সারবস্তু কিছু থাক-না-থাক। এই সাহেবটি বেদ উপনিষদের মালমশলা ছাত্রদের শোনাবার মতো ক'রে আমাদের দিকে তাকিয়ে যেভাবে বলছিলেন তাতে কৌতুকই উদ্রেক করে। কিন্তু এইসব গুরুগম্ভীর ধর্মসভায় হাসি নিষিদ্ধ।

হ্যাঁ ধর্মসভাই নিশ্চিত। মানুষের সেবার কথা এখানে গৌণ। সভাপতিটির বক্তব্যের সুর অবিকল ধর্মপ্রচারকের মতন। দ্বিতীয়ার্ধে তাঁর উদ্দেশ্য আরও প্রকট হ'ল। তিনি বললেন, জীবজগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ প্রাণী। এবং মানুষের এই শ্রেষ্ঠত্ব তখনই চূড়ান্ত হয় যখন সে জড়জগতের বন্ধন কাটিয়ে ঈশ্বরকোটিতে প্রবেশ করে। কর্ম করলে মঙ্গলয় হয়না যদি-না তাতে বিশুদ্ধ ভক্তি থাকে। আজকের মানুষ এই ভক্তিবাদ থেকে বিচ্যুত। শ্রীকৃষ্ণের যে-প্রেমধর্ম ইত্যাদি ইত্যাদি।

এক ঘণ্টা ধ'রে এরকম বক্তৃতা শোনার ধৈর্য আমার নেই। আমি মঞ্চ, মঞ্চের বাইরের ঘটনা লক্ষ করছিলুম। এই বৈঠকে সাধুদের ঐশ্বর্যের চিহ্ন চোখে না-প'ড়ে

উপায় নেই। অধিকাংশ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানই ধনী। এরা বোধহয় আরও ধনী, এদের চাঁদা আসে বিদেশী মুদ্রায়। ধনকুবের হেনরি ফোর্ডের কোন নাতিও নাকি এঁদের সদস্য! সাহেব-সাধুদের সকলেরই অঙ্গে গেরুয়া, তার দামের তারতম্য আছে। না-হয় সিল্ক, কারুর সুতো। বাইরের কাউন্টারে অতি মূল্যবান কাগজে ছাপা বই বিক্রি হচ্ছে অস্বাভাবিক কম দামে।

ঘরছাড়া এইসব তরুণ-তরুণী কিসের টানে এই অস্বাস্থ্যকর পশ্চিম বাংলায় দিনের পর দিন প'ড়ে আছে তা আমি জানিনা। ওদের দেশে বিজ্ঞান তৈরি ক'রে দিচ্ছে নিত্যনতুন আরাম, সেসব ত্যাগ ক'রে এই স্বেচ্ছানির্বাসন, এর মধ্যে একটা ট্র্যাজিক সৌন্দর্য আছে নিশ্চিত। মাথা ন্যাড়া ক'রে, গেরুয়া ধুতি প'রে কলকাতার রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো, দিনের পর দিন হালুয়া-খিচুড়ি ভক্ষণ, এই সহ্য শক্তি তো ধর্ম জোগাতে পারে? নাকি এ এক যুক্তিহীন উন্মাদনা। আমাদের দেশে অনেকেই এঁদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ ছুঁড়ে দেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তি করা আমাদের ব্যাসন। বিনা প্রমাণে আমি সেরকম কিছু মনে করিনা, তবে দু-চারটে গুপ্তচর এদের মধ্যে ঢুকে পড়তেই তো পারে, তা আশ্চর্য কিছুনা। চীনে যখন পিং-পং খেলার জন্য প্রথমে একটি মার্কিন দল পাঠাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন সি. আই. এ.-র এজেন্টদের মধ্যে অতি দ্রুত পিং-পং খেলা শিখে নেবার ধুম পড়ে গিয়েছিল।

ভোগবিলাসে বিমুখ হয়ে এককালে রাজার দুলালরা ঘর ছাড়ত। গৌতম বুদ্ধের বাবার চেয়ে হেনরি ফোর্ড নিশ্চিত অনেক গুণ বেশি বড়লোক। সে-কারণটা না-হয় মেনে নেওয়া যায়। সম্প্রদায় গঠন ক'রে তার প্রভাব বিস্তারের যে-চেষ্টা, তার মনস্তত্বটা কী? রাজীব গান্ধীকে কেন এই আলোচনাসভার ক্যাসেট পাঠানো হবে? তা কি এটাই প্রমাণ করবার জন্য যে এই সম্প্রদায় নিছক ধর্মীয়, এর মধ্যে রাজনীতি নেই, দেশের সর্বস্তরের মানুষের মতামত এখানে গ্রাহ্য করা হয়! সরকারি আইনের লম্বা হাত কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে ছোঁয়না। অন্য বক্তারাও খুব ভালো কথা বললেন। মানুষের সেবা তো ভগবানের সেবা বটেই। সব ধর্মের বাণীই এক, মানুষকে ভালোবাসো ইত্যাদি!

এরপরে আমি যদি বলতুম, আমার আর-কিছু বক্তব্য নেই, এবারে শেষ হয়েছে তো, চলুন ওঠা যাক, তাহ'লে সব ব্যাপারটা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'ত। কিন্তু আমার মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি চাপল। ভিমরুলের চাকে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে করল ছোট্ট একটা ঢিল। আমি বললুম, দেখুন মশাইরা, আমার পঞ্চাশ বছর বয়েস হ'ল, এ পর্যন্ত আমি কখনও ঈশ্বরচিন্তা করিনি। ঈশ্বরও নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে চিন্তা করেননি। কিন্তু আমরা দুজনে তো বেশ ভালোই আছি। কেউ কারুর ঝঞ্ঝাটে নেই।

আমার ধর্ম-টর্মের কোন বালাই নেই, কিন্তু আমি লোক খারাপনা। চুরি জোচ্চুরি করিনা, কারুকে ঠকাইনা, বরং সাধ্যমতো অপরের উপকার করার চেষ্টা করি! তাহ'লে আপনারা এত ধর্ম-ধর্ম করেন কেন? মানুষের সেবা করার কথা বলবেন, তা বেশ তো, করুন-না; তার মধ্যে আবার ভগবানকে টেনে আনার দরকারটা কী? সে-লোকটা আকাশে বেশ আছে, থাক্-না!

প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই ভগবান আছে, এ আমি বিশ্বাস করিনা। মানুষের পেটে ভগবান হজম করা খুব শক্ত। তাছাড়া প্রশ্ন উঠবে, সেটা কার ভগবান? কোন ধর্মের ভগবান? সব ধর্মেই বলেছে মানুষকে ভালোবাসো, এ অতি ঘোর মিথ্যে কথা। সব ধর্মই বলে, শুধু নিজের সম্প্রদায়ের লোকদের ভালোবাসো, অন্যদের ধ'রে পেটাও! পৃথিবীতে এ-পর্যন্ত যত গণ-খুনোখুনি হয়েছে সবই তো পবিত্র ধার্মিকদের ব্যবস্থাপনায়। মানুষের ভালোবাসা অত সহজ নয়! মোক্ষ, মুক্তি, এসব ফাঁকা কথায় অনর্থক সময় নষ্ট। মরার পর সবাই উড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, এই হ'ল মোক্ষ। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্ম প্রায় নেই বলতে গেলে। সেখানকার মানুষগুলো সবাই কি মৃত্যুর পরে নরকে যাচ্ছে? গরিবরা এখন যেন হয়েছে একটা খেলার বস্তু। সবাই তাদের ভালোবাসার জন্য মহা ব্যস্ত। আমাদের দেশে অনেক গরিব, বেশ তো, তাদের সাহায্য করতে চান তো খুব ভালো কথা, মানুষের মতন তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান, দয়া ক'রে তাদের মাথার ওপরে আর ধর্ম চাপাবেননা। যথেষ্ট হয়েছে। আমার মতে, ধর্ম হ'ল বড়োলোকদের আর পাগলদের সময় কাটাবার একটা জিনিস! গরিবরা কোনোদিন ধর্মচর্চা করেনা। তারা অন্ধের মতন শুধু কিছু-কিছু ধর্মীয় সংস্কার মেনে আসে, তাই তাদের খেলার পুতুল হিসেবে চালাতে অন্যদের সুবিধে হয়। এখন তাদের মন থেকে ধর্ম একেবারে মুছে দেওয়া দরকার।

আমার এই অহেতুক বাগাড়ম্বরের ফল মোটেও ভালো হ'লনা। শ্রোতাদের মধ্য থেকে প্রতিবাদ উঠল। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ। সভাপতি মহাশয় আবার দশ মিনিট ধ'রে আমাকে উপদেশ দেবার ছলে শ্লেষের সঙ্গে যা-বললেন, তার একটাই অর্থ। আমি একটি নির্বোধ! আমার মন এখনও জড় অবস্থা কাটিয়ে ওঠেনি।

৮

কলকাতায় রাসবিহারী এভিনিউর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা একটি তরুণী একটি তিনতলা বাড়ির ওপরের জানলার দিকে মুখ করে ডাকছিল, কৌশিক

কৌশিক। অবিলম্বে জানলা খুলে গেঞ্জি-পরা একটি স্বাস্থ্যবান যুবক মুখ বাড়িয়ে বলল, কে, ঝুমা? ওপরে আয়। মেয়েটি বলল, ওপরে আর যাবনা, একটা শুধু দরকারি কথা আছে। যুবকটি নিচে নেমে এলো এবং শুধু একটিমাত্র দরকারি কথা নয়, অনেক দরকারি কথা হ'তে থাকে, পাশের সিগারেটের দোকান থেকে আমি যে দু-এক টুকরো শুনতে পাই, তাতে বুঝতে পারি এরা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমার রোমাঞ্চ হয়।

আমাদের ছাত্রজীবনে, খুব বেশিদিন আগের কথাও নয়, আমরা কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে খুব সহজে দেখা করতে পারতামনা, অনেক ছলছুতো খুঁজতে হ'ত। মেয়েদের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। গ্রীষ্মের ছুটির দীর্ঘ ব্যবধানে অতিষ্ঠ হয়ে একবার এক সহপাঠিনীর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তার ব্যায়ামবীর দাদার কাছে আধ ঘন্টা ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল এবং টেবিলের তলায় আমার পাদুটো কাঁপছিল ঠকঠক ক'রে। আর ছেলেদের বাড়িতে কোন অনাত্মীয় মেয়ের আগমন পাড়াপ্রতিবেশিদের উঁকিঝুঁকি দেওয়ার মতন!

একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে যে-বয়সে বৃদ্ধ বলা হয়, সেই বয়েসটা একটা গীর্জার পক্ষে কিছুইনা। তেমনি পৃথিবীর বনেদি শহরগুলি, যেমন বাগদাদ, জেরুজালেম বা বারাণসী, এদের তুলনায় ২৯০ বছরের কলকাতা নিতান্তই নাবালক। কলকাতার কোন পূর্বস্মৃতি নেই, কোন ঐতিহ্য নেই। এই হিসেবে কলকাতার নাগরিকরা দায়মুক্ত, এখানকার নিয়মরীতি আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে।

কলকাতা সবসময় জীবন্ত। হঠাৎ-হঠাৎ উত্তেজনার ঝড় ওঠে, কখন প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে পড়ে, কিন্তু কলকাতা কখনই ঝিমিয়ে থাকেনা। দিল্লির ছাত্ররা যখন ব্রাহ্মণ-হরিজনে বিবাহ নিয়ে বিক্ষোভ জানায়, কলকাতার ছাত্ররা তখন বিশ্বরাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ভিয়েৎনাম বা কিউবার ঘটনা নিয়ে যখন কলকাতার ছাত্ররা অস্থির, তখন বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লির ক্যাম্পাস শান্ত নিঃস্তরঙ্গ। একসময় কলকাতার ছাত্ররা সুরেন বাড়ুজ্যের ঘোড়ারগাড়ির ঘোড়া খুলে নিজেরা টেনে এনেছিল। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে বাংলার ছাত্ররা বহুকাল জড়িত। অবশ্য রাজনীতি থাকলে দলাদলি থাকবেই। একসময় রাজপুতদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য থাকলেও বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি হবার কারণে তারা পরাধীন হয়ে যায়। কলকাতার ছাত্ররাও রাজনৈতিক দলাদলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এবং দলাদলির ফলে মাঝে-মাঝে মারামারি। আমাদের ছাত্রবয়সে নিজেদের মধ্যে মারামারিটা ঘুঁষোঘুঁষি বা ইঁটেই টিতে থেমে থাকত—কিন্তু বোমা, পাইপগান নিয়ে কোন সহপাঠিকে একদম খুন ক'রে ফেলার ব্যাপারটি কেউ দেখিনি। মাঝখানের কয়েক

বছর এই নৃশংস হৃদয়-বিদারক ব্যাপারটি ঘটেছিল, সুখেরকথা ছাত্ররা এখন আর খুনী হতে চায় না। যতদিন ছাত্র থাকবে, ততদিন মারামারি থাকবেই, সে খেলার রেজাল্ট নিয়েই হোক বা রাজনীতি নিয়েই হোক। কিন্তু সে-মারামারি ঘুঁষোঘুঁষিতেই নিবদ্ধ থাকলেই ভালো। কলকাতার ছাত্রদের পক্ষে সবচেয়ে প্রশংসনীয় কথা এই, এরা কোনদিনই ভাষা, প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্বে মাতেনি। সেদিক থেকে এখনকার ছাত্রসমাজ অনেক মুক্ত, অনেক রুচিশীল।

কলকাতার যৌবন দুরন্ত কিন্তু অশালীন নয়। দিল্লিতে কোন কলেজের ছাত্র সাইকেলে চেপে যেতে-যেতে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষমাণ কোন তরুণীর বেণী ধ'রে টান মারল আর মেয়েটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল—এই বীভৎস দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা। কলকাতার যুবসমাজ কোন পথযাত্রিণীর রূপযৌবন সম্পর্কে দু-চারটে মধুর উক্তি করে নিশ্চয়ই, কখন-কখন তাদের ভাষা কলেজ বাথরুমের দেওয়ালের ভাষার পর্যায়েও নেমে যায় বটে, কিন্তু কখনোই কোন অচেনা নারীর সম্ভ্রমহানি করেনা, শারীরিকভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক। তাছাড়াও কলকাতা ছাড়া এখনও ভারতের আর কোথাও ট্রামে-বাসে মহিলাদের দেখে পুরুষরা জায়গা ছেড়ে দাঁড়ায়না।

অনেক অতিকায় কলেজের মধ্যস্থল কলেজ স্ট্রিট হওয়ায় ছাত্রদের এটি একটি প্রধান কেন্দ্র। এই কলেজ স্ট্রিটে কতবার কতরকম ঝড় বয়ে গেছে। এখানকার কফি হাউস যুবসমাজের একটি প্রাণের জায়গা। দু-পাঁচ বছর পর-পর আড্ডাধারীরা বদলে যায়, কিন্তু আড্ডার স্রোত অব্যাহত থাকে। এখনও দেখতে পাই ঠিক আমাদের মতনই একদল অবিকল সেই একই ভঙ্গিতে তর্কে মেতে টেবিল ফাটাচ্ছে।

কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে যে কেউ গিয়ে এককাপ কফি কিনে খেতে পারে তবু কেন যেন র'টে যায়, যারা কফি হাউসে যায় তারাই ইন্টেলেকচুয়াল। কফি হাউসের অনেক টেবিলই আজ অনেক সহিত্য পত্রিকার অফিসিয়াল অফিস। আড্ডাধারীদের পকেট থেকে বেরোয় টাকার বদলে ভাঁজ-করা কবিতা। কলকাতা গোপনে-গোপনে কবিদেরই শহর।

বারোয়ারী পুজো ও খেলার মাঠে কলকাতার যৌবন বেশি স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের পর বিশাল এক যৌবনস্রোত ময়দান ছেয়ে ফেলে। বন্যার মতন ক্রমশ তা রেড রোড পেরিয়ে ধেয়ে আসে। কতরকমের জামা আর কতরকমের চুলের বাহার। বাসে ঝুলে প্রাণ বিপন্ন ক'রে হাসতে-হাসতে বাড়ি ফেরে। এইসব সময় যুবকদের কেউ সামান্য কোন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের সমালোচনা যখন করেন তখন আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। এ আর কী উচ্ছৃঙ্খল

ব্যবহার। এরচেয়ে কতগুণ উচ্ছৃঙ্খল তারা হতে পারত, হবার কথা ছিল। একলক্ষ যুবক একসঙ্গে হ'লে কী-না করতে পারে।

বারোয়ারি পুজোয় ছেলেরা একটু চাঁদার টাকায় ফুর্তি-টুর্তি করে। কীভাবে যেন রটে গেছে দুর্গাপুজো করে পাড়ার ভালো ছেলেরা আর কালীপুজো করে পাড়ার মস্তানরা। নিশ্চয় এটা সত্যি নয়—তবু এরকম একটা রটনা চলছে। যারাই যে-পুজো করুক-না কেন, কিন্তু খানিকটা আনন্দ-টানন্দ তো তারা করবেই। যে শহরে খেলার মাঠের সংখ্যা নগণ্য, ভালো বেড়াবার জায়গা নেই, বিশ্রী কতকগুলো সিনেমা ছাড়া সময় কাটাবার কোন ব্যবস্থা নেই সেখানে যুবকরা বছরে একবার-দুবার অন্তত আনন্দ করতে সুযোগ নেবেনা? তারা শান্ত শিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে? যে-দেশের যুবসমাজ শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী, সে দেশের সর্বনাশ হতে আর দেরি থাকেনা।

কলকাতার যৌবনের একটা ভারি করুণ দিক আছে। বিকেলবেলা নানান পথের মোড়ে-মোড়ে যুবকরা দাঁড়িয়ে জটলা করে—ঘন্টার পর ঘন্টা একই জায়গায়, পা বদলে নেয় মাঝে-মাঝে। এই দৃশ্য দেখে আমার কষ্ট হয়, বুক টনটন করে। এরা বেকার, এদের আর কোন যাবার জায়গা নেই। স্বাস্থ্যবান, সুসজ্জিত সব যুবা। চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—এর চেয়ে অর্থহীন আর কী থাকতে পারে? এরা কাজ করতে অরাজী নয়, কিন্তু এদের কেউ কাজ দিতে পারেনা। শুধু চাকরী দেওয়াই নয়—একসঙ্গে কোন বড়ো কাজে নামার জন্য এদেরকে কেউ ডাকেনি। আমি মাঝে-মাঝে স্বপ্ন দেখি, একদিন কলকাতার দু-তিন লক্ষ যুবক একসঙ্গে শাবল গাঁইতি নিয়ে কোন একটা রাস্তা তৈরি করা বা বাঁধ বাঁধা কিংবা কোন খালকে গভীরভাবে নাব্য ক'রে দু-পাশে সুন্দর রাস্তা গ'ড়ে একটি সুদৃশ্য জিনিস কলকাতাকে উপহার দিয়েছে।

৯

হঠাৎ একদিন শ্যামপুকুর স্ট্রিট ধ'রে হাঁটতে-হাঁটতে, থমকে দাঁড়িয়ে ভেবেছিলুম, কোন টাইম মেশিন কি আমাকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে? এই সেই আমার কৈশোরের চেনা পথ, প্রত্যেক দিন এই পথে হেঁটেছি, প্রত্যেকটি বাড়ি অবিকল একরকম আছে, কোন-কোন বাড়ির রকের আড্ডা এতগুলি বছর ধ'রে একইরকম চলছে। রাস্তার মানুষদের মধ্যে যে-কোন মুহূর্তে একজন কেউ আমার ডাক-নাম ধ'রে ডেকে উঠবে। অদূরের একটি বাড়িতে

আমার কৈশোরের প্রেমিকা বিকেলে গা ধুয়ে, ধপধপে সাদা ফ্রক পরে, মাথার চুলে লাল রিবন বেঁধে রাজহংসীর মতন গাড়ি-বারান্দায় এসে দাঁড়াবে !

উত্তর কলকাতার কোন-কোন রাস্তায় গেলে সত্যিই মনে হয়, সময় যেন থেমে আছে !

কলকাতা শহরের সঙ্গে আমার জন্ম-সম্পর্ক নেই, তবে অতি শৈশব থেকেই আমি এখানে লালিত-পালিত। আমার কৈশোর ও যৌবনের অনেকটা সময় কেটেছে এই শহরের উত্তর খণ্ডের বিভিন্ন রাস্তার নানানরকম ভাড়া-বাড়িতে।

তারপর চ'লে এসেছি দক্ষিণ কলকাতায়, তা-ও প্রায় দেড় যুগ হয়ে গেল। তবে, শহরের ঠিক দক্ষিণভূমিতে আমার অবস্থান নয়, বলা যায় আমি শূন্যবিহারী, আমার বর্তমান বাসস্থানের অবিকল বর্ণনা আছে হাসান রাজার একটি গানে: কী ঘর বানাইনু আমি শূন্যেরই মাঝার লোকে বলে, বলে রে, ঘর বাড়ি ভালো না আমার !

শহরের দুটো দিকই ভালো ক'রে দেখেছি ব'লে মনে হয়, এ যেন প্রকৃতপক্ষে আলাদা দুটো শহর। বুডা আর পেস্ট মিলে যেমন বুডাপেস্ট নগরী, সেইরকম গঙ্গার দু-তীরে হাওড়া ও কলকাতা মিলে একটি বৃহৎনগরী হতে পারত, কিন্তু তা হ'লনা, হাওড়া রয়ে গেল মফস্বলে, কলকাতারও উত্তর-দক্ষিণে ঠিক যেন জোড় মিললনা।

আমাদের ছেলেবেলায় গোটা দক্ষিণ কলকাতারই ডাক নাম ছিল বালিগঞ্জ। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে বালি কিংবা গঞ্জ এই দুটি শব্দের কোন অনুষঙ্গই মনে আসতনা, বালিগঞ্জ শুনলেই মনে হ'ত যেন উদ্যানময়, অতিপরিচ্ছন্ন এক সুদৃশ্য এলাকা, যেখানকার ছেলেরা অত্যন্ত চালিয়াত হয়। (অনেক গল্প-উপন্যাসে চালিয়াত যুবকদের বর্ণনায় তাদের বালিগঞ্জের ছেলে বলা হ'ত, দূরপাল্লার ট্রেনযাত্রায় প্রবাসী বাঙালিদের সঙ্গে আলাপ হ'লে যখন কেউ জিজ্ঞেস করত, কলকাতায় কোথায় থাকেন, তখন নৈহাটি-কোন্নগরের ছেলেরাও অম্লান বদনে বলত, বালিগঞ্জ !) আর সেখানকার মেয়েরা ঠোঁটে লিপস্টিক মাখে ও কুকুর পোষে। এরকম রোমহর্ষক গুজবও শুনেছি, বালিগঞ্জের মেয়েরা নাকি 'বুক-কাটা' জামা পরে। এরকম একটা রসিকতাও চালু ছিল, "বালিগঞ্জের মেয়েরা খুব খোলা-মেলা হয়, তাই-না ?" "কেন রে ?" "ওরা সব সাউথ ফেসিং কিনা !"

প্রায় টুরিস্টদের মতন সাইট সিয়িং-এর উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা মাঝে-মাঝে দোতলা বাসে চেপে বালিগঞ্জের লেক ও রাসবিহারী এভিনিউ দেখতে আসতুম। দু-পাশে বৃক্ষশোভিত এমন সুবিশাল সরণী, যার মাঝখান দিয়ে ঘাসের ওপরে স্টিমারের মতন ট্রাম চলে, এমন সুন্দর রাস্তা উত্তর কলকাতায় একটিও ছিলনা।

আর-একটি অপূর্ব সুন্দর পথ ছিল ম্যাণ্ডেভিল গার্ডেন্স, যেখান দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে মনে হ'ত বিলেত-টিলেত বোধহয় এরকমই। (সেই সুন্দর পথটি'কে একালের বহুতল আবাসন-নির্মাণকারীরা হত্যা করেছে !)

দক্ষিণ কলকাতার ছেলেরাও কি এরকম উত্তর-কলকাতা সন্দর্শনে যেত ? আমি পরবর্তীকালে দক্ষিণ কলকাতার অনেক মানুষকে দেখেছি, যাদের কাছে বৌবাজার স্ট্রিটের ওপারের অংশটি প্রায় অজানা। দুর্গাপুজোর সময় অধিক রাত্রে এদিক থেকে অনেকে বাগবাজার কিংবা সিমলার ঠাকুর দেখতে যান বটে, কিন্তু হরি ঘোষ স্ট্রিট কোথায়, এ-কথা জিজ্ঞেস করলে আকাশ থেকে পড়বেন। 'হরি ঘোষের গোয়াল' বাংলা প্রবাদের মধ্যে ঢুকে গেছে, সেই হরি ঘোষের নামের বিখ্যাত রাস্তাটি এদিককার অনেকেই চেনেননা।

দেখবার জিনিস উত্তর কলকাতাতেও বহু আছে, দক্ষিণ কলকাতার চেয়ে বেশিই আছে। এক-একখানা বাড়িরই কী সৌষ্ঠব ! ছেলেবেলায় আমরা রাজা নবকৃষ্ণ দেবের বাড়িতে খেলতে যেতুম। এখনও রাজবাড়ি বললে ঐ-বাড়িটির কথাই প্রথমে আমার চোখে ভাসে, যদিও পৃথিবীর বহু দেশের অনেক বড়ো-বড়ো রয়াল প্যালেস আমি দেখেছি। রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের একটা অংশের সবকটা বাড়িই যেন ছিল রাজালয়। ঐরকম একটি বাড়ির বারান্দায় এক ষোড়শীকে দেখে প্রথমে আমার শ্বেতমর্মর মূর্তি ব'লে ভ্রম হয়েছিল, তারপর সে একটা হাত তুলে চুলে রাখতেই আমার সর্বাঙ্গে শিহরণ হ'ল, সেই প্রথম আমার রাজকন্যা দর্শন। সেই কন্যার পায়ের নখেরও যোগ্য নয় বালিগঞ্জের কোন মেয়ে !

গ্রে স্ট্রিট ও কর্নওয়ালিস স্ট্রিটের মোড়ের জায়গাটা আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, কারণ, ঐখানে, হাতিবাগান বাজারের সামনে, আমি ব্রিটিশ শাসনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাই। আমি পরাধীন আমলের কিশোর, কিন্তু তখনও ততটা বড়ো হইনি যাতে স্বাধীনতা-সংগ্রামে অংশ নিতে পারি। আমার তখন এগারো বছর বয়েস, বাবার সঙ্গে বাজার করতে গেছি, কী একটা মিছিল এসে পড়ায় হঠাৎ খুব হুড়োহুড়ি প'ড়ে গেল, আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলুম বাবার কাছ থেকে ইঁট বর্ষণ ও লাঠি চালনার মধ্যে দিশেহারা হয়ে আমি বাড়ির দিকে পালাবার চেষ্টা করছি, এইসময় যমদূতের মতন এক লালমুখো সাহেব পুলিশ অফিসার ঠিক বেড়াল-ছানার মতন আমার কাঁধ ধ'রে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পাগলের মতন ছিল তার ভাব-ভঙ্গি। সেদিন বাড়ি ফিরে আমি সুভাষ বোসের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে শপথ করেছিলুম, বড়ো হয়ে আমি অন্তত একটি ইংরেজ খুন করবই। তার বছর দু-একের মধ্যেই অবশ্য ইংরেজরা এ-দেশ ছেড়ে চ'লে যায়।

ঐ হাতিবাগান বাজারের প্রায় উল্টোদিকেই ছিল সারি-সারি পুতুল-দারোয়ান

বসানো দত্তদের বাড়ি। শুধু ধনী নয়, ঐ-দত্তরা যে জ্ঞানে-গুণেও অনেক উঁচু, সে-কথাও জানা ছিল আমাদের। দার্শনিক হীরেন দত্ত, মঞ্চ-যুবরাজ অমর দত্ত, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এঁরা সব ঐ-বাড়ির মানুষ। ঐ-বাড়ির সাহিত্যিক আড্ডাও বিখ্যাত ছিল, সামনে দিয়ে যেতে-যেতে কতবার সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে-চেয়ে ভেবেছি, কোনদিন কি ঐ-বাড়িতে প্রবেশের অধিকার পাব?

পাথুরেঘাটার মল্লিকবাড়ি কিংবা চোরবাগানের সিংহীবাড়ি ছাড়াও ঐ-অঞ্চলে আরও কত যে মনোহর অট্টালিকা ছিল তখন। পুরো এলাকাটাই ছিল প্রাসাদপুরী। তখন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা ঐসব বাড়ি দখল করার উদ্যমে মাতেনি, গত শতাব্দীর বনেদী বাঙালিয়ানার বেশ কিছু চিহ্ন ঐ-অঞ্চলে ঘোরাফেরা করলেই পাওয়া যেত। ঐরকম সব বাড়ি ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়া দক্ষিণ কলকাতায় কোথায়? অবশ্য এদিকেও ভাওয়ালের রাজবাড়ি বা নাটোরের রাজাদের চিত্তাকর্ষক বাড়ি ছিল, কিন্তু সেগুলি পূর্ববঙ্গের জমিদারদের, পুরোনো কলকাতার কালচারের আমেজ সেখানে ঠিক পাওয়া যেতনা।

পাথুরেঘাটার মন্মথনাথ ঘোষের বাড়িতে দু-একবার গেছি গানের জলসা শুনতে। এই মন্মথনাথ ঘোষ ছিলেন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিরাট পৃষ্ঠপোষক। তাঁর উদ্যোগে গঠিত অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্সের খ্যাতি ছিল ভারতব্যাপী। মন্মথনাথ ঘোষের নিজের বাড়ির যে অন্তরঙ্গ জলসা, তা শোনার সুযোগ পাওয়া ছিল এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা। সেই সময়কার ঠুংরী ও খেয়ালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী ঐরকম এক আসরে তাঁর পুত্র মুনাব্বরকে উপস্থিত করলেন শ্রোতাদের সামনে। বাবার দিকে পেছন ফিরে ব'সে মুনাব্বর যে চুক-চুক ক'রে মদ্যপান করছিল, সেই দৃশ্যটা আমার মনে গেঁথে আছে।

উত্তর কলকাতার কয়েকটি বনেদী বাড়িতে আমি প্রবেশ-অধিকার পেয়েছিলুম গৃহ-শিক্ষকতার সূত্রে। সেইরকম একটি বাড়ির নাম ছিল মিত্তিরবাড়ি। আমাদের পুরসভা যদি নগর-সৌন্দর্য রক্ষা সম্পর্কে সচেতন হ'ত, তাহ'লে ঐরকম বাড়িগুলিকে অটুট-অবিকৃত অবস্থায় রেখে দিত নিশ্চয়ই। পৃথিবীর বড়ো-বড়ো শহরে সেরকমই করা হয়। ঝামাপুকুরে এমন একটি বৃহৎ প্রাসাদ ছিল, যার বারমহল ও অন্দরমহলের মধ্যে যাতায়াতের জন্য রেল লাইন বসানো ছিল। সে-বাড়ির কথা আমি শুনেছি মাত্র, চোখে দেখিনি, তবে খবরের কাগজে যখন সেই বাড়িটি বিক্রি হয়ে টুকরো-টুকরো হয়ে যাবার কথা পড়েছিলুম, তখন দুঃখ হয়েছিল খুব।

মিত্তির বাড়িটিও ছিল বিশাল। লোহার গেটের পাশে ঘণ্টা ঘর, একজন দ্বারবান প্রত্যেক ঘণ্টায় ঘণ্টা বাজাত, তা শুনে পথচারীরা ঘড়ি মিলিয়ে নিত।

গেটের ওপাশে বিস্তীর্ণ বাগান, বাইরে থেকে দেখে মনে হ'ত যেন ঐ-বাগানের শেষ নেই। বাগানের মাঝে-মাঝে নগ্ন পুতুল-পরী ও ফোয়ারা। একটি মস্ত বড়ো মজলিশ-কক্ষে অন্তত তিরিশ বত্রিশটা নানান আকারের ঘড়ি, সেখানে এক বৃদ্ধ মিত্তিরমশাই একটি শ্বেতপাথরের টেবিলে ব'সে ঢুলতেন, তাঁর উল্টোদিকে বসা একজন মাইনে-করা লোক তোতা পাখির মতন গীতা পাঠ ক'রে যেত। এই সুররিয়ালিস্টিক দৃশ্যটি গত শতাব্দীর নয়, মাত্র এই সেদিন, পঞ্চাশের দশকের। বাঙালি বনেদিয়ানার এই দৃশ্য সম্ভবত চিরকালের মতন মুছে গেছে।

সে-বাড়িতে আমি দুটি ফুটফুটে ছেলে-মেয়েকে পড়াতুম। মেয়েটির মা বিশেষ প্রয়োজনে কোন-কোনদিন আমার সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলতেন। তাঁকে আমি কোনদিন চক্ষে দেখিনি, দেখার কৌতূহল ছিল অদম্য। আমি তখন পাঁচরকম ভাড়াটেওয়ালা বাড়িতে থাকি, পর্দানশিন মহিলাদের কথা শুধু বইতেই পড়েছি। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে, আমার সেই ছাত্রীটির মা বেশ কয়েক বছর বিলেতে কাটিয়ে এসেছিলেন। আমার ছাত্রীটিও বাবা-মায়ের সঙ্গে বছর দু-এক বিলেতে থেকে এসেছিল, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলার সময় সে একটিও ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করতনা। কলকাতাতেও সে মিশনরি স্কুলের ছাত্রী, তবু বাংলা গল্পের বই পড়ার আগ্রহ প্রচণ্ড। এখনকার বিলেত-আমেরিকা ঘুরে-আসা ফরফরিয়াদের দেখলে আমার সেই ছাত্রীটির কথা মনে পড়ে। এখনকার মিশনরি স্কুলে-পড়া বাঙালি ছেলেমেয়েদের বাংলা বলতে যেন কত কষ্ট!

আরিস্টোক্র্যাসির যত দোষই থাক, আচার-ব্যবহারে একটা উন্নত রুচিবোধ, শিল্প-সংস্কৃতির প্রীতি ও পৃষ্ঠপোষকতা, যা তারা গ'ড়ে তুলেছিল, সেরকমটি আর পাওয়া যাবেনা। আমি অল্পবয়েস থেকেই জমিদারতন্ত্রকে ঘৃণা করি।

বনেদী বাড়ি যেমন দেখেছি, তেমন দেখেছি ঘিঞ্জি বাড়ি। উত্তর কলকাতার মতন অত সরু-সরু গলি আর এক বাড়িতে গাদাগাদি ক'রে অত মানুষের বাস, এরকম দক্ষিণ কলকাতায় নেই। উত্তর কলকাতার ভাড়াটেরা যেমন চেঁচিয়ে ঝগড়া করে, তেমনটি শোনা যায়না দক্ষিণে। ভাড়াটেবাড়ির একটি অতি পরিচিত লক্ষণ হ'ল, জল নিয়ে ঝগড়া। উত্তর কলকাতার যতগুলি বাড়িতে আমি থেকেছি, সব বাড়িতেই দেখেছি চৌবাচ্চা নামে বস্তুটি, যা দক্ষিণ কলকাতার কোন বাড়িতে দেখিনি। ঐ-চৌবাচ্চা তো শুধুমাত্র জলাধার নয়, রীতিমতন একটি প্রতিষ্ঠান, ঐ চৌবাচ্চাকে ঘিরে কতরকম কলহ, মান-অভিমান, এমনকি প্রেম! দক্ষিণ কলকাতায় যেটি বাথরুম, উত্তরের বাড়িগুলিতে তার নাম ছিল কলঘর। বাথরুম সংক্রান্ত প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলির নাম উত্তর কলকাতার লোকেরা অনায়াসে জোরে-জোরে উচ্চারণ করে, দক্ষিণে তা নতুন জেনারেশানের মুখে কদাচিৎ শোনা

যায়। এদিকে বলা হয়, ছোট বাথরুম, বড় বাথরুম। জঙ্গলে পিকনিক করতে গিয়েও মেয়েরা 'বাথরুমে' যায়।

সাহেবদের বাড়িতে ছাদ থাকেনা, দক্ষিণ কলকাতার বাড়িগুলিতে ছাদ থাকলেও তার তেমন ব্যবহার নেই (ইদানীং অবশ্য টি. ভি. অ্যান্টেনা লাগাবার জন্য ছাদের সার্থকতা দেখা দিয়েছে)। উত্তর কলকাতায় ছাদ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ি বলে অনেকসময় এক ছাদ থেকে অন্য ছাদে লাফিয়েও চ'লে যাওয়া যায়। এ-বাড়ির মেয়েরা ছাদের পাঁচিলে হেলান দিয়ে ও-বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে গল্প করে ! বাড়ির মধ্যে জায়গা কম ব'লে বিকেলের দিকে ছাদে এলে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলা যায়। ছাদের জলের ট্যাঙ্কের আড়ালে ব'সে প্রথম সিগারেট টানতে শেখা। চিলেকোঠার মধ্যে সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে প্রথম চুম্বনের অভিজ্ঞতা। বছর তিরিশেক আগেও বহু বাংলা প্রেমকাহিনীর পটভূমি ছিল বাড়ির ছাদ।

দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ির বাচ্চারা যতটা ছাদ ব্যবহার করে, বড়োরা ততটা নয়। গ্রীষ্মকালে ছাদে ঘুমোবার চলন উত্তর কলকাতাতেই বেশি। মনে পড়ে, গরম ছাদের ওপর জল ছিটিয়ে, তার ওপর মাদুর কিংবা পাটি পেতে শোওয়া, এক-একদিন মাথার ওপর সরাসরি চাঁদ ও মেঘের খেলা দেখতে-দেখতে ঘুম আসেনা, আকাশের গভীরতা যেন স্তরে-স্তরে বেড়ে যেতে থাকে, মহাশূন্যের দিকে ছুটে যায় মনোরথ। এক-একদিন ঘুমের মধ্যে আচমকা ঝুপঝাপ বৃষ্টি, হুড়ুস ধাড়ুস ক'রে উঠে, মাদুর-বালিশ গুটিয়ে দৌড়। উত্তর কলকাতার ছাদে একটাও মশা ছিলনা, এটা স্পষ্ট মনে আছে যে কোনদিন মশারি টাঙাতে হয়নি, এখন কী অবস্থা কে জানে।

তথাকথিত এনেদিয়ানারও সমর্থক নই, কিন্তু ঐ মিত্তির বাড়ির মানুষদের ভদ্রতাবোধ ও সুষ্ঠু সহবত-জ্ঞানের মনে-মনে প্রশংসা না-ক'রে পারতুমনা।

উত্তর কলকাতায় ভাড়াটেবাড়িতে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ঝগড়াঝাটি হয় বটে, আবার প্রতিবেশীদের মধ্যে ভাবও বেশি। এক পাড়ার সবাই সবাইকে চেনে, বিপদে আপদে খবরাখবর নেয়, যে-কোন পরিবারের কেচ্ছা বা কর্তার চাকরির উন্নতির সংবাদ অন্য সবাই নিমেষে জেনে যায়। নিরাত্মীয় কোন লোক মারা গেলে পাড়ার ছেলেরা শ্মশানযাত্রায় কাঁধ দিতে আসে। দক্ষিণের জীবনযাত্রা সাহেবী ধাঁচের। একই ফ্ল্যাটবাড়ির দুজন মানুষ পরস্পরের নাম জানেনা। একই পাড়ার কোন যুবতীর আত্মহত্যার খবর পরের দিন খবরের কাগজে টের পাওয়া যায়।

শহরের দুদিকের ভাষারও স্পষ্ট প্রভেদ আছে। প্রধান তফাৎ তালব্য শ ও দন্তের স-এর ব্যবহারে। দক্ষিণে তালব্য শ বেশি, উত্তরে দন্তের স। এরা বলে

বৃশটি, মিশটি, আর ওরা বলে 'সাম্‌বাজারের সসীবাবু সাইকেল চড়ে সসরীরে সগ্যো যায়'। আরও তফাৎ আছে। দক্ষিণে বলা হ'ত, 'আমার ওয়াইফ' কিংবা 'আমার গিন্নী, উত্তরে বলা হ'ত, 'আমার উনি' কিংবা 'খোকার মা'। দন্ত্য ন-এর প্রতিও উত্তর কলকাতার পক্ষপাতিত্ব, নুচি, নঙ্কা, নেবু এসব ওদিকেই বেশি শোনা যায়। উত্তরে আমি একটি বিচিত্র ক্রিয়াপদের ব্যবহারও শুনেছি। একসময় আমরা একটি স্বর্ণকারের বাড়ির প্রতিবেশী ছিলুম। সে-বাড়ির একটি কিশোরী মেয়ের কণ্ঠস্বর ঠিক স্বর্ণমণ্ডিত ছিলনা, বরং কাংস্যবিনিন্দিতই বলা যায়, সে প্রায়ই তাদের সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ছোটভাইকে ডাকত, 'পটি, পাইলে আয়, হাইরে যাবি!' সে-বাড়ির বয়স্করাও ঐ-ভাষাতেই কথা বলত। বাংলা সাহিত্যের চলতি ভাষার প্রয়োগে আমি কখনও পাইলে, হাইরের ব্যবহার দেখিনি। ঐ-পাড়াতেই আমি ছেলেদের ডাকনাম শুনতুম, পটল, ঝিঙে, আলু, বেগুন!

পুরসভার চোখে দক্ষিণ কলকাতা যেন দ্বিতীয় পক্ষের তরুণী ভার্যা। সেই দিকে নেকনজর বেশি। আমি দু-তরফেই বেশ কিছু বছর কাটিয়েছি ব'লে পক্ষপাতিত্বটা বুঝতে পারি। তুলনামূলকভাবে দক্ষিণের রাস্তাগুলি বেশি পরিচ্ছন্ন। সাদার্ন এভিনিউয়ের মাঝখানটা দেখতে-দেখতে কেমন সুন্দর কানন-শোভিত হ'ল, উত্তরের কোন রাজপথের এমন রূপ বদল হয়নি। বালিগঞ্জ লেকে লিলিপুল আছে, সার্দার্ন পার্ক হয়েছে, রোয়িং ক্লাব ও সুইমিং ক্লাব অনেকগুলি, সেই তুলনায় উত্তরের দেশবন্ধু পার্ক বা হেদো খুবই অনাদৃত। টালির নালার তবু যেটুকু সংস্কার হয়েছে, সেই তুলনায় বাগবাজারে খালের কিছুই হয়নি। দক্ষিণে এত আকাশ-ঝাড়ু বাড়ি উঠছে, উত্তরে কেন তেমন হ'তে পারেনা?

উত্তর কলকাতার অনেক রাস্তাতে গেলেই আমার সময় থেমে থাকার অনুভূতি হয়। কিছুই বদলায়নি, একটি বাড়ি ভেঙেও নতুন বাড়ি ওঠেনি, গলিগুলো সেইরকমই সরীসৃপের মতন, মনোহারি দোকানের কাচের বৈয়মগুলো যেন একটাও কমেনি বা বাড়েনি। এর যে-কোন একটি বাড়ির সদর দরজা ঠেলে যেন আমি অনায়াসে ঢুকে পড়তে পারি, ইস্কুলের বইয়ের বোঝা ছুঁড়ে ফেলে ব'লে উঠতে পারি, মা, খিদে পেয়েছে, জল-খাবার দাও!

১০

পাঁওতিয়ার মোড়ে আমরা চার-পাঁচজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিলাম। আকাশ মেঘলা, যে-কোন সময় বৃষ্টি আসবে এইরকম একটা ভাব নিয়ে গত দু-তিনদিন খুব গুমোট

গরম চলছে। আমাদের প্রত্যেকেরই মুখ ঘামে তেলতেলে। কথা বলতে-বলতে আমিই প্রথম দেখতে পেলাম ঝর্ণাকে। ত্রিকোণ পার্কের পাশ দিয়ে এসে সে এইমাত্র রাস্তা পেরুচ্ছে। ফলসা রঙের শাড়ি পরা, হাতে একটা হলুদ শপিং ব্যাগ।

এখন বিকেল সাড়ে-পাঁচটা, এইসময় রাস্তার ট্রাম-বাস, মানুষের ভিড় একেবারে চূড়ান্ত হয়। এই মোড়ে কোন ট্রাফিক পুলিশ নেই, কিন্তু ঝর্ণা রাস্তা পেরুবার সময় সবকিছু যেন আপনা-আপনি থেমে গেল। চারদিকের রাস্তায় চারখানা দোতলা বাস, বিপরীতমুখী দুটি ট্রাম, এমনকি কোন দুরন্ত ট্যাক্সিও অন্যদের পাশ কাটিয়ে এগোবার চেষ্টা করলনা, সবাই যেন বলছে, এখন ঝর্ণা যাচ্ছে, ওকে পথ ক'রে দাও। এ যেন মোজেজের জন্য সমুদ্রের দু-ভাগ হয়ে যাওয়া।

অন্যরা কথা বলছে, ঝর্ণাকে দেখতে পায়নি, আমি চুপ ক'রে আছি। ঝর্ণা কি আমাদের কাছে আসবে? মেয়েরা অনেকসময় পুরুষদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে আসেনা। আমি ঝর্ণার চোখ চোখে ফেলার চেষ্টা করলাম, যাতেও চিনতে পেরে একটু অন্তত হাসে। একটা গুমোট বিকেলে একটু হাসিই যথেষ্ট।

আমাকে দেখতে না-পেলেও ঝর্ণা এইদিকেই আসছে। ঈষৎ অন্যমনস্ক। মাটির দিকে চেয়ে হাতের ব্যাগটা দোলাচ্ছে। ঝর্ণার সঙ্গে আমার ততটা পরিচয় নেই, যাতে ওকে ডাকতে পারি। অবশ্য এতজন বন্ধুর মাঝখানে ওকে ডেকেই-বা কী হবে? যদি একলা কখন দেখা হয়, কোন-একটা বাগানের ধারে, আমি ওর সঙ্গে এলেবেলে কথার ছলে ওকে দু-চোখ ভ'রে দেখব! ঝর্ণার মুখের মধ্যে কিছু-একটা আছে, ঐ-মুখের দিকে তাকালেই মনটা আনন্দে ভ'রে যায়। শুধু চোখে দেখার এমন আনন্দ পৃথিবীর আর কোন মেয়ের কাছ থেকে বোধহয় পাওয়া যাবেনা।

ঝর্ণা হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। আমাকে নয়, সে সুদীপকে দেখতে পেয়েছে। অন্যদেরও সে চেনে। ঝর্ণা কাছে এগিয়ে আসতেই সবাই কথা থামিয়ে দিল। ঝর্ণার উপস্থিতির সম্মানে সবাই মাথা নীচু করল।

সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ঝর্ণা জিজ্ঞেস করল, এই, তোমরা কেউ ব্যালে দেখতে যাচ্ছনা? কয়েক মুহূর্ত কেউ উত্তর দিলনা।

সারা শহরে সোভিয়েত ব্যালে নিয়ে দারুণ মাতামাতি চলছে। বিশ্ববিখ্যাত বলশয় ব্যালে দল এসেছে, তাই নিয়ে কলকাতার মানুষ একেবারে উত্তাল। টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি। রবীন্দ্র-সদনের সামনে, ময়দানে ভোর থেকে লাইন। দু-দিন আগে ঘোষণা করা হয়েছে সব টিকিট শেষ!

সুদীপ বলল, আমরা কেউ টিকিট পাইনি। ঝর্ণা বলল, আমিও পাইনি। একজন দুটো টিকিট দেবে বলেছিল, তারপর তার পাত্তা নেই। আমি দেখবনা?

ঝর্ণার মুখে একটুও ঘাম নেই, তার চটি-পরা পায়ে একটুও ধুলো নেই, তার গায়ের রং ঝর্ণার জলেরই মতন স্বচ্ছ।

আমার মনে হ'ল, এই শহরে যদি একজনেরও এ নৃত্য উৎসব দেখার যোগ্যতা থাকে, তবে তা ঝর্ণারই। সে কেন টিকিট পাবেনা ? কর্তাব্যক্তিদের কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই ! আমাদের সবার মুখে একবার ক'রে তাকিয়ে ঝর্ণা অভিমানের সঙ্গে বলল, আমার এত ইচ্ছে ছিল...

ঝর্ণা চ'লে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সুদীপ বলল, এই ঝর্ণা, শোনো—

ঝর্ণা তবু দাঁড়ালনা, সে মানুষজনের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

আমি তৎক্ষণাৎ দারুণ একটু চাঞ্চল্য বোধ করলুম। ঝর্ণা আমাদের প্রত্যেকের ওপর একটা দায়িত্ব দিয়ে গেছে। ঝর্ণার জন্য একটা টিকিট জোগাড় করা যাবেনা। এ কখনও হ'তে পারে ?

আমি ঝর্ণার সঙ্গে কখনও সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাইনি। পাশাপাশি রাস্তা দিয়ে হাঁটিনি। কিন্তু এবারে দুটি ব্যালের টিকিট নিয়ে গিয়ে ঝর্ণাকে অনায়াসে বলতে পারি, তুমি আমার সঙ্গে যাবে ? ট্রাম-বাস নয়, পণ্ডিতিয়ার মোড় থেকে ট্যাক্সিতে নিয়ে যাব ঝর্ণাকে। রবীন্দ্র-সদনের সিঁড়ি দিয়ে সে আমার হাত আলতো ক'রে ধ'রে উঠবে। তৃতীয় কিংবা চতুর্থ সারির ঠিক মাঝখানে বসব আমরা, নর্তকীরাও আমাদের দেখতে পাবে।

অন্তত তিরিশজনের কাছে টিকিটের জন্য দৌড়োদৌড়ি করলুম আমি। কয়েকজন পাত্তাই দিলনা। কয়েকজন বলল, আগে এলেনা কেন ? কেউ-কেউ ক্ষীণ আশা দিয়ে বলল, কাল সকালে দেখা ক'রো। সকালে গেলে তারা বলে বিকেলে আসতে। কিংবা আবার পরের দিন দুপুরে।

শেষ পর্যন্ত একজন আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে কৃপা করে, প্রায় শেষ মুহূর্তে একখানা মাত্র টিকিট দিল। তাও খুব কম দামের। ওপরতলার এত পেছনে বসতে হবে যে সেখান থেকে ভালো ক'রে দেখাই যাবেনা। তবু টিকিটটা পেয়েই আমি ছুটে গেলুম ঝর্ণাদের বাড়ি। ঝর্ণা অন্তত জানবে যে আমি তার জন্য চেষ্টা করেছি। আমি তার সঙ্গে যেতে পারবনা, সে একলাই যাক।

ঝর্ণাদের বাড়ির গলির মুখটায় পৌছতে-পৌছতেই দেখলুম, একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে, তাতে ঝর্ণা আর সুদীপ। ব্যালে দেখতেই যাচ্ছে নিশ্চয়ই। সুদীপের বাবার অনেক চেনাশুনো আছে ওপরমহলে। সুদীপ শুধু টিকিটটি জোগাড় করেনি, গাড়িও জোগাড় ক'রে ফেলেছে। সাদা সিল্কের শাড়িতে রাজহংসীর মতন দেখাচ্ছে ঝর্ণাকে। আমাকে ওরা কেউ দেখতে পেলনা।

এখন এই টিকিটটা নিয়ে আমি কী করি ? এই টিকিট নিয়ে আমি ব্যালে

দেখতে যাব ? অসম্ভব ! আমি এত স্বার্থপর হতে পারিনা। হলের মধ্যে ঝর্ণা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে গেলে নিশ্চয়ই ভাববে, আমি তার জন্য টিকিট জোগাড়ের চেষ্টা করিনি, নিজের জন্য করেছি। এত কষ্টে সংগ্রহ-করা টিকিটটা আমি ছিঁড়ে ফেললুম।

ঝর্ণা যে শেষ পর্যন্ত দেখতে যেতে পেরেছে, তাতেই তো আমার খুশি হওয়া উচিত। সুদীপের ওপর আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু পুরীর টিকিট ?

কয়েকদিন পরই ঝর্ণার দাদা অনীশের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় বলল, নীলু, ট্রেনের টিকিটের ব্যাপারে তোর কেউ চেনাশুনো আছে ? আমার মায়ের শরীরটা ভালো নেই জানিস তো, মাকে নিয়ে ঝর্ণা পুরী যেতে চাইছে, কিন্তু এক মাসের মধ্যে কোন রিজার্ভেশন পাওয়া যাচ্ছেনা।

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, হ্যাঁ, আমি জোগাড় ক'রে দেব !

কী ক'রে যে বললুম কে জানে ! রেলের কোন লোককে তো আমি চিনিনা। বুকিং অফিসের সামনে বরাবর লম্বা লাইন দেখে এসেছি। তবে, এটাও জানি, সব সীট ভর্তি হয়ে যাবার পরেও কেউ-কেউ টিকিট পায়। ভি. আই. পি. কোটা নামে একটা নাকি ব্যাপার আছে। ঝর্ণার চেয়ে বড়ো ভি. আই. পি. আর কে আছে ? ঝর্ণা তার মাকে নিয়ে পুরী যেতে চেয়েছে, তাকে যেতেই হবে !

অনীশ বলল, ওদের দরকার তিনখানা বার্থ রিজার্ভেশন। যদি চারখানা পাওয়া যায় ? তাহ'লে আমিও যেতে পারি ওদের সঙ্গে। চলন্ত ট্রেনে ঝর্ণা আমার মুখোমুখি বসবে। ট্রেনের শব্দ ছাপিয়ে শোনা যাবে তার হাসির শব্দ। বাঙ্কে উঠে ঘুমোবে ঝর্ণা। আমি দেখব তার ঘুমন্ত মুখ। ঝর্ণা সমুদ্রে স্নান করতে নামবে, আমি জানি সমুদ্রের ঢেউ খেলা করবে তাকে নিয়ে, আকাশ ঝুঁকে আসবে তার জন্য। ট্রেনের টিকিট কে দেয় ! বুকিং অফিসে গিয়ে শুনলুম, কোন আশা নেই। তবু যেতেই হবে। ঝর্ণাদের সঙ্গে আমাকে যেতেই হবে ! বিশ্বদেবদার সঙ্গে অনেক ফুটবল খেলোয়াড়ের চেনাশুনো। খেলোয়াড়রা কি ইচ্ছেমতন টিকিট পায় ? বিশ্বদেবদা আমাকে একটা চাকরি জোগাড় ক'রে দেবার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিশ্বদেবদাকে গিয়ে বলব, আমাকে চাকরি দিতে হবেনা। তুমি শুধু আমাকে পুরীর চারখানা টিকিট দাও ?

বাস স্টপে একদিন ঝর্ণাকে দেখতে পেলুম দূর থেকে। একজন সখীর সঙ্গে গল্প করছে। হেসে-হেসে। আমি চট ক'রে স'রে গেলুম অন্যদিকে। পুরীর টিকিট জোগাড় না-ক'রে ঝর্ণার চোখের সামনে দাঁড়াবার যোগ্যতা আমার নেই। বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একজন নাম-করা সাধুমহারাজ এসেছেন। ওঁর নাকি অনেকরকম

অলৌকিক ক্ষমতা আছে। উনি তৈরি ক'রে দিতে পারেননা চারখানা ট্রেনের টিকিট ? ওঃ, সে-বাড়ির সামনে গাড়িওয়ালা লোকদের ভিড়, আমাকে উনি পাত্তা দেবেন কেন ? ভবানীপুরে এক বাড়িতে টিউশনি করেছিলুম কিছুদিন। যে-ভদ্রলোকের ছেলেকে পড়াতুম, তার কাপড়ের ব্যবসা। ছেলেকে তিনি হস্টেলে ভর্তি ক'রে দিয়েছেন। মাস্টার হিসেবে আমাকে তিনি অপছন্দ করতেননা, ছেলেটির মা মারা গেল ব'লেই তাকে হস্টেলে পাঠানো হ'ল। সেই ভদ্রলোক কি পারেন টিকিটের ব্যবস্থা ক'রে দিতে ?

শেষ পর্যন্ত মনে পড়ল, সুদীপের কাছেই তো যাওয়া যেতে পারে। সুদীপ দুর্লভ রাশিয়ান ব্যালের একটি টিকিট এনে দিতে পারে আর চারখানা ট্রেনের টিকিট দিতে পারবেনা ? সুদীপের বাড়িতে যেতেই ওর সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাকে কিছু জিজ্ঞেসও করতে হ'ল না, সুদীপ নিজেই জানাল যে পরশু সে পুরী যাচ্ছে অফিসের কাজে। ঝর্ণারাও পুরী যেতে চায় শুনে সে ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে ওদের জন্যও টিকিট কিনে দিয়েছে। মোট চারখানা টিকিট। অতি সহজ ব্যাপার। এবারেও তো সুদীপের ওপর আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। ঝর্ণা তার মাকে নিয়ে পুরী যেতে চেয়েছিল, যেতে পারাটাই তো বড়ো কথা। আমার বদলে চলন্ত ট্রেনের জানলায় ঝর্ণার মুখোমুখি বসবে সুদীপ। সমুদ্রে সুদীপই ওর পাশে থাকবে। ঝর্ণা জানতেও পারবে না, ওদের টিকিট জোগাড়ের জন্য আমি কত চেষ্টা করেছি। আমি পারিনি, কিন্তু আমার বাসনার তীব্রতায় কোন খাদ ছিলনা।

আমি ব্যাপারটাকে খুব শান্তভাবে গ্রহণ করবার চেষ্টা করলুম। সুদীপ ভালো ছেলে, সে ঝর্ণা ও তার মাকে যত্ন করবে। সুদীপের দায়িত্বজ্ঞান আছে। ওরা তো আবার ফিরে আসবেই, তখন আবার ঝর্ণার সঙ্গে দেখা হবে।

তবু রাত আটটায় আমি ঝর্ণাদের বাড়ির কাছের মোড়টায় না-গিয়ে পারলুমনা। একবার, এক ঝলক ঝর্ণাকে দেখতে চাই। আর-কিছু না, শুধু চোখের দেখা। ঐ-মুখখানি দেখলেই মন ভালো হয়ে যায়।

ডানদিকের ফুটপাথে আমি কেন দাঁড়িয়েছিলুম ! ঝর্ণা বসেছে ট্যাক্সির বাঁদিকের জানলায়। চোখাচোখি হওয়া তো দূরের কথা, ঝর্ণাকে আমি দেখতেই পেলুমনা ভালো ক'রে। ট্যাক্সিটা হুস ক'রে বেরিয়ে গেল।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হ'ল, ঝর্ণা আর কোনদিনই আমার হবে না। কখনও থিয়েটার বা নাচ দেখতে যাওয়া হবেনা তার সঙ্গে, এক ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে ব'সে আমরা কোনদিন বেড়াতে যাবনা। সমুদ্র স্নান সেরে ঝর্ণা উঠে আসবে, সেখানে আমি থাকবনা। বুকটা এমন মুচড়ে উঠল যেন আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। পরক্ষণেই নিজেকে বোঝালুম, আরে, এতটা আঘাত পাবার কী আছে ? যারা

বাসের টিকিট, ট্রেনের টিকিট, লটারির টিকিট অতি সহজে পেয়ে যায়, তারাই তো নারীদের নিয়ে যায়। সুদীপই ঝর্ণার যোগ্য, আমি তো একটা এলেবেলে। আমার আবার এত দুঃখের বিলাসিতা কিসের ?

তবু আমি আপন মনে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরতে লাগলুম। কোথায় যাচ্ছি তার ঠিক নেই। একসময় খেয়াল হ'ল, হাওড়া ব্রিজের কাছে পৌঁছে গেছি। আরে যাঃ, এখন হাওড়া স্টেশনে যাওয়া যায় নাকি ? তাছাড়া এতক্ষণে বোধহয় ঝর্ণাদের পুরীর ট্রেন ছেড়ে গেছে।

আবার পেছন ফিরলুম। রাস্তাগুলো ক্রমশ ফাঁকা আর অন্ধকার হয়ে আসছে। এখন সব রাস্তাই অচেনা। কলকাতার এসব অঞ্চলে আগে কখনও আসিনি মনে হয়। বড়ো-বড়ো বাড়ি, মাঝখান দিয়ে গাছপালা ঢাকা সরু-সরু পথ। কোন-কোন বাড়ির ওপরের দিকের জানলায় আলো।

ক্রমশ পৃথিবীটা খুব নিজস্ব হয়ে এল। এখন আর কেউ নেই।

কিছুটা পরিশ্রান্ত হয়ে আমি একটি রেলিং ধ'রে দাঁড়ালুম। কত রাত এখন কে জানে। চমৎকার জ্যোৎস্না উঠছে। রেলিংয়ের ওপাশেই একটা বেশ বড়ো বাগান। অনেকরকম ফুল, কিন্তু রাত্রিবেলা কোন ফুলেরই রং বোঝা যায়না ! বাতাসে ফুলগুলি দুলছে, আমার নাকে এসে লাগছে সুগন্ধের ঝাপটা।

এত সুন্দর বাগান, এটা কার ?

সেই বাগানের সৌন্দর্য যেন ঝর্ণার মুখের মতন, চেয়ে থাকতে যেন চোখ ফেরানো যায়না। এই বাগানটা কোনদিন আমার হবেনা, আমি এইবাগানে ঢুকবনা, এর ফুল ছিঁড়বনা। তবু এই বাগানটা আমার বুক ভরিয়ে দিচ্ছে। ফুলগুলো খেলা করছে, ডাকাডাকি করছে পরস্পরকে। কখন যেন ঢেউয়ের ঝাপটায় লাফিয়ে উঠছে। শোনা যাচ্ছে জ্যোৎস্নার হাসির শব্দ।

এমন জ্যোৎস্নার একটা বাগান আমি কোনদিন নিজের ক'রে পাবনা। সে-প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু এখানে আমি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি। একটা চরম উপভোগে আমার শরীর যেন আবিষ্ট হয়ে আসছে। আমার আলিঙ্গনের মধ্যে ধরা দিয়েছে রূপ, আমার ওষ্ঠে চুম্বন করছে বাতাসের লাবণ্য। সুদীপ এ-কথা কোনদিন জানতে পারবেনা !

নীললোহিতের অন্তরঙ্গ

শ্রাবণী ও প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়কে

১

সেই গল্পটা আশা করি সবারই মনে আছে? সেই মহাভারতে, যুদ্ধের পর—ভীষ্ম শরশয্যায় রয়েছেন, যুধিষ্ঠির এসে তাঁকে রোজ নানারকম প্রশ্ন করেন—একদিন প্রশ্ন করলেন, দাদামশাই, নারী এবং পুরুষ—এদের মধ্যে কার জীবন বেশি সুখের? (কী সময় কী প্রশ্ন! তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, ভীষ্ম মরতে বসেছেন, তার ওপর পিঠে অতগুলো তীর বেঁধানো—এ-সময় তিনি বললেন নারী-পুরুষের সুখের কথা! তাছাড়া ভীষ্ম, যিনি সারাজীবনে কখনো কোন নারীকে স্পর্শ করেননি, তিনি ওদের সম্পর্কে কী জানবেন?)

কিন্তু দমলেন না ভীষ্ম। বললেন, প্রশ্নটা খুব জটিল বটে, কিন্তু এ-সম্পর্কে একটি আখ্যান আছে—তার থেকেই এর উত্তর পাওয়া যায়। পাঠকরা গল্পটা নিশ্চয়ই জানেন। আমি সংক্ষেপে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি। পুরাকালে ভঙ্গস্বন নামে এক রাজা ছিলেন (হাতের কাছে মহাভারত নেই, নামটাম একটু ভুল হতে পারে—কিন্তু তাতে কিছু যায়-আসেনা।)—একদিন তিনি শিকারে বেরিয়ে গভীর অরণ্যে হারিয়ে গেলেন। তারপর তৃষ্ণার্ত হয়ে খুঁজতে-খুঁজতে এক জলাশয়ের কাছে এলেন—সেই পুকুরটা ছিল অপ্সরাদের স্নানের জায়গা—পুরুষের সেখানে আগমন নিষিদ্ধ, রাজা তো জানেননা—তিনি যেই পুকুরে নেমেছেন, অমনি তিনি স্ত্রীলোক হয়ে গেলেন। পুরোনো সব কথাও তাঁর মন থেকে মুছে গেল। অনুচররা রাজাকে খুঁজে না-পেয়ে ফিরে গেল, রাজা ভঙ্গস্বন এক রূপসী রমণী হয়ে থেকে গেলেন বনে। ক্রমে এক ঋষিকুমারের সঙ্গে দেখা হল তাঁর, দর্শন থেকে প্রণয়, প্রণয় থেকে বিবাহ। ঋষির বউ হয়ে আশ্রমে অরণ্যে সুখে দিন কাটাতে লাগলেন তিনি। কয়েকটি ছেলেমেয়েও হল।

একদিন মহর্ষি নারদ খুঁজতে-খুঁজতে এসে দেখতে পেলেন। তাঁকে নারদ চিনতে পারলেন দিব্যদৃষ্টিতে। তিনি রাজাকে (এখন ঋষিপত্নী) বুঝিয়ে বললেন যে, তাঁর অভাবে রাজ্য ছারখারে যাচ্ছে—তাঁর আগের পক্ষের ছেলেরা ঝগড়াঝাঁটিতে মত্ত, সুতরাং তাঁর ফিরে যাওয়া উচিত। নারদ মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে তাঁকে আবার পুরুষ করে দিলেন।

আশ্রম ছেড়ে, এ-পক্ষের ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে ছেড়ে, রাজধানীতে ফিরে

এলেন রাজা। রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করলেন। কিন্তু মনে সুখ নেই তাঁর। নারদকে ডেকে রাজা বললেন,—আমাকে আবার রমণী করে দিন, রমণী অবস্থায় আমি যে সুখ ও আনন্দ পেয়েছি—তার তুলনায় পুরুষের জীবন তুচ্ছ! আমি আবার সেই ঋষির আশ্রমেই ফিরে যেতে চাই। সত্যি-সত্যিই, রাজ্য ছেড়ে আবার সেই ঋষির বউ হয়ে চলে গেলেন ভঙ্গস্বন। প্রমাণিত হল, নারীর জীবনই বেশি সুখের।

আমি প্রায়ই ভাবি—এখনকার দিনেও নারী-পুরুষের মধ্যে কে বেশি সুখী? এই নিয়ে যদি একটা বিতর্ক প্রতিযোগিতা আরম্ভ করা যায়, তাহলে বুঝতে পারছি, মেয়েরা জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়ে আসর সরগরম করে রাখবেন। প্রায়ই তো মেয়েদের মুখে অনুযোগ শুনি, আপনাদের ছেলেদের কী মজা! যখন যা খুশি করতে পারেন! জানি, সেই বিতর্কসভায় মেয়েরা প্রমাণ করে ছাড়বেন—তাঁদের জীবন নিতান্ত বিড়ম্বনাময়, পুরুষেরা তাঁদের স্বাধীনতা খর্ব করে রেখেছে ইত্যাদি। পুরুষদের জীবনের সুখের প্রমাণ হিসেবে—তাঁরা বলবেন, পুরুষরা যখন যেখানে খুশি যেতে পারে, পুরুষরা টাকা উপার্জন করে, তারা দেশ শাসন করে. ইত্যাদি-ইত্যাদি। এর সবকটার উত্তরই আমি দিতে পারি—মেয়েদের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে পারবনা, আড়াল থেকে।

আমার ধারণা, সব সভ্যতাই মাতৃতান্ত্রিক। পুরুষরা ক্রীতদাসমাত্র। তারা নির্বোধের মতন খেটে-খেটে মরছে, কিন্তু কৃতিত্ব ও মজাটুকু সব নিয়ে নেয় মেয়েরা। পুরুষরা টাকা উপার্জন করে ঠিকই, কিন্তু সেই টাকা খরচ করে মেয়েরা, অবহেলায়, বিলাসিতায় যা খুশি। পুরুষরা অকারণে যুদ্ধবিগ্রহ করে মরে, দুরন্ত নদীর ওপর ব্রিজ বানানো থেকে শুরু করে প্রাণ তুচ্ছ করে সিংহের সঙ্গে লড়াই পর্যন্ত—পুরুষদের এ-সবকিছুই কোন-কোন মেয়েকে খুশি করার জন্য। মেয়েরা এতেও খুশি হয়না, অবশ্য ঠোঁট উল্টে বলে, এ আর এমন কী, এ তো অনেকেই পারে। তুমি নিজে আলাদা বেশি কী পারো—তাই দেখাও! এই আলাদা হবার নেশা ধরিয়ে দেওয়াও মেয়েদের অন্যতম কৌশল। বেচারা পুরুষরা নদীতে ব্রিজ বানাবার পরেও আবার সমুদ্রে বাঁধ দিতে যায়, সিংহ হত্যা করার পর মানুষ হত্যায় মেতে ওঠে। ফরাসিরা বলে, 'শ্যারশো লা ফাম', মেয়েটাকে খুঁজে আনো—সব দুর্ঘটনার আড়াল থেকে সেই মেয়েটাকে খুঁজে আনো। দিল্লিতে থাকবার সময় একজন হাইকোর্টের বিচারপতিকে দেখেছিলাম আদালতে কী দোর্দণ্ডপ্রতাপ তাঁর—কিন্তু বাড়িতে তিনি পাঞ্জাবি না ড্রেসিং গাউন পরবেন—স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া সেটুকু নির্বাচনের স্বাধীনতাও তাঁর নেই। মেয়েরা ইচ্ছেমতন যেখানে-সেখানে যেতে পারেনা বটে, কিন্তু ইচ্ছেমতন যখন-তখন যেখানে-সেখানে পুরুষদের পাঠাবার ক্ষমতা তাদের আছে। যাও, পার্ক সার্কাস থেকে নিয়ে এসো মাংস, বাগবাজার

থেকে ইলিশ, বড়বাজার থেকে জর্দা—এসব হুকুম অবলীলাক্রমে বেরুবে তাদের মুখ থেকে। পুরুষদের চিন্তাভাবনা পরিকল্পনা এক নিমেষে বদলে দিতে পারে মেয়েরা। স্বামী ঠিক করেছেন ময়দানে মিটিং শুনতে যাবেন—স্ত্রী এসে বললেন, ওমা সেকি, আজ যে আমি সেজো মাসির বাড়িতে যাব—তাঁকে কথা দিয়ে ফেলেছি। এক বন্ধুর বাড়িতে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ নিয়ে আমরা তর্কে মত্ত, দেশ ও পৃথিবীর দুঃসময় নিয়ে বন্ধুটি অত্যন্ত চিন্তিত—বন্ধুপত্নী খানিকটা শুনলেন, বিরক্তভাবে হাই তুললেন, তারপর বললেন, দ্যাখো তো, অমুক হলে কী সিনেমা হচ্ছে? তোমার বন্ধু তো ওখানকার ম্যানেজার, ফোন করে দ্যাখো-না—এখন টিকিট পাওয়া যাবে কিনা! নিমেষে পৃথিবীর দুঃসময়ের কথা ফুৎকারে উড়ে গেল, আমরা ডুবে গেলাম, হিন্দি সিনেমার জগতে।

অন্যকথা থাক্। আমি মেয়েদের কয়েকটি বিশেষ সুবিধের কথা উল্লেখ করতে চাই। প্রথমেই বলা যায়, মেয়েদের দাড়ি কামাতে হয়না। এটা যে একটা কতবড়ো সুবিধে—মেয়েরা তা বুঝবেনা। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ, ছুটির দিন, কাজের দিন—এই যে প্রত্যেকদিন দাড়ি কামাবার অসহ্য একঘেয়েমি—এর হাত থেকে নিস্তার নেই পুরুষদের। আমি পারতপক্ষে আয়নার সামনে যেতে চাইনা—কিন্তু দাড়ি কামাবার সময় আয়নার সামনে মুখ আনতেই হয়—তখন নিজেকে ভেংচি কাটি রোজ। ঠিক সময় ব্লেড কিনতে ভুলে গেলে পুরোনো ব্লেডে গাল ঘষার সময় ইচ্ছে করে নিজের গলায় এক কোপ বসিয়ে দিই। দাড়ি রাখব, মাত্র দু-তিনদিন দাড়ি না কাটলেই মেয়েরা এমন বিশ্রীভাবে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। আর মেয়েরাই যদি—দেখে মুখ ঘুরিয়ে নেয়—তাহলে আর সে মুখের মূল্য কী?

মেয়েদেব আর-একটা সুবিধে তাদের শাড়ির কোন সাইজ নেই। যে-যার শাড়ি যখন-তখন পরতে পারে—নিত্যনতুন সাজপোশাকের অভাব হয়না তাদের। অথচ, বাড়ি থেকে বেরুবার আগে প্যান্ট-সার্ট নিয়ে আমার প্রতিদিন দুশ্চিন্তা। প্যান্ট কাচা আছে তো জামা ইস্তিরি নেই। প্রতিমাসে একবার নাপিতের কাঁচির নিচে মাথা পেতেও দিতে হয়না মেয়েদের—অথচ এই ব্যাপারটা আমার কাছে অসীম বিরক্তিকর।

আর থাক্! তবে অবশ্য আমাকে আরও যতবার জন্ম নেবার সুযোগ দেওয়া হবে—আমি পুরুষই হতে চাইব। কারণ, একটি জিনিশ মেয়েরা একেবারেই পারেনা—কিন্তু পুরুষদের সে-ক্ষমতা আছে। মেয়েরা মেয়েদের ভালোবাসতে পারেনা, আমরা পারি। মেয়েদের দোষ মেয়েদেরই শুধু চোখে পড়ে, আমরা ও-ব্যাপারে একেবারেই অন্ধ।

২

আমি ভাবছিলাম আমি কোন দলে? কোলিয়ারির অফিসঘরে বসে আছি। সকালবেলা ভারী ব্রেকফাস্ট খাওয়া হয়েছে : চৌধুরি সাহেব খুব অতিথিবৎসল, তাঁর বাড়িতে খাওয়াদাওয়ার এলাহি বন্দোবস্ত। সকালেই চায়ের সঙ্গে টোস্ট, বেকন, মার্মালেড আর খাঁটি ক্ষীর খাওয়ালেন, তারপর বললেন, চলুন আমার সঙ্গে। খনির মধ্যে নামবেন তো।

খনিতে নামার ব্যাপারে আমার খুব উৎসাহ। খনি অঞ্চলে বেড়াতে এসে একবার অন্তত ভূগর্ভের অন্ধকার না-দেখার কোন মানে হয়না। মৃত্যুর পর তো নরকে যাবই, সুতরাং তার আগেই একবার পাতালের কাছাকাছি ঘুরে আসা যাক।

চৌধুরি সাহেব এখানকার চারটে খনির এজেন্ট অর্থাৎ এই বিস্তীর্ণ এলাকার দণ্ডমুণ্ডের বকলম অধিকর্তা। মালিকের অনুপস্থিতিতে প্রতিনিধি হিসেবে তিনিই এখানকার সব। একদিন আমার এক বন্ধুকে কথায়-কথায় বলছিলাম, আমার কিছুদিন খনি অঞ্চলে গিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে খুব। বন্ধুটি সঙ্গে-সঙ্গে বলেছিলেন, চলে যা না। আমার এক মাসতুতো দাদার আণ্ডারে চারটে খনি আছে, চিঠি লিখে দিচ্ছি, চলে যা।

সেই চিঠি নিয়েই এখানে আসা। চৌধুরি সাহেব ব্যস্ত মানুষ, কোলিয়ারি ছেড়ে বাইরে প্রায় যাওয়াই হয়না—অনেকদিন পর শহরের লোক পেয়ে তিনি খুশি হয়ে ওঠেন। অমায়িক, হাসিখুশি মানুষ—সাহিত্য-শিল্পেও উৎসাহ আছে, শরীরটাও মজবুত।

খাদে নামব সব ঠিকঠাক মাথায় সাদা রঙের হেলমেট পরে নিয়েছি, কোমরেও চওড়া বেল্ট লাগানো, ব্যাটারি—হাতে জোরালো টর্চ—চৌধুরি সাহেব নিজে আমার সঙ্গে নামবেন, এমন সময় একটা দূরপাল্লার টেলিফোন এলো। চৌধুরি সাহেব বললেন, তাহলে আর-একটু বসুন, আর-এককাপ চা খেয়ে নিন বরং, আমি টেলিফোনটা সেরে নিচ্ছি।

সেই থেকে আরও দেরি হয়ে গেল। টেলিফোন শেষ হয়েছে, এমন সময় আর্দালি এসে খবর দিল, সেই চারজন লোক আবার দেখা করতে এসেছে। 'সেই চারজন' শুনেই বিরক্তিতে চৌধুরি সাহেবের মুখ কুঁচকে গেল, বিড়বিড় করে কী যেন বললেন, আর্দালিকে কিন্তু বললেন, যাও ডেকে নিয়ে এসো। আমার দিকে চোখের এমন একটা হতাশ ইঙ্গিত করলেন, যার অর্থ, আরও খানিকক্ষণ বসতেই হবে।

ভেবেছিলাম, হোমরাচোমরা কেউ হবে, কিন্তু সেই চারজনকে দেখে আমি

হতাশ হলাম। চারজন অতি সাধারণ গেঁয়ো লোক—একজন ছোকরা আর তিনজন বুড়ো, বুড়োদের মধ্যে একজনের গায়ে ফতুয়া আর চোখে গোল চশমা—নিকেলের ফ্রেম, বাংলা নাটক এবং সিনেমায় গ্রাম্য কুচক্রী বদমাইশদের চেহারা যেমন থাকে—সেইরকম। তারা এসে বলল, স্যার সেই জমির ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলতে এলাম।

চৌধুরি সাহেবের মুখের বিরক্ত ভঙ্গি তখন সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, হেসে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন বসুন, এই রঘুয়া, বাবুদের চেয়ার দে। চা খাবেন তো?

গোল-চশমা-বুড়োটি বিগলিতভাবে বলল, না স্যার। আপনি ব্যস্ত লোক, বেশি সময় নষ্ট করবনা—আমাদের সেই জমিতে জল ঢোকার ব্যাপারে...

চৌধুরি সাহেব বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেসব কথা হবে। আগে চা খান। চা খেতে আপত্তি কী! এই রঘুয়া—

আমি একপাশে চুপ করে বসে সিগারেট ধরালাম। লক্ষ করলাম দিনকাল সত্যিই অনেক বদলে গেছে। চৌধুরি সাহেব তিন হাজার টাকার মতন মাইনে পান, ফুলবাগান সমেত বিশাল কম্পাউণ্ড নিয়ে তার বাড়ি, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য দুখানি মোটর গাড়ি। তাঁকে কেউ চৌধুরিবাবু বলবেনা, বলবে চৌধুরি সাহেব। ইসব সাহেবরা তো চিরকালই ঐধরনের গেঁয়ো লোকদের তুইতুকারি বলে কথা বলেছেন, হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা—এইসব আদরের সম্বোধন করেছেন। চেয়ারে বসানো? চা খাওয়ানো? স্বপ্ন বলে মনে হয়। শুধু যে চৌধুরি সাহেবই ওদের চেয়ারে বসিয়ে চা খাওয়ানোর জন্য ব্যস্ত, তাই নয়, ঐ হেঁজিপেঁজি গেঁয়ো লোকগুলোও কিন্তু চেয়ারে বসতে একটুও আড়ষ্ট বোধ করলনা, অবলীলাক্রমে চুমুক দিল চায়ের কাপে—একজন আবার আর্দালির দিকে চেয়ে বলল, আর-একটু চিনি দাও হে। ঠিক মিঠা হয়নি।

ধীরেসুস্থে চা শেষ করে তারা বক্তব্য শুরু করল। গাঁয়ের অশিক্ষিত অর্ধনগ্ন লোক হলেও তেমনটি আর হাবাগোবা নেই, বেশ গুছিয়ে কথা বলতে জানে—এমনকী দু-চারটে ইংরেজি শব্দও ব্যবহার করে।

বৃত্তান্তটি এই। ওরা কোলিয়ারি সংলগ্ন গ্রামের চাষা। কোলিয়ারির বয়লার থেকে বিষাক্ত গরমজল ওদের জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেছে, তাতে জমির ফসলই শুধু নষ্ট হয়নি। জমি একেবারে চাষের অযোগ্য ঊষর হয়ে গেছে। সেইজন্য ওরা কমপেনসেশন চায়। সেই জল পুকুরে পড়ায় পুকুরের মাছও মরে গেছে। সুতরাং ওদের মহাসর্বনাশ, ওরা খাবে কী? ওরা ক্ষতিপূরণ চায়—তার অঙ্কও নেহাৎ কম নয়।

চৌধুরি সাহেবের বক্তব্য, গরমজল গড়িয়ে গেছে ঠিকই, সেই জল ফসলের

গোড়ায় লাগলে ফসলও মরে যেতে পারে—কিন্তু ঐ জল মোটেই বিষাক্ত নয়, ঐ জল শিশিতে ভরে ডিস্টিলড ওয়াটার হিসেবে বেচা যায় পর্যন্ত। সুতরাং জমি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কথাটা বাজে, পুকুরে মাছ মরে যাবার কথাটা গুজব—এখন ক্যানাল কেটে দেওয়া হয়েছে—এখন সমস্ত জমির ওপর জল ছড়ায়না—এবং পুকুর পর্যন্ত পৌঁছুতে -পৌঁছুতে জল ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ঐ জলকে বিষাক্ত বলার কোন মানে হয়না।

নিকেল-চশমা-বুড়ো বলল, না স্যার, জমির ঘাসগুলো পর্যন্ত একেবারে হলদে হয়ে গেছে। সেই ঘাস মুখে দিয়ে একটা গরু...

চৌধুরি সাহেব ওর বাক্যের মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে বললেন, মরে গেছে তো? গরুটা ঘাস মুখে দিল আর ধপাস করে মরে পড়ে গেল। তাই না? শুনেছি আমি সে-গল্প। কিন্তু সেই মরা গরুটা কে দেখেছেন আপনাদের মধ্যে? কেউ দেখেছে?

—আজ্ঞা স্যার, গদাই—

গদাই বলেছে তো? জানি, তাও জানি। গদাইয়ের নিজের কি কোন গরু আছে? আপনাদের সারা গাঁয়ে একমাসের মধ্যে একটাও গরু মরেনি—আমি খবর নিয়েছি। গদাই তো বলবেই! সে অমুক পার্টির লোক—সে তো চায়ই সবসময় একটা হাঙ্গামা বাধাতে—সে আবার আজকাল লিডার হচ্ছে?

—তাহলে আমাদের ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটার এবার একটা ফয়সালা করেন।

মুখ থেকে পাইপটা সরিয়ে চৌধুরি সাহেব এবার উঠে দাঁড়ালেন। বেশ আবেগের সঙ্গে বলতে লাগলেন, আপনাদের যদি চাষের ক্ষতি হয়ে থাকে—তবে তার ক্ষতিপূরণ কম্পানি নিশ্চয়ই দেবে। স্থানীয় লোকের অসুবিধে করে কম্পানি ব্যবসা চালাবেনা। কিন্তু, আমি একটা কথা বলছি শুনুন। এই যে জমি নষ্ট হয়ে গেছে—এ-গুজব ছড়াবেননা। ঐ জমি আবার চাষ করুন। আমাদের দেশে এখন আরও খাদ্যের দরকার। আমি নিজের পকেট থেকে আপনাদের বীজ ধানের খরচা দিচ্ছি। বয়লারের জল আমি অনায়াসেই অন্যদিকে ঘুরিয়ে নদীতে ফেলে দিতে পারি। কিন্তু আপনাদেরই চাষের সুবিধের জন্য ঘণ্টায় চারশো গ্যালন করে জল বিনাপয়সায় পাচ্ছেন—সেই জল পুকুরে জমিয়ে যদি সেচের কাজে লাগান—

—ও-জল কেউ ছোঁবেনা। সবাই জানে, ওতে বিষ আছে।

—বিষ আছে? চলুন আপনাদের সঙ্গে আমি যাচ্ছি—আমি নিজে আপনাদের সামনে সেই জল খেয়ে দেখাব কেউ মরে কিনা—আমারও তো প্রাণের দাম আছে? নাকি নেই?

—গাঁয়ের লোকে আমাদের পাঠিয়েছে, আপনি ক্ষতিপূরণের টাকাটার কথা বলুন স্যার। ও-জমিতে আর ফসল হবেনা—মেহনত করে রক্ত সব ঘাম করে

ফেললেও কিছু হবেনা—

ব্যাপারটা অত্যন্ত ঘোরালো। আমি বাইরের লোক, আমার কোন কথা বলা উচিত নয় বলেই আমি চুপ করে রইলাম। মনে-মনে ভাবতে লাগলাম, আমি কোন দলে? কোন পক্ষ আমি সমর্থন করব? চৌধুরি সাহেব যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, তা কি পুরো সত্যি? কমপেনসেশনের কথাটা এড়িয়ে গিয়ে তিনি ভাব দেখাচ্ছেন যেন তিনি ওদের উপকার করার জন্যই ব্যগ্র। কিন্তু কোথাও একটা গোলমাল আছে। কমপেনসেশনের টাকা একবার দিলে কি বার বার দিতে হবে? জল সরাবার সত্যিই কি অন্য উপায় আছে? এ-কথা ঠিক, চৌধুরি সাহেব কোম্পানির স্বার্থ টেনেই কথা বলবেন। কোম্পানি তাকে তিন হাজার টাকা মাইনে দিচ্ছে কি এমনি-এমনি? লোকগুলোকে আপনি বলা, চা খাওয়ানো--এ সবই হয়তো কৌশল, সহজে কাজ হাসিল করবার চেষ্টা। একটা জটিল সমস্যার সহজ মীমাংসা করতে পারলে তিনি মালিকের কাছ থেকে বাহবা পাবেন—সেইজন্যই কি দেশের খাদ্যসমস্যার উল্লেখ করে তাঁর গলায় ওরকম আবেগ ফুটেছে?

আমি চৌধুরি সাহেবের পক্ষে নই। চৌধুরি সাহেব দেখছেন মালিকের স্বার্থ। যে-মালিক নিষ্কর্মাভাবে রাজস্থান বা গুজরাটে বসে থেকে মোটা মুনাফা ভোগ করছে। আমি কেন তার পক্ষে যাব? চৌধুরি সাহেবের আত্মীয় আমার বন্ধু, তার চিঠি আমি নিয়ে এসেছি—এবং আমি লিখিটিখি শুনে তিনি আমাকে খাতির করছেন। কিন্তু বিনা সুপারিশে যদি আসতাম, উনি আমাকে নিশ্চিত পাত্তাই দিতেননা। আমি একজন সাধারণ লোক—আমি কেন ঐ বুর্জোয়াদের পক্ষে যাব?

আমি কি ঐ গ্রাম্যলোকগুলোর পক্ষে? তাতেও আমার মন সায় দিচ্ছে না। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বয়লারের জলকে বিষাক্ত বলা ওদের ইচ্ছাকৃত গুজবরটনা। গরু মরার খবরটা মিথ্যে। লোকগুলোর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়—ওরা অলস আর ধূর্ত। খেটে খাব শ্রমের যথার্থ মূল্য চাইব—এরকম কোন মনোভাব ওদের নেই। এখানকার জমিতে কঠিন পরিশ্রম করে ফসল ফলাতে হয়—সেই পরিশ্রম এড়াতে চাইছে। গ্রামের সরল, নির্যাতিত চাষা এদের কিছুতেই বলা যাবেনা। আবার জমি চাষ করলেই যদি প্রমাণ হয়—জমি নষ্ট হয়নি—সেইজন্য চাষের কথা তুলতেই চাইছেনা। ভাবখানা এই, এজেন্ট সাহেবকে এবার খুব প্যাঁচে পাওয়া গেছে—ওঁর কাছ থেকে যতটা পারা যায় টাকা খিঁচে নিয়ে তারপর পায়ের ওপর পা দিয়ে খাওয়া যাবে! যদি রাজি না হয় তাহলে আন্দোলন, শ্রমিক ধর্মঘটের ভয় দেখালেই হবে। না, ঐ নিষ্কর্মা মতলববাজগুলোর পক্ষ সমর্থন করাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আমি কোন দলেই যেতে পারবনা। আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, মাঝখানে ঝুলে

থাকাই আমার নিয়তি। আমার বুকের মধ্যে একটা অপ্রয়োজনীয় বিবেক আর গুচ্ছের যুক্তি ঠাসা। সুযোগ পেলে, ঐ দুজনই আমাকে লাথি মারবে।

ধুত্তোর! এর চেয়ে খনিতে নেমে অন্ধকারে ঘুরলে অনেক বেশি ভালো লাগত!

৩

কী খাবেন বলুন? চা না কফি? আমি রীতিমতন চিন্তার ভান করে বললাম, উঁ, কোনটা খাওয়া যায়? কিছু কি খেতেই হবে? দুটোর একটাও যদি না খাই?

ঝর্না হেসে ফেলে বলল, আপনি না খেতে চাইলে কি আপনাকে আমি জোর করে খাওয়াব? কেন, কিছু খাবেননা কেন? ঠাণ্ডা কিছু খাবেন?

—ঠাণ্ডা মানে?

—স্কোয়াশ আছে। লেমনেড বা কোকোকোলা আনিয়ে দিতে পারি। যা গরম পড়েছে।

—না, না, ওসব নয়! গরমে গরম জিনিশই আমার পছন্দ। আচ্ছা, এক কাপ চা-ই দিন। শুধু চা কিন্তু, না থাক, বরং কফিই করুন। কিংবা চা—কোনটা তাড়াতাড়ি হবে?

—আপনি কোনটা খাবেন বলুন-না! কতক্ষণ আর লাগবে?

—আপনাকেই বানাতে হবে তো? না লোক আছে? তাহলে ওসব থাক না, এই তো বেশ বসে-বসে গল্প হচ্ছে।

—যাঃ, আপনি ঠিক করে কিছু বলতে পারেননা। দাঁড়ান চা করে আনছি। আমারও চা খেতে ইচ্ছে করছে!

ঝর্না চা করে আনতে গেল। গরমজল চাপিয়েই তার ফিরে আসার কথা। তারপর জল গরম হলে আবার গিয়ে চা ভেজাবে। কিন্তু এলনা। আমি উঁকি মেরে দরজার কাছে দেখলাম, ঝর্না হিটারে কেটলি চাপিয়ে কাপ-ডিস ধুচ্ছে। চা বানিয়ে ওর আসতে আরও চার-পাঁচ মিনিট লাগবেই।

আমি সতর্ক ক্ষিপ্র পায়ে এগিয়ে গেলাম টেবিলের দিকে। টেবিলের ওপরেই চাবির গোছা পড়ে ছিল। আলমারির চাবিটা খুঁজে বার করতে একটু সময় লাগল। তারপর আলমারির পাল্লায় যাতে ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ না হয়, সেইজন্য খুব সাবধানে নিঃশব্দে আমি আলমারিটা খুলে ফেললাম। এতক্ষণ চা-কফির নামে টালবাহনা করতে-করতে আসলে আমি মনস্থির করে নিচ্ছিলাম।

পাঠক নিশ্চয়ই আমাকে চোর ভাবছেন। তা ভাবুন, কী আর করা যাবে! অবস্থার গতিকে মানুষ কত কী করে!

ঝর্নার সঙ্গে আমার বন্ধু সুকান্তর বিয়ে হয়েছে। বছরখানেক মাত্র, তাও বিয়ের পর মাসখানেকের জন্য ওরা সাউথ ইন্ডিয়ায় বেড়াতে গিয়েছিল, তারপর ঝর্না দুমাস ছিল পাটনায় ওর বাপের বাড়ি। সুতরাং ঝর্নার সঙ্গে ভালো করে আমার আলাপই হয়নি। এই তো কয়েকমাস মাত্র ওরা নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে গুছিয়ে বসেছে।

সুকান্ত যখন বাড়ি থাকেনা, সেই সময়টা জেনেই এসেছি। সুকান্তটা মহা ধুরন্ধর ছেলে, ও বাড়িতে থাকলে সুবিধে হবেনা। এখন ফ্ল্যাটে শুধু বাচ্চা চাকর আর ঝর্না। ঝর্না শুধু সুন্দরীই নয়, মনটাও খুব নরম। এই আমার সুযোগ। পাঠক, নিশ্চয়ই আমাকে চোর ছাড়াও অন্যকিছু ভাবছেন। তা ভাবুন, কী আর করা যাবে।

ঝর্না চা নিয়ে ফিরে আসার আগেই আমি আবার আমার জায়গায় ফিরে এসে বসেছি। আলমারি যথারীতি বন্ধ। চাবি আবার টেবিলের ওপর।

চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, অপূর্ব। অনেকদিন এমন সুন্দর চা খাইনি!

ঝর্না জিজ্ঞেস করল, চিনি ঠিক হয়েছে তো? আপনি কতটা চিনি খান জানিনা।

আমি বললাম, একেবারে নিখুঁত হয়েছে। এক-একজনের হাতই এমন থাকে যে সেই হাতে চা বানালে কতটা চিনি কতটা দুধ তার কোন প্রশ্নই আসেনা—

বাবারে বাবা! এই কথাটা যে ছেলেরা কত মেয়েকেই বলতে পারে!

—আপনাকে আগে কেউ এরকম বলেছে?

—বলেনি আবার!

—কিন্তু কথাটা পুরোনো হয়ে গেছে কি? শুনলে এখনো একটু-একটু আনন্দ হয়না?

ঝর্না হাসল। প্রসঙ্গ বদলে বলল, আপনার বন্ধুর কাছ থেকে আপনার অনেক গল্প শুনেছি, আগে খুব দেখা হতো আপনাদের দুজনের তাইনা? কই আপনি তো এ-বাড়িতে বেশি আসেননা।

—সুকান্ত আর চায়না যে আমরা এখানে বেশি আসি।

—যাঃ! ও বলেছে একথা?

—ঠিক মুখে বলেনি—কিন্তু এখন নতুনভাবে ঘরটর সাজিয়েছে, সুন্দরী স্ত্রী বাড়িতে—এখন আর ব্যাচিলর আমলের বন্ধুদের কেউ তেমন পছন্দ করেনা!

—মোটেই নয়। দাঁড়ান, ও আজ আসুক তো—আজ আপনার সামনেই ওকে জিজ্ঞেস করব। ও এক্ষুনি ফিরবে।

—এখন ফিরবে? এখন তো সাড়ে চারটে বাজে। সুকান্তর অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতে সাড়ে ছটা-সাতটা হয়না?

—অন্যদিন তাই হয়, তবে আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। আজ ইভনিং শো-এ একটা সিনেমায় যাবার কথা আছে।

সুকান্ত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে শুনে আমি চঞ্চল হয়ে উঠলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, তাহলে আমি আজ চলি। আমার একটু কাজ আছে।

ঝর্না অবাক হয়ে বলল, এক্ষুনি যাবেন? ওর সঙ্গে দেখা করে যাবেননা?

—আজ আর না, আর-একদিন ..

প্রায় দরজার কাছে চলে এসেছি, এইসময় ঝর্না আমার হাতের বইগুলো লক্ষ করল। জিজ্ঞেস করল, আপনার কাছে, ওগুলো কী বই? গল্পের বই আছে নাকি—অনেকদিন পড়িনি—

আমি একগাল হেসে বললাম, ও আপনাকে বলতে ভুলেই গেছি। দেখুন তো কী ভুলো মন আমার। এগুলো আপনাদেরই বই। সুকান্তকে বলবেন এগুলো আমি পড়তে নিয়ে গেলাম।

ঝর্নার মুখখানা কালো হয়ে গেল। লীলায়িত হাতে চূর্ণ অলক ঠিক করছিল, হাতখানা রয়ে গেলে সেখানেই। বলল, কোথায় ছিল বইগুলো?

আমি কিন্তু মুখের হাসি মুছিনি। বললাম, আলমারিতে, আপনি যখন চা করতে গিয়েছিলেন, তখন আপনাদের আলমারির বইগুলো দেখছিলাম। অনেকদিন ধরেই এই বইগুলো—

ঝর্না বলল, ও কিন্তু বইয়ের আলমারিতে কেউ হাত দিলে বড়ো রাগ করে। আমাকে স্ট্রিক্টলি বারণ করে দিয়েছে কারুকে বই দিতে—

সে কি আর আমি জানিনা। সুকান্তর স্বভাব এতদিন বাদে ঝর্না আমাকে বোঝাবে? এমনকী, বইয়ের আলমারির এককোণে ছোট্ট নোটিশ ঝুলিয়ে রেখেছে, 'আমার একখানা পাঁজরা চান দিতে রাজি আছি। বই চাইবেননা।'

আমি তবু হা হা করে হেসে বললাম, আরে, ওসব কথা অন্যদের জন্য। সুকান্তর সঙ্গে আমার সেরকম সম্পর্কই নয়। আমরা হস্টেলে এক ঘরে থাকতাম, এক বিছানায় শুয়েছি, এক ব্লেডে দাড়ি কামিয়েছি—

সেই মুহূর্তে জুতো মশমশিয়ে সুকান্ত এসে ঢুকল। আমাকে দেখে বলল, কী রে, আজকাল পাত্তাই পাইনা কেন তোর।

ঝর্না এমনিতে খুব ভদ্র। সুকান্ত ফেরামাত্রই বইয়ের কথা তুললনা। বরং মুখোজ্জ্বল করে বলল, আপনি তাহলে আর-একটু বসুন। এক্ষুনি যাবেন কী?

খানিকটা বাদে সুকান্ত যখন ঘন-ঘন আমার হাতের বইগুলোর দিকে

তাকাচ্ছে, আমি নিজে থেকেই বললাম, সুকান্ত, আমি এই কটা বই পড়তে নিচ্ছি, কবে ফেরত দেব ঠিক নেই। তাড়া দিসনি।

সুকান্তর মুখখানাও কালো হয়ে গেল। ঝর্নার দিকে একবার কটমট করে তাকাল। অর্থাৎ, তুমি বুঝি ওকে আলমারি খুলে দিয়েছ? তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কঠিনভাবে বলল, দেখি, কী কী বই?

আমি সহাস্যে বইগুলো এগিয়ে দিলাম। পাঁচখানা বই, সুকান্ত প্রত্যেকটার পাতা উল্টে দেখল, মুখ তুলে আমার চোখে চোখ রাখল। আমিও তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইলাম। দুটি নেকড়ে বাঘ যেন পরস্পরের ওপর লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি।

ঝর্না আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনি তাহলে আর-একটু চা খান! ওর জন্য তো চা করবই—

—হ্যাঁ চা খাব। সঙ্গে যদি আরও কিছু থাকে, তাতেও আপত্তি নেই।

ঝর্না ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া মাত্রই আমি সুকান্তকে ফিসফিস করে বললাম, দ্যাখ চাঁদু, বেশি চালাকি করবি তো বউয়ের সামনে প্রেসটিজ পাংকচার করে দেব!

ঝর্না ঘরে ফেরা মাত্রই সুকান্ত অতিশয় উৎসাহ দেখিয়ে বলল, আরে, ওর কথা আলাদা। ও যখন যে-বই চাইবে দেবে। ও আমার কতকালের বন্ধু, ওর সঙ্গে আমি...

সুকান্তর আলমারি থেকে যে-পাঁচখানা বই বেছে নিয়েছি, তার প্রত্যেকটিই আমার। এর মধ্যে একখানা আবার ব্রিটিশ কাউন্সিলের বই, আমাকে টাকা গচ্চা দিতে হয়েছে। সুকান্ত বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে বই নিয়ে চিরকাল মেরে দিয়েছে। বেশি পীড়াপীড়ি করলে সুকান্ত মুখ কাচুমাচু করে বলত, বইগুলো হারিয়ে গেছে!

এখন সুকান্ত বিয়ে করেছে। ওর বউ আলমারি কিনে সব বই সাজিয়ে রেখেছে। এখন এই আমাদের সুযোগ মাঝে-মাঝে ওর বাড়িতে এসে চা খাওয়া ও বইগুলো ফেরত নিয়ে যাওয়া।

৪

ছেলেবেলায় ইস্কুলে সবাইকেই প্রায় একটা রচনা লিখতে হয়। তোমাকে যদি এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তুমি কী করিবে? আমি লিখেছিলাম, আমি ঐ টাকা দিয়ে একটা ছোটখাটো জাহাজ কিনে কোন একটা দ্বীপ দেখতে যাব। খুব বকুনি খেয়েছিলাম মাস্টারমশাইয়ের কাছে। কেননা, ঐসব রচনায় লিখতে হয়, টাকা পেলে ইস্কুল বানাব কিংবা হাসপাতাল করব কিংবা গরিব দুঃখীকে দান

করব—এই ধরনের। একেই তো আমার বাংলা লেখা খুবই কাঁচা, তার ওপর ঐরকম স্বার্থপর চিন্তা—সেই রচনায় আমি কুড়ির মধ্যে ছয় পেয়েছিলাম মোটে। কুড়ির মধ্যে আঠারো পেয়েছিল শৈবাল, আমারই পাশে বসত সে। শৈবাল সবিস্তারে প্রচুর আবেগের সঙ্গে বর্ণনা দিয়েছিল, ঐ টাকায় সে তাদের দেশের গ্রাম থেকে শহর পর্যন্ত একটা রাস্তা তৈরি করে দেবে, গ্রামবাসীর অনেক দুঃখ দূর হবে।

যাইহোক, আমি এখনো আমার মত বদলাইনি। কিংবা আমার মত বদলাবার সুযোগ দেবার জন্য কেউ আমাকে একলক্ষ টাকা দিয়েও দেখেনি। সুতরাং আমি কল্পনা করতে ভালোবাসি যে, ঐরকম কিছু টাকা পেয়ে গেলে আমি একটা জাহাজ কিনে ফেলবই—এবং সেই জাহাজে চড়ে নতুন-নতুন দ্বীপ দেখতে যাব। একলক্ষ টাকায় জাহাজ পাওয়া না-যাক, ছোটখাটো স্টিমার বা মোটরবোট হলেও আমার চলবে। এক-একজন মানুষের জীবনে এক-একটা বিশেষ শখ থাকে—আমার শখ, কোন জনমানবহীন দ্বীপে বেড়াতে যাওয়া। কোনদিন এই শখটা মিটবেনা বলেই কল্পনা করতে বেশি ভালো লাগে। এইজন্যই, 'পদ্মানদীর মাঝি'র হোসেন মিঞা আমার প্রিয় চরিত্র।

গতসপ্তাহে আমার স্কুলের বন্ধু পরিতোষের সঙ্গে বহুদিন পর দেখা। সে বলল, খবর শুনেছিস?

—কী খবর?

—তুই শুনিসনি এখনো? সব্বাই জানে—শৈবাল লটারির টাকা পেয়েছে।

—কোন শৈবাল?

—সেই যে ইস্কুলে আমাদের সঙ্গে পড়ত, আমরা বলতাম মোটা শৈবাল—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই নাকি? কোন লটারি, কত টাকা?

শৈবাল স্কুলে পড়াশুনোয় বেশ ভালো ছেলে ছিল। বাংলায় ফার্স্ট হতো প্রত্যেকবার। কিন্তু সেজন্য সে এখন বাংলার অধ্যাপক কিংবা সাহিত্যিক হয়নি, কী একটা ওষুধের কম্পানিতে কেমিস্টের চাকরি করে। স্কুলে ওর পাশাপাশি বসতাম আমি, অথচ বহুকাল ওর সঙ্গে দেখা হয়না।

পরিতোষের সঙ্গে শৈবালের এখনো যোগাযোগ আছে। পরিতোষ বলল, চল, শৈবালকে কংগ্রাচুলেশান জানিয়ে আসি! লটারিতে প্রাইজ পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা, ক্ষণজন্মা লোক না-হলে পায়না!

খবরের কাগজে প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহেই লটারির ফলাফলের বিজ্ঞাপন দেখতে পাই। অর্থাৎ প্রত্যেক সপ্তাহেই এদেশে একজন নতুন লাখপতি জন্মাচ্ছে। ভারি চমৎকার লাগে ভাবতে। এইরকমভাবে ভারতের পঞ্চান্ন কোটি লোকই যদি কোন

একদিন লাখপতি হয়ে যায় তাহলে এক অপূর্ব সোসালিজমের জন্ম হবে। আমি লটারির টিকিট কাটিনা—কারণ একথা ঠিক জানি, পঞ্চান্ন কোটি লোকের আর সব্বাই যদি লাখপতি হয়ে যায়—তাহলে আমি তো আর একা বাকি থাকতে পারিনা—তাতে দেশের বদনাম হবে। তখন গভর্নমেণ্ট থেকে এমনি-এমনিই একলাখ টাকা দিয়ে দেবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু আমি এ-পর্যন্ত কোন লটারির টাকা-পাওয়া লোককে স্বচক্ষে দেখিনি। ফার্স্ট প্রাইজ তো দূরের কথা, একশো টাকার প্রাইজও চেনাশুনো কেউ পেয়েছে বলে শুনিনি। অচেনা লোকরাই ওসব পায়। কিন্তু শৈবাল, আমাদেরই স্কুলে পড়ত যে মোটা শৈবাল, সে প্রাইজ পেয়েছে, তাকে একবার চোখে দেখার লোভ সামলাতে পারলামনা। গেলাম পরিতোষের সঙ্গে।

গিয়ে শুনলাম শৈবাল তখনো অফিস থেকে ফেরেনি। শৈবালের স্ত্রী অলকা চেনে পরিতোষকে। সে আমাদের বসতে বলল। শৈবালের বোন অঞ্জনা, যাকে ছেলেবেলায় চিনতাম, চা দিয়ে গেল। চায়ের সঙ্গে দুটি ক্রিম ক্র্যাকার।

আমি আশা করেছিলাম, এসে দেখব, সারা বাড়িতে একটা বিরাট হৈ-চৈ চলছে, প্রচুর আত্মীয়-স্বজন এসেছে, দারুণ খাওয়াদাওয়া। লাখ টাকা প্রাইজ পেয়েও শৈবাল অফিস যাবে—এটাও আশা করা যায়না। অলকা আর অঞ্জনার মুখে কোন চাপা উল্লাসের চিহ্নও নেই; অঞ্জনা আমাদের সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে ভিতরে চলে গেল। পরিতোষ ফিসফিস করে আমাকে জানাল, অঞ্জনা একটা বখাটে ছেলেকে বিয়ে করতে চায় বলে—ওকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেওয়া হয়না।

একটু বাদেই শৈবাল এল, বেশ-কিছুটা অবাক, খানিকটা খুশিও হল। জিজ্ঞেস করল, চা খেয়েছিস? আমাদের চা খাওয়া হয়ে গেছে শুনে ও আর দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলনা—শুধু নিজের জন্য চা দিতে বলল। অনুযোগ করে জানাল অফিসে বড্ড কাজের চাপ, রোজ ওভারটাইম করতে হয়—সাড়ে-ছটার আগে বেরুতে পারেনা।

শৈবাল গেল অফিসের জামা-কাপড় ছেড়ে আসতে। পরিতোষ আবার ফিসফিস করে বলল, এতগুলো টাকা পেয়েও শৈবালটা কীরকম কিপ্যুস আছে দেখলি? এতদিন বাদে এলাম, দিল কিনা শুকনো চা-বিস্কুট।

—বাঃ, টাকা পেয়েছে বলেই কি দুহাতে ওড়াবে নাকি?

—ওড়ানোর কথা হচ্ছেনা। চায়ের সঙ্গে দুটো সিঙ্গাড়া আর সন্দেশ দিতে পারতনা?

—চুপ, শৈবাল আর অলকা আসছে।

কথায়-কথায় লটারির টাকা পাওয়ার কথা উঠলই। শৈবাল পেয়েছে হরিয়ানার

সেকেন্ড প্রাইজ একলক্ষ টাকা। অলকা রীতিমতন আপশোশ করতে লাগল, ফার্স্ট প্রাইজ না-পাওয়ার জন্য। ফার্স্ট প্রাইজ ছিল পাঁচলক্ষ টাকা। একবার লাক কেটে গেলে আর কি পাওয়া যায়! অলকা নাকি আগেই ভেবেছিল সি গ্রুপের টিকিট এবার ফার্স্ট প্রাইজ পাবে—ওর মন বলছিল। সি গ্রুপেরই টিকিট কিনেছে—সি গ্রুপ থেকেই এবার ফার্স্ট আর সেকেন্ড প্রাইজ উঠেছে—কিন্তু ওদেরটাই হয়ে গেল সেকেন্ড।

প্রাইজ পাবার পুরো কৃতিত্বটাই অলকা নিতে চায়। শৈবাল বিশেষ আপত্তি জানালনা তাতে, মুচকি হাসতে লাগল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, টাকাটা দিয়ে কী করবি, কিছু ঠিক করেছিস?

—অনেকে পরামর্শ দিচ্ছে, ব্যাঙ্কে ফিক্সড ডিপোজিটে রাখতে। কিন্তু আমি ভাবছি...আচ্ছা, এ-বাড়িটার কত দাম হবে বলতে পারিস?

—এই বাড়িটা? না, ঠিক আইডিয়া নেই।

—তবু মোটামুটি একটা আন্দাজ কর—নিচে একটা ফ্ল্যাট আছে। আর আমাদের এটা। আমরা ভাড়া দিই সাড়ে তিনশো করে—প্রত্যেক মাসে এতগুলো টাকা বেরিয়ে যায়। তাই ভাবছিলাম এই বাড়িটাই যদি কিনে ফেলা যায়—কিন্তু বাড়িওয়ালা আশি হাজার টাকা দর হাঁকছে।

অলকা বলল, আমি বলছি এ-বাড়ি কিনতে হবেনা। তার চেয়ে বরং লবণহ্রদে পাঁচ কাঠা জমি কিনে—

শৈবাল বলল, জমি কিনে নতুন বাড়ি তৈরি করা কম হাঙ্গামা নাকি? আমি অফিস থেকে ছুটি পাবনা—নিজে দেখাশুনো করতে না-পারলে সবাই ঠকাবে। তার চেয়ে এ-বাড়িটাই ভালো, পজিশনটাও বেশ ভালো আছে। কিন্তু আশি হাজার টাকা, টু মাচ। তুই কী বলিস?

আমি কাঁচুমাচুভাবে উত্তর দিলাম, ভাই, বাড়ির দাম সম্বন্ধে আমার কোন আইডিয়া নেই।

—আশি হাজার যদি কিনতেই লাগে, তারপর কিছু রিপেয়ার করতেই হবে, তাতে অন্তত পাঁচ হাজার—বোনটার বিয়ের জন্য আর দেরি করা ঠিক নয়—তাতেও কম করে...

এরপর কিছুক্ষণ আলোচনা চলল, তাতে বেশ বোঝা গেল, একলাখ টাকায় শৈবালদের বাজেট কিছুতেই কুলোচ্ছেনা। কোনক্রমে টেনেটুনে যদি একলাখ টাকায় বাজেট করতেও পারে, তাহলে পরবর্তী দিনগুলো ওদের বেশ কষ্টে-সৃষ্টে টানাটানি করে চালাতে হবে। হাতে কিছু থাকবেনা। অলকা এরই মধ্যে পাঞ্জাব

ও দিল্লির লটারির দুখানা টিকিট কিনে ফেলেছে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, শৈবাল, হুগলিতে তোদের সেই দেশের বাড়িটা কী হল?

—সেখানে আর যাইনা। রাস্তাঘাট এত খারাপ যে যাওয়াই এক ঝঞ্ঝাট। সারা বছরই বলতে গেলে থকথকে কাদা—কে যাবে সেখানে। আমার এক কাকা থাকেন—

ও-বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি পরিতোষকে বললাম, ইস্কুলের রচনায় শৈবাল লিখেছিল যে, একলক্ষ টাকা পেলে ও নিজের গ্রামের রাস্তা বানিয়ে দেবে। সে-কথা ওর এখন একবারও মনে পড়লনা কিন্তু!

পরিতোষ বলল, কী করে রাস্তা বানাবে এখন? দেখছিস না, ওর নিজের বাজেটই এতে কুলোচ্ছেনা। আমার তো মনে হচ্ছে, একলাখ টাকা পাওয়ার ফলে বেচারীকে না না-খেয়ে থাকতে হয় শেষে!

তারপর পরিতোষ আবার বলল, যে জিনিশটা আমরা এখনো পাইনি সে-সম্পর্কে অনেককিছু কল্পনা করা যায়। যেমন ধর, পণ্ডিত নেহরু একসময় বলেছিলেন, ক্ষমতা পেলে তিনি সব ব্ল্যাক মারকেটিয়ারদের ধরে-ধরে ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝোলাবেন। কিন্তু ক্ষমতা পাবার পর দেখলেন, ল্যাম্পপোস্টগুলো ঠিক মজবুত নয়, কিংবা ফাঁসির দড়ি ঠিক মতন পাওয়া যাচ্ছেনা—অর্থাৎ এ-ও সেই বাজেটে না-কুলোনোর ব্যাপার!

আমি মনে-মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস আমি এখনো একলক্ষ টাকা পাইনি। তাই দ্বীপ দেখার স্বপ্নটা আমার এখনো অম্লান আছে।

৫

দুপুরবেলা অনিমেষের অফিসে দেখা করতে গিয়েছিলাম। খানিকটা পরে মনে হল, না-এলেই ভালো হতো।

অনিমেষ একটা ছোটো অফিসে চাকরি করে। এক মারোয়াড়ি কম্পানির আমদানী-রপ্তানীর শাখা অফিস। স্ট্র্যান্ড রোডে তিন-চারখানা ঘর নিয়ে অফিস, দশ-বারোজন কর্মচারী, একজন মারোয়াড়ি বড়োবাবু, অনিমেষের কাজ ইংরেজিতে চিঠিপত্র লেখা। ধুতি ও হাফশার্ট, শীত, গ্রীষ্ম বারোমাস অনিমেষের পায় কেড্‌স জুতো—কাঁধে একটা ঝোলানো ব্যাগ, শান্ত লাজুক প্রকৃতির। ভেবেছিলাম

অনিমেষের অফিসটা নিরিবিলি হবে—এই শীতের মনোরম দুপুরে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমি দুপুরবেলা একাকীত্ব একেবারে সইতে পারিনা। আর অনিমেষও, ভিড়ের মধ্যে বা অনেক বন্ধুর মধ্যে একেবারেই কথা বলতে পারেনা—কিন্তু একা-একা দেখা হলে অনেক কথা বলে।

ও আমাকে দেখে উদ্ভাসিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আয় একটু বোস—আমি ততক্ষণে হাতের কাজটা সেরে নিই। তারপর—। চা খাবি তো?

চা আনতে পাঠিয়ে অনিমেষ কী একটা চিঠি শেষ করতে লাগল। মাস দু-এক ওকে দেখিনি, আজ লক্ষ করলাম, ওর মুখ চোখ যেন কিছুটা শুকিয়ে গেছে। ক্রমশই শুকিয়ে যাচ্ছে—গত সাত-আটবছর ধরে দেখছি। আমারই সমান বয়েস—তবু ওর মুখের চেহারা আমার চেয়ে অনেক রুক্ষ, রেখাময়—সারা মুখের মধ্যে নাকটাই এখন বেশি প্রকট।

অনিমেষ নিজের জীবনে একজন খাঁটি ব্যর্থ মানুষ। আমি আমার নিজের ব্যর্থতার কথা জানিনা, ক্বচিৎ দৈবাৎ যদি নিজের দিকে তাকিয়ে আমি বুকের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত পুকুরের ঘাট দেখতে পাই—সেই ভয়ে আমি একা থাকতে পারিনা—ছুটে-ছুটে যাই অন্য মানুষের দিকে—আমি তাদের ব্যর্থতা দেখার চেষ্টা করি। আমি অনিমেষের অনেকগুলি ব্যর্থতার কথা জানি।

ছেলেবেলায় অনিমেষ ছিল আমাদের মধ্যে পড়াশুনোয় সবচেয়ে ধারালো ছেলে, ইংরেজি পরীক্ষায় প্রতিবার ফার্স্ট হতো। আমরা ভাবতাম, অনিমেষ একসময়ে নামকরা ইংরেজির অধ্যাপক হবে। কিন্তু, কী কারণে যেন বি. এ. পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে ফেল করে গেল অনিমেষ, আর ওর পড়াশুনো করাই হলনা। মানিকতলার দিকে বেশ চমৎকার তিনতলা বাড়ি ছিল ওদের, ওর বাবা মারা যাবার কয়েকদিন পরই জানাতে পারলাম, সে-বাড়ি নাকি অনেকদিন আগেই বিক্রি হয়ে গেছে। অনিমেষরা এখন আছে বরানগরের এক নড়বড়ে ভাঙা বাড়িতে। সংসারে ছোটো ভাই-বোন, মা-ও বিধবা পিসি—সকলেই পাখির ছানার মতো হা করে আছে, অনিমেষ সারামাস খেটে ওদের মুখে খাবার এনে দেবে। অনিমেষ রত্না নামে একটা মেয়েকে ভালোবাসত কলেজজীবনে। তখন আমরা ভাবতাম, এ অত্যন্ত বিসদৃশ জোড়—অনিমেষের মতো বুদ্ধিমান ছেলের পাশে ওরকম একটা বোকা অহংকারী মেয়েকে মানায়না। রত্নার ধারণা ছিল সে সুন্দরী, কিন্তু আসলে একটা পুষি বেড়ালের মতো চেহারা। দেখা হলেই গড়গড় করে যত কথা বলত—তার একটি কথাও না-শুনলে—পৃথিবীর কিছুই যায়-আসেনা। অথচ অনিমেষ ছিল রত্নারই জন্য গোপন উন্মাদ। কোনদিন রত্নাকে কিছু বলতে ভরসা পায়নি, যেদিন মুখ ফুটে বলল, সেইদিনই প্রত্যাখ্যান—তখনও অনিমেষ বাবা ও তিনতলা

বাড়ি হারায়নি। রত্না ওরই সমান আর-একটি বোকা—পরাশরকে বিয়ে করেছে। এবং ওরাই জীবনে সাকসেসফুল। ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকরি নিয়ে রত্না আর পরাশর এখন আছে সুইটসারল্যাণ্ডে! অনিমেষ আর কোন মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি।

কিন্তু এ সবই তো বাইরের ব্যর্থতা। অনিমেষ তার চেয়েও বেশি হেরে গেছে। অনিমেষের চেহারায় কোন খুঁত ছিলনা—দীর্ঘ চেহারায় সুপুরুষই বলা যায়, কিন্তু ক্রমশ ও ভিড়ের যে-কোন লোক হয়ে গেল। কোনদিন ও রুখে দাঁড়ালনা। পৃথিবীতে ও একটি দাবিও আদায় করে নিতে চেষ্টা করলনা। কোন গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে পথ দিয়ে যাবার সময় আমি যদি দূরে অনিমেষকে দেখি, আমিও হয়তো ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করব। ভিড়ের মধ্যে মিশে থেকেই হয়তো অনিমেষ একদিন অগোচরে অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়।

অনিমেষ বলল, আর-একটু বোস, হয়ে গেছে, আমি চিঠিটা টাইপে দিয়ে আসি। ওর জামার হাতা ঢল-ঢল করছে, মনে পড়ল, একসময় সৌখিন অনিমেষ সোনার বোতাম ব্যবহার করত।... ওর অফিসঘরটা ছোটো, আরও দুটো চেয়ার আছে—একটি চেয়ারে কোট রাখা, অন্যটি খালি। যাক, কিছুক্ষণ নিরিবিলিতে গল্প করা যাবে।

ফিরে এসে ও বলল, টাইপিস্ট আসেনি আজ। চিঠিটা জরুরি ছিল—তা আর কী করব!

জিজ্ঞেস করলাম, তোর বাড়ির সব কেমন আছে।

ও স্মিত হেসে বলল, ভালোই।

বুঝতে পারলাম, এই যে ভালো কথাটির সঙ্গে একটা 'ই' যোগ করে দেওয়া এবং স্মিত হাসি—এর পিছনে অন্তত আছে মায়ের বাতের ব্যথা, ছোটো বোনটার জ্বর, পিসিমার চোখ অপারেশন করাতে হবে—ইত্যাদি। এগুলিরই সংক্ষিপ্ত রূপ, ভালোই! আমি জানি অনিমেষ যখন মরে যাবে তখন মরার ঠিক আগের মুহূর্তে যদি ওকে জিজ্ঞেস করা হয়, কেমন আছিস, ওর যদি উত্তর দেবার ক্ষমতা থাকে তখন, তবে অনিমেষ নিশ্চিত তখনও বলবে স্মিত হাসি হেসে, এই একটু মরে যাচ্ছি আর কী!

—আবেশ, উত্তেজনা অনিমেষের জীবন থেকে একেবারে অন্তর্হিত হয়ে গেছে।

সুতরাং কী কথা শুরু করব? আমি তাই আলগাভাবে বললাম, তোদের অফিস থেকে গঙ্গা দেখা যায় দেখছি!

—হ্যাঁ, মাঝে-মাঝে জাহাজের বাঁশিও শোনা যায়। এ-বাড়ির ছাদে উঠলে

দেখা যায় অনেকদূর পর্যন্ত। শীতকালের রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে গঙ্গা দেখতে ভালো লাগে।

—চল-না, ছাদেই যাই। নাকি, অসুবিধে হবে তোর অফিসে?

—নাঃ অসুবিধে কী! চল—

এইসময়ে ঘরে একটি লোক ঢুকল। বলে দিতে হয়না, এই লোকটিই এ-অফিসের মারোয়াড়ি বড়োবাবু। সার্জের সুট, হাতে সোনার ব্যান্ডের ঘড়ি। কিন্তু বিশাল ভুঁড়ি ও মুখে পানের দাগ—দর্পিত পদশব্দ—বড়োবাবুর এই চিহ্নগুলিও আছে। লোকটির বাংলা জ্ঞান নিখুঁত। আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অনিমেষকে জিজ্ঞেস করল, চ্যাটরজি নন ফেরাস মেটালের সেই চিঠিটা হয়েছে?

অনিমেষ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, হ্যাঁ।

—এখুনি পাঠিয়ে দাও!

—সেটা তো গতকালই পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনি সই করে দিলেন—

—আমাকে এজেন্টরা ফোন করেছিল—আমি বলতে পারলামনা, আমার প্যাডে লিখে দিয়ে আসবে তো!

—আপনিই সই করলেন কিনা—

—আমার মাথায় বৃহৎ কাম ঘোরে। একটা চিঠঠির কথা মাথায় ভরে রাখলে চলেনা। প্যাড আছে কী জন্যে? ডেপুটি কন্ট্রোলারের চিঠিটাও হয়ে গেছে কাল?

—না, ওটা আজ লিখেছি। কিন্তু টাইপিস্ট আসেনি।

এবার কি কারবারটা ডকে তুলব? কেন আসেনি কেন?

—আপনার কাছ থেকেই ছুটি নিয়েছে শুনলাম—

—টাইপিস্ট ছুটি নিয়েছে বলে চিঠি যাবেনা? ডেপুটি কন্ট্রোলার সে-কথা বুঝবে?

—হাতে লিখে পাঠাব?

—আমাদের কারবারের কি প্রেস্টিজ নেই যে হাতে লিখে চিঠি যাবে? চিঠঠিটা আজই যাওয়া দরকার।

—আমি তো টাইপ জানিনা।

—টাইপ আবার জানা আর না-জানা কী! একটু সময় বেশি লাগবে। বাজে গপ্পোসপ্প না-করে চিঠিটা টাইপ করে ফেলুন। যদি দেরি হয়ে যায়, ওভারটাইম নিয়ে লেবেন! যান!

লোকটা আবার পায়ের শব্দ করে চলে গেল। লোকটার অসম্ভব রূঢ়তায় এবং অভদ্রতায় আমি খুবই রেগে উঠেছিলাম—কিন্তু দুনিয়ার এত মানুষের বিরুদ্ধে রেগে ওঠার আছে যে বন্ধুর অফিসের বড়োবাবুর বিরুদ্ধে আর রাগ দেখিয়ে লাভ

কী—এই ভেবে চুপ করে বসেছিলাম। ঐরকম বাক্যালাপের পরই আমি চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি—অনিমেষ এসব সহ্য করেও এখানে হাসিমুখে চাকরি করবে—কিন্তু আমার এসব সহ্য করার দরকারটা কী! কিন্তু অনিমেষ আমার হাতটা চেপে ধরে বলল, আর-একটু বোস।

নিজেই পাশের ঘর থেকে টাইপরাইটারটা নিয়ে এল ঘাড়ে করে। সেটাতে কাগজ পরিয়ে টকাটক শুরু করল। আমি এই দুপুরবেলা টকাটক শোনার জন্য আসিনি। একটু অধৈর্য হয়ে বললাম, তুই কাজ কর, আমি চলি রে!

—বোস, আর-এককাপ চা খেয়ে যা।

আমার সত্যিই অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। অনিমেষদের অফিসে হয়তো এটা স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আমার সামনেই অপমানিত হয়ে অনিমেষ নিশ্চয়ই বেশি লজ্জিত হয়েছে। এখানে আমার না-আসাই উচিত ছিল। অনিমেষের মুখ কিন্তু আগের মতোই প্রশান্ত, নির্বিকার। থাকতে না-পেরে বললাম, তুই জীবনে আর কত সহ্য করবি? মানুষের কাছে এত ছোটো হতে-হতে তোর আর মনুষ্যত্ব কী থাকবে?

—কার কাছে ছোটো হলাম? ঐ রাজোরিয়ার কাছে? ওর কাছে আর অপমান হবার কী আছে? ও তো আর বেঁচেই নেই!

—কী বলছিস...

অনিমেষ টাইপরাইটার থেকে মুখ তুলে সেইরকম স্মিত হেসে বলল, সত্যি ও-লোকটা আমার সামনে আর বেঁচে নেই। অনেকদিন আগেই আমি ওর মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। তারপর আমিই ফাঁসি দিয়েছি ওর। ওর চরম নির্বুদ্ধিতা এবং বুনো শুয়োরের মতো গোঁয়ার্তুমি দেখে আমি ঠিক করেছিলাম, ওর আর বাঁচার অধিকার নেই। অনেকদিন আগে, ও যখন আরও বাচালের মতো কথা বলছিল—আমি এই চেয়ারেই বসে থেকে বিচারকের আসনে বসেছিলাম, ওর ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলাম শান্তভাবে। তারপর, নিজেই উঠে এসে—আমিই তখন জল্লাদ সেজে ওর গলায় দড়ি পরিয়ে ওকে ঝুলিয়ে দিয়েছি। ও তখনও কথা বলে যাচ্ছিল—কিন্তু জানলনা, সেই মুহূর্তে ওর ফাঁসি হয়ে গেল। তারপর থেকে ওর কোন কথাই আমার গায় লাগেনা। ও তো একটা মড়া—ওর আবার কথার মূল্য কী।

আমার অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে ও আবার বলল, তোর অবাক লাগছে? শাস্ত্রে আছে, অতি মূর্খ এবং স্মৃতিভ্রষ্ট মৃতের সমান। দেখছিস-না—আমি ওকে মেরে ফেলেছি বলে যে-চিঠি ও নিজে সই করেছে—তার কথাও ওর মনে থাকেনা! টাইপিস্টকে ছুটি দিয়ে নিজেই ভুলে গেছে—একি জীবিত মানুষের

লক্ষণ? ওর কথায় আবার রাগ করব কী?

—কিন্তু, তুই ওর কথা অমান্য করতেও পারিসনা।

—কারণ, ওর কাছ থেকে আমি অর্থ পাই। অর্থ মৃতের হাত দিয়ে আসুক আর জীবিতের হাত দিয়ে আসুক—তার মূল্য একই। তার সঙ্গে মানসম্মানের প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন সেখানে—যদি আমি ওকে ভয় করতাম। কিন্তু আমি ওকে ভয় করিনা—কারণ, আমি ওকে চরম শাস্তি দিয়েছি!

—তুই এইভাবে সব মানুষকে দেখিস!

—হ্যাঁ। সেদিন ট্রামে একটা পুলিশ ভারী জুতো দিঁয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম, সে দুঃখিত বা লজ্জিত হবে। পাঁচ মিনিট সময় দিয়েছিলাম। কিছুই হলনা—ভ্রূক্ষেপও করল না। তখন আমি ওর একটা পা কেটে ফেলার হুকুম দিলাম। তারপর নিজের করাত দিয়ে পুচিয়ে-পুচিয়ে সেই ট্রামের মধ্যেই ওর একটা পা কেটে বাদ দিলাম। ও জানেনা। এখনও ওকে দেখি মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকে সদর্পে, কিন্তু ও জানেনা—আমার কাছে ওর একটা পা চিরকালের মতো খোঁড়া—কোনদিন আর আমাকে আঘাত করতে পারবেনা। কলেজে পড়ার সময় রত্না আমাকে অন্যায়ভাবে অপমান করেছিল। আমি ওকে নির্বাসন দণ্ড দিয়েছি। কী কঠিন সেই দণ্ড।...এই তো সেদিন, আমার বাড়িওয়ালা বিষম পাজী ছিল—কোন কথায় কান দিতনা। আমি তার কানদুটো কেটে নিয়েছি। লোকটা জানেনা—এখনও মনের সুখে কাগজ পাকিয়ে কান চুলকোয়, কিন্তু জানেনা, আমি ওর কানদুটোই কেটে নিয়েছি—সেখানে দুটো রক্তাক্ত গর্ত আমি স্পষ্ট দেখতে পাই।....

আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম, অনিমেষের এসব পাগলামির লক্ষণ কিনা। টাইপ মেসিনের ওপাশে—ময়লা হাফশার্ট গায় অনিমেষ একবার জোব্বা-পরচুল পরে কঠিন বিচারক হয়ে যাচ্ছে—আবার সে পরমুহূর্তে কালো কাপড় পরে খড়গ হাতে নিয়ে হয়ে যাচ্ছে নৃশংস জল্লাদ। কে জানে এসব পাগলামি কিনা—কিন্তু এই খেলা নিয়ে অনিমেষ সুখেই আছে মনে হল।

৬

আগে মস্তানি, পিছে পস্তানি!

কথাটা নতুন শুনলাম, ভালোই লাগল। যে-লোকটি বলল কথাটা, তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। খালি গা, কালো তেলচকচকে দেহ, ধুতির এক পাক কোমরে

জড়িয়ে মোটা করে গিট বাঁধা। লোকটার হাতে একটা ছোটো লাঠি, রাগে দুলছে। কথাটা ও শত্রুর উদ্দেশ্যে বলছে বোঝা যায়, নিজেকে সাবধান করছেনা। শত্রু অবশ্য তখন অনুপস্থিত।

আর-একটা নতুন কথাও সেখানে শুনলাম। 'লাল বল'। অনেকক্ষণ কথাটাব মানে বুঝতে পারিনি। দশ-বারোজন নারী-পুরুষের জটলা, উত্তেজিত চিৎকার, শাসানি, তার মাঝে-মাঝেই শোনা যাচ্ছে, 'লাল বলটা এই তো এখানে ছিল', 'আমি নিজের চোখে দেখেছি লাল বলটা নিয়ে ভেগে গেল' ইত্যাদি। এতগুলো বয়স্ক লোক সত্যি-সত্যিই একটা লাল বল নিয়ে বিচলিত—এটা বিশ্বাস করা যায়না। বাচ্চা ছেলের খেলার জিনিশ, চুরির ঝগড়া এ নয়।

আমি ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলাম, লাল বলটা কী? ইন্দ্রনাথও ঐ একই ব্যাপারে চিন্তা করছিল বোধহয়, হেসে বলল, কী জানি! বুঝতে পারছিনা।

মাটির দাওয়ায় চাটাইয়ের ওপর হেলান দিয়ে বসেছিলাম দুজনে। মালদা শহর থেকে আট-দশমাইল দূরে, জায়গাটার নাম পাণ্ডুয়া। সেই পাণ্ডুয়া—যেখানে রাজা গণেশের রাজধানী ছিল, বাজা গণেশের ছেলে ইসলামে ধর্মান্তরিত হযে শেখ জালালুদ্দীন নাম নিয়েছিল—তার সমাধিভবন আর রাজ দরবারের ধ্বংসস্তূপ দেখতে গিয়েছিলাম। ঠা ঠা করছে রোদ, প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, পিচের রাস্তা এমন চটচটে যে জুতো আটকে যায়—কোনরকমে চক্কর মেরে আমরা ফিরে এলাম বড়ো রাস্তায়, এখান থেকে ফের বালুরঘাট যাবার বাস বা ট্যাক্সি ধরতে হবে। কখন তা পাওয়া যাবে ঠিক নেই।

মোড়ের মাথায় একটা ছোটো চায়ের দোকান, সেখানে দুকাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে বাসের খোঁজখবর নিচ্ছিলাম, চা তৈরি কবছিল একজন স্ত্রীলোক, সে বলল, আহা ভাইয়েরা আপনারা রোদ্দুরে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন। আমাব ঘরের দাওয়ায় এসে বসুন।

মাটির ঘর, তাই মেঝেটা একটু ঠাণ্ডা, সেখানে আধ-শোয়া হয়ে আমরা দুজনে ঘাম মুছতে-মুছতে ঝগড়া শুনতে লাগলাম। এখানে সেই লাল বল নিয়ে আন্দোলন চলছে। যাক, আমাদের পক্ষে ভালোই তো, সময় কেটে যাবে।

অবিলম্বে লাল বলের অর্থ আমরা নিজেরাই বুঝতে পারলাম। বলদকে এখানে বল বলে। কিন্তু লাল রং? লাল গরুর কথা শুনিনি। মেটে-মেটে রঙের গরু হয় বটে—। অর্থাৎ মামলাটা গরু চুরির।

ভিতর দিকে মুসলমানদের প্রাচীন বসতি—অদূরে পূর্ববঙ্গ থেকে আসা উদ্বাস্তুদের কলোনি, তার উল্টোদিকে সাঁওতালদের গ্রাম। সুতরাং এলাকাটা যে তপ্ত বিছানা হয়ে থাকবে—তা তো খুবই স্বাভাবিক। আজকের ঝগড়াটা সাঁওতাল

আর উদ্বাস্তুদের মধ্যে। মারামারির নিশ্চয়ই অনেক কারণ থাকে—দুপক্ষেরই গরু চুরিটা নেহাত ছুতো।

উদ্বাস্তুরা এখানে বিদেশি, কিন্তু পনেরো-কুড়ি বছর কেটে গেছে, অনেকটা শিকড় গেড়েছে, এখন আর সেই আগেকার মতন ভীতু দয়াপ্রার্থী ভাব নেই। এখন তারাও এককাট্টা হয়ে রুখে দাঁড়ায়, পুরো অধিকার দাবি করে। সুতরাং তিনপক্ষই এখন সমান-সমান—মুসলমান, উদ্বাস্তু, সাঁওতাল—এদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-লড়াই বাধে, দুপক্ষ যখন লড়াই করে—বাকি একপক্ষ তখন চুপ করে থেকে মজা দেখে।

বেশ বুঝতে পারলাম, আজ সাঁওতাল বনাম উদ্বাস্তু একটা ঘোরতর লড়াই বাঁধতে আর দেরি নেই। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা ছেলে, নাম তার লখা, সে শুধু চোর নয়, পুরোপুরি মস্তান। বাবলা গাছে বাঁধা ছিল সাঁওতালদের একটা গরু, সে সেটা শুধু খুলে নিয়ে যায়নি, যাবার সময় চেঁচিয়ে বলে গেছে—সাঁওতালরা আবার গরু পুষবে কী? ওরা কুকুর পুষুক! গরু আমাদের কাজে লাগবে!—কেউ একজন তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, লখা ও-গরুতে হাত দিসনি, ওটা দুখো মাঝির গরু, দুখো মাঝি তুলকালাম করবেনি! লখা নাকি তার উত্তরেও বলেছিল, যা যা! ওরকম দু-দশটা দুখো মাঝিকে হাপুর হাটে কিনে বেচতে পারি! বলিস তাকে বলদ ছাড়িয়ে আনতে—দেখব তার কত হেম্মৎ!

লখার চরিত্রটা বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে। এ-নাটকে ভিলেন হিসেবে সে খুব জোরালো। কিন্তু মঞ্চে তাকে দেখা যাচ্ছেনা। দুখো মাঝিকে দেখলাম, ভিড়ের মধ্যে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে—এই ভরদুপুরেই কিছুটা নেশা করেছে মনে হয়।—চোখে রাগ কিন্তু ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি—এইসব লোক সত্যিই বিপজ্জনক।

খানিকটা শরীর ঠাণ্ডা হয়েছে, হেলান দিয়ে বসে আমরা দুই বন্ধুতে উদগ্রীব হয়ে দেখছি। কখন মারামারি লাগবে! লাগলেই তো পারে—আমরা তাহলে দেখে যেতে পারতাম। আমরা দুজনেই মনে-মনে চাইছি—মারামারিটা তাড়াতাড়ি লাগুক! প্রায়ই মারামারি হয়, ভবিষ্যতেও হবে—এব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছুই নেই—সুতরাং এই উত্তেজক দৃশ্যটা দেখার সুযোগ নষ্ট করার কোন মানে হয়না। সাইকেল আছে, ট্রানজিস্টার আছে, অনেকের হাতেই ঘড়ি, তবু আদিম সমাজ। জমি আর জাতিভেদ নিয়ে লড়াই অনবরত চলবে। সভ্যতা-সংস্কৃতি ইত্যাদি যা-সব আমরা বলি—সে সবই শহুরে ফ্যাশান।

দুখো মাঝি পিছন ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী একটা চিৎকার করে উঠল। দূর

থেকে তার উত্তর ভেসে এল। সেদিকে আমরা তাকিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, এবার জমবে মনে হচ্ছে। জন পনেরো সাঁওতাল দ্রুত পায় এগিয়ে এল, কারুর হাতে ধনুক, কারুর কাঁধে টাঙ্গি—সঙ্গে কয়েকটা শিকারী কুকুর। না, সিনেমার দৃশ্যের মতন ঠিক নয়, এ সাঁওতালদের খুবই দৈন্য দৃশ্য—অধিকাংশরই চেহারা ডিগডিগে, অস্ত্রগুলো প্রথমশ্রেণীর নয়—বহুদিন শান পড়েনি। তা হোক—রিফিউজিদেরই বা স্বাস্থ্য আর অস্ত্র কত ভালো হবে? এ-অঞ্চলে হাত বোমার কুটিরশিল্প চালু হয়েছে কিনা ঠিক জানিনা। দুপক্ষ প্রায় সমান-সমানই হবে মনে হয়।

আর-একটাও নতুন শব্দ শিখলাম। 'খিটকেল।' 'একি খিটকেল দেখুন দিদি দাদারা!' আমাদেরই বলছে। চায়ের দোকানের সেই স্ত্রীলোকটি। তিরিশের কাছাকাছি বয়েস, আঁটো স্বাস্থ্য, চোখদুটো বেশি উজ্জ্বল—স্ত্রীলোকটিকে দেখলেই বোঝা যায়—শুধু নিজের স্বামীকেই নয়—আশপাশের সকলকে হুকুম করার ক্ষমতা ওর আছে। একটু আগে চায়ের দোকানে ঐরকমই তার প্রতাপ দেখেছিলাম। কিন্তু এখন সে ভয় পেয়েছে। বারান্দার বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে আমাদের বলল, আমি কারুর সাতে নেই, পাঁচে নেই—আমারই দোকানের সামনে একি খিটকেল শুরু হল।

শুধু মারামারিতেই তো নাটক হয়না—মনস্তত্ত্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, নারী চরিত্র—এসবও তো থাকবে। এবার সেদিকটা চোখে পড়ল। স্ত্রীলোকটি খুব সংক্ষিপ্তভাবে নিজের অবস্থাটা বুঝিয়ে বলল। ওদের পরিবারটিও উদ্বাস্তু। কিন্তু স্ত্রীলোকটি নিজের বুদ্ধিতে এই উন্নতি করেছে। কলোনিতে থেকে চাষবাস করার বদলে সেখান থেকে বেরিয়ে এসে এই চায়ের দোকান বানিয়েছে। পাণ্ডুয়াতে প্রায়ই ভ্রমণকারী আসে—সুতরাং এখানে চায়ের দোকানের উপযোগিতা সে নিজের বুদ্ধিতেই বুঝেছিল। আশেপাশে কোন চায়ের দোকান নেই—বেশ চালু হয়েছে তার দোকান, পাশে এই মাটির বাড়িটা বানিয়েছে, পিছনে ধান জমি কিনেছে তিন বিঘে। তার দোকানে সাঁওতাল, উদ্বাস্তু, মুসলমান—সবাই চা খেতে আসে। সে নিজের হাতে চা বানায়—সবাই তাকে সুরোদিদি বলে ডাকে।

আজ লাল বলদটা চুরি হয়েছে প্রায় দোকানের সামনে থেকে। সাঁওতালরা এসে তাকে জিজ্ঞেসবাদ করছে। সে এখন কী বলবে? একজনের দোষে সবার দোষ। ঐ হারামজাদা লখাটা চোর-গুণ্ডা, কিন্তু দোষ পড়বে সব রিফিউজিদের নামে। লখাকে মারতে গেলে অন্য রিফিউজিরা দল বেঁধে রুখে দাঁড়াবে। অর্থাৎ দাঙ্গা হবে সাঁওতাল আর রিফিউজিতে। আর-একবার দাঙ্গা শুরু হয়ে গেলে—সাঁওতালরা কি তাকেও মারবেনা? সেও তো আসলে রিফিউজিই। এক হয়, এখনই যদি চুপি-চুপি পালিয়ে গিয়ে রিফিউজি কলোনির মধ্যে ঢুকে পড়া

যায়—তাহলে হয়তো প্রাণে বাঁচবে। কিন্তু ব্যাপারটা টের পেলে সাঁওতালরা তো রাগের চোখে প্রথমেই তার দোকানবাড়ি ভাঙবে। এত সাধের, পরিশ্রমের, কষ্টের গড়া দোকান।-সাঁওতালরা এখনো তার সঙ্গে কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।

আর নয়তো, দোকান-প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে যদি সাঁওতালদের পক্ষ নেয়—চেঁচিয়ে লখার নামে, রিফিউজিদের নামে গালাগালি করে চেঁচিয়ে, যদি বলে ঐ রিফিউজিদের উচিতশিক্ষাই দেওয়া উচিত—তাহলে হয়তো সাঁওতালরা খুশি হবে। কিন্তু হাজার হোক, রিফিউজিরা তার জাতভাই—তাদের নামে ওরকম বলা যায়? আর রিফিউজিরাও কম শক্তিশালী নয়—ও-কথা শুনলে তারাও আজ না হোক কাল এসে ঝামেলা করবেনা? একি খিটকেল বলুন তো! সত্যি, 'খিটকেল' ছাড়া অন্য কোন শব্দ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝানো যেতনা!

বন্ধু ইন্দ্রনাথ বলল, থানা নেই এখানে? থানায় খবর দিননা!

সুরোদিদির বুদ্ধি কি কম, সে খেয়াল কি তার নেই? চুপি-চুপি একজনকে সাইকেল দিয়ে থানায় খবর পাঠিয়েছি কিছুক্ষণ আগে। কিন্তু কারু দেখা নেই। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু না হলে দু-একজন লোক খুন-জখম না হলে—আগে কি কখনো পুলিশ আসে? কেউ সেরকম দেখেছে কখনো?

সাঁওতালদের আলোচনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এবার তারা যুদ্ধে যাবেই বোঝা যাচ্ছে। একজন ডাকল, এ সুরোদিদি, ইদিকে শোন, তু তো দেখেছিস উঁ শালা লখাটো...

এইসময় পথের দিগন্ত কাঁপিয়ে আমাদের বাস এল। ইস, মারামারিটা দেখা হলনা! ইন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলাম, কী এই বাসটা ছেড়ে দেবে নাকি? ইন্দ্রনাথ বলল, তুমি বলো কী করব? আমরা দুজনে কেউই মনঃস্থির করতে পারছিনা। পরের বাস আবার দুঘণ্টা বাদে। এই গরমে আরও দুঘণ্টা কি অপেক্ষা করা ঠিক হবে? যদি শেষপর্যন্ত মারামারি না হয়? না, আর দেরি করবনা—আমরা দুজনে ছুটে গিয়ে বাসে উঠে পড়লাম।

বাস একটু দূর যেতেই দেখলাম পথের ওপর আর-একটা দঙ্গল! এখানেও কিছু লোকের হাতে লাঠি-সোঁটা। এটা রিফিউজিদের দল। পাজামার ওপর হাওয়াই শার্ট-পরা ওই লোকটাই কি লখা? ওপাশ থেকে একটা চিৎকার ভেসে আসতেই এরাও ক্রুদ্ধ চিৎকার দিয়ে উঠল। আমরা নেমে পড়ার সুযোগ পেলামনা—বাস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাল।

এইসব মারামারিতে পরের দিন খবরের কাগজে পাঁচ-ছ লাইন খবর বেরোয় মাত্র। নিহতের সংখ্যা তিনের বেশি হলে পনেরো-কুড়ি লাইন। কিন্তু তাতে সুরোদিদির খিটকেলের কথা কিছুই থাকেনা। কোন শক্তিমান নাট্যকারের পক্ষেই শুধু ওর অন্তর্দ্বন্দ্ব ফোটানো সম্ভব। আমার সে-ক্ষমতা নেই।

৭

মেয়েদের সবচেয়ে সুন্দর লাগে, আমার চোখে, যখন তারা প্রবল বাতাসের স্রোতের বিপরীত দিকে হাঁটে। হু-হু করছে হাওয়া, চুল এলোমেলো এবং আঁচলটা পিছনের দিকে ডানার মতন উড়তে থাকে, মেয়েরা তখন বদলে যায়, তাদের চোখমুখ অচেনা মনে হয়। সেইরকম হু-হু করা বাতাসের মধ্যে দিয়ে পাশাপাশি হাঁটতে-হাঁটতে একপলক তাকিয়ে বরুণাকেও আমার হঠাৎ সুন্দরী মনে হল। অন্য কোন সময় মনে হয়নি, একটু পুরুষালি ধরনের চেহারা বরুণার, বেশ লম্বা, গায়ের রং ফর্শার কাছাকাছি হলেও রাজপুতানিদের মতন চওড়া হাতের কবজি এবং নাকটা গুজিয়ার মতন ছোট্ট, আর বোঁচা। অন্যসময় সুন্দরী মনে হয়না, কিন্তু তখন সেই মুহূর্তে বরুণাকে মনে হল বত্তিচেল্লির আঁকা 'থ্রি গ্রেসেস'-এর অন্যতমা। আমি বরুণার দিকে পাপচোখে আবার তাকালাম। কিছু একটা কথা বলা দরকার, তাই বললাম, দারুণ হাওয়া দিচ্ছে না?

বরুণা যেন অন্যজগৎ থেকে কথা বলছে, সেইভাবে উত্তর দিল, আঃ, আমার ইচ্ছে করে, সমুদ্রের ওপর একটা ছোট্ট ডিঙি নিয়ে একলা এ-রকম হাওয়ার মধ্যে দিয়ে ভেসে যাই।

কথা হচ্ছিল নদীর পাড়ে। পাশেই বিশাল নিষ্প্রাণ দামোদর। ইউনেস্কোর উদ্যোগে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল, গ্রামের অশিক্ষিত চাষী-মজুররা কথা বলার সময় কতগুলো শব্দ ব্যবহার করে, সাধু বাংলা তারা কতখানি বোঝে এইসব তথ্য সংগ্রহ করার। কলেজের কোন একটা পরীক্ষার পরের ছুটিতে আমি বাই চান্স সেই চাকরি পেয়ে যাই। ন'জন ছেলে এবং পাঁচজন মেয়ের একটি দল মিলে আমরা গ্রামে-গ্রামে ঘুরতাম, ইস্কুলবাড়িতে ক্যাম্প করা হতো। সেই দলের একটি মেয়ে বরুণা, তখন আমরা বর্ধমানের কলানবগ্রামে, শক্তিগড় অঞ্চলে। দলের আর-চারটি মেয়ে আর-চারশো মেয়েরই মতন, তারা ছেলেদের থেকে একটু দূরে আলাদা দল মিলে থাকে, লাজুক লতার মতন আড়ে-আড়ে চায়, হাসির কথায় চুপ করে থাকে, আবার অকারণে হাসে, অকারণে ভয় পায়, পদে পদে, 'ইস কী বিশ্রী কাদা, উঃ কী বিচ্ছিরি গন্ধ...'। দলের মধ্যে যে মেয়েটি সবচেয়ে সুন্দরী ছিল—তাকে আমরা ছেলেরা আড়ালে বলতাম, মিস পুটুলি, শাড়ি-ব্লাউজে জড়ানো একটা পুটুলির মতনই দেখতে ছিল তাকে। আমাদের বিকাশ মাঝে-মাঝে মন্তব্য করত, ইস, অতই যখন লজ্জা, তখন চাকরি করতে আসা কেন?

একমাত্র বরুণা ছিল আলাদা, ডাকাবুকো ধরনের, অহেতুক লজ্জার বালাই নেই, ছেলেদের সঙ্গে পাশাপাশি হাঁটছে, ছোটখাটো খানাখন্দ দেখলে দিব্যি লাফিয়ে

পার হচ্ছে, কখনো-বা কাদার মধ্যে হাঁটু ডুবিয়ে সাঁওতালনির মতন হি-হি করে হাসছে। বরুণা বলত, আমি চাকরিটি নিয়েছি কেন জানেন? এই যে বাড়ির লোকজন ছাড়াই একা-একা বেড়াবার সুযোগ পেলাম। বেড়াতে আমার এত ভালো লাগে।

সেইসময় আমার একটা গুরুতর অসুখ ছিল। ঘন-ঘন প্রেমে পড়া। ঘণ্টায় ষাট মাইল স্পীডে কোন গাড়ি ছুটে যাচ্ছে, তার জানলায় বসে-থাকা কোন মেয়ের মুখ দেখেও এমন প্রেমে পড়ে যেতাম যে, মনে হতো, একে না-পেলে আমি বাঁচবনা! সাতদিন আহারে রুচি থাকতনা। সুতরাং বরুণার সঙ্গে যে আমি প্রেম করবার চেষ্টা করব, তাতে আর আশ্চর্য কী! বাকি ছেলেরা অন্য চারটি মেয়ের পিছনেই ঘুরঘুর, তাদের মুখের একটু হাসি বা চোখের ঝিলিক দেখবার জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকত। বরুণাকে ওরা একটু ভয়-ভয় করত, তাছাড়া বরুণা বেশ লম্বা, অন্য ছেলেদের প্রায় সমান-সমান—দলের মধ্যে আমি একটু বেশি লম্বা ছিলাম বলে—আমার পাশেই বরুণাকে একটু-একটু মানাত। কিন্তু হায় হায়, বরুণার সঙ্গে আমার এক বিন্দুও প্রেম হলো না।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সঙ্গে একজন প্রৌঢ় দলপতি ছিলেন—আমরা যে-কাজের জন্য এসেছি সেটা সার্থক হচ্ছে কিনা দেখার বদলে—ছেলেরা-মেয়েরা সবসময় আলাদা থাকছে কিনা, এটা লক্ষ রাখাই ছিল যে তাঁর প্রধান দায়িত্ব। আমরা তাঁকে গ্রাহ্য করতাম না, এবং সবথেকে অগ্রাহ্য করত বরুণা। বরুণা অনবরত আমাদের মধ্যে চলে আসছে, খপ করে যখন-তখন হাত ধরছে, ইয়ার্কি করে পিঠে কিল, পুকুরপাড়ে পা ধুতে গেলে গায়ে জল ছিটিয়েছে—এমনকী সন্ধের পরও এসে বলেছে, চলুন-না এ গ্রামের শ্মশানটা দেখে আসি। কিন্তু গলার স্বর একটু গাঢ় করে কথা বলতে গেলেই বরুণা চোখ পাকিয়ে বলেছে, এই, ওকি হচ্ছে, ন্যাকামি? ইস, একেবারে গদগদ দেখছি!—না, ওরকম মেয়ের সঙ্গে প্রেমের কথা বলা যায়না, ওদের সঙ্গে শুধু বন্ধুত্ব।

বরুণার বাড়ির কথা একটু-একটু শুনেছিলাম। যৌথ পরিবার, জ্যাঠামশাই বিষম আচারনিষ্ঠ, গোঁড়া, বাবা—অধিকাংশ প্রৌঢ় মধ্যবিত্ত যেরকম হয়, কোন বিষয়েই কোন জোরালো মতামত নেই, মা বহুকাল হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, দাদা কাঠের ব্যবসা ফেঁদেছে—আরও অনেকগুলো ভাইবোন। অর্থাৎ বরুণাদের বাড়িতে গিয়ে বরুণাকে দেখলে কোন বৈশিষ্ট্যই দেখতে পেতামনা নিশ্চিত, সব মেয়ের মতনই গুটি-গুটি কলেজ যায়—বাড়ি আসে, মাসিপিসির সঙ্গে নাইট শো-তে সিনেমা যায়, দাদার বন্ধুরা বাড়িতে এলে সে ঘরে ঢোকা বারণ। কিন্তু বাড়ির সঙ্গে খুব বোঝাবুঝির পর চাকরি নিয়েছে, আমাদের দলপতি

নীতীশদা ওর কাকার বন্ধু—তিনি ওর ওপর নজর রাখবেন এই শর্তে। বাড়ি থেকে সেই প্রথম আলাদা বেরিয়েছে বরুণা, তার চরিত্র আমূল বদলে গেছে, পায়ে-পায়ে ওর চঞ্চলতা। বরুণার মধ্যে একটা প্রবল অ্যাডভেঞ্চারের নেশা দেখেছিলাম।

বরুণা বলত, পৃথিবীতে কত জায়গা আছে, আমার ইচ্ছে করে একা-একা ঘুরে বেড়াই। কোন একটা অচেনা পাহাড়ের চূড়ায় উঠছি, আঃ, ভাবতে যা ভালো লাগে!

আমি বলতাম, ইস, মেয়ে হয়ে শখ কত!

বরুণাব চোখ ঝলসে উঠত। তীব্র স্বরে বলত, কেন, মেয়েরা বুঝি পারেনা? ছেলেরাই সব পারে? দেখলাম তো কত ছেলে মেয়েরও অধম। দেখবেন, আমি একদিন আফ্রিকা চলে যাব, একটা নতুন নদী কিংবা জলপ্রপাত আবিষ্কার করব!

আমি হা-হা-করে হাসতাম। বলতাম, দেখা যাবে! বড়জোর স্বামীর সঙ্গে হুড্রু জলপ্রপাত দেখতে যাওয়া কিংবা বাবা-মার সঙ্গে এলাহাবাদের ত্রিবেণী—এর বেশি না!

বরুণা তখন রাগের চোখে দুম করে আমার পিঠে এক বিরাশি সিক্কা কিল!

আল্পস পাহাড়ের উচ্চতা মিসিসিপি নদীর দৈর্ঘ্য ওর মুখস্থ ছিল। হিটাইট সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের ব্যাপারে একজন সুইডিস মহিলার অভিযানের কথা ও আমাকে শুনিয়েছিল। বরুণাও ছেলেমানুষের মতন কল্পনা করত, ও নিজেও একদিন মধ্যপ্রাচ্যে কিংবা হিমালয়ের জঙ্গলে কিছু একটা আবিষ্কার করে ফেলবে।

সেবার আমাদের দলে বরুণা সত্যিই একটা অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গী হয়েছিল। মরা দামোদরের পাড়ে আমরা দুপুরে এসে থেমেছি। বিষম হাওয়া দিচ্ছে, মেঘলা আকাশ। প্রত্যেকের দশজন করে চাষীকে ইন্টারভিউ করার কথা, আসবার পথে, একটা বাজার দেখে তা আমরা সেরে ফেলেছি। শেষ শীতের শুকনো দামোদর —বিরাট চাওড়া—কিন্তু বেশিরভাগই বালি দেখা যাচ্ছে, মাঝে-মাঝে জল। আমরা ঠিক করলাম, হেঁটে দামোদর পার হব। বিদ্যাসাগর মশাই নাকি বর্ষার দামোদর সাঁতরে পার হয়েছিলেন, আমরা শীতের দামোদর হেঁটে রেকর্ড করব। তখন 'আওয়ারা' বইটা সদ্য রিলিজ করেছে, আমি আর বিকাশ রাজকাপুরের ভঙ্গিতে হাঁটু পর্যন্ত প্যান্ট গুটিয়ে নিলাম। হঠাৎ বরুণা বলল, আমিও যাব! দলপতি নীতীশদা আঁতকে উঠে বললেন, না, কক্ষনোনা, বরুণা যাবেনা। বরুণা ততক্ষণে আঁচল কোমরে বেঁধেছে, বলল যাবই! নীতীশদা বললেন, না বলছি! অনেক জায়গায় কোমর এমনকী বুকজল। বরুণা বলল, তা হোক, আমি সাঁতার জানি।

ঐ তো চাষীর মেয়েরা পার হচ্ছে। নীতীশদা বললেন, ওরা ঠিক-ঠিক জায়গা চেনে। এক-এক জায়গায় দারুণ স্রোত আছে।... বরুণা, যেয়োনা বলছি, তাহলে তোমার বাবাকে আমি নালিশ করতে বাধ্য হব! বরুণা এবার ঠোঁট উল্টে বলল, করুন গে যান, আমার বয়ে গেল।—ততক্ষণে সে ঢালু পাড় দিয়ে নামতে শুরু করেছে!

প্রথমে বালি, বালির ওপর দিয়ে আমরা তিনজনে ছুটতে লাগলাম। বরুণার শাড়ি হাওয়ায় ফুলে উঠে পত্ পত করে উড়ছে! খুশিতে ওর মনখানা উদ্ভাসিত সুশ্রী। আমারও এমন ভালো লাগছিল যে, আমি ল্যাং মেরে বিকাশকে বালির ওপর ফেলে দিয়ে দুজনে গড়াগড়ি করলাম, বরুণা মুঠোমুঠো বালি আমাদের গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। পাড়ে দাঁড়িয়ে বাকি সবাই দেখছে—ওরা ভদ্র, সভ্য, ওরা মাটিতে গড়াগড়ি দেবার কথা চিন্তাই করতে পারেনা। একটু পরেই জলের ধারার কাছে পৌঁছোলাম। ঠাণ্ডা টলটলে জল—অঞ্জলি ভরে মুখে ছিটোলাম তিনজনেই, তারপর নেমে পড়লাম। বরুণা শাড়িটা হাতে ধরে উঁচু করে নিল। ক্রমশ-ক্রমশ জল হাঁটু ছাড়াল—তখন বরুণা শাড়ি ছেড়ে দিয়ে বলল, ভিজুক গে।

সেই জল ছাড়িয়ে আবার বালি—ওপর থেকে বোঝা যায়না, কত চওড়া নদীব খাত। আবার বালি ছাড়িয়ে জল। এবার জল উরু ছাড়িয়ে গেল—জল ঠেলাব সাঁ সাঁ শব্দ, বরুণা আনন্দে একেবারে খল খল করছে, একবার হোঁচট খেয়ে পড়তে গিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। আমি ওর কাঁধ ধরে বললাম, এবাব দিই ডুবিয়ে? ও বলল, ইস, আসুন-না দেখি, আমারও গায় কম জোর নেই।

কোমর ছাড়িয়ে প্রায় বুক পর্যন্ত জল। বিকাশ বলল, জল আরও বাড়বে নাকি? বরুণা সেকথা গ্রাহ্য না-করে উত্তর দিল, এত ভালো লাগছে, আমরা যেন ওপারে কী আছে জানিনা, যেন একটা নতুন জায়গায় যাচ্ছি!—হাওয়া খুব জোর, জলেও স্রোতের টান লাগল, আর ব্যালান্স রাখা যাচ্ছেনা, বিকাশ ভয়ে-ভয়ে বলল, হঠাৎ জোয়ার-টোয়ার এল নাকি! আমি কিন্তু সাঁতার জানিনা! বলতে-বলতেই বিকাশ হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আমাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠল, আমি বললাম, আরে ওকি করছিস! বরুণা বলল, সাঁতার জানেননা তো এলেন কেন! বিকাশ বলল, চলো আমরা ফিরে যাই। বরুণা বলল, মোটেইনা! আমার দিকে ফিরে বলল, আপনি তো সাঁতার জানেন, আসুন আপনি আমি দুজনেই যাই! বিকাশ বলল, নিলু, আমাকে আগে এপাড়ে পৌঁছে দিয়ে যা! আমি পা রাখতে পারছিনা! দুচোখ ভরা বিদ্রূপ নিয়ে বিকাশের দিকে তাকাল বরুণা। তারপর সাঁতারের ভঙ্গিতে জলে গা ভাসিয়ে দিয়ে বরুণা বলল, আমি তাহলে একাই চললাম।

চাকরিটা ছিল মাত্র তিন সপ্তাহের। শেষ হয়ে যেতে তারপর আর কেউ কারো

খোঁজ রাখিনি। শুধু বিকাশের সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা হয়। কিছুদিন আগে বিকাশ বলছিল, তোর সেই দেবী চৌধুরানী মার্কা মেয়েটাকে মনে আছে? বরুণা? সেদিন আমাদের এক কলিগের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, তার বউ সেই বরুণা। কী চেহারাই হয়েছে! চেনা যায়না—এর মধ্যেই তিনটে বাচ্চা।

তার কিছুদিন পর আমিও একদিন বরুণাকে দেখেছিলাম দুপুরবেলা চলন্ত ট্যাক্সিতে। টাক মাথায় আলু-আলু মার্কা একজন লোক, নিশ্চয়ই বরুণার স্বামী, মুটিয়েছে বলে বরুণার মুখখানাও ভোঁতা ধরনের, সঙ্গে একটা দেড় বছরের ছেলে, খুব সম্ভবত হিন্দি সিনেমার দুর্গম পাহাড় কিংবা নির্জন হ্রদের দৃশ্য দেখতে যাচ্ছে। না চেনার কী আছে, এইটাই তো স্বাভাবিক ও সাধারণ ঘটনা!

বরুণার কথা আজ আবার মনে পড়ল, কেননা, কাগজে দেখছিলাম আটটি বাঙালি মেয়ে হিমালয়ে উঠে রন্টি শৃঙ্গ জয় করেছে। ভাবছি এই খবরটা পড়ে বরুণা খুশি হবে, না দুঃখিত হবে?

৮

এই সময়টায় ওদের দেখলেই চেনা যায়, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ এই চারমাসে বাংলাদেশে যে হাজার-হাজার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল, এখন এই শরৎকালে তাদের দেখলেই বোঝা যাবে—তারা অন্যসব মেয়ের চেয়ে আলাদা। তারা আর কুমারী নয়, তারা এখনও গিন্নী নয়, তারা নতুন বউ। তাদেব পা এখন পৃথিবীর মাটি ছোঁয় কী ছোঁয়না।

তাদের মাথায় সিঁথির সিঁদুর বড় বেশি গাঢ়, অনভ্যস্ত হাতে সিঁথি ছড়িয়ে চুলের মধ্যেও ছড়ানো সিঁদুরের গুঁড়ো—সেইসঙ্গে মুখেও একটা অরুণ আভা সবসময়। হাতের সোনার গয়না অন্যদের চেয়ে বেশি ঝকঝকে, এখন প্রত্যেকদিন তারা এক-একটা নতুন শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোয়, পায়েব চটিজোড়াও নতুন, ব্লাউজ নতুন। অর্থাৎ নতুন বউদের সবই নতুন। গায়ের চামড়াও নতুন রং ধরেছে মনে হয়, ঠোঁটে নতুন রকমের হাসি, পাশের নতুন লোকটির দিকে মাঝে-মাঝে চোরা চাহনি—এইসব মিলিয়ে ওদের আলাদা করে চেনা যায়।

এই লগনশা'য় আমার চেনা পাঁচটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। দুজন নেমন্তন্ন করেছিল, আর তিনজন ভুলে মেরে দিয়েছিল। তা নেমন্তন্ন করুক আর না-করুক, প্রত্যেকের বিয়ের দিনই আমি বিষণ্ণ বোধ করেছি। সত্যিকথা বলতে কী, পৃথিবীর যাবতীয় কুমারী মেয়ের বিবাহ সংবাদেই আমি ব্যক্তিগত ক্ষতি অনুভব করি।

যেমন, পৃথিবীতে তো প্রতিদিন অসংখ্য শিশু থেকে বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যু হচ্ছে, কিন্তু কোন কুমারী মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনলে আমি আমার বুকে দারুণ শেলের আঘাত পাই। মনে হয়, পৃথিবীর পক্ষে এ-ক্ষতি অপূরণীয়।

যাইহোক, যে-পাঁচজনের বিয়ে হয়ে গেল, তাদের মধ্যে দুজন বিয়ের পরই চলে গেল কলকাতার বাইরে, একজন শিলং আর অন্যজন মাদ্রাজ—সুতরাং আমার চোখে তাদের কুমারী জীবনের ছবিই জেগে রইল। বাকি তিনজনের মধ্যে রত্নার বিয়ে হয়েছে এক বনেদী পরিবারে—তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনা কম। দেখা করার জন্য আমি যে খুব উদগ্রীব—তাও তো নয়, আমি তো আর একসঙ্গেই সব কুমারীর ব্যর্থ প্রেমিক হতে পারিনা। ওরা কেউ আমার প্রেমিকা ছিলনা, কিংবা আমাকে প্রেমিক হবার সুযোগ দেয়নি, তবু ওদের বিবাহজনিত আমার যে বিষণ্ণতা, সেটা একটা অন্যরকম ব্যাপার—আমি তার ব্যাখ্যা করতে পারবনা।

স্নিগ্ধার সঙ্গে দুবার দেখা হল এরমধ্যে। স্নিগ্ধার বরটি বেশ নাদুসনুদুস, মুখে একটা বিগলিত হাসি, তার পাশে স্নিগ্ধা যেন হাওয়ায় উড়ছে। চাঁপারঙের বেনারসীর আঁচল হাওয়া থেকে ফিরিয়ে আনতে-আনতে স্নিগ্ধা হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে অযাচিতভাবে উচ্ছল হয়ে বলল, আরে আপনি? কী খবর? বিয়েতে আসেননি কেন?

স্নিগ্ধা ভুলে গেছে যে ও আমাকে নেমন্তন্নই করেনি, কিন্তু সেকথা তো মনে করিয়ে দিতে পারিনা এখন। তাই আমাকে লাজুক মুখে বলতে হল, না, ইয়ে, খুব দুঃখিত, খুব যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একটা বিশেষ কাজ—

স্নিগ্ধা তার বরের দিকে ফিরে বলল, ঐ যে টুটু মাসি, টুটু মাসিকে মনে আছে তো? যিনি সেই বউভাতের দিনে একটা কইমাছ পাড় শান্তিপুরী শাড়ি পরে এসেছিলেন, সেই যে আসানসোলে ওঁর বাড়িতে যাবার জন্য আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন—তার দেওরের ছেলে নীলুদা, আমাদের সঙ্গে একবার থিয়েটার করেছিলেন। নীলুদা, আসবেন একদিন আমাদের বাড়িতে, নিউ আলিপুরের ও ব্লক, এ-সপ্তাহে না, সামনের মাসে একদিন—আমরা হায়দারাবাদে হনিমুনে যাচ্ছি (এইসময় একটু মুচকি হাসি)—ফিরে এলে তারপর—

স্নিগ্ধার কী বদল হয়েছে এই ক'দিনে! আগে স্নিগ্ধা ছিল খুব শান্ত ধরনের মেয়ে, বেশি কথা বলতনা, কখনো জোরে শব্দ করে হাসেনি—বিয়ের একমাসের মধ্যেই স্নিগ্ধা অজস্র কথায় উচ্ছ্বসিত। একাই সবকিছু বলে যাচ্ছে, হায়দারাবাদে হনিমুনের কথা, নিউ আলিপুরে ওদের ফ্ল্যাট কত সুন্দর, 'ওর' অফিস থেকে শিগগিরই গাড়ি দিচ্ছে—স্নিগ্ধা যেন তার গয়নার ঐশ্বর্য এবং শাড়ির জৌলুষের সঙ্গে-সঙ্গে কায়দা আমাকে দেখিয়ে, দ্যাখো, আমার স্বামীও কত ভালো লোক

—তোমার মতন একটা রোগা আর কালো চেহারার বাউণ্ডুলের তুলনায় আমার স্বামী কীরকম রূপবান দেবতা।

আশ্চর্য মেয়েদের মনস্তত্ত্ব। আমি কি কোনদিন স্নিগ্ধার পাণিপ্রার্থী ছিলাম? কক্ষনোনা! তাহলে আমার কাছে ওর এত স্বামীগর্ব করে কী লাভ? ও বুঝি হিংসেয় আমার বুক ফাটিয়ে আনন্দ পেতে চায়? কিন্তু এই ফাটা বুক আর কত ফাটবে?

পূরবী আবার অন্যরকম। পূরবীর একটু-একটু দুর্বলতা ছিল আমার সম্বন্ধে। আমিও তাতে খানিকটা প্রশ্রয় দিয়েছি। কোন-কোন নম্র গোধূলিতে বারান্দার রেলিংয়ে হেলান দিয়ে পূরবী আর আমি মৃদুস্বরে কথা বলেছি। শুধু কথাই, তার বেশি আর এগোয়নি। যেসব স্থান পূরবীর ভালো লাগত, সেগুলো আমার প্রিয়। হাজারীবাগের ক্যানারি হিল থেকে দেখা সূর্যাস্ত আমার ভালো লেগেছিল, পূরবীর সঙ্গে তা মিলে গেল। কোথাও ভিড়ের মধ্যে আমাকে দেখলে পূরবী এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলত, কখনো-বা হাত ধরে টেনে নিয়ে যেত ভিড় থেকে আড়ালে। তবে শুধু ঐটুকুই, তার বেশিনা।

সেইরকমই এক নম্র গোধূলিতে পূরবীর সঙ্গে আমার দেখা হল রাসবিহারীর মোড়ে। বিয়ের পর পূরবীকে এই প্রথম দেখলাম। সিঁদুরের আভায় তার মুখখানি আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। পূরবীর স্বামী ছিল না, পাশে যে মেয়েটি—সে বোধহয় তার ননদ বা ঐরকম কিছু, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হল পূরবীর—সঙ্গে-সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল—একটা কথাও বললনা, না-চেনার ভঙ্গিতে চলে গেল। আমি আমার ঠোঁটের উদ্যত কথা ফিরিয়ে নিলাম। আমি পূরবীকে অভিনন্দন জানাতে যাচ্ছিলাম—কী ক্ষতি হতো পূরবীর—একটা কথা বললে! পূরবী কোনদিনই তো এমন আড়ষ্ট সংস্কারগ্রস্ত ছিলনা। কিন্তু একটি মেয়ে, কুমারী অবস্থায় যার সঙ্গে আমি কোনদিন একটা কথাও বলিনি, নতুন বিবাহিতা হিসেবে তাকে যেদিন দেখলাম, সেদিন আমি একমুখ হেসে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে, বললাম, আরে, বাঃ কবে হল? মেয়েটি উত্তর না দিয়ে লাজুকভাবে হাসল।

মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনদিন আলাপই হয়নি, আমি তার নামও জানিনা। মেয়েটিও আমার নাম জানেনা। দীর্ঘ তিনবছর মৌলালির মোড়ে একটা অফিসে আমি চাকরি করতাম—প্রতিদিন ঠিক দশটা বেজে দুশে বাসে উঠতাম শ্যামবাজার থেকে। রামমোহন লাইব্রেরির সামনে থেকে মেয়েটি। প্রত্যেকদিন ওকে দেখেছি, প্রত্যেকদিন রামমোহন লাইব্রেরির স্টপ এলে আমি মেয়েটির জন্য উঁকি মেরে দেখতাম। একটু কালো, ছিপছিপে চেহারা লাবণ্যমাখা মুখে মেয়েটিকে প্রত্যেকদিন দেখা এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে, এক-আধদিন ওকে না-দেখলে চিন্তিত হয়ে পড়তাম। মেয়েটিও দেখত নিশ্চয়ই আমাকে—আমি দরজার সামনে ঝুলন্ত

অবস্থা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটির জন্য জায়গা করে দিতাম। এক-একদিন কণ্ডাকটরকে চেঁচিয়ে বলেছি, রোককে, রোককে, জেনানা হ্যায়! যেন আমারই কোন আত্মীয়া। কিন্তু কোনদিন একটাও কথা হয়নি।

আজ মেয়েটিকে নতুন সিঁদুর-পরা ও নতুন বেনারসী-পরা চেহারায় সিনেমা হলের সামনে দেখে আচমকা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, আরে! বাঃ! কবে হল? মেয়েটি লাজুকভাবে মুখ নিচু করল—তারপর আবার মুখ তুলে বলল, গতমাসের সাত তারিখে। মেয়েটি আবার হাসল, আমিও হাসলাম। জীবনে আর আমাদের কোন কথা হবেনা—শুধু একঝলক অনাবিল খুশির বিনিময় হয়ে গেল।

৯

বললাম, তোমার কপালের টিপটা ব্যাঁকা।

মেয়েটি বলল, যাঃ, মোটেইনা।

বলার সময় মেয়েটি হাসেনি। বরং যখন 'যাঃ' বলল, সেটা শোনাল ছোট্ট ধমকের মতো। আমি তখনও খরচোখে ওর ভ্রূসন্ধিতে তাকিয়ে আছি, সম্মোহনকারীর ভঙ্গিতে। চোখ না-সরিয়েই মৃদুস্বরে টেনে-টেনে ঘরের অন্যান্য লোকেরা যাতে ঠিক শুনতে না-পায় এমনভাবে বললাম, আমি এ-পর্যন্ত যত সুন্দরী মেয়ে দেখেছি, সকলেরই কপালের টিপ ব্যাঁকা হয়। কখনোই ঠিক মাঝখানে বসেনা।

মেয়েটি মুখ নিচু করল। আমার এই স্তুতি একটু অপ্রত্যক্ষ বলে মুখ নিচু করতেই হয় এসময়ে। কোন উত্তর দেওয়া যায়না। আমি তখনও দ্বিধায় দুলছি। আর-একটু কী বলব? ঠিক আমার যা মনের কথা? কিন্তু বলার বিপদও আছে—এক-একসময় প্রতিফল এত খারাপ হয়! তবু আমিও মুখ নিচু করে বললাম, কেন ঠিক হয়না জানো? কেন? এবার মেয়েটি স্পষ্টই হাসল। উত্তর শোনার প্রতীক্ষায় যেরকম হাসতে হয়।

বললাম, কারণ, সুন্দরী মেয়েরা যখন আয়নার সামনে টিপ পরতে যায়, তখন তারা নিজের মুখ সবচেয়ে নিবিড়ভাবে দেখে। স্নো-পাউডার মাখা কিংবা চুল আঁচড়ানোর সময় আয়নায় দাঁড়ানোর সঙ্গে এর তুলনাই হয়না। অন্যসবসময়ই তারা আলগাভাবে দেখে, কিংবা দেখে সারা শরীর—অথবা ব্লাউজের হাতাটা কুঁচকে গেছে কিনা, কানের পাশে পাউডারের দাগ—এইসব। কিন্তু শুধু মুখখানা—সম্পূর্ণ মুখও নয়, দুই চোখ, নাকের সামান্য অংশ, ঈশ্বরের কবিতার খাতার মতো নির্মল

কপাল (এইটা বলার সময় আমি টুক করে একটু হেসে নিলাম)—মুখের যেটুকু সবচেয়ে সুন্দর অংশ, মেয়েরা সেটা দেখতে পায়। দেখে অবাক হয়ে যায়, হাত কেঁপে যায়, ঠিক জায়গায় টিপ বসেনা। পৃথিবীর কোন সুন্দরী মেয়ের এপর্যন্ত বসেনি, আমি জানি। টিপ পরতে গিয়ে প্রত্যেক মেয়েই একবার করে নার্সিসাস হয়ে যায়। অবশ্য খুব গভীর দুঃখ পেলেও শুনেছি কোন-কোন মেয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এরকম নিবিড়ভাবে নিজেকে দেখে। কিন্তু তাদের কথা আমি ঠিক জানিনা।

এবার মেয়েটি কাচের গ্লাস ভাঙার মতন বেশ জোরে হেসে উঠল। বলল, ইস, বাকি সব সুন্দরীদের কথাই যেন জেনে বসে আছেন। খুব চালিয়াতি, না?

আমিও বেশ জোরে হাসলাম। আমার বিপদ কেটে গেল। মনের ভেতরটা খুব পরিষ্কার এবং ভালো লাগতে লাগল।

না, এইভাবে কোন গল্প শুরু করতে যাচ্ছিনা। এ-গল্পের এখানেই শেষ এবং কোন ক্রমশ নেই। আমি আমার একটি ছোট্ট বিপদমুক্তির ইতিহাস জানালাম। আমার জীবনটাই বিপদে ভরা, প্রত্যেক পায়েপায়ে আমাকে বিপদের হাত থেকে সাবধান হয়ে চলতে হয়। তার মধ্যে একটা বিপদ, কোন নারী বা বালিকার রূপের প্রশংসা করার পর তার মুখের কথা শুনে আমার কী অবস্থা হবে। আমি সবসময় ভয়ে-ভয়ে থাকি। এ-ভয় শারীরিক নয়। মেয়েটি আমাকে চপেটাঘাত করবে, না তার ব্যায়ামবীর দাদা এসে আমার হাত মুচড়ে দেবে, বা তার স্বামী বা হবুস্বামী এসে আমার সামনে রাগে নাকঝাড়ার আওয়াজ করবে, এরকম কোন আশঙ্কার কারণ আমার নেই! আমার স্তুতি নির্লোভ—আমার আশঙ্কা মেয়েটির উত্তর যদি আমার মনঃপূত না হয়। আসলে রূপের চেয়েও রূপসীর মুখের ভাষারই বোধহয় আমি বেশি ভক্ত। যাকে আগে সুন্দর মনে হয়েছিল, অনেকসময় তার মুখের উত্তর শুনে আমার তাকে কুৎসিত মনে হয়েছে।

অথচ, রূপ দেখলে প্রশংসা বা স্তুতি না-করেও পারিনা। প্রশংসার ভাষা এমন কিছু কঠিন নয়—আমি যদিও একটু কাঁচা—তবে অনেকেই খুব সুন্দর সুরুচি-সম্মতভাবে প্রশংসা করতে জানে। কিন্তু সবচেয়ে শক্ত প্রশংসার উত্তরে কী বলা হবে—সেই ভাষা। প্রশংসার উত্তরে চুপ করে থাকা উচিত নয়, সেটা দৃষ্টিকটু, তাহলে মনে হবে, অহংকারে কথাটা গ্রাহ্যই করা হয় না। আবার প্রশংসায় বিগলিত হয়ে পান্তুয়া-মুখে-পোরা গলায় উত্তর শুনলেও গা জ্বলে যায়।

আমি প্রায়ই ভাবি, কোন নবীন লেখককে যখন কোন প্রবীণ লেখক প্রশংসা করে, তখন নবীনটি কী করবে? চুপ করে বসেও থাকতে পারেনা, হেঁ-হেঁ ধরনের হাসতেও পারে না—তাহলে সেই সময়টি নিশ্চয়ই তার খুবই অস্বস্তি বা সংকটের

সময়। অবশ্য আমার এ-ভাবনা নেই—কাজ তো খই ভাজার মতন, কারণ এরকম সৌভাগ্য আমার এ-পর্যন্ত হয়নি, অদূর-ভবিষ্যতে এমন সম্ভাবনাও নেই যে, আগে থেকে রিহার্সাল দিয়ে নেব।

তবে প্রশংসার সময় সবচেয়ে অরুচিকর জিনিশ, প্রশংসার উত্তরে প্রতিপ্রশংসা। আমি যদি কারুকে বলি আপনার অমুক ব্যাপারটা খুব সুন্দর তার উত্তরে যদি শুনি, আপনারও তো অমুকটা আ-হা-হা—তাহলেই আমার গা রি-রি করে। নেমন্তন্নবাড়িতে কোন একটা রান্নার প্রশংসা করলেই তার পাতায় সেই পদ আরও খানিকটা এনে ঢেলে দেওয়া হয়—এই নিয়মটি ক্ষেমন কুৎসিত। একমাত্র মেয়েরাই, অধিকাংশ মেয়েরাই ন্যায্যভাবে প্রশংসা গ্রহণ করতে জানে। কারণ, মেয়েদের ক্ষেত্রে ঐ প্রতিপ্রশংসা করার ব্যাপার নেই। একটি পুরুষ যদি একটি নারীর রূপের প্রশংসা করে উন্মুক্ত গলায় তার উত্তরে কোন নারীই পুরুষের রূপের প্রশংসা করবেনা। কারণ মেয়েরা জানে রূপের প্রশংসা তাদের সবসময়ই প্রাপ্য, তাদের দাবি—কিন্তু প্রশংসা পাবার জন্য কোন পুরুষকে অনেক যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। তাছাড়া মেয়েদের প্রশংসা হয় নিন্দাচ্ছলে—অর্থাৎ ব্যাজস্তুতি। অন্নপূর্ণা যেমন তাঁর স্বামী সম্পর্কে বলেছিলেন, কোন গুণ নাই তার কপালে আগুন। এখনও সব মেয়েরাই এরকম ভাষা ব্যবহার করে। কোন মেয়ে যদি কোন ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলে দাড়ি না-কামানোই বুঝি স্টাইল হয়েছে আজকাল? কী বিশ্রী খোঁচা-খোঁচা দাড়ি—ঠিক কয়েদীর মতো চেহারা হয়েছে।—তাহলেই বুঝতে হবে মেয়েটি আসলে ছেলেটির মুখের প্রশংসা করছে। ব্যাজস্তুতি ছেলেরা সহ্য করেও বোঝে, মেয়েরা সহ্যই করতে পারেনা। আবার সোজাসুজি স্তুতিতে ছেলেরা একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়, নাকচোখ পর্যন্ত গোল হয়ে সাবা মুখ গোল হয়ে যায়, কোন কথাই বলতে পারেনা। কিন্তু মেয়েরা গ্রহণ করতে পারে, রূপের প্রশংসা শুনে মেয়েরা আরও রূপসী হয়ে ওঠে সেইমুহূর্তে।

মনে করা যাক, একটি সাহেবী কায়দার নেমন্তন্ন বাড়িতে এক মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হল। তিনি একটি কোঁকড়ানো ফুলকাটা জামা পরেছেন। মহিলার কপালের দুপাশে চূর্ণ চুল জংলী ফুলের মতো স্তবক বেঁধে আছে। ঘুরতে-ঘুরতে তাঁর সামনে এসে আমি দাঁড়ালাম হয়তো। আমি অনেককথা বলতে পারতাম, কেমন আছেন, অমুকের সঙ্গে কি দেখা হয়, অমুক ফিল্ম দেখেছেন কিনা, অমুক লেখকের লেখা—ইত্যাদি অনেক বাজে কথা। কিন্তু যে কথাটা আমার প্রথমেই মনে এল, এক মিনিট দ্বিধা করে আমি সেই কথাই বললাম, আপনার জামার সঙ্গে আপনার সুন্দর চুল—অথবা আপনার সুন্দর চুলের সঙ্গে আপনার জামা—চমৎকার মানিয়েছে। মনে হচ্ছে, ভিড়ের মধ্যেও আপনি আলাদা। মহিলা

মুখ টিপে হেসে বললেন, আপনাকে কি আমি ধন্যবাদ দেব?

আমি আঁতকে উঠলাম। মেয়েদের মুখ থেকে ধন্যবাদ শুনলে আমার মনে হয়, কেউ যেন আমার শরীরে গরম লোহার শিক ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আর এই সাহেবী কায়দার নেমন্তন্নে ধন্যবাদের তো ছড়াছড়ি।

মহিলা বললেন, এসব জায়গায় ধন্যবাদ দেওয়াই রেওয়াজ। কিন্তু আপনাকে আমি কিন্তু ধন্যবাদ জানাবনা।

এই বলে তিনি মুখের চাপা হাসিটুকুই রেখে দিলেন কিছুক্ষণ। আমার বিপদ কেটে গেল।

আমার নিতান্ত ভাগ্যদোষে এবং ঘটনাপরম্পরায় প্রায়ই কিছু কিছু সাহেব-মেমের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। সাহেব-মেমদের সঙ্গে কথাবার্তায় কমা ফুলস্টপের মতো প্রায়ই 'ধন্যবাদ' বসিয়ে যেতে হয়, আমি সবসময় সজাগ থাকি। কিন্তু পারতপক্ষে আমি মেমসাহেবদের এড়িয়ে যাই, কথাবার্তা বিশেষ বলিনা। যদি-বা কখনো পাকে-চক্রে কথা বলতেই হয়, কিছুতেই কোন মেমের রূপের প্রশংসা করিনা কখনো। কারণ জানি রূপের প্রশংসা শুনলে কোন মেমের মুখে লজ্জার আভা আসবেনা, অর্ধস্ফুট হাসি দেখা দেবে না, মুখের একটি রেখাও না-কাঁপিয়ে তিনি বলবেন, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। তারপরই আবার অন্যকথা। আমার কাছে এ-জিনিশ ভয়ংকর। সুতরাং মেমসাহেবদের রূপের প্রশংসা আমার মুখ দিয়ে বেরয়না। আর সত্যিকারের রূপসী মেমসাহেবদের মধ্যে ক'জন আছে কে জানে —আমার তো একটিও চোখে পড়েনি। এ-কথাটাও আমি সুযোগ পেলেই কোন বাঙালি মেয়েকে জানিয়ে দিই!

১০

রামায়ণের রাবণ সীতাহরণের চেয়েও বড়ো অন্যায় কাজ করেছিলেন একটি। তখনকার ক্ষত্রিয়ধর্ম অনুযায়ী রূপসী নারীহরণ হয়তো খুব অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিলনা। তাছাড়া, সীতাহরণের প্রধান সার্থকতা, ঐ ঘটনাটি না-ঘটলে রামায়ণ এরকম একটি মহৎ কাব্য হয়ে উঠতে পারতনা। কিন্তু রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করতে গিয়েছিলেন কেন? সব ছদ্মবেশই যখন তিনি ধরতে পারতেন—তখন রামের ছদ্মবেশে গণ্ডি পার হলেই পারতেন!

রাবণ সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরার পর থেকেই মানুষ আর কোন সন্ন্যাসীকে ঠিক বিশ্বাস করেনা। সব সন্ন্যাসীকেই প্রথমে ভণ্ড সন্ন্যাসী বলে ভাবে।

সাধুসন্ন্যাসীদের সম্পর্কে আমার একটু দুর্বলতা আছে। আমার একেবারেই ধর্মবিশ্বাস নেই, নাস্তিকস্য নাস্তিক যাকে বলে, কিন্তু সন্ন্যাসীর জীবন আমাকে আকৃষ্ট করে। কোথাও শিকড় গাড়েনি, কোন আসক্তি নেই, সবকিছু ছেড়ে এই বিশাল বিশ্বে একা হয়ে গেছে এইসব মানুষ। গেরুয়া রংটার মধ্যেও খানিকটা ঔদাসীন্যের ছোঁয়া আছে। অবশ্য চেলাচামুণ্ডা বা ভক্তদের মাঝখানে বসে থাকেন যেসব সাধু তাঁদের সম্পর্কে আমি উৎসাহহীন। কিংবা কলকাতায় যেসব বিখ্যাত সাধু বা মোহন্ত মাঝে-মাঝে এসে ওঠেন—আর তাঁর বাড়ির সামনে বড়লোক ভক্তদের গাড়ির লাইন লেগে যায়—তাঁদের সম্পর্কেও আমার মনোভাব ব্যক্ত না করাই শ্রেয়। আমার ভালো লাগে একা-একা ভ্রাম্যমাণ সন্ন্যাসীদের—একটু ঈর্ষাও হয়, মনের কোন একটা ইচ্ছে উঁকি মারে—আমিও ওদের মতন বেরিয়ে পড়ি।

জানি, খুনী কিংবা চোর-ডাকাতরাও সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে ঘোরে। কিংবা অনেক সাধুই আসলে গেরুয়া-পরা ভিখারি। অর্থাৎ সেই রাবণের ছদ্মবেশ। তবু প্রথম দেখলেই কোন সাধুকে আমার ভণ্ড হিসেবে ভাবতে ইচ্ছে করেনা, প্রথমে আমি তাদের বিশ্বাস করতেই চাই।

ট্রেনের থার্ড-ক্লাস কামরায় একদল ছেলে একজন সাধুকে ক্ষেপাচ্ছিল। এই সাধুটির বয়েস বেশি নয়, তিরিশের কাছাকাছি, খুবই রূপবান। সত্যিকারের গৌরবর্ণ যাকে বলে, টিকোলো নাক—তবে দাড়ি ও জটার বহর আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হতে পারে, কোন সিনেমার নায়ক বোধহয় শুটিং-এর জন্য সাধু সেজেছে। তা অবশ্য নয়, আশেপাশে কোন ক্যামেরা নেই—তাছাড়া সন্ন্যাসীর মুখে যে নির্মল ঔদাসীন্য কোন সিনেমার নায়কের পক্ষে তা আনা খুব শক্ত। সাধুটি কোন জাত তা বোঝা যায়না। তবে বাঙালি নয়, বেশ দুর্বোধ্য হিন্দিতে কথা বলছিল। ওকে আমার খাঁটি সন্ন্যাসীই মনে হচ্ছিল।

একটি ছেলে তাকে বলল, ইস্, গা দিয়ে গাঁজার বিটকেল গন্ধ বেরুচ্ছে! এই যে সাধুবাবা, একটু সরে বসো-না।

সাধু ছেলেটির কথা শুনতে পেলনা। স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

—কী বাবা, ভস্ম করে দেবে নাকি!

—ওসব এঁটেলু এখানে ছাড়ো! সাধু হয়েছ হেঁটে যেতে পারনা?

—গাঁজাফাঁজা থাকে তো বার করো!

—দাড়িটা আসল তো?

—টেনে দ্যাখ-না!

সন্ন্যাসীটিকে নিয়ে একটা তাণ্ডব শুরু হয়ে গেল। কেউ তার চুল-দাড়ি টেনে

দেখতে লাগল, কেউ তার ঝোলা হাতড়াতে লাগল, কেউ তাকে ঠেলে সিট থেকে মাটিতে বসাতে চায়। সাধুটি শান্ত ধরনের, রেগে উঠছেনা, দুর্বোধ্য হিন্দিতে কী যেন বলছে আর মাঝে-মাঝে হাত জোড় করছে। আমার কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্য। তবে, রেলের কামরায় আট-দশটি ছেলে মিলে আজকাল যদি কিছু কাণ্ড শুরু করে, তার তো কোন প্রতিবাদ করা হয়না।

তবু আমি মৃদু গলায় বললাম, আহা থাক-না, বেচারী চুপচাপ বসে আছে—

একজন ছেলে বলল, ডব্লুটি'তে যাচ্ছে, তা আবার সীটে বসা কেন?

আর-একজন বলল, আপনি চুপ মেরে থাকুন! আপনার সঙ্গে কোন কথা বলেছি?

আমাকে চুপ করেই যেতে হল। আমি দৃঢ় নিশ্চিত যে, ঐ আট-দশটি ছেলের মধ্যে অন্তত চার-পাঁচজন নিজেরা টিকিট কাটেনি। তবে, আজকাল নিজেরা একটা অন্যায় করেও অন্যদের সে-সম্পর্কে অভিযোগ জানানো যায়। মনে-মনে বললাম সাধুবাবা, কী আর করা যাবে, সব রাবণের দোষ!

ঐ ছেলেগুলোও নিশ্চয়ই আসলে খারাপ নয়। কলেজ থেকে ফেরার পথে একটু আমোদ করছে। আমোদটা যে মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেটুকু খেয়াল নেই। ঐ ছেলেগুলোর প্রত্যেকের সঙ্গে যদি আলাদাভাবে দেখা করা যায়, নিশ্চয়ই দেখব ভদ্র, বুদ্ধিমান ছেলে। আমারই মতন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তো, আমার চেয়ে আর আলাদা কী হবে? একা-একা এরা প্রত্যেকেই সহজ সাধারণ, কিন্তু একটা দঙ্গল হলেই মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখন একজন আর-একজনকে টেক্কা দিয়ে খারাপ হতে চায়। খারাপ হওয়াই আজকালকার ফ্যাশান, নইলে বন্ধুদের কাছে মান থাকেনা।

কোথায় কোন পাড়ায় কবে দুটো পাজী ছেলে চাঁদা দিতে রাজি হয়নি বলে এক ভদ্রলোককে ছুরি মেরেছিল, তারপর থেকে চাঁদা আদায়কারী ছেলেদের সম্পর্কেই মানুষের একটা বিশ্রী ধারণা হয়ে গেছে। ঐ ছেলে দুটিও আসলে ছদ্মবেশী রাবণ। নইলে, পাড়ায় সবাই মিলে চাঁদা দিলে পুজো হবে, সবাই মিলে আনন্দ করবে—এইটাই তো স্বাভাবিক। বহুকাল ধরে এরকম চলছে, লোকে তো কখনো আপত্তি করেনি। তবে কারুর বেশি চাঁদা দেবার অসুবিধে থাকলে কিংবা না দিতে চাইলে মারধোর করার নিয়ম ছিল না। প্রথম যে ছেলে দুটো মারল, তারা আবহাওয়া বদলে দিল। ঐ ছেলে দুটো আসলে গুণ্ডা ছিনতাইবাজ, ওরা চাঁদা আদায়কারীর ছদ্মবেশ ধরল কেন? সরাসরি ছুরি দেখিয়ে কেড়ে নিলেই পারত। রাবণের মতন আর-একটা অন্যায় করল বলে ওরা সমস্ত চাঁদা আদায়কারীদের ওপর কলঙ্ক দিয়ে গেল। এখন কেউ চাঁদা চাইতে এলেই লোকে

সন্দেহ করে, দিতে চায়না। আর ওরাও দেখেছে, জোর করা কিংবা ভয় দেখানোই সহজ পথ—ফলে সম্পর্কটা এত বিশ্রী হয়ে গেল।

সেজোমাসি হন্তদন্ত হয়ে এসে চোখ গোলগোল করে বললেন, জানিস, সেই মেয়েটাকে আজ আবার দেখলাম ল্যানসডাউন রোডের মোড়ে—

জিজ্ঞেস করলাম, কোন মেয়েটা?

সেই যে সেদিন এসে কাঁদছিল! কী পাজী! কী পাজী! আজও ঠিক সেই একরকম—

মাস দু-এক আগে মেয়েটি আমাদের বাড়ির দরজার কাছে বসে কাঁদছিল। বছর পঁচিশেক বয়েস চেহারা, দেখলে মোটামুটি ভদ্র পরিবারেরই মনে হয়। শুধু কেঁদেই চলেছে, জিজ্ঞেস করলে কিছুই বলতে চায়না। আমার সেজোমাসি যেমন রাগী তেমনি দয়ালু। কথায়-কথায় লোকের ওপর রেগে ওঠেন—আমার ওপর তো অনবরতই রেগে আছেন। আবার লোকের দুঃখ-কষ্ট শুনলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন—মনটা এত নরম। সেজোমাসি প্রথমে রাগ করে বলছিলেন, এই, তুমি এখানে বসে কাঁদছ কেন? কাঁদবার আর জায়গা পাওনি?

মেয়েটি আস্তে-আস্তে তার দুঃখের কথা বলল। কাল রাত্তিরে তার বাবা মারা গেছেন। মায়ের খুব অসুখ। তিনটে ছোটো-ছোটো ভাইবোন! পাড়ার ছেলেরা তার বাবার মৃতদেহ দাহ করার জন্য উদ্যোগ করছে, কিন্তু ওদের বাড়িতে একটাও টাকা নেই। পাটনায় কাকা থাকেন, তাঁকে টেলিগ্রাম করা হয়েছে, তিনি যদি টাকা পাঠান কিংবা আসেন...ভদ্র পরিবারের মেয়ে। কারুর কাছে টাকা চাইতেও পারছেনা। তার কানের দুলদুটো বাঁধা রেখে যদি গোটা পঞ্চাশেক টাকা দিই!

মেয়েটিকে দেখে সন্দেহ করার কোন উপায় নেই। তাছাড়া আমাদেরও তো মাসের শেষে প্রায়ই কোন টাকা থাকেনা, একটাকা-দুটাকা দিয়ে কাজ চালাতে হয়। তখন যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে? ধার যাক, মাসের শেষ রবিবারের সকালে? তাহলে তো আমাদেরও টাকার জন্য—

টাকার জন্য দুল বাঁধা নেবার কোন প্রশ্নই ওঠেনা, সেজোমাসিরই তখুনি চোখ ছলছল করতে শুরু করেছে। ঝড়াক করে দিয়ে দিলে পঞ্চাশ টাকা। বললেন, *আরও যদি কিছু দরকার হয়, কাল এসো—*

কাল আর আসেনি, কোনদিন আসেনি। দুমাস বাদে মেয়েটিকে সেই একই গল্প বলতে শুনেছেন আর-একটা বাড়িতে—সেই কাল বাবা মারা গেছে, পাটনায় কাকাকে টেলিগ্রাম, কানের দুল বাঁধা দেওয়া। সেজোমাসি রেগে আগুন। *ব্লাডপ্রেসার বেড়ে গিয়ে সেজোমাসি না অজ্ঞান হয়ে যান!*

মেয়েটি রাবণের মতন ওরকম ভুল করল কেন? এরপর সত্যিই যদি

আর-কারুর বাবা মারা যাবার পর হঠাৎ বিপদে পড়ে সাহায্য চায়...তখন তার সত্যিকারের দুঃখের মুহূর্তেও তো লোকে তাকে রেগে তাড়া করে যাবে। কেউ বিশ্বাস করবেনা। ঐ মেয়েটির বাবা দুমাস ধরে প্রত্যেকদিন মারা যেতে পারেনা, টেলিগ্রাম পৌঁছুতে যতই দেরি হোক, দুমাস লাগেনা—তবুও মেয়েটির সত্যি-সত্যি সংসারে অভাব আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু ভিক্ষে করার তো অনেক পথ আছে। ঐরকম মিথ্যে গল্প বলায় ফল হল এই, সত্যিই যে ভিক্ষুক নয়, অথচ হঠাৎ বিপদে পড়েছে—সেও আর সাহায্য পাবেনা।

ছদ্মবেশ ধরার আগে এগুলো ভেবে দেখা নিশ্চয়ই উচিত। রাবণেরও উচিত ছিল।

১১

এলা নাম্নী কোন মেয়েকে আমি চিনিনা। কখনো এই নামের কোন জীবিত মেয়ের কথাও শুনিনি। কিন্তু প্রত্যেকটা নামের সঙ্গেই কল্পনার একটি মুখ থাকে। সুতরাং এলা যদি কোন মেয়ের নাম হয়, তবে তার মুখখানি কেমন দেখতে হবে—সে সম্পর্কে আমার কল্পনায় একটি স্পষ্ট ছবি ছিল।

শ্যামলী নামের যত মেয়ের সঙ্গেই আমার দেখা হোক—ঐ নাম শুনলেই আমার ছোটো পিসিমার কথা মনে পড়ে। সাধারণত একটু কালো মেয়েদেরই নাম রাখা হয় শ্যামলী—কিন্তু আমার শ্যামলী পিসিমা ছিলেন ধপধপে ফর্শা। বড় বেশি ফর্শা। একটু লম্বাটে, ডিম ছাঁদের মুখ, নাকে একটা মুক্তোর নাকছাবি—কথায়-কথায় লুটোপুটি হতেন। শ্যামলী পিসিমা মারা গেছেন অনেকদিন আগে, কিন্তু এখনও কোন সপ্রতিভ, আধুনিকা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হলে যদি শুনি তার নাম শ্যামলী, তবুও আমার সেই হাস্যমুখী ফর্শা পিসিমার মুখখানাই প্রথমে মনে পড়ে। অল্পক্ষণের জন্যই যদিও পরক্ষণে সেই মুখ ভুলে সম্মুখবর্তিনীর প্রতি মনোযোগী হয়ে পড়ি। মৃতদের বেশি মনে রাখতে নেই।

এমনকী ইন্দিরা নামটি শুনলেও আমার ইন্দিরা গান্ধীর মুখ মনে পড়েনা। ভবানীপুরে থাকার সময় আমাদের পাশের বাড়িতে একটি ইন্দিরা নামের মেয়ে থাকত—তেরো-চোদ্দবছর বয়েস, খানিকটা কালোর দিকে—বৃষ্টিভেজা মাটির মতন গায়ের রং, ঢলঢলে চোখদুটি একটু বোকা-বোকা—কিন্তু গলার আওয়াজটা ছিল শুভলক্ষ্মীর চেয়েও সুরেলা। ইন্দিরাও বেঁচে নেই, টাইফয়েডে হঠাৎ মারা গিয়েছিল। এখনকার মেয়েদের মধ্যে ইন্দিরা নামটা শোনা যায়না তেমন, তবু,

কোথাও টাইফয়েড অসুখটার কথা শুনলেই ইন্দিরার মুখটা মনে পড়ে একপলক। মৃতদের মুখচ্ছবি স্মৃতিতে সহজে মরেনা।

একটা পার্টিতে একটি মেয়ের অপূর্ব নাম শুনেছিলাম। খুব কায়দার পার্টি, বিলিতি বাজনার সঙ্গে নাচেরও ব্যবস্থা ছিল, ছিল চার প্রকার পশুপাখির মাংস, ছিল তিন প্রকার লঘু ও কড়া মদ। আমার যে-কোন আনন্দ উৎসবই ভালো লাগে, দিশি-বিলিতি যে-কোন সঙ্গীত-নৃত্যই ভালো লাগে, মদ-মাংস সম্পর্কে তো কথাই নেই। শুধু ভালো লাগছিলনা, উপস্থিত কিছু ছেলেমেয়েদের। আজকাল একদল বোকা ছেলেমেয়ে তৈরি হয়েছে, বাঙালি হয়েও যারা নিজেদের মধ্যে পিড্জিন ইংরেজিতে কথা বলতে ভালোবাসে—পার্টিতে সেইরকম বোকা ছেলেমেয়ের দলই ছিল বেশি। তাদেরই মধ্যে একটি মেয়ে, শাড়ি পরেছে স্কার্টের ধরনে আঁটভাবে পেঁচিয়ে, শিঙ্গল করা চুল, মুখখানা ঝকঝকেভাবে মাজা, নিশ্চিত লরেটো হাউস বা কোন মিশনারি কলেজে পড়া মেয়ে, মুখ দিয়ে ধাতব ইংরেজির খই ফুটছে। মেয়েটিকে দেখতে ভালো, অর্থাৎ তার শরীরখানি সমানুপাতিক—সুতরাং তার সাজসজ্জা যাই হোক—তাতে কিছু যায়-আসেনা—আমি মেয়েটির দিকে তাকিয়েছিলাম একদৃষ্টে। মিশনারি স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে একটা উদ্ভট ব্যাপার আমার মনে পড়ছিল। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীরা—যে-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালায়—যারা নিজের দেশ-সংসার-প্রতিষ্ঠা ছেড়ে এসে এদেশের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে আত্মনিয়োগ করেছে—তাদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েও এইসব ছেলেমেয়েরা বেশিরভাগই এমন উৎকট রকমের বোকা আর চালিয়াৎ হয় কী করে? কী এর সামাজিক ব্যাখ্যা? হঠাৎ আমার ইচ্ছে হল ও মেয়েটির নাম জানতে হবে। নাম না-জানলে কোন মেয়ের ছবি সম্পূর্ণ হয়না। ভিড় ঠেলে আমি আস্তে-আস্তে মেয়েটির দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালে আলাপ হবেই। হলও তাই, আর-একটি ছেলে আমার সঙ্গে মেয়েটির আলাপ করিয়ে দিল। মেয়েটির নাম শুনে আমি চমকে উঠলাম। কিছুই বুঝতে পারলামনা। মেয়েটির নাম জাটাবেডা। জাটাবেডা বটআচারিয়া।

এ আবার কী অদ্ভুত নাম? মেয়েটি স্পষ্টতই বাঙালি, ঠোঁটের ভঙ্গি দেখলেই বাঙালি চেনা যায়—যতই ইংরেজি কায়দা দেখাক। একবার মনে হল, মেয়েটির মা বাঙালি, বাবা হয়তো অন্যদেশের অন্যজাতের লোক। কিন্তু কোন্ জাতের মেয়েদের এমন বিদঘুটে নাম হয়? আমার অস্বস্তি কাটলনা। একফাঁকে মেয়েটিকে একটু একলা পেয়ে আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম, মুখের ভাব বেশ কঠোর করে—আপনি-টাপনি নয়, সরাসরি তুমি সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার

নামটা কী? ঠিক বুঝতে পারিনি তখন।

মেয়েটি চমকে আমার দিকে তাকাল, এক অনুপল আমার চোখে চোখ রাখল, কী জানি ভয় পেল কিনা—কিন্তু শরীরের সজাগ ভঙ্গি সাবলীল করে পরিষ্কার কৃষ্ণনগরের ভাষায় বলল, আমার নামে জাতবেদা ভট্টাচার্য। আমার দাদামশাই এই নাম রেখেছিলেন—

আমি জিজ্ঞেস করলাম, জাতবেদা মানে কী?

মেয়েটি এবার রহস্যময়ীর মতন হেসে বলল, আপনি বলুন-না? আপনি জানেননা? খুব আনয়ুজুয়াল নেম, তাই না?

আমি ভুরু কুঁচকোলাম। সত্যিই জাতবেদা কথাটার মানে আমি জানিনা, আগে কখনো শুনিনি। আন্দাজে মানে তৈরি করা যায়। সংস্কৃত শব্দ, মাঝখানে বা শেষে বোধহয় একটা বিসর্গ থাকার কথা। যে বেদ নিয়ে জন্মেছে? জন্ম থেকেই যে জ্ঞানী? এইরকমই কিছু একটা হবে।

জিজ্ঞেস করলাম, তোমার দাদামশাই এই নাম রেখেছিলেন?

মেয়েটি আবার ইংরেজিতে ফিরে গেছে। বলল, ইয়েস, দ্যাটস হোয়াট মাই মাদার টোল্ড মী। আই হার্ডলি রিমেম্বার হিজ ফেস দো—

হঠাৎ আমার হাসি পেল। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে, ভট্টাচার্য যখন—পূজারী, পুরোহিতের বংশ হওয়াও বিচিত্র নয়, দাদামশাই ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ ও ঐতিহ্যবাদী। তারপর পৃথিবীতে কত ওলোপালোট হয়ে গেছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কত সংসারের ভাগ্য বদলে দিয়েছে, পুরুত বংশের মেয়ে এখন প্রাণপণে মেম হবার চেষ্টা করছে—কিন্তু দায় হয়েছে দাদামশাইয়ের চাপিয়ে দেওয়া ঐ নামটা। এমনই নাম যে, সংক্ষেপে জাটা কিংবা বেডা করলেও শ্রুতিমধুর হয়না। আহা বেচারা! এফিডেবিট করে নামটা বদলে নিতে পারেনা? এই তো কিছুদিন আগে রত্নাকর নামে এক ভদ্রলোক এফিডেফিট করে বাল্মীকি হয়ে গেলেন।

সেই থেকে কোন অদ্ভুত উদ্ভট বিষম উল্টোপাল্টা ব্যাপার দেখলেই আমার ঐ মেয়েটির কথা মনে পড়ে। বিহারের একটি গ্রাম্য রাস্তায় একটি গামছা-পরা লোকের হাতে হাতঘড়ি দেখেও আমার জাতবেদার কথা মনে পড়েছিল।

কিন্তু এলার কথা আলাদা। এলা নাম্নী কোন মেয়েকে আমি এপর্যন্ত দেখিনি, তবু ঐ নামের মুখখানি আমার কল্পনায় স্পষ্ট আঁকা আছে। একদিন সেই মুখ আমি বাস্তবে দেখতে পেলাম। দেখে আকস্মিক খুশির ছোঁয়ায় অভিভূত হবার বদলে অকারণ ভয়ে আমার বুক দুরদুর করছিল।

অনেকদিন বাদে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কলেজ স্টিট কফিহাউসে দুপুরবেলা আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম। এমনসময় পাশের টেবিলে এলা এসে বসল। এলা

তার সত্যিকারের নাম কিনা জানিনা—কিন্তু অবিকল আমার কল্পনায় রাখা সেই মুখ। রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এককালে আমার অত্যন্ত প্রিয় বই ছিল, সেই চার অধ্যায়ের নায়িকা এলা, সেই কোমল তেজস্বিনী প্রণয়িনী, অন্তু অর্থাৎ অতীন যাকে দেখে বলেছিল।

'প্রহর শেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলেম
আমার সর্বনাশ।'

এই সেই এলা, আজ সশরীরে, দুপুরবেলা কফিহাউসে। চায়ের দোকানে এলার হঠাৎ চলে আসার বর্ণনা আছে চার অধ্যায় উপন্যাসে। কিন্তু এ যে বাস্তব কফিহাউস। একটা অজানা ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল।

একটা টেবিলে একজন যুবক একা বসেছিল, আর দুটি মেয়ের সঙ্গে সেই এলা এসে বসল সেই টেবিলে। আমার ঠিক সামনে। কল্পনায় যেরকম ছিল, অবিকল সেই রূপ। অন্য মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা, রোগাও নয় স্থূলও নয়, ধপধপে ফর্শা রং, শাদা রঙের শাড়ি, কোথাও প্রসাধনের কোন চিহ্ন নেই—কিন্তু একটা চিক্কণ শ্রী ছড়িয়ে আছে সর্বাঙ্গে। ধারালো নাক, ধারালো চোখ—তবু মুখে কোন কঠোরতা নেই। পাতলা ঠোঁট দুখানি, সুষ্ঠু চিবুক। টেবিলের ওপর হাত রেখে তার ওপর চিবুক, হাসিমুখে কথা বলবে। ঠিক তাই।

ভূত দেখলে যেরকম ভয় করে, কল্পনার মূর্তিকে বাস্তবে দেখলে সেইরকম ভয় হয়। ভয়-ভয় চোখে মেয়েটির দিকে আমি চেয়ে রইলাম। দুরন্ত ইচ্ছে হল, উঠে গিয়ে ঐ টেবিলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করি, আপনার নাম কি এলা? যদি না-ও হয়, তবু আপনি এলা—আপনি আমাদের টেবিলে এসে একটু বসুন! কিন্তু পরক্ষণে মনে হল, একথা বলার কী অধিকার আছে আমার! আমি তো অন্তু নই! আমি একটা এলেবেলে লোক। আমি আগে থেকেই ওর ঐ রূপ কল্পনা করে রেখেছিলাম, তাতে ওর কী যায় আসে। বিশ্বাসই বা করবে কেন?

বন্ধুদের সঙ্গে কথা আর জমছেনা, অন্যমনস্কভাবে হুঁ-হাঁ করে আমি ঘনঘন চেয়ে দেখছি মেয়েটিকে। ক্রমশ আমার ভয় বেড়ে যাচ্ছে। ভয়ে প্রায় কাঁপছি তখন। আমি এত ভয় পাচ্ছি কেন? বারবার নিজেকে প্রশ্ন করে উত্তরটা খুঁজে পেলাম। যদি আমার কল্পনার ছবিটা হঠাৎ-রূঢ়ভাবে ভেঙে যায়—সেই ভয়। যদি দেখি মেয়েটি গোপনে নাক খুঁটছে কিংবা ওর হাসির আওয়াজ বিশ্রী কিংবা ঐ

ছেলেটির সঙ্গে ও কোন বদ রসিকতা করে তাহলে আমি জীবনে চরম আঘাত পাব! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যদি আমার চোখে পড়ে ওর ঘাড়ে ময়লা কিংবা কনুই-এর কাছে শুকনো চামড়া—তাও আমি সহ্য করতে পারবনা। ঐটুকু ত্রুটিও আমার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়।

অকস্মাৎ আমি উঠে দাঁড়িয়ে বন্ধুদের বললাম, চলি রে! সঙ্গে-সঙ্গেই—মেয়েটির দিকে আর একবারও না তাকিয়ে—কফি হাউস থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার কল্পনায় এলা চির রূপসী থাক। তাকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারিনা!

১২

ছেলেবেলায় মা বলতেন, অচেনা জলে কখনও স্নান করিসনি। জলের আবার চেনা-অচেনা কী, সব জলই তো সমান। আসলে, মা হয়তো বলতেন, অচেনা পুকুরে। পুকুর বা পুষ্করিণী কথাটা কী যে-জায়গার মধ্যে জল থাকে সীমাবদ্ধ আয়তনের নাম, না সেই জলটুকুরই নাম, আমি ঠিক জানিনা। তবে, কোন অচেনা জায়গায় গিয়ে পুকুরে স্নান করতে, কোন রোগের ভয়ে নয়, বা সাঁতার জ্ঞানের অভাবে নয়—আমি পূর্ববাংলার নদীনালার দেশ থেকে প্রায় সাঁতারে এসেছি কলকাতা—সুতরাং ডুবে মরার ভয় নেই, কিন্তু তবু যে-কোন অজানা পুকুরে স্নান করতে, বিশেষত যদি আকারে একটু বড়ো এবং জলের রং কালো হয়, আমার ভয়-ভয় করে। মনে হয় পুকুরের ঠিক মাঝখানে কোন অজ্ঞাত চরিত্রের অতিকায় প্রাণী লুকিয়ে আছে। সেই জন্তুর চেহারাটা কল্পনা করতে পারিনা বলেই ভয়ে আরও গা ছমছম করে। জানা শত্রুর চেয়ে অজানা শত্রু হাজারগুণ ভয়াবহ।

কোন মানুষকে একবার অপয়া বলে ঘোষণা করলে যেমন আর সে অপবাদ কখনও ঘোচেনা, যে-কোন অঘটনের জন্য কোন-না-কোন সূত্রে সেই লোকটি দায়ী হয়ে যায়, সেইরকম পুকুর সম্বন্ধেও একবার 'রাক্ষুসে' বা 'সর্বনেশে' নাম রটে গেলে, সে কলঙ্ক আর মুছে ফেলার কোন উপায় নেই। এমন কোন দিঘি বা পুষ্করিণী নেই, যেখানে দু-একটা মানুষ বা বাচ্চা ডুবে মরেনি, মানুষ তো কতরকমভাবেই মরে, পুকুরে ডুবে মরার মধ্যে এমন আশ্চর্য কী আছে, তবু পাড়ার কোন প্রাজ্ঞ পিসিমা যদি উচ্চারণ করে ফেলেন 'ও পুকুরটা রাক্কুসে, প্রত্যেক বছর একটা করে মানুষ নেয়—' তাহলে তৎক্ষণাৎ সে কথা রটে যাবে, এবং স্থান পেয়ে যাবে ইতিহাসে। উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের পুকুর সম্পর্কে আমরা

ছেলেবেলায় গুজব শুনেছি, ওর মধ্যে কী একটা অদ্ভুত প্রাণী আছে, যা প্রতিবছর দুটো করে বাচ্চা ছেলে খায়। একবার নাকি কুড়ি হাত লম্বা একটা বিকট জন্তু জল থেকে উঠে এসে লোকজনকে তাড়া করে আবার জলে নেমে যায়। অবশ্য, সে-জন্তু আমরা দেখিনি, দেখেছে এমন লোকের সঙ্গেও দেখা হয়নি, কিন্তু প্রতি বছর এখনও দুটো করে ছেলে মরছে ঠিকই।

যাইহোক, আমাদের আগের বাড়িতে একটা বেশ বড়ো পুকুর ছিল। অবশ্য পুকুরটা ঠিক বাড়িতে নয়, এবং বাড়িটাও আমাদের নয়। করপোরেশনের এলাকা একটু ছাড়িয়ে, কোন ধনী জমিদারের একদা যে প্রমোদ-বাগানবাড়ি ছিল, এখন দৈন্যদশায় সেটাতে অনেকগুলি ফ্ল্যাট বানানো, তারই একটাতে আমরা ছিলাম। বাড়ির পাশে একটা শ্রীহীন বাগান, সেখানে দু-একটা দুর্লভজাতীয় ফুলগাছের সঙ্গে অজস্র আগাছার ঝোপ, তার ওপাশে পুকুর—একদা চারদিক পাঁচিল ঘেরা ছিল নিশ্চিত, এখন দূরের রাস্তার গাড়োয়ান গাড়ি থামিয়ে বলদজোড়াকে এ-পুকুর থেকে জল খাইয়ে নিয়ে যায়।

সারা গ্রীষ্মকালটা ওখানে স্নান করতাম। জল বেশ হাল্কা ও ঠাণ্ডা, তাছাড়া শ্যাওলা ছিলনা, একবার সাঁতার কেটে এপার-ওপার হয়ে এলে শরীর ঝরঝরে হয়ে যেত।

সেই পুকুরটা সম্পর্কে হঠাৎ একবার অপয়া বা সর্বনেশে বদনাম রটে গেল। একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ফেলে পুকুরের মাঝখান থেকে একডুবে মাটি তুলতে গিয়েছিল। যখন ভেসে উঠল, হাতে মাটি নেই, কিন্তু কপাল ও নাক জুড়ে অনেকখানি কাটা, ছেলেটা কোনমতে পাড়ে সাঁতরে এসে অতখানি রক্তক্ষরণের পর অবশ হয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই কোন ইটের টুকরো বা গজাল বা পাথরে লেগে—কিন্তু লোকে অন্যরকম সন্দেহ করল। বিশেষত, ত্রিলোচনবাবু, যিনি প্রত্যেকদিন ঐ পুকুরের একগলা জলে দাঁড়িয়ে গঙ্গাস্নানের স্তব পড়তেন, ঈষৎ গম্ভীরভাবে বললেন, এ-পুকুরটায় দোষ আছে হে। আমি অনেকদিন থেকেই লক্ষ্য করছি! কুমীর বা কচ্ছপ না—ওরা লুকোতে পারেনা, জানান দেয়ই। ওসব আগেকার দিনের জমিদারদের ব্যাপার—কত লোককে মেরে হয়তো পুঁতে রেখেছিল এই পুকুরেই। নইলে, সেদিন একটা মরা শালিক ভাসছিল কেন? পুকুরে কেউ কখনও মরা পাখি দেখেছে এর আগে?

ত্রিলোচনবাবুর বলার ভঙ্গি এমন, যে, শুনলেই বিশ্বাস করতে মন চায়। বিশেষত শেষের কথাটা। সত্যিই কয়েকদিন আগে পুকুরে একটা মরা শালিক ভাসছিল। কীরকম যেন শুকনো ধরনের মরা, শরীরে কোন আঘাত নেই, অর্থাৎ কেউ উড়ন্ত পাখিটাকে মারেনি। তাহলে কি আপনিই মরে পড়েছিল? আজ পর্যন্ত,

কোন স্বাভাবিকভাবে মৃত পাখি আমি দেখিনি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই গল্প 'চড়ুই পাখিরা কোথায় যায়?' বহুবার ভেবেছি। বাড়িতে কত চড়ুই পাখি, ঘুলঘুলিতে বাসা বাঁধে, অথচ একটা মরা চড়ুই, স্বাভাবিকভাবে হার্ট ফেল করে বার্ধক্যে মরা, কোনদিন বাড়িতে দেখিনি। মরার আগে সব পাখিরাই কোন এক অনির্দিষ্ট দেশে চলে যায় মরতে।

এরপর ঐ পুকুরে স্নানার্থীদের সংখ্যা যত কমতে লাগল, তত বাড়তে লাগল গুজব। কে নাকি, দুপুরে একলা ঘাটে গিয়ে দেখেছে জলের মাঝখান থেকে অসংখ্য বুড়বুড়ি উঠছে। আরেকজন সত্যিই দেখেছে একটা কোন বিশাল প্রাণী জলের মধ্যে থেকে দাপাদাপি করছে। অসম সাহসিনী মাদ্রাজী বউ এসব শোনা সত্ত্বেও হাসতে-হাসতে সাঁতরে পুকুর পার হতে গিয়ে পায়ে ক্র্যাম্প ধরে—এবং তার ধারণা কেউ তার পা টেনে ধরেছিল।

আমাদের নিচের ফ্ল্যাটে থাকত তপন, পোর্ট কমিশনে কাজ করে, ক্রিকেট খেলা চেহারা, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও মুর্গীর মাংস রান্না ওর জীবনের এই দুটিমাত্র নেশা, একদিন আমাকে ডেকে বলল, কী আপনি যে আর পুকুরে স্নান করতে আসেননা, আপনিও ভয় পেলেন নাকি? স্বীকার করতে লজ্জা হল, তবু সত্যিই আমি ভয় পেয়েছিলাম। পুকুরটা আমার কাছে আবার কী রকম অচেনা হয়ে গেছে। পুরোনো কালো জল, সারাদিন আজকাল আর স্নানার্থীদের দাপাদাপি থাকে না বলে শান্ত ও গম্ভীর, দেখলেই আমার কীরকম রহস্যময় যেন মনে হয়। আমাদের বারান্দা থেকে দূরে পুকুরটা একটু-একটু দেখা যায়। একদিন পড়ন্ত বিকেলে সেদিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম। কিছুই দেখিনি, তবু চমকে উঠেছিলাম। কিছু একটা দেখব এই প্রত্যাশা, অথবা অযৌক্তিক অলৌকিকের প্রতি আমার গোপন বিশ্বাস জন্মানোর লজ্জাতেই চমকে উঠেছিলাম হয়তো।

কাঁধে তোয়ালে, ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে-মাজতে তপন আমাকে বলল, আসুন, নেমে আসুন।

আমি বললাম, না, এখন বর্ষা নেমে গেছে, ঐজন্যই আর পুকুরে যেতে ইচ্ছে হয় না আর কী।

যাঃ, এ আর কী এমন বর্ষা। আসুন, নেমে আসুন। আমি তো রয়েছি, ভয় কী!

শেষের কথাটাই আমার আত্মাভিমানে আঘাত দিল। যেতে হল। পুকুরে যাবার পথে তপন সদ্যদেখা কী যেন একটা সিনেমার গল্প বলতে লাগল আমায়, জলে নেমেও সেই গল্প, কখন যে আমরা পুকুরটাকে ভুলে থেকে স্নান সেরে

উঠে এলাম খেয়ালই নেই। এইরকম পরপর তিনদিন গেলাম, নির্দোষ, সরল জল, কোথাও কোন রহস্য নেই, আমরা দুজন যুবক স্নান সেরে আসি। যদিও আমরা দুজনেই হয়তো মনে-মনে লজ্জিত হয়ে ছিলাম একটা ব্যাপারে, আগে একবার অন্তত পুকুরটা সাঁতরে পার হয়ে আসতাম, এখন মাঝখান পর্যন্তও যাইনা।

এরপর কয়েকদিন যাইনি, তিনদিন প্রবল ঝড় ও বৃষ্টি, স্নান না-করে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে খিচুড়ি খাবার দিন। হঠাৎ শুনতে পেলাম, তিনদিন ধরে তপন বাড়ি নেই। বাড়ির লোক কিছুই জানেনা কোথায় গেছে। মেঘ সরে গিয়ে চতুর্থ দিনের রোদে আমরা তপনের জন্য সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। এরকম না বলে-কয়ে সে তো কোথাও যাবেনা। ত্রিলোচনবাবু বললেন, পুলিশে খবর দাও হে, আর পুকুরে জাল ফেলো!

পুলিশে খবর দেওয়া হল, কিন্তু পুকুরে জাল ফেলতে হলনা। তার আগেই তপনের মৃতদেহ ভেসে উঠল। জলে ফুলে বীভৎস চেহারা। সেই প্রথম আমি মৃতদেহ দেখলাম, যাকে আমি জীবন্ত অবস্থায় চিনতাম। আমাদের পরিবারে তখনও কোন মৃত্যু আসেনি। পুলিশ খুব পুলিশী কায়দায় জিজ্ঞেসবাদ করতে লাগল সকলকে, প্রথমেই ত্রিলোচনবাবুকে, আমরা সবাই বিষম অস্বস্তিতে রইলাম! এ কী ধরনের মৃত্যু তপনের, যাতে ওর সম্পর্কে শোক করার বদলে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধেই উদবিগ্ন হতে হচ্ছে। অবশ্য, বেশিক্ষণ এরকম রইল না, তপনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল সকালে, বিকালের দিকে তপনের বউদি বুকশেলফের পিছন থেকে চিঠিটা খুঁজে পেলেন। চিঠিটায় তিনদিন আগের তারিখ দেওয়া, বোধহয় ঝড়ে উড়ে পড়ে গিয়েছিল টেবিল থেকে। সেই মামুলি এবং অতি প্রয়োজনীয় চিঠি, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়...'। আমরা সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তপনের সম্বন্ধে সত্যিকারের দুঃখিত হতে শুরু করলাম। যদিও তপনের রুচির প্রশংসা করতে পারিনি আমি, মরতে হলে কত ভদ্র উপায় আছে, ঘুমের ওষুধ, তার বদলে অমন বিশ্রীভাবে ডুবে মরা। তাছাড়া ডুবলই বা কী করে, অমন ভালো সাঁতার জানত!

যাইহোক, এরপর পুকুরটা সম্বন্ধে বদনাম কেটে যাওয়া উচিত ছিল, কারণ ওর মৃত্যুর জন্য জলের কোন দোষ নেই। তাছাড়া, জলের মধ্যের অদেখা জন্তু তো আর ওকে দিয়ে চিঠি লেখায়নি! কিন্তু পুকুরটা হয়ে গেল সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত। কেউ আর ওর ধারও মাড়ায়না, সাঁতার জানা সত্ত্বেও তপন ডুবে মরল কী করে, এ-রহস্যই সকলকে ভয় দেখায়।

অথচ, খুব সহজ। হয় তপন গলায় ভারী কিছু বেঁধে নিয়েছিল, তিনদিন

পর সেটা ছিঁড়ে যেতে মৃতদেহ ভেসে ওঠে। অথবা...অথবা, আর-একটা কথা আমার বারবার মনে হতে লাগল, হয়তো তপন ঝোঁকের মাথায় পুকুরের মাঝখানে ডুব দিয়ে দেখতে গিয়েছিল—কেন সেই ছেলেটার নাক ও কপাল কেটেছিল—তারপর মনে ভয় থাকার জন্যই হয়তো দম আটকে যায়, কিংবা কিছুতে জামা-কাপড় জড়িয়ে...কী জানি। আমার এই দ্বিতীয় সন্দেহটার কথা দু-একজনকে বলতেই তারা তৎক্ষণাৎ মেনে নিল এবং এটাই মুখে-মুখে ছড়িয়ে গেল যে, পুকুরের মাঝখানে একটা ভয়ংকর কিছু আছে—তপন সেটাই ডুব দিয়ে দেখতে গিয়ে মারা যায়। উল্টে আমিই তখন প্রতিবাদ করে বলি, তাহলে তপন চিঠি লিখল কেন? কেউ সে কথা শোনেনা। পুকুরটা সম্পর্কে চরম দুর্নাম ছড়াবার জন্য দায়ী হলাম আমিই।

তপনের মৃত্যু আমাকে সাহসী করে দিয়েছিল। পুকুরটা সম্বন্ধে সব কুসংস্কারই তখন অবিশ্বাস করতে শুরু করেছি। অতদিনের পুকুর—ওর মধ্যে আবার জন্তুজানোয়ার কী থাকবে? থাকলে কেউ-না-কেউ দেখতই। বড়জোর মাঝখানে কোন বাঁশ বা পাথরের টুকরো পোঁতা আছে। আমার ইচ্ছে হত এক-একবার, আমিও খুব খারাপ সাঁতার জানিনা, সাবধানে একবার ওখানে ডুব দিয়ে দেখে আসি, ওখানে কী আছে, তারপর লোকের ভুল ভেঙে দি।

তার বদলে আমরা ও-বাড়ি ছেড়ে দিলাম। আমিই উদ্যোগী হয়ে খুব তাড়াতাড়ি খোঁজাখুঁজি করে, অমন খোলামেলা বাড়ি ছেড়ে চলে এলাম আবার করপোরেশন এলাকার মধ্যে। বাড়ির লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল আমার ব্যস্ততা দেখে, কিন্তু আমি সত্যিই ওখানে থাকতে চাইনি আর। জলের রহস্য জানতে আমার আর ইচ্ছে হয়না। এখন করপোরেশনের কলের ছিরছিরে জলই আমার ভালো লাগে।

ও-বাড়িতে শেষ ক'দিন আমার ইচ্ছে হতো পুকুরে স্নান করতে। মা দিতেননা কিছুতেই। অথচ, কুসংস্কার মেনে একটা নিরীহ পুকুরে স্নান না-করার কী মানে হয়। আমি মাঝে-মাঝে সন্ধেবেলা পুকুরপাড়ে যেতাম। বাঁধানো ঘাটের ওপর বসে সিগারেট ধরাতাম। পুকুরের যেখানটায় তপনের দেহটা ভেসে উঠেছিল সেদিকে তাকালে কীরকম বিশ্রী উদাসীন লাগত। হঠাৎ একদিন কান্নার শব্দ। দেখি ঘাটের পাশে মাঠের ঘাসে বসে একটি যুবতী মেয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তখন সন্ধের আবছা অন্ধকার। মেয়েটি বোধহয় আমাকে দেখতে পায়নি। আমি তৎক্ষণাৎ সে-জায়গা ছেড়ে উঠে এলাম, মেয়েটির মুখ দেখার চেষ্টাও না-করে।

নিছক ভদ্রতাবোধে চলে আসিনি। ভয়ে! ভয় হয়েছিল, মেয়েটিকে যদি কোন কারণে চিনতে পেরে যাই, যদি হঠাৎ মনে পড়ে তপনের মৃত্যুর সঙ্গে ওর কোন

সম্পর্ক—তা হলেই তো মহামুশকিল। পুকুরের জলের রহস্যের বদলে চোখের জলের রহস্য নিয়ে তখন আমাকে আবার মগ্ন হতে হবে। তাছাড়া মেয়েটি যদি বলে, আপনি বিশ্বাস করেন, পুকুরের মাঝখানে কী আছে—এটা জানার জন্যই শুধু তপন মরেছে? আপনি একবার ডুব দিয়ে দেখে আসুন না! সর্বনাশ, এই রহস্য কিংবা রহস্য উন্মোচন করতে আমাকে কতদূর জটিলতায় চলে যেতে হবে ভাবতেই আমার ভয় হয়েছিল।

তারপরই ও-বাড়ি থেকে চলে আসি। এখন জলের আর কোন চেনা-অচেনা নেই। কোন রহস্য নেই। কল দিয়ে কেঁচো বা সাপ বেরুলেও এখন আর নতুন বিস্ময়ের কিছু থাকবেনা। সরু জলের ধারায় আমার স্নান করার সময় পুরো শরীরটাও ভেজে না—কিন্তু তাতেও দুঃখ নেই তবু তো আমাকে কোন জলের রহস্য ভেদ করতে হবেনা।

১৩

মা জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁরে, কাল শান্তাদের বাড়িতে গিয়েছিলি?

আমি বই হাতে, অন্যমনস্ক, তবু সঙ্গে-সঙ্গে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেয়েই বুঝেছিলাম মা আসছেন আমার ঘরে এবং এসে এই প্রশ্নটাই জিজ্ঞেস করবেন। মা তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, কী বলল শান্তা?

বইয়ের সে-পাতার একেবারে শেষ লাইনে এসে চোখ থমকে আছে, সুতরাং সেই লাইনটা না-পড়ে উত্তর দেওয়া যায়না। শেষ করে, বইটা মুড়ে রেখে চোখ তুলে উত্তর দিলাম, শান্তামাসির সঙ্গে দেখাই হলনা। বড়ো মেসো আর শান্তামাসি টালিগঞ্জ গেছেন শুনলাম, বাড়িতে আর কেউই নেই। ছোটকু বাথরুমে ছিল, আর নবনীতাকে দেখলাম তার প্রাইভেট টিউটর পড়াচ্ছে—তখন ওর সঙ্গে কথা বলা যায়না। তাই আমি বেশিক্ষণ না-দাঁড়িয়ে চলে এলাম। আমার একটা কাজ ছিল।

—শান্তার শাশুড়ি ছিলনা?

—দেখলাম না তো!

—আজ তাহলে একবার যাস—

ততক্ষণে আমি আবার বইটা খুলেছি, পরের পাতার প্রথম লাইনে চোখ নিবদ্ধ, উত্তর দিলাম, হ্যাঁ, দেখি যদি পারি তো একবার যাব আজ আবার—

—শান্তার টেলিফোনটা খারাপ—আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারছিনা, তুই একটু জিজ্ঞেস করে আসিস আজ, ওর কী মত সেই বুঝে—

—যাব, যাব, বলছি তো সময় পেলে আজ যাব—

আজ যে যাব তা বহুক্ষণ আগে থেকেই আমি ঠিক করে রেখেছি, সিঁড়িতে মার পায়ের শব্দ পেয়েই—যত কাজই থাক আজ যাব। কেননা, কাল আমি সত্যিই যাইনি। ওটা মিথ্যে কথা। শান্তামাসির মেয়ে নবনীতার সঙ্গে আমাদের পাশের বাড়ির দেবনাথের বিয়ের সম্বন্ধ মা প্রায় ঠিকঠাক করে ফেলেছেন। দেবনাথের বাবার চিনির কল আছে, দেবনাথ নিজেও জার্মানি থেকে ও ব্যাপারে ডিগ্রি নিয়ে এসেছে, বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা তার। খুবই সুপাত্র যাকে বলে। এ-বিয়ে হলে শান্তামাসিও আনন্দে আটখানা হবে, আমারও আনন্দের কারণ আছে, স্যাকারিন দিয়ে চা খেয়ে-খেয়ে জিভ তেতো হয়ে গেল, এ-বিয়ে হলে নবনীতার শ্বশুরবাড়ি গেলে নিশ্চয়ই চিনি দেওয়া চা খাওয়া যাবে সবসময়। ও-বাড়িতে নিশ্চয়ই প্রত্যেকদিন প্রতিবারের চা-তেই চিনি থাকে।

সেদিন সন্ধেবেলা সব কাজ ফেলে শান্তামাসির বাড়িতে গেলাম। শান্তামাসি বাড়ি ছিলেন, সবাই বাড়ি ছিলেন, শান্তামাসি এই সম্বন্ধের কথা শুনে খুব খুশি —নবনীতাকে আমি বিয়ের কথা বলে রাগালাম। আমার আগের দিন না আসায় কোন ক্ষতি হয়নি, মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথা বলাটা ধরা পড়ারও কোন সম্ভাবনা নেই। লাখ কথা না হলে বিয়ে হয়না, মা-মাসিতে এখন এত কথা হবে যে আগের দিন আমি গিয়েছিলাম কী যাইনি—সে প্রসঙ্গই উঠবেনা। কিন্তু আমার মিথ্যে কথায় একটু খুঁত রয়ে গেল।

শান্তামাসির বাড়িতে এর আগে গিয়েছিলাম মাস দুয়েক আগে, সেদিন ঘরভর্তি সবাই বসে গল্প করছিল, এমনসময় ঝি এসে নবনীতাকে বলল, দিদিমণি তোমার মাস্টারমশাই এসেছেন! আড্ডার মাঝপথে নবনীতাকে উঠে যেতে হল, শুনলাম পরীক্ষার আগের চারমাস ওকে ওদের কলেজের একজন অধ্যাপক বাড়িতে পড়াচ্ছেন—নবনীতা বরাবরই ইংরেজিতে একটু কাঁচা। সেদিন উঁকি মেরে দেখেছিলাম, আমারই বয়েসী অ্যাংরি ইয়ংম্যান টাইপের এক ছোকরা ওর সেই অধ্যাপক।

সুতরাং, মায়ের কাছে মিথ্যে কথা বলবার সময়, পরিবেশ ফোটাতে আমার বিশেষ অসুবিধে হয়নি। শান্তামাসির ভাসুরের ক্যান্সার হয়েছে, তাঁকে দেখতে প্রায়ই ওরা টালিগঞ্জে যান। সুতরাং শান্তামাসির টালিগঞ্জে যাওয়ার কথা শুনলে মা অবিশ্বাস করবেননা। ছোটকুর স্বভাব অফিস থেকে ফিরেই ঘণ্টাখানেক বাথরুমে কাটানো—দিনে তিন-চারবার চান করা ওর বাতিক। আর সন্ধেবেলা নবনীতার অধ্যাপক তো পড়াতে রোজই আসে। শান্তামাসির শাশুড়িও প্রায় রোজ বিকেলেই মহানির্বাণ মঠে কথকতা শুনতে যান। সুতরাং বইয়ের দিকে মনোযোগ দেবার

অছিলায় আমি চট করে মিথ্যে কথাটা বানিয়েছিল্যম। তবু একটা খুঁত রয়ে গেল। পরের দিন শান্তামাসির বাড়িতে গিয়ে কথায়-কথায় জানতে পারা গেল, দিন পনেরো আগে নবনীতার সেই অধ্যাপককে নাকি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। নবীন অধ্যাপকটি উগ্র আধুনিক এবং উদ্ধত, বাড়ির সবার সামনে সিগারেট খায়, এমনকী স্বয়ং শান্তামাসির বর অর্থাৎ আমার জবরদস্ত বড়োমেসোর কাছে সে নাকি দেশলাই চেয়েছে—এই অপরাধে তার চাকরি গেছে। শান্তামাসি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, আমি বুড়োসুড়ো ধীরস্থির আর-কোন অধ্যাপককে জোগাড় করে দিতে পারি কিনা।

মায়ের কাছে আমার মিথ্যে কথাটায় এই একটা খুঁত থেকে গেল—নবনীতা প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়ছে। তা যাকগে, আসল কাজটা তো ঠিকঠাকই হচ্ছে —সামান্য একটা মিথ্যে কথায় কী আসে যায়!

কিন্তু মায়ের কাছে ঐ মিথ্যে কথাটা আমি কেন বললাম? যদি বলতাম, না মা, কাল শান্তামাসিদের বাড়িতে যেতে পারিনি, আজ যাব—তাহলে কী এমন ক্ষতি হতো? মা দু-তিনদিন ধরেই যেতে বলছিলেন, আমি রোজই যাব-যাব করে পাশ কাটাচ্ছিলাম, সুতরাং তিনদিনের দিন ঐ মিথ্যে কথা এবং চতুর্থ দিনের দিন সত্যিই যাওয়া। কিন্তু তৃতীয় দিনেও ঐ মিথ্যেটা না বলাই তো আমার উচিত ছিল। তবু কেন?

—তারপর ইন্দ্রনাথ স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল।

—তাই নাকি? তারপর?

—প্ল্যাটফর্মে বিশেষ লোকজন নেই, কয়েকটা ছোকরা একদিকে জটলা করছিল—তাদের চেহারাও বিশেষ সুবিধের নয়—ইন্দ্রনাথের ঐ অতবড়ো জোয়ান শরীর আমার পক্ষে বয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়— মাথায় জল ছেটানো দরকার—অথচ ওকে ফেলে রেখে যেতে পারছিনা।

—কেন, তাতে কী হবে?

—ইন্দ্রনাথের পকেটে চার হাজার টাকা ছিল, ও আমাকে আগেই বলেছিল —সুতরাং ওকে একা ফেলে যাওয়া, আর সেই ছোকরাগুলোর রকমসকম...

—তখন কী করলি?

—ইন্দ্রনাথের ওপর চোখ রেখে একটু দূরে ঘোরাঘুরি করে অতিকষ্টে একটা কুলিকে দেখতে পেলাম, ছোটো স্টেশন তো...কুলিটাকে দিয়ে জল আনালাম এক বালতি...তারপর পৌনে দুঘণ্টা বসে থাকার পর পরের ট্রেন যখন এল...

ইন্দ্রনাথ এবং আমার—দুজনের বন্ধু এমন একজনকে ঘটনাটা শোনাচ্ছিলাম। ঘটনাটি সবই সত্যি। ইন্দ্রনাথের একদিন সত্যিই খুব শরীর খারাপ হয়েছিল এবং

অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল রাত্রিবেলার প্ল্যাটফর্মে। কিন্তু বলার সময় কেন যে একটু বদলে গেল—কিছুই বুঝিনা। ইন্দ্রনাথ বলেছিল ওর পকেটে দেড হাজার টাকা আছে। দেড় হাজার টাকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবু সেটাকে বাড়িয়ে চার হাজার টাকা বলার ইচ্ছে আমার কেন হল, আমি নিজেই জানিনা। পরের ট্রেন এসেছিল আধঘণ্টা বাদে—আমি সেটাকে বাড়িয়ে করলাম পৌনে দুঘণ্টা। কেন? এমনকী আধঘণ্টার বদলে একঘণ্টা কী দুঘণ্টাও নয়, পৌনে দুঘণ্টা। ঘটনাটাকে বেশি গুরত্ব দেবার জন্য এই মিথ্যের অবতারণা? পকেটে দেড় হাজার টাকা নিয়ে নির্জন প্ল্যাটফর্মে এক বন্ধুর অজ্ঞান হয়ে যাওয়াটাই তো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা—তাকে আরও বাড়িয়ে আমার লাভ কী? তাহলে কী, সবসময় যা ঘটে—তারই পুনরুক্তি করতে একঘেয়ে লাগে বলেই এইসব নির্দোষ মিথ্যে বলতে সাধ হয়?

—রতনটা একেবারে বাজে ছেলে। কোন কথা দিয়ে কথা রাখেনা—বড়োবউদি বললেন।

—অফিসেও কেউ ওকে গ্রাহ্য করেনা শুনেছি। মুখেই শুধু লম্বাচওড়া কথা, কাজের বেলা কিছুনা—এবার ছোটোবউদি।

পারিবারিক মহলে আমার মামাতো ভাই রতনের খুব নিন্দে হচ্ছিল। আমার ঠিক সহ্য হচ্ছিলনা। রতনকে আমার খুব ভালো লাগে, চমৎকার দিলখোলা মানুষ, সবলভাবে হা-হা করে হাসে, কী চমৎকার গান গায়। রতনের দায়িত্বজ্ঞান একটু কম, সময়ের ঠিক রাখে না, কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনা—কিন্তু একই মানুষ ভালো গান গাইবে, আবার সময়েরও ঠিক রাখার আদর্শ দায়িত্বপালন হবে—এতটা আশা করা যায়না। রতনের আমি ভক্ত। সুতরাং আমি প্রাণপণে বউদিদের নিন্দের প্রতিবাদ করতে লাগলাম। কিন্তু বউদিরা ওসব গানটানের দিকেই যাচ্ছেনা। শুধু ঐ দায়িত্বজ্ঞানটার ওপরই সব জোর। তখন আমি বললাম, রতনের দায়িত্বজ্ঞান নেই কে বলল? গতবছর সেই যে আমরা পুরী গেলাম— রতনই তো আমাদের বাড়ি ঠিক করে দিল!

বড়োবউদি বললেন, রতন বাড়ি ঠিক করে দিয়েছে? আমি বিশ্বাস করিনা। আমি বললাম, সত্যিই। রতনের কথাতেই তো আমরা দীঘা না গিয়ে পুরী গেলাম। রতন বাড়ি ঠিক করে দেবে বলেছিল—আমিও প্রথমটায় ঠিক বিশ্বাস করিনি—কিন্তু রতন ওর এক বন্ধুকে চিঠি লিখে রেখেছিল—স্বর্গদ্বারে চমৎকার বাড়ি—ভাড়া লাগলনা —এমনকী পৌঁছে দেখলাম আমাদের জন্য খাবারদাবার রেডি। রতনের অফিসের ম্যানেজারের বাড়ি—

—সত্যি বলছ?

রতনের নিন্দে থামাবার জন্য রতনের দায়িত্বজ্ঞানের এই কাহিনীটা বলার প্রেরণা আমার ভেতর থেকেই কে যেন আমায় দিয়ে দিল। ঘটনার কাঠামোটা তো সত্যিই। আমরা ঠিকই পুরী গিয়েছিলাম, রতন ছিল আমাদের সঙ্গে—ঠিক করেছিলাম কোন হোটেলে থাকব। কিন্তু স্টেশনেই রতনের অফিসের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা হল—তিনি কলকাতায় ফিরছেন সপরিবারে। তিনিই উৎসাহিত হয়ে বললেন, স্বর্গদ্বারে একটা বাড়ি তিনি অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে দুমাসের জন্য ভাড়া নিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ কারণে একমাসের পরই তিনি ফিরে যাচ্ছেন—সুতরাং সেই বাড়িতে আমরা অনায়াসে একমাস থাকতে পারি। বাকি অংশটা রং চড়ানো হলেও রতনের জন্যই তো আমরা বাড়িটা পেয়েছিলাম।

ছোটোবউদি বললেন, সত্যি, রতন পুরীতে বাড়ি জোগাড় করে দিতে পারে নাকি—আমার দাদা বউদি পুরী যাবেন বলেছিলেন—তা হলে রতনকে বলতে হবে তো!

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সর্বনাশ, এদিকটা তো আমি ভেবে দেখিনি! আজ বিকেলেই রতনের কাছে ছুটতে হবে। রতনের প্রশংসা করতে গিয়ে আমিই তার বিপদের কারণ ঘটালাম।

এইসব অকারণ মিথ্যে অকারণেই অনেকসময় ধরা পড়ে যায়। প্রথম ঘটনায় আবার ফিরে আসি। শান্তামাসির বাড়ির টেলিফোন আবার ঠিক হয়ে গেল, আমার আর দায়িত্ব রইল না কিছুই। নবনীতার বিয়ে আমার মায়ের উদ্যোগেই প্রায় ঠিকঠাক। এমন সময় একদিন মা ট্যাক্সিতে আসতে-আসতে দেখলেন, কলেজের রাস্তায় নবনীতা আরও দুটি মেয়ে এবং তিনটি ছেলের সঙ্গে খুব হাসিগল্প করছে। এতে মনে করার কিছু নেই—আজকালকার কলেজের মেয়েরা বাইরে ছেলেদের সঙ্গে মিশবে, গল্প করবে—এ তো স্বাভাবিক। মা বাড়ি ফিরে হাসতে-হাসতেই বললেন, নবনীকে রাস্তায় দেখলাম, খুব বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছে, আমি আর ডাকিনি! তারপর মা শান্তামাসিকে ফোন করলেন—একথা সেকথা সাতকাহনের পর মা জিজ্ঞেস করলেন, নবনীতা বাড়ি ফিরেছে কিনা। ফিরেছে শুনে মা টেলিফোনেই ফিসফিসিয়ে বললেন, দ্যাখ শান্তা, নবনীকে যখন মাস্টার এসে পড়ায়—তখন তোরা সবাই বাড়ি ছেড়ে চলে যাসনা! আজকালকার ছেলেমেয়ে—যতই ভালো হোক...নবনী অবশ্য সোনার টুকরো মেয়ে কিন্তু বলা তো যায় না—কখন কী বিপদ হয়ে যায়—খবরের কাগজে যা এক-একখানা মাঝে-মাঝে বেরোয়।

—শান্তামাসি অবাক হয়ে বললেন, নবনীকে তো এখন আর কেউ পড়ায়না।

—কেন, এই যে নীলু দেখে এল গত সোমবার?

—গত সোমবার? অসম্ভব!

—হ্যাঁ, নীলু নিজের চোখে দেখে এসেছে—সেই মাস্টার নবনীকে পড়াচ্ছে, তোরা তখন টালিগঞ্জে গিয়েছিলি—

তারপর কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। আবার সেই দৃশ্য, আমি আমার ঘরে, হাতে বই, আমার সামনে রাশিয়া, আমেরিকার মতন দুই বিশাল শক্তি, মা আর মাসিমা। শান্তামাসি : নীলু, তুই নিজের চোখে দেখেছিলি? মা : তুই না দেখে থাকলে শুধু-শুধু কেন মিথ্যে কথা বললি? আমি আর কী উত্তর দেব? কোন যুক্তি নেই, কোন উদ্দেশ্য নেই—আমি যে এমনিই বলেছিলাম—সেকথা তো ওঁদের বলা যায়না! সুতরাং বোকার মতন ফ্যালফ্যাল করে হাসতে-হাসতে বললাম, কী যে হয়েছে তোমরা, একটু ইয়ার্কিও বোঝনা।

১৪

বেচু রক্ষিত নামে একজন লোক কেষ্টনগর থেকে কলকাতায় আসছিলেন তাঁর ভগ্নিপতির বাড়িতে। ট্রেনে ওঠবার আগে চার টাকার সরপুরিয়া-সরভাজা কিনে নিয়েছেন দিদি-জামাইবাবুর জন্য। কলকাতায় তো আর দুধ-ক্ষীরের জিনিশপত্র পাওয়া যায়না, তাই কেষ্টনগরের নামকরা মিষ্টি নিয়ে চলেছেন ওদের খুশি করতে।

ব্যাপারটার শুরু এইখান থেকে। বেচু রক্ষিত মিষ্টির হাঁড়িটা বাঙ্কের ওপর সুটকেশ-বিছানার পাশে লুকিয়ে রেখে নিশ্চিন্তে ঘুম দিয়েছেন। এক ঘুমে কলকাতা। শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছেই ধড়মড় করে উঠে প্রথমেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন মিষ্টির হাঁড়ির। না, কেউ চুরি করেনি, কেউ খোলেওনি। কিন্তু হাঁড়িটার ওপর দুটো নীলরঙের ডুমো-ডুমো মাছি বসে আছে। ওরা সেই কেষ্টনগর থেকেই হাঁড়ির মধ্যে রসের খোঁজ পেয়ে হাঁড়ির গায়ে লেগে আছে। বিরক্ত হয়ে বেচু রক্ষিত হাতের ঝাপটায় মাছি দুটোকে তাড়িয়ে বললেন, যাঃ যাঃ! মাছিদুটো একটু ভন-ভন করে উড়ল আশেপাশে, তারপর হাতের ঝাপটার ভয়ে দূরে-দূরে রইল।

গাড়ি থেকে নেমে কাঁখালে সতরঞ্চি মোড়া বেডিং, বাঁহাতে টিনের সুটকেশ ও ডানহাতে মিষ্টির হাঁড়ি নিয়ে বেচু রক্ষিত শেয়ালদা স্টেশন থেকে এবং আমাদের এই কাহিনী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কেষ্টনগরের সেই নীল ডুমো মাছিদুটো ভন-ভন করে ওড়াউড়ি শুরু করে পরস্পরকে বলল, এ আবার কোথায় এলাম রে? চল, ভালো করে আগে জায়গাটা দেখে নেওয়া যাক! এই বলে, হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে তারা বেশ খানিকটা উঁচুতে উঠে গেল। মাছিদুটি যুবক ও যুবতী। যুবক মাছিটি একটু চালিয়াৎ গোছের, সে বলল, বুঝেছি, এ জায়গাটায় নাম নবদ্বীপ। যুবতী মাছিনী বলল, কী করে বুঝলে?

—একবার নবদ্বীপের এক মাছিনীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, সে বলেছিল, ওঃ, নবদ্বীপে একেবারে...

—বুঝেছি, সেই যে-মাছিনীটাকে পেয়ে তুমি আমাকে ছেড়ে কয়েকদিন...

—আর তুমি বুঝি তখন...

—যাক, আর ভ্যানভ্যান করতে হবেনা...

যাইহোক, ওরা দুজনে উঁচু থেকে খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করেই বুঝে ফেলল, ওরা কলকাতা শহরে এসেছে। কেষ্টনগরের আসল দুধ-ক্ষীর-খাওয়া মাছি তো, বুদ্ধি বেশ পরিষ্কার। কলকাতা শহরকে চিনতে পেরে ওরা একেবারে আহ্লাদে আটখানা। মাছি মাছিনীকে বলল, আর ঝগড়া করিসনি। আজ জীবনটা সার্থক হল। কলকাতা শহরের কত নাম শুনেছি, কোনদিন কি স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম এখানে আসতে পারব? কেষ্টনগরের মিষ্টি খেয়ে-খেয়ে মুখ পচে গেছে, এখানে ওসব মিষ্টিফিষ্টির পাট নেই, এখানে খুব ভালো-ভালো নোংরা, আঁস্তাকুড় আর জঞ্জাল আছে।

মাছিনী বলল, দ্যাখো না নিচে, কত মাছি গিসগিস করছে। কত দেশ থেকে মাছি আসে এখানে—দ্যাখো, রাস্তাঘাট একেবারে ভরা!

কিন্তু নিচে নেমে এসে দেখল, একটাও মাছি নেই, সব মানুষ। মাছি দুটো খুব মুশকিলে পড়ল, সারা শহরে আর একটাও মাছি নেই, এমনকী মশা কিংবা পিঁপড়ে এইসব ছোটো জাতের প্রাণীও নেই। সব মানুষ। কলকাতার আকাশে মাত্র এই দুটো মাছি, অনেক লোক ওদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটা বাচ্চা ছেলে বলল, বাবা, ও দুটো কি চড়ুই পাখির বাচ্চা! বাবা উত্তর দিলেন, না, ওদের বলে মাছি, মফস্বল থেকে হঠাৎ এসে পড়েছে বোধহয়। এই নিয়ে কাগজে একটা চিঠি লিখতে হবে তো!

সবকটা রাস্তা ধপধপে ঝকঝকে, কোথাও এক ছিটে ময়লা নেই, কোথাও

জঞ্জাল জমে নেই, মাছিদুটো পড়ল মহামুশকিলে। ঝাড়ুদারেরা অনবরত রাস্তা সাফ করছে, ধুয়ে দিচ্ছে, নোংরা জমবার কোন সুযোগই নেই। এ কি আর কেষ্টনগর, ময়রার দোকানের সামনের ভাঙা ভাঁড়গুলোতে যা রস জমে থাকে তাতেই কত মাছির সংসার চলে যায়। ঝাড়ুদাররা দিনে মাত্র দুবার ঝাঁট দেয় কী না-দেয়। আর এ কলকাতা শহর, এখানে প্রত্যেক দোকানে কাচের বাক্স দিয়ে জিনিশপত্র ঢাকা, প্রত্যেক বাড়ির লোকেরা মুখ-বন্ধ টিনের বাক্সের মধ্যে ময়লা জমা রাখে, মেথররা অনবরত এসে সেগুলো পরিষ্কার করে নিয়ে যাচ্ছে।

মাছি মাছিনীকে বলল, শেষকালে কি এখানে এসে না খেয়ে মরব নাকি?

মাছিনী বলল, চল-না, মাছের বাজারে যাই, সেখানে তো মাছের কানকো নাড়িভুঁড়ি ফেলবেই।

ঘুরতে ঘুরতে এল মাছের বাজারে। মাছের বাজার ধোয়া-সাফ, কিচ্ছু নেই, মাছওলা মেছুনীরা বসে-বসে কীর্তন গাইছে খোল করতাল বাজিয়ে। নিরাশ মাছিনী সঙ্গী মাছিকে বলল, আম-জামের সময় হলে রাস্তায় অন্তত দু-একটা আমের খোসা ঠিকই পড়ে থাকত। খিদে পেয়ে মাছির শরীর দুর্বল হয়ে গেছে, তার গলার আওয়াজ এখন ভনভনের বদলে পিনপিন, সে বলল, এ-শহরকে কিছু বিশ্বাস নেই। তাও হয়তো সঙ্গে-সঙ্গে পরিষ্কার করে ফেলে। আমের সময় না হোক, কলার তো সময়! রাস্তায় একটাও কলার খোসা দেখলি?

—সত্যিই এ শহরের লোকেরা কলা খায় না নাকি?

—খাবে না কেন? বোধহয় খোসাশুদ্ধু খায়!

—মাছিদের জন্য একটু দয়ামায়াও নেই!

ঘুরতে-ঘুরতে এল একটা বিরাট বাড়ির সামনে, যাকে বলে, রাইটার্স বিল্ডিং! মাছি-মাছিনী একেবারে বেপরোয়া হয়ে গেছে, ভালো-ভালো ময়লার বদলে ওরা এখন থুতু-কফ খেতেও রাজি। সেখানে গিয়েও ওরা অবাক। মাছি মাছিনীকে বলল, হ্যাঁরে, কলকাতার বদলে কি আমরা ভুল করে বিলেতে চলে এলাম? মাছিনী বলল, সত্যি মানুষগুলো এমন নিষ্ঠুরও হয়! রাইটার্স বিল্ডিংয়ের কোথাও একছিটে ময়লা নেই, দেয়ালে পানের পিক নেই, সিঁড়ির পাশে সিকনি নেই, আলুর দমের ঝোল মাখানো একটি শালপাতাও নেই পর্যন্ত। ঝকঝকে তকতকে সবকিছু, লোকগুলো নিঃশব্দে কাজ করে মাঝে-মাঝে উঠে থুতুটুতু ফেলার জন্য বারান্দায় গিয়ে থুক না-করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকছে, আবার বেরিয়ে এসে সযত্নে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। এরা কি মানুষ? মানুষ এমন হৃদয়হীন হয়?

মাছি বলল, চল, এখানকার মানুষেরা কিছুতেই ময়লা থাকতে দেবে না

বুঝেছি। দেখি কোথায় এমন জায়গা আছে কিনা—যেখানে মানুষ নেই, সেখানে যদি আপনি-আপনি ময়লাটয়লা কিছু থাকে। কিন্তু কলকাতার লোক এমন বোকা নয় যে, ফাকাজায়গা রাখতে দেবে। কোথায় মানুষ নেই? মাঝে-মাঝে পার্কময়দান তাও মানুষ দখল করে রেখেছে, সব জায়গা মানুষ বসে-বসে পাহারা দিচ্ছে, যাতে কেউ কিছু নোংরা না-করে ফেলে।

নাঃ মাছিদুটো ভাবল, মানুষকে আর বিশ্বাস নেই। এবার জন্তুজানোয়ারের খোঁজ করা যাক। হ্যাঁরে এ-শহরে কি বেড়ালছানা মরেনা? কুকুর গাড়িচাপা পড়েনা? তাদের মরা দেহগুলো কোথায় যায়? রাস্তায় একটাও তো নেই! মোষের গাড়ির মোষের কাঁধে ঘা পর্যন্ত নেই, ব্যাপার কী? মাছি মাছিনীকে বলল, বুঝলি, এসবই আমাদের না-খাইয়ে মারবার ষড়যন্ত্র।

মাছিনী বলল, চল, প্রাণ থাকতে-থাকতে এ শহর থেকে পালাই। আমাদের কেষ্টনগর এর থেকে ঢের ভালো ছিল!

এইজন্যই এ শহরে মিষ্টি বন্ধ করেছে, বুঝলি? যাতে আর কোন জায়গা থেকে মাছি না আসে! মিষ্টির গন্ধ পেলে দেশ-বিদেশ থেকে মাছি তো আসতই!

—মিষ্টি কে চাইছে? একটু পচা জঞ্জালও রাখতে নেই আমাদের জন্য। চারপাশের এত বড়-বড় বাড়ি মাঝখানে একটু ফাঁকা মতন জায়গা। ভালো করে ওরা লক্ষ করে দেখল, ঠিক ফাঁকা নয়, ছোট-ছোট ঘরের মতন। মাছিনী আহ্লাদে বলল, চল, ঐখানে যাই, ঐ ছোট-ছোট ঘরগুলো নিশ্চয়ই মানুষের নয়, ওখানে জন্তুরা থাকে। জন্তুরা তো নিজেদের ময়লা লুকোতে পারবেনা।

ওপর থেকে নিচে নেমে এল আবার। কোথায় জন্তু-জানোয়ার? একটা বস্তি —এখানেও মানুষ। আর কী আদর্শ বস্তির আদর্শ মানুষ। পরিষ্কার নিকানো ঘরগুলো, অনেক ঘরের সামনে আবার আল্পনা দেওয়া, পরিচ্ছন্ন আবহাওয়া, নর্দমা দিয়ে যে-জল বইছে, তা পর্যন্ত পরিষ্কার। ছোট-ছোট ছেলেরা পর্যন্ত নাকের সিকনি ফেলে রাস্তা নোংরা করার বদলে নিজের সিকনি নিজেই খেয়ে ফেলছে!

—মাছিনী, আজ আর বাঁচার আশা নেই!

—এই নাকি কলকাতা? এই শহরের এত নামডাক? দূর-দূর...

—গুজব! মাছি সমাজে যে বলে কলকাতা একেবারে স্বর্গের মতন, যেখানে-সেখানে ময়লা-নোংরা ছড়ানো, এবার বুঝলি তো, সব গুজব! কলকাতা না-দেখেই কলকাতা সম্বন্ধে যত গল্প! বিলেত না-গিয়েই বিলেতফেরত।

বিকেলের দিকে মাছিদুটো একেবারে করপোরেশনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত। স্বয়ং নগরপালের ঘরে গিয়ে তাঁর নাকের সামনে ভন-ভন করতে

লাগল। নগরপাল আঁতকে উঠে বললেন, কী? আমার শহরে মাছি? তাজ্জব কাণ্ড! কে কোথায় আছিস?

একদল লোক ছুটে এল, সবাই মিলে তাড়া করতে লাগল, মাছিদুটোকে। কোথা থেকে দুটো উটকো মাছি শহরে ঢুকে পড়েছে, এই নিয়ে কলকাতার নামে কলঙ্ক রটে যাবে। কাল না এ-খবর আবার কাগজে বেরিয়ে যায়। মারো, মারো!

মাছিদুটো কিন্তু ভয় পেয়ে বেরিয়ে গেলনা। নগরপালের কাছাকাছি উড়তে লাগল। ক্ষুধাতৃষ্ণায় ওরা একেবারে মুমূর্ষু, সারাদিন কোথাও একটু বসারও জায়গা পায়নি, গায়ের সেই চিক্কণ নীল রং মলিন হয়ে গেছে, গলার আওয়াজ প্রায় শোনাই যায়না, ওরা মরীয়া হয়ে নগরপালের মুখের সামনে ঘুরে-ঘুরে কাতরভাবে অভিযোগ জানাতে লাগল, অন্যায়। এ আপনার অন্যায়, বিদেশ-বিভুঁই থেকে দু-একটা পোকা-মাছি এখানে বেড়াতে এলে—তাদের জন্য আপনি কোন ব্যবস্থাই রাখেননি? শহরের কোন একটা জায়গায় অন্তত একটুখানি ময়লা তাদের জন্য রাখা উচিত ছিল। সারা শহর ঘুরে দেখলাম, কোথাও একছিটেও ময়লা নেই। এ আপনার অন্যায়। আমাদের মেরে ফেলতে চান। এরকম করলে কলকাতায় বেড়াতে আসবে কী করে, অ্যাঁ? আমরা আর কতখানি খাব, অন্তত একরত্তি ময়লাও যদি রাখতেন—

১৫

জামাটা পিঁজে গেছে, কলারের পাশ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে আঁশ, কাঁধের পাশে সামান্য ফাটতে শুরু করেছে, ডানহাতের কনুইয়ের কাছটায় একবার শেলাই করা, তবু জামাটা ফেলতে মায়া হয়। নীল-শাদায় ডোরাকাটা আমার জামাটার বয়েস পাঁচ বছর পূর্ণ হল, এবার ওকে তোরঙ্গের নিচে নির্বাসন দেবার কথা, কিংবা আগামী বছরের দোল খেলার জন্য জমিয়ে রাখা, কিংবা বাসনওয়ালীদের রুক্ষ হাতে সমর্পণ করলেও হয়, কিন্তু কিছুতেই জামাটাকে বিদায় দিতে আমার ইচ্ছে করেনা, নরম মোলায়েম স্পর্শ দিয়ে সে আমার শরীরের সঙ্গে লেগে থাকে। ডায়িং-ক্লিনিং-এ পাঠালে পাছে ওর সর্বস্বান্ত হয়ে যায়, তাই আমি ওকে নিজেই সাবধানে বাড়িতে কেচে নিই। এখন শীতকাল কোট বা সোয়েটারের নিচে পরলে ওর ছেঁড়া অংশ আর তেমন চোখে পড়েনা, কিন্তু বুকের কাছাকাছি থাকে।

জামাটাকে বিসর্জন দেওয়া মানেই তো কত স্মৃতি নষ্ট করা। অনেক জামাকাপড়ের মধ্যে কোন একটার প্রতিই অনেকসময় বেশি মায়া পড়ে। গত

পাঁচ বছরে আমার কত জামা ছিঁড়ল, হারাল—কিন্তু এই নীল-শাদায় ডোরাকাটা জামাটাই আমার প্রাণের বন্ধু।

মনে পড়ে পাঁচ বছর আগে নতুন এই জামাটা কিনে দুমকায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। রামপুরহাট থেকে বাসে যাবার পথে প্রথম শীতের অবসন্ন আলোর সন্ধ্যায় কোন একটা কারণে হঠাৎ আমার খুব মন খারাপ হয়ে যাবার পর চোখে পড়েছিল ছোটোখাটো দু-চারটে পাহাড় অবোলা জন্তুর মতন রাস্তার খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। আমি হিমালয় অভিযাত্রী সংঘের সদস্য কোনদিনই হবনা, কিন্তু প্রায়ই আমার কোন পাহাড় চূড়ায় উঠতে ইচ্ছে করে। ইচ্ছে করে কোন পাহাড়ের শিখরে একা উঠে উড়িয়ে দিই আমার নিজস্ব পতাকা। সেদিন হাতের কাছেই অতগুলো চমৎকার শান্তশিষ্ট পাহাড় দেখে আমার খুব লোভ হচ্ছিল। এই নীল-শাদা ডোরাকাটা জামাটাকে আমি সেদিন পতাকা করে উড়িয়েছিলাম।

সেই বাসে চারজন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রী ছিল। কী ঝকঝকে কথা আর খুনসুটি হাসি তাদের, কার না ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে একটু ভাব জমাতে, সংক্ষিপ্ত প্রবাসের দিনগুলো রঙ্গরসে ভরাতে। কিন্তু আমি হেরে গেলাম, যেমন অনেক খেলাতেই হেরে যাই। বাস ছাড়ার আধঘণ্টার মধ্যে একটি মেয়ের ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে গিয়েছিল, আমি শশব্যস্তে সেটা তুলে দিয়ে ভূমিকা পর্যন্ত সেরে রেখেছিলাম, মেয়েটি আমার দিকে মৃদু হেসে বলেছিল, ধন্যবাদ। আরও আড়াই ঘণ্টা একসঙ্গে যেতে হবে—মাঝপথে ওদের জন্য চা এনে দিয়ে কিংবা অন্য কোন ছলে ওদেব সঙ্গে আলাপ জমাবার পরিকল্পনায় মশগুল ছিলাম। কিন্তু শেষপর্যন্ত আমি হেরে গেলাম। মেয়ে চারটি তাদের কাচভাঙা কণ্ঠস্বরে প্রেসিডেন্সি কলেজ, লেকে সাঁতারের ক্লাব, নিউ মার্কেটে কোন্-কোন চিত্রাভিনেত্রীকে নিয়মিত দেখা যায়, —এইসব আলোচনায় বিভোর হয়েছিল। আমি মন দিয়ে ওদের কথা শুনছিলাম, ওদের মুখের রেখায়, হাসির ভঙ্গি, শাড়ির ভাজ—এবং মেয়েদের আরও যা-যা দেখার শুধু তাই দেখছিলাম, তখন জানলার বাইরে তাকাইনি, পাহাড় কিংবা জঙ্গল দেখিনি, প্রকৃতি দেখার সময় ছিলনা। চোখের সামনে জ্যান্ত প্রকৃতি থাকতে কে আর বনজঙ্গল দেখতে চায়। হঠাৎ ওদের মধ্যে একজন তার হাতের কব্জি তুলে বলল, ইস, ঘড়িটা বোধহয় বন্ধ হয়ে গেছে। অনুরাধা, তোর ঘড়িতে কটা বাজে রে?

চারটি মেয়েরই হাতে ছোট জ্বলজুলে ঘড়ি, কিন্তু দেখা গেল চারজনের ঘড়িতে চাররকম সময়। তাই তো স্বাভাবিক! ওরা তন্বী, ওরা যুবতী ও সৌভাগ্যবতী—ওরা চারজনই আলাদা-আলাদা সময় ভোগ করবে—তাই তো স্বাভাবিক! কিন্তু ওরা সঠিক সময় জানার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওরা সময় নিয়ে কলহ করে কালহরণ করতে লাগল। অনুরাধার ধারণা তার ঘড়িটাই ঠিক, কিন্তু রুচিরা বলছে তার ঘড়ি

রেডিও মেলানো। পারমিতার দৃঢ় বিশ্বাস তার ঘড়ি কখনো এক সেকেন্ডও শ্লো-ফাস্ট হয়না—আর দময়ন্তীর ঘড়ি তো থেমেই আছে—ধুক্ ধুক শব্দও নেই। মোটমাট ওদের পরস্পরের ঘড়িতে পাঁচ থেকে আধঘণ্টা সময়ের তফাৎ। শেষ পর্যন্ত কার ঘড়িতে ঠিক সময়—তা জানার জন্য ওরা পরস্পরের মধ্যে বাজি রাখল। রুচিরা বলল, অন্য কারুর ঘড়িতে দ্যাখ তাহলে কটা বাজে।

মেয়েদের সবচেয়ে কাছের সীটে আমি বসে আছি। আমার ফুলহাতা নীল-শাদা ডোরাকাটা জামাটায় কব্জি পর্যন্ত বোতাম-আঁটা। ওরা আমার দিকে আলতোভাবে তাকিয়ে পরোক্ষে প্রশ্ন করল, কটা বাজে? কিন্তু আমার সঙ্গে ঘড়ি নেই, আমি ঘড়ি হাতে দিইনা। সময়কে অত নিখুঁতভাবে জানার কোন ইচ্ছে আমার নেই। আলোর যেমন সাতটা রং, সেইরকম ভোর, সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধে, রাত্রি, গভীর রাত্রি—এই সাতটা বেলা আমি খালিচোখে দেখতে পাই—এতেই আমার কাজ চলে যায়। কিন্তু মেয়েগুলোর সঙ্গে আলাপ করব এই তো সুযোগ। ঘড়ি নেই শুনলে ওরা কি আর আমায় পাত্তা দেবে? আমার বেশভূষা দেখে ওরা ধরেই নিয়েছে আমার যখন চোখ, কান, নাক সবই ঠিক আছে—তখন হাতে ঘড়িও আছে—তাই তো থাকে। সুতরাং আমি স্মার্ট হবার জন্য বললাম, আপনাদের ঘড়ির সময়গুলো যোগ করে চার দিয়ে ভাগ দিন—তাহলেই ঠিক সময় পেয়ে যাবেন।

মেয়েদের কোন উত্তর দেবার সুযোগ না-দিয়েই আমার পাশের সীট থেকে একজন যুবা বলে উঠল—এখন ঠিক চারটে বেজে সাতচল্লিশ! যুবকটি আস্তিন গোটানো কব্জি উঁচু করে ঘড়িটা চোখের সামনে তুলে ধরেছে—ঘড়িটার চেহারাই এমন ইম্প্রেসিভ যে দেখলেই মনে হয়—ওরকম ঘড়ি ভুল সময় দিতে পারেনা। যুবকটি তবুও তার সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করল, কী রে বরুণ, তোর ঘড়িতে কটা বাজে? সঙ্গী উত্তর দিল, ঠিক ঐ চারটে বেজে সাতচল্লিশই। রুচিরা সঙ্গে-সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, দেখলি, বলেছিলাম-না, আমারটাই—

যুবক দুজনের নিখুঁত পোশাক, চুল ও জুতো সমান ঝকঝকে এবং ওদের হাতে সঠিক সময়। ওরাই জিতে গেল। যুবক দুজনের একজন ঐ মেয়েদের মধ্যে একজনের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, আপনি কি প্রশান্তর বোন? সেই মেয়েটি সঙ্গে-সঙ্গে উদ্ভাসিত মুখে বলল, হ্যাঁ, আপনি আমার দাদাকে চেনেন বুঝি? যুবকটি বলল, হ্যাঁ, চিনি, মানে আপনার দাদার এক বন্ধু আমার খুব বন্ধু, সেই হিসেবে একবার...আমার বন্ধুর নাম সিদ্ধার্থ মিত্র। রুচিরা বলে উঠল, ও, সিদ্ধার্থদা? হ্যাঁ, হ্যাঁ—

সব মিলে যাচ্ছে। এরপর আর কথার অভাব হয়না—যুবকদুটির সঙ্গে মেয়ে চারটি প্রচুর ভাব বিনিময় করতে লাগল। আমি একেবারে হেরে গেলাম। আমার

টিলা। মন খারাপ হলেই প্রকৃতিকে বেশি ভালো লাগে সন্দেহ নেই। মেয়ে চারটিকে ক্রমশ আমার অসহ্য লাগতে লাগল—মনে হল, হালকা প্রগলভা, ফচকে মেয়ে সব- —সময়ের মর্ম বোঝেনা—তবুও হাতে ঘড়ি পরা চাই! আর ক্রমশই আমি পথের পাশের নীরব দৃশ্যে মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলাম।

বাস থামল এক জায়গায়। চা খেতে নেমে আমি কন্ডাক্টরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরপর আরও বাস আছে? সে বললে অনেক-অনেক। সেই বাসটা যখন আবার ছাড়ল—আমি আর তাতে উঠলামনা।

আস্তে-আস্তে পথ ছেড়ে মাঠের মধ্যে হাঁটতে লাগলাম। লাল কাঁকর মেশানো জমি, সজনে আর মহুয়া গাছ এদিক-ওদিক ছড়ানো। নির্জনতা এখানে গগনস্পর্শী। কাছেই একটা খুব ছোট পাহাড়, পাহাড় নয়, টিলা কিংবা ঢিবিও বলা যায়—আমি সেটার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মনের ভেতরটা বিষম ভারী, বিষণ্নতা আর অভিমান চাপ বেঁধে আছে! সেই নির্জন প্রান্তরে একাকী দাঁড়িয়ে মনে হল যেন সারা জীবনটাই বঞ্চিত হয়ে গেছি। অথচ কী জন্য? বাসের মধ্যে চারটি ঝকঝকে মেয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে আর-দুজনের সঙ্গে কথা বলেছে, সেইজন্য? অসম্ভব অবাস্তব এই বিষণ্নতা—সামান্য একটা জিনিশও না-পেলে—সারা জীবনের সমস্ত না-পাওয়া দুঃখ এসে ভিড় করে।

টিলাটার পাথরগুলো খাড়া এবং মসৃণ—একটাও গাছ বা লতা নেই। কিন্তু খাঁজ রয়েছে অনেক, বেশি উঁচুও নয়। একবার সামান্য পা পিছলে ধাক্কা খেতেই ধারাল পাথরের খোঁচায় কনুইয়ের কাছে জামাটা ছিঁড়ে গেল। ইস, নতুন জামা। আর-একটা দুঃখ বাড়ল। যুক্তিসংগতভাবে পর্যাপ্তভাবে আজ আমার মন খারাপ করার সময়।

কিন্তু টিলাটার ওপরে যখন উঠে দাঁড়ালাম, সব বদলে গেল। বুকের মধ্যে একধরনের নিঃসঙ্গতা আছে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিঃসঙ্গতা এত বিশাল যে তার রূপ অন্যরকম। টিলার ওপর দাঁড়িয়ে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়, সাঁওতাল পরগনার আকাশ ও প্রান্তর। দূরের গ্রামে দু-চারটি ফুটকি-ফুটকি আলো—এ ছাড়া পাতলা জল মেশানো ছাইরঙে ভরে গেছে দশদিক। টিলার ওপর আমি একা দাঁড়িয়ে —কিন্তু একটুও নিঃসঙ্গ মনে হলনা। মনে হল এই পাহাড় এই আকাশ ও ভূবিস্তার —এই বুনো ঝিঁঝির ডাক ও হাওয়ার খেলা—এসবই যেন আমার। আমি এদের সম্পূর্ণভাবে ভোগ করতে পারি। আমি জীবনে অনেক খেলায় হেরে গেছি—কিন্তু

[illegible] পাহাড় জয় করেছি। এই পাহাড়চূড়ায় আমার পতাকা উড়িয়ে দিতে হবে। পকেটে একটা রুমাল পর্যন্ত নেই, আমি তখন আমার নীল-শাদা ডোরাকাটা জামাটা খুলে পতাকার মতন উড়িয়ে আপন মনে বলেছিলাম, এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড়ো মধুর। যে যাই বলুক, নানান দুঃখকষ্ট মিলিয়ে বড়ো আনন্দেই বেচে আছি। হে সময়, আমাকে আর-একটু সময় দাও।

১৬

শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত, এরকম খারাপ ট্রেনলাইন ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। ছোটো ট্রেন, অনিয়মিত চলাচল, কামরাগুলো যেমন নোংরা তেমনি অস্বাস্থ্যকর, আর ভিড়ের কথা না-বলাই ভালো। ঝাঁসি থেকে কানপুর আসার সময় প্রায় এইরকম দুঃসহ ট্রেনযাত্রার অভিজ্ঞতা আমার একবার হয়েছিল, কিন্তু আসামের ট্রেনের অবস্থা আরও খারাপ।

তবে, শিলচর থেকে লামডিং পর্যন্ত এমন অপূর্ব সুন্দর পথ আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। সমতলভূমি ছাড়িয়ে পাহাড়ের রেঞ্জে এসে ঢোকার পর ট্রেনের কামরা থেকে একবার বাইরে তাকালে আর চোখ ফেরাতে ইচ্ছে করেনা। দুপাশে কী আদিম অন্ধকার বন, মনে হয়, ঐসব পাহাড়ি জঙ্গলে কোনদিন কোন মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি, সভ্যতার জন্মের আগে থেকে ঐসব জঙ্গলে অন্ধকার বাসা বেঁধে আছে। দুর্দান্ত সরল স্বাস্থ্যবান পাহাড়ি নদী, নামও তার কীরকম, ঝাটিংগা। বেশ আস্তে-আস্তে চলে ট্রেন, অসংখ্য ঝর্নার ওপর ব্রিজ, মাঝে-মাঝে ছোট্ট-ছোট্ট স্টেশন। নিরভিমান ছিমছাম স্টেশন, পাহাড়ের গায় খাপ খাইয়ে নিয়েছে, একটি বা দুটি লোক ওঠে নামে। স্টেশনের নাম এইরকম—হারাংগাজাও। এইসব শব্দ শুনলেই বুকের মধ্যে রোমাঞ্চ হয়।

আমরা পাঁচ বন্ধু মিলে হাফলং যাচ্ছিলাম। ট্রেনের কামরায় এত ভিড় যে বসবার জায়গা তো দূরের কথা, ভালো করে দাঁড়াতেও পারছিনা সোজা হয়ে। সবজায়গায় মালপত্র ঠাসা, তারই মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, অসুস্থ নারী, এমনকী দুজন খুনী আসামী পর্যন্ত—পুলিশ তাদের হাতকড়া দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যাত্রীরাও যে কত জাতের—বাঙালি, অসমিয়া, পাঞ্জাবি, মারোয়াড়ি, মাদ্রাজি আর আঠারো রকম পাহাড়ি জাত। দরজার কাছে মেঝেতে মালপত্র পেতে তার ওপর বসে আছে পাঁচটি খাসিয়া যুবতী, গাঢ় উজ্জ্বল রঙের স্কার্ট-পরা, হাতে চওড়া ব্যান্ডের ঘড়ি, চোখে সানগ্লাস—দেখলে ভারতীয় বলে মনেই হয়না, অনেকটা স্প্যানিশদের মতন লাগে।

আসামে ট্রেনে চাপলে একবার-না-একবার নিজের দেশের কথা মনে হবেই। এতরকমের চেহারা, এতরকমের জাত ও ভাষা অথচ সবাই এক দেশের মানুষ, এটা অবিশ্বাস্য মনে হয়। একথাও মনে হয়, এদের সবাইকে কে এক করে মেলাবে? মেলাবার কোন মূলমন্ত্র কি সত্যি আছে? রেলের কামরায় প্রায় কেউই কারুর সঙ্গে কথা বলেনা—কারুর সঙ্গে কারুর মিল নেই। বিশেষত পাহাড়ের মানুষরা সমতলভূমির মানুষদের বিশ্বাস করেনা। কারণও আছে তার। তার একটা প্রমাণ আমি নিজেই দেখলাম।

আসামের প্রায় সর্বত্র রাইফেল হাতে মিলিটারির আনাগোনা। এমনকী ট্রেনের জানলা দিয়ে তাকালে মাঝে-মাঝে চোখ পড়ে, দারুণ নির্জন পাহাড়ি জঙ্গলে ঝর্নার ওপর কোন সেতুর পাশে সাব-মেশিনগান হাতে একজন সৈনিক দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে! স্যাবোটাজের ভয়। ঐ সৈনিকটির জন্য মায়া হয়, ওর মতন নিঃসঙ্গ আর কি কেউ আছে?

ট্রেনের কামরাগুলোতেও মিলিটারির অভাব নেই। তাদের জন্য আলাদা রিজার্ভড কম্পার্টমেন্ট তো রয়েছেই, সাধারণ যাত্রীকামরাতেও তাদের আনাগোনা। রাইফেল কাঁধে একজন বিশাল চেহারার পাঞ্জাবি সৈনিক আমাদের কামরায় ঘুরছিল, হঠাৎ সে আমাদের সামনের একটি পাহাড়ি যুবককে এসে বলল, তোমার মালপত্র কোথায়? খুলে দেখাও।

আমরা দাঁড়িয়েছিলাম, যুবকটি বসবার জায়গা পেয়েছিল। ছিপছিপে চেহারার সুদর্শন তরুণ, বয়েস তেইশ-চব্বিশ, সে নাগা কী লুসাই কী খাসিয়া কী কাছাড়ি তা চেনার ক্ষমতা আমার নেই। তার হাবভাব ইওরোপীয় ধরনের, তার পোশাক, গায়ের রং আর শরীরের গড়ন দেখলে ভারতীয়ের বদলে স্প্যানিশ বা কোন ল্যাটিন জাত বলেই মনে হয়, শুধু হয়তো নাকের উচ্চতায় একটু তারতম্য হবে।

যুবকটি বলল, তার সঙ্গে একটি সুটকেশ ও বেডিং আছে। কিন্তু অনেক মালপত্তরের নিচে চাপা-পড়া, এখন বার করা মুশকিল। কথাটা মর্মে-মর্মে সত্যি, তা আমরাও বুঝতে পারছিলাম। অত ভিড়ে সব মালপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে, হঠাৎ কিছু একটা বার করা সত্যিই দারুণ ঝঞ্ঝাটের ব্যাপার।

সৈনিকটি তবু কঠোরভাবে বলল, না, খুলে দেখাও।

যুবকটি তখন পকেট থেকে তার পরিচয়পত্র বার করল। সে কী একটি সরকারি চাকরি করে—এটা দেখেও আশা করি তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

সৈনিকটি বলল, ওসব জানিনা, মালপত্র দেখাও।

—আমি যে-স্টেশনে নামব সেখানে প্ল্যাটফর্মে যদি খুলে দেখাই তাহলে হবে?

—না, এক্ষুনি দেখাতে হবে।

যুবকটির মুখে তখন রাগ, ঘৃণা না অভিমান—কিংবা তিনটেই মেশানো। কিন্তু

সে ধৈর্য হারালনা। অতিকষ্টে সে তার সুটকেস ও বেডিং টেনে বার করল, খুলল। আমরাও উঁকি মেরে দেখলম, তার সুটকেসে নিছক প্যান্টশার্ট থরে-থরে সাজানো, এছাড়া একটি অর্ধ-সমাপ্ত মদের বোতল ও একটি বাইবেল। নিষিদ্ধ কিংবা ভয়াবহ কিছুই নেই। তবু সৈনিকটি ছাড়লনা, তার বেডিংও খোলালো, সেখানে শুধু বিছানা। সৈনিকটি তখন চলে গেল অন্যদিকে।

ব্যাপারটা আমাদের সবারই খারাপ লেগেছিল। আমি যুবকটিকে জিজ্ঞেস করলাম, হঠাৎ আপনার বাক্স-বিছানা খুলতে বলল কেন?

সে কোন উত্তর না-দিয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে রইল। তার ঠোঁটে একটা তেজি অবজ্ঞার ভঙ্গি। সে আমাদের আত্মীয় মনে করেনা।

তবু আমার কৌতূহল গেলনা। আমি তখন ভিড় ঠেলেঠুলে পাঞ্জাবি সৈনিকটির কাছে গিয়ে নিরীহ গলায় জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, আপনি ঐ লোকটির বাক্সবিছানা খুলে দেখাতে বললেন কেন?

আশ্চর্যের ব্যাপার, সৈনিকটি যা উত্তর দিল, তাও খুব অযৌক্তিক নয়। সে বলল, বুঝতেই পারছ, সামরিক দিক থেকে আসামের গুরুত্ব কতখানি! কেউ কোন বন্দুক-পিস্তল বা এক্সপ্লোসিভ নিয়ে যাচ্ছে কিনা, সেটা চেক করতে হয়।

—আর কারুকে না বলে শুধু ঐ ছেলেটিকেই বললেন কেন?

—ট্রেনের সমস্ত যাত্রীর সমস্ত মালপত্র তো আর সার্চ করা সম্ভব নয়। তাই বেছে-বেছে হঠাৎ এক-একজনকে বলতে হয়—যাতে অন্যরাও ভয় পেয়ে যায়।

—কিন্তু পাহাড়ি ছেলেটিকেই শুধু বললেন কেন? আমাকেও তো বলতে পারতেন!

—তারও কারণ আছে। বিদ্রোহী নাগা আর মিজোদের মতন অন্য কোন পাহাড়ি জাতও হঠাৎ হয়তো হঠকারীভাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করতে পারে। সেইজন্য আমাদের সবসময় চেক করতে হয়।

সৈনিকটির যুক্তির সারবত্তা আছে। কিন্তু ঐ পাহাড়ি ছেলেটির দিক থেকে? সে নির্দোষ। সে ভাবল, তার নিজের দেশে তার ইচ্ছেমতন চলাফেরার স্বাধীনতা নেই। অথচ অন্য প্রদেশের লোকেদের আছে। একজন বাঙালি বা মাদ্রাজি আসামে যেমন খুশি ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু আসামের আদি অধিবাসী হয়েও তাকে পুলিশের হাতে হয়রান হতে হবে। ঐ পাঞ্জাবি সৈনিকটি—যার সঙ্গে তার চেহারায়, ব্যবহারে, ভূষায় কোন মিল নেই—তাকে সে কখনো নিজের দেশবাসী এবং বন্ধু বলে মনে করতে পারবে—এরপর?

যাকগে, আসামের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব, সাবধান মাথা আমার নয়। ও নিয়ে দিল্লির লোকেরা মাথা ঘামাক।

হাফলং-এ গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। ছবির মতন সুন্দর জায়গা, ভারি নির্জন।

কলকাতার মানুষ কলকাতা ছেড়ে বেশিদিন কোথাও থাকতে পারেনা—তবু দু-একটা জায়গায় গেলে মনে হয়, এখানে সারা জীবন থেকে গেলে মন্দ হয়না! নিছক মনে হওয়াই যদিও। হাফলং সেইরকম জায়গা।

তবে, হাফলং-এর স্থানীয় অধিবাসিরা ভ্রমণার্থীদের সঙ্গে মেশেনা। দূরে-দূরে পাহাড়ে গরীব পার্বত্যজাতিদের গ্রাম, শহরের লোকেরা সবাই প্রায় খ্রিস্টান, ইংরেজি পোশাক ও ভাষা, ইওরোপীয় ধরনের জীবনযাত্রা। তাদের সঙ্গে যেচে কথা বলতে গেলে, তারা ভদ্র আড়ষ্টতায় দু-একটা উত্তর দেয়, তারপর এড়িয়ে যায়। কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়না। প্রায়ই মনে হয়, বিদেশের কোন শহরে এসেছি। দু-চারটে বাঙালির দোকান আছে অবশ্য, তবে সেরকম দোকান তো বিলেতেও আছে।

এক বিকেলে আমরা বন্ধুরা বেড়াতে-বেড়াতে একটু দূরে চলে গেছি। হঠাৎ বৃষ্টি এল। বৃষ্টি মানে কী, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার, বৃষ্টির বদলে আকাশের জলপ্রপাত বললেও হয়। দিক-দিগন্ত ভাসিয়ে দিচ্ছে বৃষ্টিতে।

কোথাও দাঁড়াবার জায়গা নেই, একটা বন্ধ দোকানঘরের সামনে আমরা আশ্রয় নিয়েছি, তবু বৃষ্টির ছাঁট আমাদের ভিজিয়ে দিচ্ছে। আধঘণ্টা একঘণ্টা কেটে গেল, তবু বৃষ্টির সেই সমান তোড়। এভাবে আর দাঁড়িয়ে থাকা যায়না।

অনেকক্ষণ বাদে, দূরে বৃষ্টির মধ্যে রঙিন ছাতা মাথায় দিয়ে একটি মেয়ে আসছে। কাছে আসতে দেখলাম, একটি যুবতী পাহাড়ি মেয়ে, স্কার্ট-পরা, রূপসীযোগ্য অহংকারী মুখভঙ্গি। সে আমাদের দিকে একবারও তাকালনা, আমাদের পাশ দিয়ে বেঁকে গেল একটা রাস্তায়, বোঝা যায়, কাছেই তার বাড়ি।

আমাদের এক বন্ধু বেপরোয়া হয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যে ছুটে গিয়ে মেয়েটিকে ইংরেজিতে বলল, দ্যাখো, আমরা একদম ভিজে যাচ্ছি, তোমাদের বাড়িতে একটু বসতে দেবে?

মেয়েটি প্রথমে কথাটা বুঝতে না-পেরে ভুরু কুঁচকে বলল, কী? তারপর আবার শুনে বলল, ইয়েস অফকোর্স!

নিছক বিলিতি ভদ্রতা। কোন আন্তরিকতা নেই, বিখ্যাত ভারতীয় আতিথ্যের কোন ব্যাপার নেই। আমরা ছুটতে-ছুটতে মেয়েটির সঙ্গে তাদের বাড়ির বারান্দায় উঠলাম। একজন বৃদ্ধ লোক কঠোর মুখ নিয়ে বেরিয়ে এল, মেয়েটি তাকে নিজেদের ভাষায় কী বলে চলে গেল বাড়ির মধ্যে। বৃদ্ধটি আমাদের রীতিমতো জেরা করল কিছুক্ষণ, তারপর বারান্দায় বসবার অনুমতি দিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বারান্দায় একটা কাঠের বেঞ্চ পাতা। সেখানেও বসে স্বস্তি নেই, রীতিমতো জলের ঝাপটা লাগছে। যদিও তখন মে মাস, বেশ শীত করতে শুরু করেছে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, বারান্দার পরেই ওদের ড্রয়িংরুম, সেখানে রীতিমতো সোফা-কৌচ পাতা, যিশুখ্রিস্টের মূর্তি। পুরো বাড়িটাই বিলিতি ধরনের। আমাদের

চেহারা খুব একটা হাড়-হাভাতের মতো নয়—তবু আমাদের ভেতরে বসতে দেওয়া হলনা।

খানিকটা বাদে একটি যুবক এল বাড়ির ভেতর থেকে, আবার আরেক প্রস্থ জেরা। বৃষ্টি তখন আরও বেড়ে উঠেছে।

শেষপর্যন্ত আমাদের ভেতরের ঘরে বসতে দেওয়া হল বটে, কিন্তু কোন আন্তরিকতা নেই। চা-ফা খাওয়ানো তো দূরের কথা। আমরা মনে-মনে বলতে লাগলাম, আমরা কোন দোষ করিনি, আমাদের পূর্বপুরুষরা যত দোষ করেছে, তার জন্য আমরা ক্ষমা চাইছি, আমাদের বন্ধু হিসেবে নাও।

কিছুই হলনা, ওরা আমাদের বিশ্বাস করেনা।

১৭

কীরকমভাবে তালা খুলতে হয়? তালা খোলার মাত্র দুরকম স্বাভাবিক উপায় আছে। বন্ধ তালার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে নির্দিষ্ট চাবি বার করে টুক করে খুলে ফেলা। অথবা যদি চাবি হারিয়ে যায়, তবে ছোটো তালা হলে, ডানহাতের মুঠোয় তালাটাকে চেপে ধরে—কব্জিতে সমস্ত জোর এনে কট করে ভেঙে ফেলা উচিত। আর, তালাটা যদি বেশ বড়ো হয়, একটা লোহার রড তালাটার মধ্যে ঢুকিয়ে মটাং করে ভেঙে ফেলা যায়। তালা খোলার এই দুই রীতি।

কিন্তু অনেক মানুষ দেখেছি যারা এরকম সহজ পথে যেতে চায়না। ঘন-ঘন তালার চাবি হারিয়ে ফেলে বড় বেশি ব্যস্ত আর উদভ্রান্ত হয়ে পড়ে। তালাটাকে ভাঙার কথা মনেও পড়েনা। আশেপাশের বাড়ির সকলের কাছ থেকে চাবির থোকা নিয়ে আসে। হয়তো, জড়ো হল পঞ্চাশটা চাবি, প্রত্যেকটা পরের চাবি এক-এক করে চেষ্টা করা হচ্ছে নিজের তালায়। এতে কখনো তালা খোলে, আমার বিশ্বাস হয়না। তবে শুনেছি, কারুর-কারুর ক্ষেত্রে খুলে যায়। কেউ-কেউ আরও উৎকট কাণ্ড শুরু করে দেয়। তালার ছোটো গর্তের মধ্যে একটা ছোটো পেরেক কিংবা লোহার তার ঢুকিয়ে খুব কায়দায় নাড়াচাড়া শুরু করে। এতেও নাকি তালা খোলা সম্ভব।

ছেলেবেলা বিশ্বনাথ নামে একটি ছেলের কথা শুনতাম—যে নাকি চাবি হারানো তালায় পেরেক ঢুকিয়ে অনায়াসে খুলতে পারত। সে ছিল পরোপকারী ছেলে, কারুর বাড়িতে এরকম তালাসংকট হলে ডাক পড়ত বিশ্বনাথের।

একদিন ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সত্যিই তুমি পেরেক ঢুকিয়ে তালা খুলতে পার?

—হুঁ! লাজুক হেসে বিশ্বনাথ বলেছিল।

—যে-কোন তালা?

—হুঁ।

তখন আমি ব্যগ্রভাবে প্রশ্ন করি, সে-তালাগুলো পরে আবার লাগানো যায়? ঠিক-ঠাক থাকে?

—নাঃ। তা আর যায় না। খারাপ হয়ে যায়।

—আশ্চর্য। যদি খারাপই হয়ে যায় তবে তুমি অত কষ্ট করে খুলতে যাও কেন? ভেঙে ফেললেই তো হয়। সেটাই তো সোজা।

—কী করব, সবাই যে খোলাতেই চায়। কেউ ভাঙতে চায় না। দেখবেন, সকলের বাড়িতে দু-চারটে তালা থাকে—যেগুলো দেখতে ঠিকই আছে, কিন্তু ভেতরের কলকব্জা খারাপ। তাছাড়া, আমারও প্রত্যেকবারই মনে হয়, এবার বোধহয় না-খারাপ করেই খুলতে পারব।

এ-জীবনে কার না দু-একবার তালার চাবি হারিয়েছে? চাবির মতো সামান্য জিনিশ কখনো-কখনো হারাতে বাধ্য। চেনাশুনোদের মধ্যে, যারা ব্রাহ্মণ—তাদের দেখেছি, পৈতের সঙ্গে চাবি বেঁধে রাখে সযত্নে। তাদেরও চাবি হারায়। অতিসাবধানীদের বারবার হারায়।

আমার একটা অদ্ভুত স্বভাব আছে, যখন কোন নতুন নারীপুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়, মনে-মনে আমি যখন তাদের চরিত্র ও স্বভাবের পরিমাপ করি, তখন প্রথমেই ভাবি, এর যদি কখনো চাবি হারিয়ে যায়, কী উপায়ে খোলার চেষ্টা করবেন? ভেঙে ফেলা, পাশের বাড়ি থেকে চাবির থোকা চেয়ে আনা, না বিশ্বনাথের মতো কারুকে ডেকে পেরেক নাড়াচাড়ার কৌশল—জানতে আমার খুবই ইচ্ছে হয়। অথচ, মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে পারিনা। প্রথম পরিচয়ে অনেককিছু জিজ্ঞেস করা যায়—কোথায় চাকরি, অমুকের সঙ্গে চেনা আছে কিনা। বাড়ির সামনের রাস্তায় জল দাঁড়ায় কিনা, প্রেসিডেন্ট জনসনের বুদ্ধি সম্পর্কে তাঁর কী মত, সর্ষের তেল পাওয়া গেলেও আর বাদাম তেলের অভ্যেস ছাড়া উচিত না অনুচিত—এসবই জিজ্ঞেস করতে পারি—কিন্তু সবচেয়ে জরুরি প্রশ্নটা কিছুতে জিজ্ঞেস করতে পারিনা—চাবি হারিয়ে গেলে আপনি কী করেন? অথচ এ প্রশ্নের উত্তর জানা নাহলে, একটা লোকের চরিত্র সম্পর্কে আমার কিছুই জানা হয়না, সবসময় আমি বিষম অস্বস্তি বোধ করি।

চাবি খোলার চরিত্র দেখে মানুষ চিনতে আমার ভুল হয়না। বিশ্বনাথের ছোটবেলা থেকেই আমার দুশ্চিন্তা ছিল। ওর পরোপকারী সরল মুখ দেখে আমার

ভয় হতো, বুঝতে পারতাম বিশ্বনাথ ভুল করছে। আর আমার ছোটোমাসি? আমাদের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তিনিই প্রথম এম-এ পাস মেয়ে। যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমন খুশির হৈ-হল্লা করতে ভালোবাসতেন ছেলেবেলায়, অর্থাৎ আমার ছেলেবেলায়,—উনি তখন কলেজে পড়েন। ছোটোমাসির একটা চামড়ার সুটকেস ছিল—তার মধ্যে যে কী অমূল্য সম্পদ থাকত জানিনা। কিন্তু প্রায়ই সে সুটকেসের তালার চাবি হারাত। আমি দাদামশাইয়ের বাড়িতে যেতাম মাঝে-মাঝে—গিয়েই শুনতাম, ছোটোমাসি চাবি হারিয়ে বাড়ি মাথায় করেছেন। জামাকাপড় ছড়িয়ে বইপত্র এলোমেলো করে ছোটোমাসি চাবি খুঁজছেন। সে চাবি যে পাওয়া যাবেনা সকলেই জানে—কোনদিন পাওয়া যায়নি। আমাকে দেখলেই বলতেন ছোটোমাসি, এই নীলু, চট করে তালাটা ভেঙে দে তো।—ছোটো টিপ-তালা, ভাঙতে এমন কিছু শারীরিক শক্তি লাগেনা। এমন অনেকবার ভেঙেছি। প্রায়ই ছোটোমাসি বাড়ি ফেরার পথে নতুন তালাচাবি কিনে আনতেন। একদিন আমি ঐরকম সময়ে উপস্থিত হয়েছি। ছোটোমাসি সাজগোজ করে কোথায় বেরুবেন, হঠাৎ চাবি খুঁজে পাচ্ছেননা। যথারীতি, আমার ওপর ভাঙার হুকুম হল। আমি তালাটা হাতে নিয়ে, ছোটোমাসির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, প্রায়ই যখন হারায়, তখন তুমি তালা লাগাও কেন?

ছোটোমাসি মুখ ভেংচে বললেন, ইস, বাক্স খোলা রাখি আর কী!

সেই মুহূর্তে ছোটোমাসির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হয়েছিল, ছোটোমাসি জীবনে সুখী হবেননা। কেন মনে হয়েছিল জানিনা, কিন্তু ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার ভয় হয়েছিল। তালা ভাঙার পর বাক্স খুলে ভেতরে কী আছে কোনদিন আমাকে দেখতে দেননি। কিন্তু, তখন আমি প্যান্ডোরার বাক্সের গল্প নতুন পড়েছি। আমার মনে হয়েছিল, বাক্স বন্ধ করে যা উনি আটকে রাখতে চাইছেন, তার নাম প্যান্ডোরার সেই 'আশা'। দুঃখদুর্দশা-কষ্ট-হতাশা আগেই বাক্স থেকে বেরিয়ে এসে ওঁকে ঘিরে ধরেছে। তখন ওঁর মুখ কিন্তু বিষম হাসিখুশি থাকত।

ছোটোমাসির জীবন সুখের হয়নি। ওঁর স্বামী স্বনামধন্য পুরুষ, নিউ আলিপুরে প্রাসাদোপম বাড়ি, দেবশিশুর মতো দুটি ছেলেমেয়ে, নতুন মোটরগাড়ি। তবু ছোটোমাসিকে দেখলে না-ভেবে পারিনা—উনি জীবনে সুখ পাননি।

ছোটোমাসির এক ছেলেকে দেখতাম, প্রায়ই গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। তারপর জিজ্ঞেস করতাম, কীরে পরেশ, দাঁড়িয়ে আছিস কেন? পরেশ বলত, চাবিওলা খুঁজছি।

ঝনঝন শব্দে পুরোনো চাবিওলা কলকাতার রাস্তা দিয়ে যেত—বাবা প্রায়ই চাবি হারিয়ে ফেলতেন, আশেপাশের সব বাড়ির চাবি লাগিয়ে চেষ্টা করার পরও

না-খুললে, পরেশ দাঁড়িয়ে থাকত রাস্তায়। ডুপ্লিকেট চাবি বানাবে চাবিওলা ডেকে। অসীম ধৈর্য ছিল পরেশের—দাঁড়িয়েই থাকত। আমরা তখন হয়তো ক্যারাম খেলছি কিংবা টেনিসবলের গলি-ক্রিকেট, পরেশ তবু দাঁড়িয়ে। বলতাম, যা না, তালাটা ভেঙে ফেল! পরেশ যেতোনা। চাবিওলা সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরত।

জানতাম পরেশ জীবনে উন্নতি করবে। করেছে। ওর বাবার অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায়ে পরেশ আজ মেরুদণ্ড। লক্ষ-লক্ষ টাকার খেলা করে। পাড়ার দুর্গাপুজোয় চাঁদা দেয় পাঁচশো টাকা, ঠাকুমার নামে হাসপাতালে দান করেছে একলক্ষ। ব্যাঙ্কের লকারের চাবি পরেশ নিশ্চিত হারায়না।

আর, পেরেকের কৌশল জানা বিশ্বনাথ, একটা প্রাইমারি স্কুলে পড়ায়। হঠাৎ বেরিবেরিতে ওর একটা চোখ অন্ধ হয়ে গেছে, অন্যচোখেও কম দেখে। হাতে চাবি থাকলেও বিশ্বনাথ আজকাল তালা খুলতে পারেনা—চোখে দেখে না বলে, চাবিটা গর্তে ঢোকাতে পারেনা।

কিন্তু এ-পর্যন্ত লিখে মনে হয় আমার ভুল হচ্ছে। হয়তো, এসব যোগাযোগ কার্যকারণহীন। মনে পড়ল, অনেকের চাবির রিঙে অনেকগুলো চাবি থাকে—কিন্তু সব চাবির তালা থাকেনা। মেয়েদের আঁচলে যতগুলো চাবি বাঁধা থাকে—সবই তালা খোলার জন্য নয়। অনেক মেয়ের নাকি তালা খোলার দরকারই নেই—এমনিই আঁচলে বা কোমরে চাবির থোকা ঝোলানো নতুন কায়দা। অনেক ছেলেও যে হাতে চাবির রিং ঘোরাতে-ঘোরাতে যায়—সেসব কিসের চাবি? আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছি।

কিন্তু, আর-একটি ছেলের কথা না-বললে চলবেইনা। তার তালা খোলার স্বভাব দেখে আমি শিউরে উঠেছি। ঘরের দরজায় তালা বন্ধ, সে চাবি হারিয়েছে। সে তালা ভাঙালনা, পাশের বাড়ি থেকে চাবির গোছা চাইলনা, পেরেক ঘোরালনা। বারান্দায় একটা স্ক্রুড্রাইভার ছিল, সে তাই দিয়ে দরজার যে কড়া দুটোর সঙ্গে তালা লাগানো—সেটাই খুলতে লাগল। আমি বললাম, এ কী করছ, এ তো তালা খোলা নয়, ঘর ভাঙা!

সে বলল, কিছুই ভাঙছিনা। শুধু ঘরে ঢুকছি। দরজার কড়া-দুটো পরে আবার লাগিয়ে দিলেই হবে।

আমি বললাম, তালাটা তো তখনও লেগেই থাকবে। পরে তো ভাঙতেই হবে।

—সে পরে দেখা যাবে। এখন তো ঘরে ঢোকা যাক।

তালা না-ভেঙেও বন্ধঘরে ঢোকার যে এরকম উপায় তার মনে এল, তা দেখে আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। ছেলেটির চরিত্র বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারিনা।

আকাশ পাতাল

কৃষ্ণা গুহঠাকুরতাকে

১

বারোজন বৃদ্ধ আর একটি শিশু। রেলের কামরার একদিকের দুটো বেঞ্চ জুড়ে বসেছে ওরা, ছোট কামরায় যথেষ্ট ভিড়, আমি মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছি। বারোজন বৃদ্ধ ও একটি শিশু মিলে ওরা একটি দল, ওরা হুমড়ি খেয়ে সবাই তাকিয়ে আছে জানলার বাইরে দ্রুত অপসৃয়মান নদী-নালা, গাছপালা, মাঠ-ঘাট দেখছে অতিশয় ব্যগ্রভাবে, ক্ষণে-ক্ষণে মুগ্ধ হয়ে উঠছে। ওদের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন, কিন্তু চোখ আনন্দে উজ্জ্বল। বারোজন বৃদ্ধের এক সঙ্গে এই প্রকৃতিপ্রীতি দেখে আমার একটু অবাকও লাগল। বার্ধক্যে সবই পুরোনো হয়ে যায়, প্রকৃতিও কি পুরোনো হয়না?

শিশুটি চুপ করে আছে, আর সেই বারোজন বৃদ্ধই মন্তব্যে মুখর। 'যাওয়ার সময় তো এই খালে এত পানি দেখি নাই।' 'মাটির রং দেখো না বেশ কালচে মেরেছে—এবার ধান ভালো হবে! যাই বলো আর তাই বলো, এমন সবুজ ঘাস আর কোথাও দেখতে পাবেনা।'

আমি অতিশয় কৌতূহলে ওদের কথা শুনছিলাম। এমন সময় একজন বৃদ্ধ আমাকে বললেন, আপনি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন! আপনি বসুন বাবুমশাই, আমি দাঁড়াই!

শশব্যস্তে আমি বললুম, না, না, তা কি হয়! আমি ঠিক আছি, কোন অসুবিধে হচ্ছেনা, আপনি বসুন।

বৃদ্ধটি তখন সীটের তলা থেকে একটা পুঁটুলি বার করে নিজে তার ওপর বসে—আমাকে একটু জায়গা করে দিলেন। আমি ওঁদের মাঝখানে বসলুম। বৃদ্ধ বললেন কদ্দিন পর দেখছি এই দেশ, আর যে দেখব কখনো সে আশা তো নাই। তাই এত ভালো লাগতেছে।

জিজ্ঞেস করলুম, আপনারা কোথায় গিয়েছিলেন?

প্রশ্নের অপেক্ষামাত্র, এক সঙ্গে অনেকে উত্তর দিলেন। কথা বলার জন্য ওঁরা সবাই টগবগ্ করছেন। বুকের মধ্যে জমা অফুরন্ত গল্প।

ঐ বৃদ্ধের দল মক্কায় হজ করতে গিয়েছিলেন। মক্কা-মদিনা ঘুরে প্রায় সাত-আটমাস বাদে আবার দেশে ফিরছেন—বাঁকুড়া জেলার এক গণ্ডগ্রামে। কী সরল বিস্ময়কর ওদের অভিজ্ঞতা। ঐ বারোজনের মধ্যে ন-জন আগে কলকাতা শহরই দেখেননি, নিজের গ্রাম ছাড়া শহর বলতে দেখেছেন বাঁকুড়া সদর, জমিজিরেত

কাবাদর্শন, মদিনা—একসঙ্গে এতগুলো অভিজ্ঞতার বিহ্বলতা ওঁদের চোখে-মুখে। সারাটা জীবন একরকম কাটিয়ে গ্রামের ধুলো-কাদায়, অন্ধকারে কাটিয়ে হঠাৎ বাইরে সারা পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ার চমক সত্যিই আন্দাজ করা শক্ত।

আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ওঁদের অভিজ্ঞতার কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। কত টাকা লাগল ? জাহাজ ভাড়া সাড়ে-সাতশো টাকা ! কিন্তু সব মিলিয়ে তিন হাজার টাকার মতন খরচ পড়েছে এক-একজনের। একজন গ্রাম্য চাষীর পক্ষে তিন হাজার টাকা খরচ করা কম কথা নয়। টাকা থাকলেও সবাই যেতে পারেনা—সরকারি হজ দপ্তরে আগে থেকে নাম লেখাতে হয় যাদের নাম আগে থাকে তারাই সুযোগ পায়। ওঁরা অনেকে জমিজায়গাও বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেছেন—বৃদ্ধ বয়েসে তীর্থযাত্রা, অচেনা দেশ আর সমুদ্রের পথ—পথে রোগশোকের সম্ভাবনা আছে। ফেরার ভরসা না-করেই বেরিয়েছিলেন—তীর্থের পথে কিংবা তীর্থস্থানে মৃত্যু—সে তো পরম পুণ্য। কিন্তু দলের কেউ মরেনি সবাই ঠিকঠাক বেঁচে আবার ফিরে এসেছে, এখন আবার দেখতে পাবে নিজের গ্রামখানি—এই এক অপ্রত্যাশিত আনন্দ।

ভারত সরকার প্রত্যেককে ৩০ কেজি চাল সঙ্গে করে নিতে দিয়েছে, দিয়ে দিয়েছে প্রতিষেধক ইঞ্জেকশান, মক্কায় ডাক্তার পাঠিয়েছে। মক্কায় লক্ষ-লক্ষ মানুষের ভিড়, সারা পৃথিবী থেকে এসেছে তারা, বাড়ি ভাড়া অগ্নিমূল্য, তাঁবুতে থেকেছে অনেকে, জলের সংকট, কুরবানির জন্য একেকটা ছাগলের দাম একশো-দেড়শো টাকা—কিন্তু এসব কষ্ট সহ্য না করলে তীর্থের ফল ফলবে কেন ? মক্কায় খুব ভিড়—কিন্তু মদিনা—সে বড় দিব্য আনন্দের জায়গা। ওদের মুখ থেকে আমি শুনতে লাগলুম, মদিনায় কী শান্ত নিরালা ভাব, সেখানে গেলে মানুষের মন থেকে লোভ-হিংসা লোপ পায়—এমনকী ক্ষুধাতৃষ্ণাও কমে যায়। হজরত সাহেবের প্রিয় স্থান সেই মদিনা।

জিজ্ঞেস করলুম বড়মিঞা সেখানে গিয়ে কথাবার্তা বলতেন কী করে ? আপনারা বাঙালিমুসলমান—আপনারা কী আরবি-ফার্সি জানেন ?

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বললেন, না বাবুমশাই, ওসব আমরা জানিনা। বাংলা কথা জানি তাও লিখতে-পড়তে জানিনা। মুখ্যুসুখ্যু লোক—আমাদের কালে কী আর এত পাঠশালা-মাদ্রাসা ছিল !

—তবে সেখানে গিয়ে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন কী করে ?

—এই যে এই আঙুল দেখিয়ে। দোকানদার যদি দশটাকা দাম বলে তো দশটা আঙুল দেখায়—আমি বলি ছ-টাকার বেশি দেবনা আমি দেখাই ছ'আঙুল। বাংলাও বোঝে দু-চারজন।

—বাংলা বোঝে ?

—হে' সেই তো আশ্চর্যি ! মাঝে-মাঝেই দু-একটা লোক বেশ দু'-চার কথা বাংলায় বলে ! ফি বছরই তো যাচ্ছে আমাদের এই বাংলা দেশ থেকে অনেকে—শিখে নিয়েছে ওরা। একেকটা দোকানি আটটা-দশটা ভাষায় গড়গড়িয়ে বলে যায়—ইংলিশও জানে পর্যন্ত।

—অতদূর দেশে হঠাৎ বাংলা শুনে কেমন লেগেছিল ?

—সত্যি কথা বলতে কী, নিজের দেশের কথা না-শুনে প্রাণটা জুড়োয় ? ঐ আপনার বাংলা কথা আর যেদিন মাছ পেলাম—একটাকা-দেড়টাকা সেরের টাটকা মাছ—তখন যা আনন্দ হইছিল।

ছোট ছেলেটি জানলায় থুতনি রেখে সেই একদৃষ্টে চেয়ে আছে বাইরে। বছর নয়-দশ বয়েস, মিষ্টি মুখখানি। যে বৃদ্ধ আমার জন্য বসার জায়গা করে দিয়েছিলেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম ঐটুকু ছেলেকেও আপনারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

বৃদ্ধ সস্নেহ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বললেন, উটি আমার নাতি। ওকে আর কোথায় রেখে যাব। ওর বাবা-মা মরেছে পিঠোপিঠি বছরে—আমি ছাড়া এ সংসারে ওর আর আপনজন নাই, ওরে আর কোথায় রেখে যাই কন।

তারপর আমার দিকে মুখটা এগিয়ে এনে গোপনকথা বলার ভঙ্গিতে বললেন ইচ্ছেটা কী ছিল জানেন ? আর ফিরে আসবনা। আমার নাতি ঐ আলিজানকে আরো নিয়েছিলাম সেই জন্য। আমার তো দিন শেষ হয়ে এসেছে, শেষের দিনটা মক্কাতেই কাটিয়ে দেব। আমি মরলে আলিজানেরও তিনকূলে কেউ থাকবেনা—ও ওখানেই থেকে যাবে।

—তাহলে ফিরে এলেন কেন ?

—পারলামনা। সারাজীবনটা কাটল হেথায়—নতুন দেশে গিয়ে কী আর মন টেকে এখন ? আলিজানও কান্নাকাটি করত। মনটা পোড়াত আমার। আমাদের এই দেশের নরম-নরম মাটি, গাছপালার কী সবুজ রং, মেঘ আসে আকাশ কালো করে—এসব ছাড়া আমাদের আর অন্যকিছুই ভালো লাগেনা। তাই মনে করলাম, তীর্থ করা তো হল, এবার মরব যখন তখন আমার হাড় ক'খানা বাংলা দেশের মাটিতেই যেন গোর পায়। নইলে মরার পরও শরীর জুড়োবেনা।

ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরের সবুজ রেখার দিকে তাকিয়ে বৃদ্ধ আবিষ্টভাবে বললেন, মক্কা-মদিনা দর্শন করে যত আনন্দ পেয়েছি [illegible] শে ফিরে আসার আনন্দ তার চেয়ে কম নয়।

২

মাতাল জমিদারের আদর্শবাদী ছেলে সেজেছে টুটু। বাগ্দীপাড়ায় কলেরার মড়ক লেগেছে, সেখানে রাত জেগে সেবা করতে যাবার আগে বাবার সামনে এক ভাবগর্ভ বক্তৃতা দিচ্ছে। ছেলেবেলা থেকেই টুটু একটু বোকা-বোকা, ঐরকম বোকা-বোকা মুখ-চোখ বলে সিনেমায় আদর্শবাদীর ভূমিকা বেশ মানায়। সবুজ পাঞ্জাবি পরে টুটু অনবরত ঘামছে, মাঝে-মাঝে কাট করে মেক-আপ ম্যানেরা এসে তার মুখের মেক-আপ ঠিক করে দিচ্ছে। পাড়াগাঁয়ের জমিদার বাড়ির বাগানের সেট, কিন্তু ঝোপের আড়ালে টেবল ফ্যান ফিট করা। তবুও অসম্ভব গরম।

সুটিং দেখতে আমার একেবারে ভালো লাগেনা। একঘেয়ে ব্যাপার, দু-তিনটেমাত্র কথা তুলতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়, লাইটসম্যানরা আলো নিয়ে টালবাহানা করে অনবরত। কিন্তু আসতে হয়েছে মামাতো বোনেদের পাল্লায় পড়ে। মামাতো বোনেরা আগে আমাকে বিশেষ পাত্তাই দিতনা, হঠাৎ কোথা থেকে জানতে পেরে গেল, বাংলা সিনেমার জনপ্রিয় অমুক কুমার ছেলেবেলায় আমার সঙ্গে ইস্কুলে এককাসে পড়ত। ব্যস, সেই থেকে মিলিতা আর নন্দিতার চোখে আমিও একটা ছোটখাটো হিরো।

ওদের পীড়াপীড়িতে এবং আমি যে সত্যিই অমুক কুমারকে চিনি এটা প্রমাণ করার জন্য টুটুকে একদিন ফোন করতেই হল শুটিং দেখার জন্য। টুটু আমার মান রেখেছে, উৎসাহের সঙ্গেই রাজি হয়েছে! কিন্তু অত্যন্ত বিচ্ছিরি সিনে সুটিং দেখতে এসেচি; শুধু বক্তৃতা আর বক্তৃতা। মামাতো বোনরা খুশি—একে তো টুটু অর্থাৎ অমুক কুমার রয়েছেই, তার সঙ্গে মাতাল জমিদার হিসেবে বিকাশ রায়। শুনলাম বাগ্দীর মেয়ে সেজেছে মাধবী মুখার্জি—আমার ভালো লাগত সেই সুটিং দেখলে।

সেদিনকার মতন টেক শেষ বলে, ধরাচূড়া ছেড়ে টুটু এল আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। ইন্দ্রপুরী স্টুডিওর বাইরের মাঠে এসে বসলাম পা ছড়িয়ে। কিছুক্ষণ আমার মামাতো বোনদের গদগদ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে টুটু আমার দিকে ফিরে বললো, কিরে, কী করছিস আজকাল! তোর তো পাত্তাই পাওয়া যায়না!

সেদিনকার সেই বোকা টুটু, সিনেমার নায়ক হয়ে কী চালিয়াৎই হয়েছে। রংটা ফর্সা ছিল, চেহারাটা ছিল কার্তিক-কার্তিক, তাই এক পরিচালকের নজরে পড়ে যায়! শুনছি, শিগগিরই বোম্বে পাড়ি দেবে। আমি বললুম কিরে, খুব তো পিটছিস! টুটু উত্তর দিল, শুধু টাকাটাই দেখছিস, কত খাটতে হয় তা তো জানিসনা! টাকাপয়সা থাকেনা—এ মাসেই তো ছোট ভাইকে একটা গাড়ি কিনে দিতে হল! ন গিয়ে

একটা প্রশ্ন অনেকক্ষণ থেকে আমার মনে ঘুরঘুর করছিল। আমি টুটুর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছিলুম। টুটু বলল, কিরে হাসছিস কেন? আমি মামাতো বোনদের দিকে তাকিয়ে বললুম, এই তোমরা একটু ওদিকে যাও তো—বিকাশ রায় কিংবা অন্যদের অটোগ্রাফ নিয়ে এসো। আমি টুটুর সঙ্গে একটু প্রাইভেট কথা বলব!

তালুতে থুতনি রেখে ঘাসের ওপর কনুই ভর দিয়ে আধ-শোওয়া হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, হ্যাঁরে টুটু, তোর মনীষার কথা মনে পড়ে?

এখনো মেক-আপ ওঠায়নি, কৃত্রিম উজ্জ্বল মুখ টুটুর, অবিচলিতভাবে জিজ্ঞেস করল কোন মনীষা? টাইটল কী? আজকাল নিত্যনতুন এত মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে, সবার নাম মনে রাখা—

—বেশি চালাকি করবি তো পেছনে ক্যাৎ করে এক লাথি মারব! মনীষাকে তোর মনে নেই? সেই চন্দননগরের—

কথা শেষ হলনা। আরেকঝাঁক ছেলেমেয়ে এসে টুটুর সামনে অটোগ্রাফের খাতা খুলে ধরল। টুটু মুখে নায়কোচিত হাসি ফুটিয়ে সবার খাতাতেই সই করল। তারপর তারা চলে যেতেই প্রোডাকশান ম্যানেজারকে ডেকে গরমভাবে বলল, দ্বিজেনবাবু আপনাকে বলেছি না, স্টুডিওর মধ্যে আমি কোন অটোগ্রাফ সই করবনা! তবু এদের আসতে দেন কেন?

আমি বললুম টুটু, তুই এখনো বিয়ে করিসনি, নারে?

—না ভাই! এত মেয়ে সবসময় ছেঁকে ধরে আছে—এদের মধ্যে থেকে কাকে বিয়ে করব ভেবে পাইনা। তাছাড়া, যতদিন বিয়ে না-করছি ততদিন মেয়েমহলে ইমেজ...যাকগে, নীতীশ কেমন আছে? অনেকদিন দেখা হয়না পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে...তুইও তো—

—মনীষাকে তোর মনে নেই বলতে চাস?

টুটু হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল। বলল, কেন মনে থাকবে? যা-তা একখানা মেয়ে...গাল তোবড়ানো, পুরু ঠোঁট...ওসব মেয়ে এ-লাইনে একস্ট্রার পার্টও পায়না।

আমি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে হাসতে লাগলুম। এখনো বেশ রাগ আছে দেখছি! টুটু অন্যমনস্কভাবে মাটি থেকে ঘাস টেনে-টেনে ছিঁড়তে লাগল।

টুটুর সঙ্গে অনেকদিন বাদে আজ দেখা হওয়ার পর, মনীষার কথা আমার বারবার মনে হচ্ছিল। নীতিশের বোন মনীষা, একসময় তাকে বিয়ে করার জন্য টুটু পাগল হয়ে উঠেছিল। সত্যিই দেখতে তেমন সুন্দরী ছিলনা মনীষা, কিন্তু পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, রুচি ও ব্যক্তিত্ব ছিল স্পষ্ট। নীতিশদের বাড়িতে

সন্ধেবেলা আমরা আড্ডা মারতে যেতুম, মনীষা আর তার দিদি রুচিরাও এসে যোগ দিত আমাদের সঙ্গে। রুচিরা আবার কম্যুনিষ্ট পার্টিতে নাম লিখিয়েছিল, প্রায়ই সাহিত্য আর রাজনীতি নিয়ে খুব তর্ক বাঁধত। একবার আমরা সবাই মিলে রিহার্সাল দিয়ে ওখানে একটা থিয়েটারও করেছিলাম, তাতে আমিও একটা মাঝারি ধরনের পার্ট পেয়েছিলাম, কিন্তু অতিরিক্ত লাজুক বলে টুটু পেয়েছিল এক সিনের প্রতিনায়কের বন্ধুর পার্ট।

মনীষা টুটুকে নিয়ে খুব ঠাট্টা-ইয়ারকি করত, ঝকঝকে চোখা-চোখা কথা বলতে পারত মনীষা, টুটু খুব সরল আর লাজুক ছিল বলে কোনটারই ঠিক সময় উত্তর দিতে পারতনা শুধু ফর্সা চেহারায় লজ্জায় লাল হতো। দুর্বল আর অসহায়দের আঘাত করতেই তো মেয়েদের আনন্দ, টুটুকে আঘাত দেওয়ার ব্যাপারে মনীষার কোন ক্লান্তি ছিলনা। হয়তো রাজনীতি নিয়ে তর্ক হচ্ছে, টুটু যদি কখনো একটা কথাও বলত—মনীষা অমনি ধমকে উঠত, আপনি চুপ করুন। যে বিষয়ে কিছুই জানেননা—সে বিষয়ে কথা বলতে আসেন কেন ? টুটুর পোশাক আর চেহারা নিয়েও ঠাট্টা করতে ছাড়তনা, দেখা হলেই বলত, কী, মেয়েদের মতন চোখে কাজল দিয়েছেন বুঝি ? না সুর্মা ?...এঃ, আপনার গা দিয়ে কী বিশ্রী গন্ধ বেরুচ্ছে ! সেণ্ট মেখেছেন বুঝি ? কিংবা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, কোনদিন কোন কাজকর্ম করেননা, শুধু দিনরাত আলস্য...। সবচেয়ে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিল মনীষা—যেবার আমাদের বি.এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলো। আমরা সবাই কোনক্রমে পাশ করে গেলুম, টুটু পারলনা—সেজন্য আমরা সবাই দুঃখিত, একমাত্র মনীষাই হেসে উঠে বলেছিল, জানতাম। আমি আগেই জানতাম।

সেই মনীষার প্রেমে পড়ে টুটু একেবারে হাবুডুবু খেয়েছিল। মনীষাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়ে উঠল, আমাদের সাহায্য নিল, কাকাকেও পাঠাল মনীষাদের বাড়িতে, তার বাবার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে। টুটুর তখনকার পাগলামি আমাদের সকলের কাছেই ছিল পরম উপভোগ্য ব্যাপার। টুটুর সঙ্গে দেখা হলেই আমরা বলতাম, টুটু মনীষা একটু-একটু এবার রাজি হয়েছে বোধহয়, কাল তোর কথা বলছিল, তুই চারদিন যাসনি ওদের বাড়িতে...খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ! টুটু উদ্ভাসিত মুখে বলত, তাই নাকি ? সত্যি ?

কথা নেই বার্তা নেই, দুমাসের মধ্যে দুম করে মনীষা বিয়ে করে ফেলল দীপঙ্করকে। দীপঙ্করের রোগা চেহারা, ধারালো নাক, কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ডিবেট করার খুব নাম ছিল। ঐ একটাই গুণ ছিল দীপঙ্করের—ধারালো কথা বলা। পৃথিবীর সবকিছু নস্যাৎ করে দিতে পারত সে যুক্তিজালে। কারুকে কিছু না-জানিয়ে ওরা রেজিস্ট্রি বিয়ে করে ফেলল, তারপর দীপঙ্কর মনীষাকে নিয়ে চলে

গেল বহরমপুরে এক কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পেয়ে।

একদিন টুটুর ঘরে গিয়ে দেখলাম ঘরের দেওয়ালে লাল পেন্সিলে অসংখ্য দাগ কাটা। টুটু বলেছিল, আমি রোজ দেওয়ালে দাগ কাটি, একশো সতেরো দিন হয়ে গেল—মনীষাকে আমি আজও একটুও ভুলতে পারছিনা।

অন্যমনস্কভাবে ঘাস ছিঁড়ছে টুটু। সেদিন কেউ ভাবতেও পারেনি, আমাদের চন্দননগরের সেই টুটু হঠাৎ ফিল্মস্টার হয়ে যাবে—তার জন্য বাংলা দেশের হাজার—হাজার মেয়ে ব্যাকুল হবে—খোলামকুচির মতন টাকা নিয়ে খেলবে। টুটু এখন আর সেই বোকা ভালোমানুষটি নেই, এখন সে ক্যামেরাম্যান আর প্রোডাকশন ম্যানেজারদের ধমকায়, সাদা টাকা—কালো টাকার হিসেব ঠিক রাখে, প্রচারের কায়দা সম্পর্কে উপদেশ দেয়, আয়নার সামনে দাড়িয়ে নিত্যনতুন রকমের হাসি প্র্যাকটিস করে। অভাবিতভাবে অনেক কিছু পেয়েছে টুটু কিন্তু মনীষার মতো একটা সামান্য মেয়ের কাছে হেরে গেছে। আজ কত মনীষাকে সামান্য ইঙ্গিত করলেই...কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই একজন তাকে অবহেলাই করেছে শুধু।

আর মনীষা? দীপঙ্কর বোধহয় চার-পাঁচশো টাকা মাইনে পায় ডিবেট কিংবা রাজনীতিও করেনা—সেই তেজি ছোকরাও সে আর নেই এখন, বোধহয় অতিরিক্ত একশো-দুশো টাকা আয়ের জন্য নোট লেখে কিংবা কোচিং ক্লাস নেয়। দুটি ছেলেমেয়ে ওদের!

টুটুকে জিজ্ঞেস করলাম, মনীষার সঙ্গে তোর আর দেখা হয়েছে?

—নাঃ, বহরমপুরের দিকে গিয়েছিলাম একমাত্র সুটিং-এ—গত বছর, একবার ভেবেছিলাম ও হয়তো আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে—অন্তত ভাইপো—ভাইঝির জন্যে অটোগ্রাফ নেবার নাম করেও, অনেকেই তাই আসে।

মনীষা তোর অটোগ্রাফ নেবে? তুই তো খাড়িখানেক চিঠি লিখেছিলি তাতেই তো তোর সই...

—এখন আমার সই বদলে ফেলেছি। তাছাড়া মনীষা কী আর সেসব চিঠি রেখে দিয়েছে নাকি?

আমি আবার হাসলাম। টুটুকে আঘাত দিতে আমার ইচ্ছে হলনা। টুটুর হয়তো কিছু যায় আসে না ও অনেককিছুই পেয়েছে এখন—তবু মনীষার কথা ওকে আমার বলতে ইচ্ছে করলনা।

মনীষার সঙ্গে মাস ছয়েক আগেই আমার দেখা হয়েছিল। কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল ওরা, আমার সঙ্গে ধর্মতলায় দেখা। চৌরঙ্গী দিয়ে দীপঙ্কর আর মনীষার সঙ্গে হাঁটতে-হাঁটতে আমি একটা সিনেমা পোস্টারে টুটুর ছবি দেখিয়ে মনীষাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী চিনতে পারো?

মনীষা ভ্রূভঙ্গি করে বলেছিল না চিনে উপায় আছে। আজকাল তো যেদিকে তাকাই সেদিকেই ঐ ছবি। বাংলা হিন্দি—

—তুমি ওর বই-টই দেখেছ ?

—না, একটাও দেখিনি, এবার একটা দেখে ফেলব ভাবছি। সিনেমা তো আমার দেখাই হয়না।

সিগারেটের দোকান দেখে দীপঙ্কর এগিয়ে যেতেই মনীষাকে চুপিচুপি বললুম, কী আজকাল একটু-একটু আপশোশ হয়না ?

লঘুভঙ্গিতে ঝরঝর করে হেসে মনীষা বলল, একটু কেন, ভীষণ-ভীষণ আপশোশ হয় ! ছবিটা দেখুন, আগে তবু একটু বোকা ভালো মানুষ চেহারা ছিল, এখন কীরকম ন্যাকার মতন দেখাচ্ছে ! উঃ পুরুষ মানুষ হয়েও কেউ এত ন্যাকা সাজতে পারে ?

৩

ভ্রমণকাহিনী পড়তে আমার খুব ভালো লাগে। গল্প-উপন্যাস পড়ে প্রায় নিরাশ হতে হয়, কিন্তু ভ্রমণকাহিনীতে সে সম্ভাবনা নেই, লেখাটা ভালো হোক বা না-হোক—কিছুক্ষণের জন্য তো সেই বর্ণিত জায়গাটায় মনে-মনে ঘুরে আসা যায়।

আমার নিজেরও ইচ্ছে করে একটা ভ্রমণকাহিনী লিখে ফেলি। কিন্তু কোন জায়গার কথা লিখব, কোন দুর্গম পাহাড়ে কিংবা অচেনা জনপদে তো যাওয়া হয়নি, দেখা হয়নি এই পৃথিবীর কত রহস্য, কত মনোহারিণী শোভা আমার চোখের আড়ালেই রয়ে গেল। বছরের পর বছর কলকাতা শহরেই বন্দি হয়ে আছি। কিন্তু ভ্রমণকাহিনী লেখার খুবই সাধ আমার। তাই ঠিক করলুম, কলকাতা শহরের একখানা ভ্রমণকাহিনী নিয়েই হাতেখড়ি করা যাক।

এক নাতিশীতোষ্ণ অপরাহ্ণে, খাঁটি পরিব্রাজকের মতন সঙ্গে কিছু মালপত্র না-নিয়ে পকেটে সামান্য কিছু টাকাকড়ি, আমি কলকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে একটি নীলরঙা দোতলা বাসে উঠে বসলাম। বাসটি সেখান থেকেই ছাড়ে, সুতরাং বেশ ফাঁকা ছিল, দোতলার জানালার পাশে একটি বহু আকাঙ্ক্ষিত আসন পাওয়া গেল। সেইদিনই যে ভ্রমণ করার খুব একটা ইচ্ছে আমার ছিল, তা নয়, জীবনে [illegible]হৎকার্যের মতন আমার সেই অপরাহ্ণভ্রমণও আকস্মিক। আমার উদ্দেশ্য [illegible]দহ নামক অঞ্চলে নেমে কোন একটি কর্তব্য সমাপন, কিন্তু তা বদলে [illegible]ণবশত। সূত্রপাত হল এইভাবে যে, বাস ছাড়ার আগেই বিড়িতে

শেষ টান দিতে-দিতে কণ্ডাক্টর মহোদয় টিকিটগুচ্ছে আঙুল চালিয়ে আমার নাকের সামনে এনে এক প্রকার উৎকট শব্দ করতে লাগলেন। আমি তখন পথের সৌন্দর্য নিরীক্ষণে ব্যস্ত ছিলাম। সেই শব্দে চমকিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, কী ? তিনি বললেন টিকিট ! আমি আমার পকেট থেকে সযত্নে রক্ষিত পাঁচ টাকার নোটটি এগিয়ে দিলাম। কণ্ডাক্টর সেদিকে পলকের মাত্র চাহনি দিয়ে বিরক্তিমিশ্রিত স্বরে বললেন, পাঁচ টাকা ? নেমে যান !

আমি হতবাক।

আমার বরাবরই কলকাতা শহরে বাসের ভাড়ার ব্যাপারে সন্দেহ ছিল। ধরা যাক একশো মাইল দূর থেকে কেউ ট্রেনে চেপে কলকাতা শহরে আসতে চায়। তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলে ভাড়া তিন টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ছ'টাকা, প্রথম শ্রেণীতে প্রায় বারো টাকা দিতে হবে। একই দূরত্ব, একই ট্রেন, শুধু আসনের আরাম অনুযায়ী বিভিন্ন দাম। অথচ কলকাতায় শ্যামবাজার থেকে বালিগঞ্জগামী বাসে যারা হাতল ধরে ঝুলছে, যারা ভিড়ে চ্যাপ্টা হচ্ছে, যারা অস্থায়ী মহিলা আসনে বসে সদা কম্পিত, যারা জানালার পাশে নিশ্চিত আরামের আশ্রয় পেয়েছে—সকলেরই টিকিটের ভাড়া এক হয় কী প্রকারে ? সুতরাং আমার মনে হল, কর্তৃপক্ষের বুঝি এতদিনে চেতনা ফিরেছে। দোতলায় জানালার ধারের আসনকে এয়ারকণ্ডিশনড কামরার মর্যাদা দিয়ে ভাড়া বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি সভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কত ভাড়া ? কণ্ডাক্টরটি পুনশ্চ বিরক্তিভরে বললেন, বললুম তো খুচরো নেই। নেমে যান ! নেমে যান !

শাস্ত্রে আছে, যেসব মানুষের শরীর অত্যধিক রোমশ হয়, যাদের বর্ষাকালে জন্ম, যাদের শরীর রোগা নয় আবার খুব স্থূলও নয়, যাদের চোখ বড় কিন্তু নাক ছোট, যারা দ্রুত স্নান সারে কিন্তু খাবার খেতে দেরি করে, যারা দিনে ঘুমোয় কিন্তু অধিক রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে, সেইসব মানুষ অত্যন্ত গোঁয়ার প্রকৃতির হয়। আমার সঙ্গে এর প্রত্যেকটার মিল থাকা সত্ত্বেও—আমি গোঁয়ার গোবিন্দ হিসেবে তেমন পরিচিত নই। কিন্তু এক নিরুপদ্রব বিকেলবেলা নিশ্চিন্তভাবে বাসের জানালায় বসেছি, এমন সময় আমার সঙ্গে ভালো করে কথা না-বলেই 'নেমে যান' বলায় চড়াৎ করে আমার মেজাজ সপ্তমে উঠল। একবার বললেও হয়তো অতটা মনে করতামনা, কিন্তু পরপর দুবার নেমে যান নেমে যান আমার কানে অতিশয় রূঢ় শোনাল। তখন আমি স্থিরভাবে বললুম আমি নেমে যাবনা, আমি এখানেই বসে থাকব। এই বাস যতদূর যায় ততদূর যাব তার মধ্যেও যদি আপনার খুচরো না হয়—তবে এই বাস যতবার আজ যাতায়াত করবে—আমি এখানেই বসে থাকব—যদি তাতে পাঁচ টাকার পুরো ভাড়া হয় !

অতএব এরপর আমার যাত্রার আর কোন উদ্দেশ্য রইলনা, আমি ভ্রমণকারীর মতন নিরাসক্তভাবে বসে রইলাম। অন্যদিন কাজের জন্য বাসে চাপতে হয়, তখন তাড়া থাকে কতক্ষণে পৌঁছুব। আজ সেরকম কিছু নেই বলেই—অনেককিছু চোখে পড়তে লাগল।

পাইকপাড়ার রাজা-রানীদের স্মৃতিমণ্ডিত রাস্তা ধরে বাস ছুটছিল, অচিরে তা দুবার ডানদিকে বেঁকে বেলগাছিয়ায় এসে পৌঁছুল। বেলগাছিয়ার রাস্তাটুকু অতিশয় অভিনব। এখানে বাস কিছুক্ষণ ঘোড়ার চাল অনুসরণ করে। প্রতি কদমে বাসটি লাফিয়ে উঠছে ও ডানদিকে-বাঁদিকে হেলছে—সেই অনুযায়ী যাত্রীরাও। একেবারে সামনের আসনে কয়েকটি শিশু ছিল তারা আনন্দে খলখল করতে লাগল। আমার মনে পড়ল, অতিশৈশবে দার্জিলিং গিয়ে বাবার সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে চেপে আমারও এইপ্রকার আনন্দ হয়েছিল। যেসব বাচ্চারা আজকাল দার্জিলিং যেতে পায়না—তাদের আনন্দের জন্যই বোধহয় বেলগাছিয়ার রাস্তায় এই বন্দোবস্ত। তারপরেই বাসের নৃত্য থামল, জলের সরসর শব্দ কানে এল। তাকিয়ে দেখি ব্রিজের পাদদেশ সম্পূর্ণ জলমগ্ন। গত পূজার পর আর একদিনও বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে পড়েনা—কিন্তু বেলগাছিয়া ব্রিজের কাছে কোমর জল, বাস তার মধ্যে সাঁতার কাটিতে লাগল। কলকাতার বাসগুলি সত্যিই বাঘের বাচ্চা—জল-স্থলের কোন বাপাই তারা মানেনা, মনে হয় শূন্যপথেও তারা যাতায়াতে পারঙ্গম। এক মহিলা সেই কোমর জলে রিকশা চেপে আসছিলেন, রিকশা থেকেই তিনি বাসের পাদানিতে লাফ দিয়ে পড়লেন।

বাস ব্রিজের ওপর উঠল, এবার দৃশ্য সত্যিই অপূর্ব। ব্রিজটি বেশ উঁচু, দূরে অনেক নিচে শ্যামবাজারের গমগম জনতা। ব্রিজের দুপাশে বহু আঁকিবুকি কাটা রেললাইন—দিগন্তবিস্তৃত শূন্যতা—মেদুর সন্ধ্যা তার ওপর ঝুঁকে আসছে। ডানধারে পার্শ্বনাথের ঠাণ্ডা ছিমছাম মন্দির, ভিতরে জলাশয়, তার আশেপাশে সুবেশ নরনারী। বাঁদিকে একটি শিবমন্দিরের শুধু চূড়াটুকু উঠে আছে, তার ওপর প্রাইভেট বাসের কণ্ডাকটররা কী কারণে যেন পয়সা ছুঁড়ে দেয়। বাস এখানে একবার শরীর ঝাড়া দিল, যেন শহরতলি ছেড়ে শহরে ঢুকবার জন্য তৈরি হয়ে নিচ্ছে। শ্যামবাজারে এসে থামা মাত্র একটা বিশাল ভিড় বাসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

শ্যামবাজার থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সার্কুলার রোডের একটি বিশেষত্ব আছে—এতদিন চোখে পড়েনি। সার্কুলার রোডের বাঁপাশে প্রায়শই বস্তি, কিন্তু ডানপাশে সবই প্রায় পাকাবাড়ি। সার্কুলার রোডের মতন একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় এত বস্তি কেন, বস্তির বদলে ব্যারাকবাড়ি তুলে দিলে অনেক স্থান সঙ্কুলান হত—এসব কথা

তুলছিনা। একটা রাস্তার একদিকে বেশি বস্তি, অন্যদিকে বেশি পাকা-বাড়ি—এর কারণ কী ? তখন মনে হল, হয়তো কলকাতার প্রাচীন কালের চিহ্ন এখানে এখনও রয়ে গেছে। সার্কুলার রোড তো খাল-ভরাট-রাস্তা। বর্গির হাঙ্গামার ভয়ে যে খাল কাটা হয়েছিল—সেটাকেই পরে বুঁজিয়ে রাস্তা হয়েছে। অর্থাৎ এই রাস্তাটির ডানদিকে ছিল কলকাতা শহর বাঁদিকে গ্রাম—বাঁদিকের বস্তিগুলোয় এখনো বোধহয় সেই গ্রামের চিহ্ন রয়ে গেছে।

শিয়ালদহে এসেও আমার মন কেমন করলনা। বিবাগী ভ্রমণে বেরিয়েছি—আজ আর কর্তব্য-কর্ম থাক। ইতিমধ্যে পুরানো যাত্রীরা অধিকাংশ নেমে গিয়ে নতুন যাত্রীদল উঠেছে। এক-এক এলাকার যাত্রীদের পোশাকেও কিছু-কিছু সূক্ষ্ম তফাৎ আছে—কিন্তু সে প্রসঙ্গ থাক। মৌলালি থেকে বাঁদিকে ঘুরতেই দৃশ্য আমূল বদলে গেল। এ এক নতুন কলকাতা। ঝকঝকে পরিষ্কার দুপাশের বাড়িগুলি নতুন, জানালার পরদায় হরেক শোভা। বারান্দায় রেলিং ধরে ঝোঁকা মেয়েরা স্বাস্থ্যবতী পুরুষদের পা-য় হরিণের চামড়ার চপ্পল। পথও দুভাগ করা, মাঝখানে সবুজ ঘাসের নর-চারণ ক্ষেত্রং। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আলেকজাণ্ডার যখন দিগ্বিজয়ে বেরন, তখন তাঁর গুরু অ্যারিস্টটল নাকি বলেছিলেন, পৃথিবীর যত জায়গাতেই যাও, মানুষের মতন এত আশ্চর্য জিনিশ আর কিছুই দেখবেনা। সুতরাং বাসের জানালায় বসে আমি যে শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্যই দেখছিলাম, তা নয়, দোতলার প্রত্যেক যাত্রীর ওঠা-নামা এবং ধরন-ধারণও লক্ষ করছিলাম। তাছাড়া আজকালকার ভ্রমণকাহিনীতে একটি সুন্দরী নায়িকা এবং দুটো-একটা রোমাঞ্চকর ঘটনা না-থাকলে জমেনা। আমার এ ভ্রমণকাহিনীতেও তার অভাব নেই, যথাসময়ে বলছি।

বাস তখন ভিড়ে ভর্তি অনেক লোক দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েদের দুটি আসনই ভর্তি, তাছাড়াও দু-একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমি বসেছি অনেক দূরে, সেখান থেকে হঠাৎ শিভালরি দেখাবার অবকাশ নেই। আমার পাশে আগাগোড়া বসে আছে একজন হিন্দুস্থানী, তার প্রতি আমার রাগের উদ্রেক হবার কোনই কারণ নেই, কিন্তু তার কাঁধে একখানি ময়লা গামছা। আমার বারবার তাকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, এই ভর সন্ধ্যাবেলা তুমি কী বাসে চেপে কোথাও স্নান করতে যাচ্ছ ? তা যদি না হয় তবে ঐ মহামূল্য গামছাখানা বাড়িতে রেখে এলে কী তুলসী দাসের রামায়ণ অশুদ্ধ হয়ে যেত ? আমার সামনের সীটের দুজন প্রৌঢ় অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় পঞ্চাশ হাজার কিংবা ষাট হাজার টাকার কী একটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন ! পিছনের সীটে দুজন যুবক ভারতের ক্রিকেটভাগ্য নিয়ে অত্যন্ত উত্তেজিত। একেবারে সামনের সীটে-বসা এক ভদ্রলোক একেবারে

পিছনের সীটে-বসা একজন চেনা লোককে দেখে চিৎকার করে সারা বাস শুনিয়ে ঘোঁতনদার বিয়ের দিন কী কাণ্ড হল সেই গল্প শুরু করলেন। বাস সি আই টি রোড ছেড়ে বাঁদিকে বেঁকল।

বণ্ডেল রোড, চার নম্বর গেট এইসব নামগুলো কেমন যেন অচেনা। এতকাল কলকাতা শহরে আছি, অথচ চার নম্বর গেটের পাশে থাকি—একথা কারুকে বলতে শুনিনি। অথচ, কণ্ডাক্টর চার নম্বর গেট, চার নম্বর গেট বলে চেঁচাচ্ছে—অমনি একদল লোক হুড়মুড় নেমে যাচ্ছে, একদল লোক উঠছে। এখানেও তো কম লোক থাকেনা। আমার ইচ্ছে হল, একদিন পায়ে হেঁটে এ রাস্তা দিয়ে ঘুরব। এখানে রাস্তাটা খুব ছোট, দুটো বাস পাশাপাশি এলে সরু হয়ে কাৎ হয়ে যেতে হয়। উগ্র কাচা চামড়ার গন্ধ। পাশে রেললাইন। ছোট-ছোট খাপরার ঘরে গরু-ছাগল আর মানুষ একসঙ্গে রয়েছে। রাস্তায় কয়েকটি উলঙ্গ ছেলে। বড় শহরের এইরকমই বৈশিষ্ট্য 'বড়'র পিরীতি বালির বাঁধ ক্ষণেক হাতে দড়ি খনেক চাঁদ'। এইমাত্র ছিল সি আই টি রোডের চমৎকার রাস্তা, সাজানো বাড়ি-ঘর—মাঝখানে চামড়ার হঠাৎ গন্ধ আর বস্তি আর আবর্জনা—আমার একটুপরেই বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে মর্ত্যের স্বর্গ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ির পাশ দিয়ে ঘুরে বাস হাজরা রোডে পড়ল।

এখানে হঠাৎ বাস প্রায় খালি। মনে হয় বাসে চড়ার মানুষ এসব রাস্তায় খুব কম থাকে। এখন দোতলা বাসেব জানালার ধাবে-ধারে একজন-একজন বসে আছে। পাশের সীটগুলো প্রায় ফাঁকা। আমার পাশের লোকটিও কখন যেন নেমে গেছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, হঠাৎ উগ্র সেন্টের গন্ধ নাকে লাগল।

'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন'?

চমকে উঠলাম। কণ্ডাকটর নয়, এক তরুণী, হালকা নীল-রঙা নাইলন জর্জেট পরা, কানে দুটি মুক্তোর দুল। মেয়েটিকে সুন্দরীই বলতে পারতাম, কিন্তু ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধ সবকিছু নষ্ট করে দিচ্ছিল। মেয়েটির পিছনে বাচ্চাছেলে কোলে নিয়ে একটি পুরুষ, পুরুষটিকে দেখলেই বোঝা যায়—কোন এক গোধূলি লগ্নে তিনি তাঁর সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে দাসখৎ লিখে দিয়েছেন। ব্যাপারটা বোঝা গেল, বাসের প্রায় সবকটা আসনই একটা-একটা খালি, ওঁরা পাশাপাশি বসতে চান। মেয়েটি ব্যগ্র গলায় আবার প্রশ্ন করল, 'আপনি একটু উঠে অন্য সীটে বসবেন'?

আমি মেয়েদের অন্ধ স্তাবক। কিন্তু এটুকু জানি মেয়েদের আর যত গুণই থাক—সামগ্রিকভাবে অধিকাংশ মেয়েরই ভদ্রতাবোধ তেমন প্রবল নয়। ট্রামে-বাসে হিলতোলা জুতোয় পুরুষদের পা মাড়িয়ে দিয়ে মেয়েরা অক্লেশে ভ্রূক্ষেপহীন থাকে, লেডিস সীটে বসে থাকা পুরুষদের তুলে দিয়ে তাদের প্রতি একটু সামান্য

কৃতজ্ঞতার হাসি বিলোতেও তারা কার্পণ্য করে। এমনকী এইধরনের স্বার্থপর অনুরোধও তাদের পক্ষেই করা সম্ভব। এইজন্যই পুরুষটি সলজ্জ মুখে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে যাইহোক, মেয়েদের দেখে তড়াক করে আসন ছেড়ে দিতে আমার বেশ ভালোই লাগে, তাতে মনের মধ্যে একধরনের সুড়সুড়ি বোধ করি। কিন্তু এক্ষেত্রে ঐ বিশ্রী সেন্টের গন্ধের জন্য মেয়েটিকে আমি গোড়া থেকেই অপছন্দ করেছিলাম। আমি বিলাতপ্রেমিক নই, কিন্তু দিশি সেন্টের গন্ধের চেয়ে ঘামের গন্ধ, ধোঁয়ার গন্ধ, কাচা চামড়ার গন্ধ, পেট্রোল পোড়ার গন্ধ এসব স্বাভাবিক গন্ধও আমার অনেক ভালো লাগে। কিন্তু মেয়েটির অনুরোধ তো প্রত্যাখ্যান করা যায়না। সেইজন্য শীতকালের পুকুরে স্নান করতে মামার সময় যেরকম আলস্য লাগে—সেইরকম ভঙ্গিতে আমি চটিতে পা গলাতে-গলাতে বললুম, উঠতে হবে ? আচ্ছা—

মেয়েটি বোধহয় আমার ভঙ্গি দেখে অপমানিত বোধ করল। আমার কথার উত্তর না-দিয়ে মেয়েটি সামনের সীটের আরেকজন পুরুষের পাশে বসে পড়ে স্বামীকে বলল, তুমি ওখানেই বসো—একটা ট্যাক্সি পাওয়া যায়না...পুরুষটি লাজুক মুখে আমার পাশে বসলেন। আমি হাসি চেপে জানালার বাইরে তাকিয়ে রইলাম। খানিকক্ষণ চুপচাপ।

একটু পরেই মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, ঐ তো ট্যাক্সি যাচ্ছে, ডাকোনা, ট্যাক্সি ! ট্যাক্সি !

রাস্তা দিয়ে আলো জ্বালিয়ে একটা ট্যাক্সি যাচ্ছিল, পুরুষ ও নারীটি বাসের জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সমস্বরে চেঁচাতে লাগল সেটার উদ্দেশ্যে। ট্যাক্সিটা হঠাৎ থেমে পড়ল এবং দোতলা বাস তার পিছনে একটা ঢু মারল। সঙ্গে-সঙ্গে কেঁপে উঠল জগৎসংসার, ঝন ঝন ঝন আমার কপাল ঠুকে গেল সামনের সীটে, মেয়েটি হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল প্রায়। বাসসুদ্ধু লোক চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাকসিডেন্ট ! অ্যাকসিডেন্ট !

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার ভিড়, দুপদাপ করে আমরা সবাই বাস থেকে নেমে পড়লাম। সেই মেয়েটির হাত ধরে পুরুষটি পিছনদিকে দ্রুত পালাল। আমার ভ্রমণপর্বেরও সেইখানেই শেষ।

ভ্রমণের অশেষ উপকারিতা। সেদিন আমি ভ্রমণ করব এই মনস্থ করাতেই শেষপর্যন্ত আমার বাসের ভাড়া লাগেনি।

৪

মানুষের দুঃখের কি কোন মাত্রা আছে? কেউ বেশি দুঃখী, কেউ কম দুঃখী একথা কী ক'রে বোঝা যায়?

আমার বন্ধু, পরমেশকে বেশ ফিটফাট সুখী লোক বলা যায়। এ পর্যন্ত কেউ তাকে পালিশহীন জুতো পরতে দেখেনি, ভোরবেলা সূর্য ওঠবার আগেই প্রত্যেকদিন সে দাড়ি কামিয়ে ফেলে—এমনই তার সদা চকচকে মুখ। দীর্ঘ উন্নত চেহারা, সরল স্বাস্থ্য, গায়ের রং ফর্শা, সে রাস্তা দিয়ে যাবার সময় তরুণী মেয়েরা পরমেশকে ফিলম স্টার মনে করে ফিরে দেখে। বস্তুত একটা ফিলম নায়কের পার্ট করার জন্য পরমেশের কাছে প্রস্তাবও এসেছিল, কিন্তু বেশি লোকজনের সামনে পরমেশ বিষম লাজুক হয়ে পড়ে, গলার আওয়াজটাও একটু ভাঙা-ভাঙা —তাই পরমেশ রাজি হয়নি। ফিলমস্টার হবার বিশেষ ইচ্ছেও ওর কখনো ছিলনা —সেজন্য পরমেশ ও ব্যাপারে দুঃখ পায়নি।

পরমেশ তার প্রভাবশালী ছোট মামার সুপারিশে ভালোই চাকরি পেয়েছে, আশির্বাদপূতঃ ভাগ্যবান কয়েকজন, অর্থাৎ 'চোজেন ফিউ'-এর অন্যতম পরমেশ রোজ সুট-টাই পরে স্কুটারে চেপে অফিস যায়। পাক্কা সাহেবদের মতন দুপুরে লাঞ্চ খায়, পার্কস্ট্রিটের দোকানে। এক বিখ্যাত ডাক্তারের মেয়ে চম্পা সান্যালের সঙ্গে পরমেশের প্রেমও গভীর হতে চলেছে। সন্ধ্যার দিকে পম্পাকে নিয়ে বেড়াতে যায় ফুরফুরে হাওয়ায়। ওদের বিয়ে হলে দু'বাড়িতেই কোনরকম আপত্তি করার কথা নয়। সচ্ছল-সুখী-তৃপ্ত জীবন মনে হয় পরমেশের।

কিন্তু আমি জানি, পরমেশ বড়ই দুঃখী। ওর দুঃখের কারণ, আজও স্কুটার ছেড়ে পরমেশ গাড়ি কিনতে পারলনা। ওর অফিসের সমান চাকরেদের আর সবারই গাড়ি আছে, পরমেশের শুধু নেই—এতে ও মনে-মনে গভীর অপমান বোধ করে। চম্পাকে নিয়ে বেড়াতে যায় যখন, তখন স্কুটারটা বাড়িতে রেখে যেতে হয়। কেননা, চম্পা যদিও স্কুটারে চাপতে খুবই ভলোবাসে, কিন্তু সবার চোখের সামনে দিয়ে স্কুটারে চেপে সে প্রেম করতে যাবে—এতখানি উদার তার অভিভাবকরা নয়। এখনো তাকে বান্ধবীর বাড়ি কিংবা মিস্টুনি বউদির বাড়ি যাচ্ছি বলে পরমেশের সঙ্গে দেখা করতে হয়। পরমেশের ঐ দুঃখ নিজের স্কুটার থাকতেও তাকে ট্যাক্সি চেপে প্রেম করতে হচ্ছে। যদি গাড়ি থাকত! কবে গাড়ির জন্য নাম লিখিয়ে রেখেছে, এখনো কোন সাড়াশব্দ নেই।

আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়, নতুন গাড়ির জন্য পরমেশের নাম লেখানোর ব্যাপারটা বোধহয় সত্যি নয়। নতুন গাড়ির বদলে একটা ভালো সেকেণ্ডহ্যাণ্ড গাড়ি

ও তো অনায়াসেই কিনতে পারত। পরমেশ অবশ্য পুরোনো জিনিশ পছন্দ করেনা, তার নিজের প্রতিটি জিনিশ ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন, অপরের ব্যবহার করা তোয়ালে দিয়ে জন্মেও হাত মুছবেনা, সেইজন্যই কী অপরের ব্যবহার করা গাড়িতে তার অরুচি? কিংবা, পরমেশ যা-ই বলুক, গাড়ি কেনার সামর্থ পরমেশের বোধহয় এখনো হয়নি।

পরমেশের দুঃখ আসলে দুরকম। ও স্কুটার চালাতে সত্যিই ভালোবাসে। দক্ষ হাত, কালো চশমা পরে রূপবান পরমেশ যখন উইণ্ড শিল্ড ছাড়াই চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল গতিতে স্কুটার চালায়, তখন ওকে অপূর্ব দেখায়। যেন আগেকার অশ্বারোহী বীরপুরুষদেরই নতুন রূপ। সেই তুলনায় মোটরগাড়ির স্টিয়ারিং-এর সামনে তার রূপ অনেকটা ম্লান। কিন্তু তার সামাজিক প্রতিষ্ঠার পূর্ণতার জন্য তার মোটরগাড়ি চাই। মোটরগাড়ি ছাড়া তার প্রেমও বাধা পাচ্ছে। মোটরগাড়ি কিনলে প্রিয় স্কুটারটা তাকে ছাড়তে হবে—এই ভেবে তার দুঃখ, আবার মোটরগাড়ি এখনও কেনা হচ্ছেনা—এইজন্যও তার দুঃখ। দুই দুঃখের দোটানায় পরমেশ গভীরভাবে দুঃখী।

থিয়েটার রোডের মোড়ে পরমেশের সঙ্গে দেখা। ট্রাফিকের লাল আলোর সামনে পরমেশ স্কুটার থামিয়েছে। আমি ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, কী রে পরমেশ, কেমন আছিস?

পরমেশ চোখ থেকে রোদ-চশমা খুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আরে তুই! আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেছিস যে। দেখাই পাওয়া যায়না।

আমি বললুম, আয় এপাশে চলে আয় না, কোন্ চায়ের দোকানে একটু বসা যাক।

—আরে আজ নয়, আজ আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে ছ'টার সময়! আর-একদিন...

ছটার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো এখন কী? কার সঙ্গে? চম্পা? চম্পা এখনো তোকে পাত্তা দিচ্ছে?

—আমাকে পাত্তা দেবেনা কী তোকে দেবে?

—এখনতো পাঁচটা বাজে, ছ'টার সময় অ্যাপয়েন্টমেন্ট—অনেক দেরি, আয় একটু আড্ডা দিই।

—নারে, বাড়িতে স্কুটারটা রেখে আসতে হবে আগে—

—তুই এখনো গাড়ি পেলিনা? আমি তো ভেবেছিলাম এতদিন তুই গাড়ি কেনা আর বিয়ে দুটোই সেরে ফেলেছিস।

—হঠাৎ পরমেশের হাসিখুশি মুখখানা বদলে গেল। গভীর বিরক্তির সঙ্গে বলল, ধুৎ কোন জিনিশ কী আজকাল ইচ্ছেমতন হয়। একটা গাড়ির জন্য কত

লোককে ধরাধরি করলুম, ধ্যাত্তেরি স্কুটার নিয়ে দিনরাত ট্যাং ট্যাং করতে-করতে জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল।

—কী রে, তুই তো স্কুটার চালাতে খুব ভালোবাসতিস আগে! বিনা কাজেও ঘুরতিস স্কুটারে চেপে।

মা যে-চোখে তার মৃত সন্তানের ছবি দেখেন, সেইরকমভাবে পরমেশ তার স্কুটারের দিকে এক পলক তাকিয়ে গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, আর ভালোবাসা!

সবুজ বাতি জ্বলতেই পরমেশ মাটি থেকে প্যাডেলে পা তুলে বলল, চলি রে আজ, আসিস একদিন বাড়িতে...। স্পীড নিয়ে পরমেশ রাস্তা পেরিয়ে রেড রোডের দিকে ছুটে গেল, আর-একবার ফিরে তাকালো আমার দিকে। কী-রকম দুঃখী আর একা মানুষের মুখ!

পরমেশের এই দুঃখকে মনে হতে পারে বিলাসিতা। কত লোক ট্রাম-বাসেই হাতল ধরার সুযোগ পায়না, ওর তো স্কুটার আছে কিংবা কত লোক খেতে পাচ্ছেনা—সেই তুলনায় ওর আবার দুঃখ কী! এইখানেই আমার সন্দেহ, কারুর দুঃখই বোধহয় সামান্য কিংবা বেশি নয়। ফুটপাতে শুয়ে থাকা ভিখারি বুড়ি গভীর রাত্রে জেগে উঠল, প্রবল বৃষ্টি নেমেছে, গাড়িবারান্দার নিচে গিয়ে বসল, সেখানেও বৃষ্টির ছাঁট, রাস্তায় জল জমে ক্রমশ ফুটপাত গ্রাস করবার জন্য এগিয়ে আসছে। বুড়ির তখন আর কোথাও যাবার উপায় থাকবেনা। পোঁটলাপুঁটলি বুকের কাছে জড়িয়ে বুড়ি জুলজুলে চোখে অসহায়ভাবে তাকিয়ে দেখছে জলের এগিয়ে আসা। সেই গভীর রাত্রে বৃষ্টির মধ্যে বুড়ির দুঃখ ও একাকিত্বও আমি দেখেছি। কিন্তু তার সঙ্গে পরমেশের কোন তুলনা আমার মনে আসেনি। একথা কখনো মনে হয়নি, পরমেশের চেয়ে ঐ বুড়ির দুঃখ বেশি। পরমেশের দুঃখের জন্য আমার কোন সমবেদনা হয়না অবশ্য বরং একটু হাসিই পায়। কিন্তু বুড়ির দুঃখের জন্যই কি আমার সমবেদনা আছে? সমবেদনা কথাটার মানে কী? ঐ বুড়ির দুঃখ দূর করার জন্য আমি কোনদিন কিছুই করবনা। ওকে বৃষ্টির মধ্যরাত থেকে তুলে এনে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে পারবনা, যেমন পরমেশের গাড়ি জোগাড় করে দেবার জন্য আমি নিজে নিশ্চয়ই কখনো ছোটাছুটি করবনা। তাহলে আর ওদের দুজনের মধ্যে তফাৎ কী! পরমেশ যদি ওর স্কুটারবাহন অবস্থাটা মেনে নেয়, তাহলে আর ওর কোন দুঃখ থাকেনা, তেমনি ঐ বুড়িও তো ওর মধ্যরাত্রে বৃষ্টিভেজা অবস্থাটা মেনে নিতে পারে!

কে যেন আমার মনের মধ্য থেকে বলছে, মূর্খ, স্কুটারের বদলে মোটরগাড়ি না-পেলে কিংবা চম্পার বদলে মল্লিকার সঙ্গে প্রেম করলে পরমেশ মরবেনা, কিন্তু খেতে না-পেলে সামান্য আশ্রয় না-পেলে মানুষ মরে যায়। ঠিক! খেতে না-পেলে

বেশ কষ্ট হয়—আমি নিজেও মাঝে-সাঝে তা টের পেয়েছি—এমনকী শেষ পর্যন্ত মরেও যায় অনেকে—সে অভিজ্ঞতা অবশ্য আমার এখনো হয়নি—কিন্তু খেতে না-পাওয়াটা কী দুঃখের?

আমাদের বাড়িতে তিনটে বাচ্চা ভিখিরি মেয়ে প্রায় রোজই আসে। সাত থেকে এগারোর মধ্যে বয়েস, শুধু ইজের-পরা খালি গা, মাথার চুল ধুলোময়লায় জটলা পাকানো। এসেই ওরা আমাদের বাড়ির সিঁড়িতে বসে পড়ে চেঁচিয়ে বলে মা দুটি ভিক্ষা দেবে—শেষকথা সুর করে দে-বে-এ-এ-এ বলে টেনে চলে। রিনরিনে মিষ্টি গলা ওদের, তিনজন যখন একসঙ্গে চেঁচায়—মনে হয় যেন একসঙ্গে রিহার্সাল দিয়ে ওরা একটা গান গাইছে। বেশিরভাগ দিনই বাড়ির লোক ওদের দিকে নজর দেয়না, ওরা সিঁড়িতে বসেই থাকে, হাতে খুচরো পয়সা নিয়ে লোফালুফি করে, নিজেদের মধ্যে খুনসুটিতে মেতে থাকে, ভিক্ষে নেবার খুব একটা গরজ নেই যেন। একদিন দেখি, ওরা সিঁড়ির নিচের চাতালে নয়াপয়সা দিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলছে। আমি তাড়া দিয়ে বললুম এই পাগলি। কী হচ্ছে এখানে! যা, পালা! ওরা খিলখিল করে হাসতে-হাসতে ছুটে পালিয়ে যাবার সময় একজন আমার উদ্দেশ্যে বলে গেল, আমি পাগলি না, তুমি পাগলা? যে বলল কী সুন্দর, সেই মেয়েটার মুখের গড়ন অবিকল নার্গিসের মতন। আমিও হেসে ফেললাম। ঐ বাচ্চাগুলো খুব তো দুঃখে আছে বলে মনে হলনা। বেশ খেলায় মেতে আছে, ভিক্ষে করাটা যেন একটা খেলা, খিদের কষ্টও যেন খেলার অঙ্গ, যদি খেতে না-পেয়ে একদিন মরতে হয়—তবে ঐরকম এক্কা-দোক্কা খেলার মতোই মৃত্যু-মৃত্যু খেলা খেলতে-খেলতে মরে যাবে মনে হয়, কিন্তু ওরা মরবেনা। ক্ষুধার্ত মানুষেরা একদম মরতে চায়না, তারা বিষম বেশি বাঁচতে চায়। ওরা বেশি বাঁচতে চায় বলেই পৃথিবীতে ক্ষুধার্তের সংখ্যা এত বেশি! বাচতে চায় বলেই, খেতে না-পেলেও দুঃখ কম। অথচ, পরমেশ সামান্য মোটরগাড়ি কিনতে পারছে না বলেই বলেছিল, দূর দূর, জীবনটার ওপর ঘেন্না ধরে গেল! বাসের জানালার ধারে বসে আমি যাচ্ছিলাম একদিন, একজন বুড়ো ভিখিরি এসে হাত বাড়াল। শরীরের প্রত্যেকটা হাড় গোনা যায়, চোখদুটো কোটরে ঢুকে গেছে, হাতখানা যেন কঙ্কালের হাত। আমি তাকে দশটা নয়াপয়সা দিয়ে খুব মিষ্টিভাবে বললুম, আর বেঁচে থেকে কী হবে তোমার? এবার মরলেই তো হয়! সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখ জ্বলে উঠল, চেঁচিয়ে বলল, আমি মরব কেন, তুই মর না, মর, মর, আজই তোর কলেরা হোক...! এমনভাবে যে বাঁচতে চায় একে আমি কিছুতেই দুঃখী বলতে পারিনা।

অথচ আমার এক বন্ধুর মাসিমা, আমিও তাঁকে টুকুন-মাসিমা বলতুম, তিনি আত্মহত্যা করলেন। তার তো কোন অভাব ছিলনা। নিউ আলিপুরে বাড়ি, দুটি

অপ্সরা-গন্ধর্বের মতন ছেলেমেয়ে, দু'খানা গাড়ি, একবার বিলেত ঘুরে এসেছেন। ডাকসাইটে সুন্দরী তিনি, রেডিওতে অতুল প্রসাদের গান শোনান, পার্টিতে মজলিশে প্রথম আকর্ষণীয়া, আমাদের থিয়েটার রিহার্সালে কীরকম হৈ-হুল্লোড়-মজা করতেন, মিউজিক কণ্ডাক্ট করেছিলেন টুকুনমাসি। সেই টুকুনমাসি আচম্বিতে একদিন আত্মহত্যা করলেন। কোনকিছুরই অভাব ছিল না তাঁর, শুধু নাকি ভালোবাসার, তাঁর স্বামী প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ অফিসের স্টেনোর সঙ্গে...। কিন্তু তাতে কী ক্ষতি হয়েছিল সবরকমের সাচ্ছন্দ্য সুখভোগ, আরাম তো তার ছিলই, শুধু ভালোবাসা না-পাওয়াটা আর কী এমন? এখানে যদি সেই কথাটা আবার ওঠে কত লোক খেতে পাচ্ছে না, পরতে পাচ্ছে না—সেই তুলনায় ভালোবাসাটা, যা না-হওয়াটা আবার দুঃখ নাকি? ওটা স্রেফ ন্যাকামি! স্বামীর ভালোবাসা পাননি তো কী হয়েছে, আরো কত লোকের ভালোবাসা তো পড়ে আছে, অমন দুঃখ ক'জন পায় শুধুশুধু...। কিন্তু এ তুলনাটা আমি মানতে পারিনা। খেতে না-পাওয়ার চেয়েও ভালোবাসা না-পাওয়ার দুঃখ নিশ্চয়ই টুকুনমাসির কাছে কম তীব্র নয়, নইলে নিজের সারা শরীরে পেট্রোল ঢেলে অগ্নি জ্বালিয়ে অমন বীভৎসভাবে কেউ মরে?

সুখী মানুষদের বোধহয় দুঃখবোধ বেশি। সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের একটা অতিরিক্ত লাভ এই যে তখন বেশ দুঃখ নিয়ে নেশা করা যায়। বৃষ্টির মধ্যরাতে ফুটপাতে বসে-থাকা সেই বুড়ির আদৌ কোন দুঃখবোধ আছে কিনা আমার সন্দেহ হয়, কেননা সে বেঁচে থাকার কাজে ব্যস্ত। আর বেঁচে থাকা যাদের কাছে খুব সহজ, তাদেরই নানারকম দুঃখবোধ, এমনকী আশ্চর্য, তাদের মধ্যে কেউ-কেউ এই দুঃখ নিয়ে যেতেও চায়!

৫

আমি অত্যন্ত চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম একি অতুলদা? একি চেহারা হয়েছে আপনার?

অতুলদা বিমর্ষভাবে হাসলেন শুধু। আমি ফের প্রশ্ন করলুম আপনার কোন কঠিন অসুখবিসুখ হয়েছিল নাকি।

—নারে; আমার কিছু হয়নি। বল্লবীর অসুখটাই—

অতুলদার সমস্ত চুল পেকে গেছে রাতারাতি, চোখদুটো কোটরগত, মুখে একজন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত, পরাভূত মানুষের ছবি।

অবাক না-হয়ে উপায় নেই। মাসছয়েক আগেও অতুলদাকে দেখেছি, কী সুন্দর দীপ্ত ও তেজস্বী চেহারা। প্রায় ছ'ফুটের কাছাকাছি লম্বা, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন সাবলীল, চকচকে কালো ঢেউ খেলানো মাথার চুল। আগে মার্চেন্ট নেভিতে যখন কাজ করতেন, তাঁর ধপধপে সাদা পোশাক ও নীল বর্ডার দেওয়া টুপি পরিহিত মূর্তি এখনও চোখের সামনে ভাসে। বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের বেশি বয়েস নয় অতুলদার হঠাৎ এই কয়েকমাসে তাঁর এই বিস্ময়কর রূপান্তর —কল্পনাই করা যায়না।

অতুলদা ছিলেন আমাদের ছেলেবেলার হীরো। খেলাধুলো, পড়াশুনো—সবদিকেই চৌকোশ, হো-হো করে হাসতেন, রেডিওতে যে-কোন গান শুনলেই গলা মিলিয়ে গাইবার চেষ্টা করতেন, সবসময় প্রাণবন্ত। সমস্ত ছেলেমেয়ের সঙ্গেই ছিল তাঁর আন্তরিক ব্যবহার—তবু কোন ফাঁকে তিনি শান্তাদির সঙ্গে প্রেম করে ফেললেন—আমরা বুঝতেই পারিনি, শান্তাদির সঙ্গে যখন ওঁর বিয়ে হল—সবাই একবাক্যে বলেছিল, এমন আদর্শ দম্পতি সচরাচর দেখা যায়না। মেরিন এঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে অতুলদা একটা ইটালিয়ান জাহাজ কম্পানিতে চাকরি নিয়েছিলেন, বছরে তিন-চারমাস মাঝসমুদ্রে কিংবা দূর-দূরদেশের বন্দরে কাটিয়ে আসতেন। ফিরে আসার পর অতুলদার শরীরে আমরা কল্পনায় বিদেশের সৌরভ পেতাম।

শুধু রোমান্টিক দিকটাই নয়। অতুলদার ন্যায়-অন্যায় ও আদর্শবোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র। যেটাকে তিনি অন্যায় কিংবা যুক্তিহীন মনে করতেন, সেটা তিনি অন্য কারুর কথায় কিংবা অনুরোধেও মেনে নিতেন না। আদর্শজ্ঞান তো অনেকেরই থাকে—কিন্তু জীবনে ক'জন আর তা মেনে চলতে পারে? অনেকসময়ই গুরুজন, আত্মীয়স্বজনের যুক্তিহীন অনুরোধে অনেককিছুই ঢোক গিলে সহ্য করে যেতে হয়। অতুলদাকে ঐজন্য আমরা আরও বেশি শ্রদ্ধা করতাম।

অতুলদা প্রথম চমকপ্রদ কাজ করেছিলেন তাঁর বাবার মৃত্যুর পর। ওঁর বাবার যখন হঠাৎ স্ট্রোক হল, অতুলদা পাগলের মতন ছোটাছুটি করেছিলেন, কলকাতার সবচেয়ে বড় স্পেশালিস্টকে জোর করে ধরে এনেছিলেন মাঝরাত্রে, শেষরাত্রে ধর্মতলা থেকে ওষুধ এনেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বাবা মারা গেলেন। মৃত্যুর পর, অতুলদা আড়ালে কেঁদেছিলেন কি না আমরা দেখিনি, কিন্তু অতুলদা অশৌচ পালনে অস্বীকার করলেন, মাথা ন্যাড়া হলেননা, এমনকী শ্রাদ্ধ করতেও রাজি হলেননা। তাঁর আত্মীয়স্বজন, শ্বশুর-শাশুড়ি এসে অনুনয়-বিনয়, ভর্ৎসনা, তিরস্কার কতকিছু করলেন কিন্তু অতুলদা অটল। তিনি বলেছিলেন, আমার বাবাকে আমি বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করেছি, তা যখন পারিনি—তখন এসব অবান্তর জিনিশ

নিয়ে আমি সময় নষ্ট করতে চাইনা। আমি এসব বিশ্বাস করিনা, আমি পরলোক মানিনা, শুধু-শুধু কতকগুলো সামাজিক সংস্কার আর ভড়ং-এর জন্য আমি টাকা খরচ করতেও রাজি নই, কষ্ট সহ্য করতেও রাজি নই। আমার মা যদি বেঁচে থাকতেন, তাঁকে খুশি করার জন্য না হয় আমি এসব করতাম কিন্তু তিনিও বেঁচে নেই—শুধু-শুধু কতকগুলো বামুনকে আমি ডেকে এনে খাওয়াবই-বা কেন, আর ন্যাড়ামাথায় অফিসে যাবই-বা কেন?

পরলোকে অনেকেই বিশ্বাস করেনা, অনেকেই আজকাল ঠাকুর-দেবতা মানেনা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বিদ্রোহ সত্ত্বেও এখনো প্রায় সব হিন্দু পরিবারেই এসব উপরোধের ঢেঁকি গিলতে হয়। ক'জন দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারে? অতুলদা পেরেছিলেন। পণ নিয়ে বিয়ে হচ্ছে শুনলে তিনি সে বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে যেতেননা পর্যন্ত।

জাহাজে চাকরি ছেড়ে অতুলদা এক্সপোর্টের একটা এজেন্সি খুলেছিলেন—অল্পদিনেই তাতে বেশ সমৃদ্ধি ঘটল। ইদানীং কাজে খুব ব্যস্ত থাকতেন—কিন্তু মাঝে-মাঝে যখনই দেখা হয়েছে, অতুলদা সেইরকম হাসিখুশি উচ্ছল মানুষ, নিছক কেজো ব্যবসায়ী হননি। জরুরি কাজ ফেলেও আড্ডায় মশগুল হয়ে যেতে দেখেছি। ছ'মাস আগেও দেখেছি তাঁর ঈর্ষণীয় সুন্দর স্বাস্থ্য। হঠাৎ এর মধ্যে এই বদল?

জিজ্ঞেস করলাম, বল্লরী কেমন আছে এখন? ওর কী যেন অসুখ হয়েছে শুনেছিলাম, দেখতে যেতে পারিনি—

অতুলদা ক্লান্তভাবে বললেন যাস একদিন, তাড়াতাড়ির মধ্যে। ও আর বেশিদিন বাঁচবেনা।

—বাঁচবেনা? কী হয়েছে?

বল্লরী অতুলদার একমাত্র মেয়ে। এখন পনেরো-ষোলো বছর বয়স। অমন ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে আমি আর কোথাও দেখিনি! নিখুঁত সৌন্দর্য একেই বলা যায়। শুধু ফর্শা নয়, তার শরীরে একটা গোলাপি আভা, একরাশ কালো চুল প্রায় কোমর পর্যন্ত, চঞ্চল সরল দুই চোখ, যে-কোন সময় ওর ঠোঁট দেখলেই মনে হয়—যেন এইমাত্র হাসি শেষ করল। বল্লরীর শুধু একটা খুঁত ছিল, তার অতিরিক্ত ঘাম হত। শীতকালেও কুলকুল করে ঘামতে দেখেছি তাকে। সেটার আমরা কোন গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু শুনলাম, বল্লরীর সাংঘাতিক অসুখ এখন।

এখন বল্লরীর অসম্ভব ঘাম হয়, সবসময় টপটপ করে ঘাম ঝরে পড়ে, এই বয়েসেই তার ব্লাডপ্রেসার দারুণ এরাটিক। কখনো আশি, কখনো আড়াইশো। তাছাড়া আজকাল আবার সারাদিন তিন-চারবার তার হাত-পা কাঁপতে থাকে মৃগী

রোগীর মতন, একটু বাদেই অজ্ঞান হয়ে যায়। আরো সাংঘাতিক, মাসচারেক আগে থেকে বল্লরীর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেছে, এখন সে একেবারে বোবা, একটি শব্দও বার করতে পারেনা। অমন সুন্দর মেয়েটির এই নিদারুণ রোগের কথা শুনে আমি শিউরে উঠলাম, অতুলদা ধীরস্বরে সব বলে যেতে লাগলেন।

বল্লরীর এই অদ্ভুত অসুখ বছরখানেক আগে থেকেই ধরা পড়েছিল। এদেশের কোন ডাক্তার এর চিকিৎসা খুঁজে পাননি। সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত স্পেশালিস্ট আছে সবার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন অতুলদা। কেউ আশা দিতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত কার কাছে শুনলেন, রাশিয়াতে এই রোগের চিকিৎসা হয়। সর্বস্ব বিক্রি করেও অতুলদা রাশিয়ায় গিয়ে বল্লরীর চিকিৎসা করাতে রাজি ছিলেন, ভারত সরকারের অনুমতিও পেয়েছিলেন, কিন্তু রুশ ডাক্তারদের চিঠিপত্র লিখে রোগের বিবরণ জানাবার পর তাঁরা জানিয়েছেন এ রোগের কথা তাঁরা জানেন বটে, এ নিয়ে গবেষণা হচ্ছে—কিন্তু এর কোন ওষুধ তাঁদেরও জানা নেই। তাঁরা বল্লরীকে বাঁচাতে পারবেননা—ষোলো থেকে আঠারো মাসের মধ্যে সে মারা যাবে। তাঁরাই আগে বলেছিলেন, বল্লরীর কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে যাবে, অজ্ঞান হওয়া আরো বাড়বে—ক্রমশ এক-একটা প্রত্যঙ্গ অক্ষম হয়ে যাবে—রুশ ডাক্তারেরা যা উপসর্গ বলেছেন, তা একটার পর একটা ঠিক মিলে যাচ্ছে। বল্লরী বাঁচবেনা।

কিন্তু অতুলদা শুধু এতেই ভেঙে পড়েননি। তাঁর পরাজয় অন্য জায়গায়। অপমানিত, লাঞ্ছিত মানুষের মতন শুকনো হেসে অতুলদা বললেন, এই দ্যাখ! জামার হাতা গুটিয়ে তিনি দেখালেন, তাঁর বাহুতে বাঁধা নানান সাইজের একগাদা কবচ আর তাবিজ। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলামনা।

বল্লরীর নিয়তি অতুলদা শান্তভাবেই মেনে নিয়েছিলেন। তার শেষ দিন ক'টি যতদূর সম্ভব আনন্দ ও শান্তিতে কাটাতে পারে—তিনি সেই চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় অতুলদার শ্বশুর কোথা থেকে এক সন্ন্যাসীকে ধরে আনলেন। সন্ন্যাসী নাকি যাগযজ্ঞ করে বল্লরীকে সারিয়ে তুলতে পারবে। অতুলদা তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছিলেন। তিনি ওসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করেননা। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তাররা যে-রুগীকে জবাব দিয়েছে সে সেরে উঠবে ধুলোর ধোঁয়ায়। অনেক অনুনয়-বিনয় কাকুতি-মিনতির পর অতুলদা শুধু এইটুকু রাজি হয়েছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের ইচ্ছেমতন যাগযজ্ঞ যা খুশি করতে পারেন, কিন্তু বল্লরীকে কোন কষ্ট দেওয়া চলবেনা আর অতুলদা নিজে সেই সময়ে বাড়ি থাকবেননা।

কিন্তু জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর শর্ত অন্যরকম। তাঁর যজ্ঞে মেয়ের বাবাকেই প্রধান অংশ নিতে হবে, হোম করতে হবে, হাতে তাবিজ ধারণ করতে হবে এবং একদিন তারকেশ্বরে গিয়ে হত্যে দিয়ে থাকতে হবে। এসব শুনে অতুলদা রাগে

জ্বলে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, যারা ওসবে বিশ্বাস করে—তাদের এসবে ফল ফলতেও পারে—কিন্তু আমি ওসব মানিনা; মানিনা। আমি কিছুতেই পারবনা। অতুলদার মামাশ্বশুর, সন্ন্যাসীকে জোগাড় করার কৃতিত্ব যার—তিনি বললেন, কিন্তু বাবা, যদি মেয়েটা এতে কোনক্রমে বেঁচেই যায়, তাহলে তোমার নিজের একটু কষ্ট হলেও—

সেই সময় অতুলদার চোখ পড়েছিল দরজার দিকে। বল্লরী এসে দাঁড়িয়েছে। নীরবে ডাগর চোখদুটি মেলে আছে। কথা বলতে পারেনা বল্লরী—কিন্তু এখনো সব শুনতে পারে, বুঝতে পারে। শান্তাদি বিছানার ওপর পড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। শান্তাদির আর কোনরকম মনের জোর নেই, এখন তিনি যে-কোন ভরসার খড়-কুটো পেলেও আঁকড়ে ধরতে চান। হঠাৎ অতুলদার মনে হয়েছিল—এখন এই সন্ন্যাসীর বুজরুকিতে যদি তিনি রাজি না হন—তাহলে শান্তাদি হয়তো সারা জীবন এই দুঃখ পুষে রাখবেন যে—অতুলদা যদি যাগযজ্ঞ করতেন—তাহলে, বাঁচতে পারত। এমনকী বল্লরীও হয়তো মৃত্যুর আগে শেষ দীর্ঘশ্বাস ফেলার সময় ভেবে যাবে—তার বাবা তাকে বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করেনি। সবাই ভাববে মেয়ের জীবনের চেয়েও অতুলের নিজের গোঁয়ার্তুমিটাই বড়! শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন অতুলদা, আজীবন নাস্তিক হয়েও দুদিন ধরে যজ্ঞ করেছেন, হাতে পরেছেন তাবিজ এমনকী তারকেশ্বরেও গিয়েছিলেন।

কিছুই সুফল হয়নি, রুশ ডাক্তারদের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী বল্লরীর অবস্থা ক্রমশ খারাপ দিকে যাচ্ছে। বল্লরী বাঁচবেনা, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের আদর্শেরও মৃত্যু হওয়ায় অতুলদা ভেঙে পড়েছেন। তিনি এখন অন্তরে দগ্ধ; পরাজিত মানুষ, হ্যাজাক বাতির ম্যান্টলের মতন, আকৃতি বজায় রাখলেও আসলে পোড়া ছাই।

৬

তখনও ভালো করে ভোর হয়নি, আমার ঘুম ভেঙে গেল। কাল রাত্রে শুয়ে-শুয়ে বুকের ওপর একটা বই নিয়ে পড়তে-পড়তেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বইটা ঘুমের ঘোরে খসে পড়ে খাটের নিচে। আজ সকালে আমার বুকের ওপর সেই বইয়ের সাইজেরই খানিকটা রোদ্দুর!

আমার ঘুম ভাঙা দুরকম। এক-একদিন ঘুম ভেঙেও যেন ভাঙতেই চায়না! আলস্যে চোখ টেনে থাকে, সারা শরীরে ঘুমের মাদকতা লেগে থাকে, কেউ ওঠার জন্য তাড়া দিলেও এপাশ থেকে ওপাশ ফিরে শুই, পাশে চা ঠাণ্ডা হয়ে যায়

—এক চুমুক দিয়েও আবার তন্দ্রাকে প্রশ্রয় দিই। মাঝে-মাঝে এক-একদিন, ঘুম ভাঙলেই অর্থাৎ সকালবেলা প্রথম চোখ মেলে তাকাবার পরই মনে হয় সম্পূর্ণ জেগে গেছি, আর একমুহূর্তও বিছানায় থাকার ইচ্ছে হয়না, স্থির হয়ে যায় যে জাগরণ সেদিনের মতন চূড়ান্ত। কেউ ডাকেনা, তবু ধড়মড় করে উঠে বসি।

আজ এইরকম দ্বিতীয়ভাবে আমার ঘুম ভাঙল। ভালো করে ভোর হয়নি, ঈষৎ শীতের উপভোগ্য হাওয়া, ডাকবাংলোয় নিশ্চিন্ত ছুটির সপ্তাহান্ত, চাদরটা আবার গায়ে টেনে নিয়ে আজ আট-ন'টা পর্যন্ত ঘুমোলেও কেউ বাধা দেবার ছিলনা। তবু যেন আমার বিশেষ কোন কাজ আছে, যেন অ্যালার্ম ঘড়ি আমাকে জাগিয়ে তুলেছে, এইভাবে অতিদ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে চটিতে পা গলালাম।

অথচ, আমার কোন কাজই নেই। আমার সঙ্গী-সঙ্গীনীরা—তিনজন পুরুষ ও দুই নারী,—এপাশে-ওপাশের ঘরে প্রগাঢ় ঘুমে মগ্ন। জায়গাটার নাম হেসাড়ি—চক্রধরপুর ছাড়িয়ে টিলা ও জঙ্গলের মধ্যে একটা ছিমছাম ডাকবাংলো, কাল বিকেলেই এখানে এসে পৌঁছেচি, আজ হাতে কোন কাজ তো দূরে থাক দিন কাটাবার কোন পরিকল্পনাও নেই। তবু আমাকে এত ভোরে জেগে উঠতেই হল।

ঘুমন্ত সঙ্গী-সঙ্গিনীদের ডাকলামনা, মাঝখানের দরজা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে তাদের ঘুমন্ত, ব্যক্তিত্বহীন ও সরল নিভাঁজ সুন্দর মুখগুলি দেখলাম। কারুর গায়ের ভ্রষ্ট চাদর সরিয়ে ঠিকঠাক করে ঢেকে দিলাম, কারুর ঝুলন্ত হাত তুলে দিলাম খাটে, কোন রমণীর শাড়ির প্রান্ত প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি উঠে যাওয়ায়—নামিয়ে দিলাম পায়ের কাছে। কেউ জাগলনা। বেশির ভাগ দিন আমিই দেরি করে উঠি, তাই বহুদিন সকালের আলোয় এতগুলি ঘুমন্ত মুখ আমার দেখা হয়নি।

ডাকবাংলার চৌকিদার কি উঠেছে? টুথব্রাস ও পেস্ট হাতে নিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম চৌকিদারের ঘরে দিকে। একটু চা কিংবা কফি পেলে খুব ভালো লাগত। সেটা শুধু চা বা কফির জন্য নয়। দিনের প্রথম সিগারেটটা আমি কোন গরম পানীয়ে ঠোঁট ভেজাবার আগে কিছুতেই টানতে পারিনা। অনেককে ঘুম থেকে উঠেই সিগারেট ধরাতে দেখেছি, আমি পারিনা, আমার কাশি হয়। অভ্যেসগুলো পরপর বাঁধা। টুথপেস্টের স্বাদ আমার এত বিশ্রী লাগে যে দাঁত মাজার পরই ভোঁতা মুখে চা কিংবা সিগারেট না-টেনে আমি থাকতে পারিনা। এ ব্যাপারে আমি এতই খুঁতখুঁতে যে চায়ের কাপ চোখের সামনে না-দেখলে আমি দাঁত মাজতেই যাইনা কখনো। সুতরাং পেস্ট ও টুথব্রাস হাতে নিয়ে আমি চৌকিদারের ঘরের দিকে এগোলাম।

অরণ্যের মাঝখানে এমন উন্মুক্ত পরিবেশে বাংলো, তবু চৌকিদারের ঘরখানি এমন করে বানানো হয়েছে যে দিনেরবেলায়ও সেটাতে আলো ঢোকেনা।

সপরিবারে চৌকিদার বারান্দায় খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে। ওরা কেউ জাগেনি। একটি খাটিয়ায় চৌকিদার—ঘুমের মধ্যে তার হাত-পা এমনভাবে ছড়ানো যেন মনে হয় গত রাত্রে কেউ তাকে বেদম প্রহার দিয়ে অজ্ঞান অবস্থায় খাটিয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। অথচ জানি, সেরকম কিছুই ঘটেনি, কাল রাত সাড়ে এগারোটায় আমাদের কাজ শেষ করে চৌকিদার সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে শুতে গেছে। তবে, তার ঈষৎ ব্যাদিত মুখের কাছে একটা নীল ডুমো মাছি ভনন্-ভনন্ শব্দে উড়ছে দেখে সন্দেহ হয়, শোবার আগে চৌকিদার নিভৃতে কিছু মহুয়ার আরক পান করেছে, সেই মিষ্টি গন্ধই মাছির আকর্ষণ। পাশের খাটিয়ায় চৌকিদারের ঈষৎ স্থূলাঙ্গী যুবতী পত্নী দুটি শিশুকে নিয়ে শয়ান। ঐটুকু খাটিয়ায় সারারাত ওরা তিনজন কী কৌশলে যে শুয়ে আছে—সেটা সত্যিই বিস্ময়কর। রাতে একটি বাচ্চাও কী টিপ করে পড়ে যায়নি? চৌকিদার পত্নীও খানিকটা হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। এইসব অশিক্ষিত নিচু জাতীয় লোকরা সবাই ঘুমের মধ্যে মুখ খুলে থাকে—এটা আমি লক্ষ করে দেখেছি। সভ্য লোকেরা মুখ বুজে ঘুমোতে শিখে নিয়েছে। হয়তো দিনেরবেলা সারাক্ষণই তাদের মুখসর্বস্ব জীবন কাটাতে হয় বলেই, ঘুমের মধ্যে অন্তত।

সবাই ঘুমন্ত, শুধু আমি একা জেগে আছি, আশেপাশে কোথাও জাগ্রত মানুষের সাড়া নেই। অরণ্য ভেদ করে জেগে উঠেছে ডিমের কুসুম-রঙা সূর্য, এই লাল রং কী করে এবং কেন বেলা বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যায়—আমি জানিনা, না-গেলেই ভালো হত। একরাশ পাখির কোলাহল শোনা যাচ্ছে—কিন্তু এ তল্লাটে আমি এখন একমাত্র জাগ্রত মানুষ। ঘুমন্ত চৌকিদার দম্পতিকে ডাকতে হঠাৎ আমার কী জন্য যেন মায়া উপজিল। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলাম রান্নাঘরে। খুব প্রয়োজনে সামান্য চা কিংবা কফি আমি নিজেই বানিয়ে নিতে পারি, যদি সব ঠিকঠাক থাকে। কিন্তু এ যে কাঠের উনুন। কাঠ সাজিয়ে উনুন ধরানো আমার অসাধ্য। তাহলে থাক চা-কফি। তাহলে এখন দাঁত মাজা মুখ ধোওয়াও মুলতুবি থাক, সিগারেট খাওয়া বন্ধ।

ঠিক যে বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়েই তখন আমি একা-একা অরণ্যের মধ্যে অনেকখানি চলে এসেছিলাম, তা মনে হয়না। এত ভোরের আলোয় জঙ্গলে বেড়াবার মতন ভাবুক প্রকৃতির মানুষ আমি নই। নিশ্চয়ই আমার প্রবৃত্তিবেগ জঙ্গলের মধ্যে আমাকে টেনে এনেছিল এই গোপন ইচ্ছায়—হয়তো কিছুটা জঙ্গল পেরুলেই কোন পাহাড়ি গ্রাম চোখে পড়বে, হয়তো সেখানকার দোকানে আমি পায়জামা ও চাদর জড়ানো মূর্তিতে গ্রাম্য মানুষদের সঙ্গে সোদা গন্ধযুক্ত ভাঁড়ের চায়ে চুমুক দিতে-দিতে একপ্রকার আনন্দ পাব। হয়তো কোন ওরাও বৃদ্ধের কাছ

থেকে বিড়ি চেয়ে আমি ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার আত্মপ্রসাদ লাভ করব। নিশ্চিত এইরকমই অভিপ্রায় ছিল আমার। কেননা, মিনিট পনেরো সেই অরণ্যের পায়ে-চলা পথ দিয়ে হাঁটার সময়েও আমি কী কী নিয়ে যেন অন্যমনস্ক ছিলাম, অরণ্যের রূপ ও সৌন্দর্যের দিকে আমার চোখ পড়েনি। তাছাড়া আমি উদ্দেশ্যহীনভাবে এলোমেলো হাঁটিনি, একটা পথের নিশানা ঠিক রেখেছিলাম। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হলে, একটা গাছ বেয়ে সরসর করে নেমে আসছে একটা হলুদ সাপ।

সাপটা বেশ বড়, অন্তত চারহাত লম্বা, সেই তুলনায় বেশ স্বাস্থ্যবান। সাপদের সমাজে হয়তো ওকে মোটা-মোটা বলে রাগায়। সাপটার গতি খুব অলস-সেটা সদ্য ঘুম ভাঙার জন্য নয়, সাপেরা রাত্রে ঘুমোয়না আমি জানি—সামনেই শীত—তখন ও বহুদিনের জন্য ঘুমোতে যাবে—সেই আলস্য। সাপটাকে দেখে আমি খুব যে বেশি ভয় পেয়েছিলাম, তা বলা যায়না। বরং সাপ সম্পর্কে আমার যে অস্বাভাবিক আতঙ্ক, তার তুলনায় তখন আমি অনেকটাই হাল্কা ও উদাসীনবোধ করেছিলাম। জানি, সাপ দেখে দৌড়ে পালাবার চেষ্টা হাস্যকর, আমার হাতে কোনপ্রকার অস্ত্র ছিলনা। তবু রহস্যময়ভাবে আমার মনের মধ্যে স্পষ্ট বোধ হতে লাগল, আজ সকালবেলা আমার কোন বিপদ হবেনা।

সাপটা আমাকে দেখতে পেয়েছিল। দুজনের দূরত্ব প্রায় দশহাত। গাছ থেকে সরসর শব্দ করে নেমে এসে, তখন আমি সদ্য শুকনো পাতায় শব্দ করে থমকে দাঁড়িয়েছি, সাপটা আমার দিকে তাকাল। তাকাল তো তাকিয়েই রইল অনেকক্ষণ। আমিও চেয়ে আছি। হঠাৎ আমার মনে হল, সাপটা যেন আমাকে কিছু বলতে চাইল। মহাভারত-বাইবেল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত সাপদের সম্পর্কে যে হাজার-হাজার উপকথা পড়েছি, হয়তো তার প্রভাবেই সাপের এই কথা বলার প্রবৃত্তির কথা আমার মনে হয়। কিন্তু কোন অলৌকিক ব্যাপার ঘটলনা, সাপ সেই ভোরবেলার নির্জন অরণ্যে মানুষের ভাষায় কথা বলে উঠলনা, শুধু চেয়েই রইল। কিন্তু আমি তো সাপদের ভাষা জানিনা—ওদের আদৌ কোন ভাষা আছে কি না তাই জানিনা। অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার পর সাপটা একবার ফোঁস করল। সেটাকে দীর্ঘশ্বাসও মনে করা যেতে পারে।

এবার সাপটা নড়ে উঠে বাঁদিকে বেঁকল, একটা পাতাহীন সাদা ফুলগাছের মধ্য দিয়ে গলে গিয়ে বেশ কিছুটা পরিষ্কার জায়গা দিয়ে সোজা এগিয়ে যেতে লাগল, আমার দিকে আর চেয়েও দেখল না। সাপটার গতিপথ আমি চোখ দিয়ে অনুসরণ করছি, এবং সে একটু দূরে যাওয়ার পরই আমি একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে সশস্ত্র হইনি। কিন্তু সাপটা ক্রমশই দূরে যেতে লাগল, আমি তাকে ভালো করে দেখবার জন্য একটু এগিয়ে গেলাম ওর দিকে। এই প্রথম আমি লক্ষ করলুম,

ভোরবেলাকার অরুণবর্ণ রোদে সেই অপসৃয়মাণ হলুদ প্রাণীটিকে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। মাঝে-মাঝে খসে-পড়া পাতার রাশির মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে ও আবার বেরিয়ে আসছে তকতকে জমিতে, ও যাতে আমার চোখ থেকে হারিয়ে না-যায় —আমি বেশ উদগ্রীব হয়ে উঠেছিলাম। পাথরগুলো এবার একটু ঢালু হয়ে এসেছে, খানিক পরেই একটা মরা ঝর্না কিংবা ছোট নদীর খাত, লাল টুকটুকে পর্টুলেকা ফুল ফুটে আছে অনেক, কী এক অনির্দিষ্ট কারণে একঝাঁক ফড়িং ওড়াউড়ি করছে সেখানে—ও জায়গাটা ছেড়ে ফড়িংগুলো নড়ছেনা। সাপটা সেই ঝর্নার খাতে নেমে আমার চোখের আড়ালে চলে গেল।

হয়তো আশেপাশে আরো সাপ আছে কিনা এই দেখার জন্যই আমি এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলাম। তখন সেই অরণ্যের বিশাল সৌন্দর্য আমাকে চেপে ধরল। আমি প্রকৃতিপ্রেমিক নই, পৃথিবীতে কেইবা আর—আমি অন্যমনস্কভাবেই জঙ্গল দিয়ে হাঁটছিলাম—কিন্তু সেই হিংস্র সাপের আকস্মিক উপস্থিতি যেন আমার নাকে একটা ঘুঁষি মেরে বলল, এবার দ্যাখ!

চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখে আমার মনে হল, ভোরের অস্পষ্ট আলোয় সেই অরণ্যযেন এক রহস্যময় সৌন্দর্যের খনি। প্রথমেই আমার চোখে পড়ল, একটা ভেলভেটের মতন কালো রঙের রোমশ মাকড়শা। এই জীবটিকে আমি বরাবর ঘৃণা করি। কিন্তু এই পাহাড়ি মাকড়শা—এর চেহারা একেবারে অন্যরকম—একে বলতেই হয় তুমি সুন্দরী। বিশেষত সাদারঙের যে একঝাঁক পরগাছা ফুলের পাশে ও বসে আছে, তাতে ওকে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। গাছগুলোর মাথার দিকে রোদ্দুর, নিচে এলোমেলো ঝাপসা রং ফাঁক দিয়ে, ফাঁক দিয়ে এসে পড়েছে লাল-লাল শিখা, একটা ভাঙা পাথরের টুকরো জ্বলছে হীরের মতন, একদল বুনো পাখি কুচিটাং-কুচিটাং বলে চেঁচিয়ে উঠতেই দূরের গাছ থেকে একটা অদেখা-পাখি সাড়া দিল টুটি-টু-টি-টুঁ। অরণ্যে এসে কেউ প্রতিটি গাছকে দেখেনা—কিন্তু তাঁদের গম্ভীর অস্তিত্ব দেখে মনে হয়—তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিত্ব পৃথক—অমন কঠিন শালগাছ —কিন্তু তাদের সদ্যফোটা বল্লরী দেখলে মনে হয়—পৃথিবীতে এরই নাম পবিত্রতা। গাছ থেকে ঘুরতে-ঘুরতে পড়ল একটা সবুজ রঙের পালক—ওপরে তাকিয়ে দেখি একটা হৃষ্টপুষ্ট টিয়াপাখি ব্যগ্রভাবে আমাকে দেখছে। গলায় বহুরঙা একটা গিরগিটি তার থেকে মাত্র আধহাত দূরে—কিন্তু পরস্পর শিকার-শিকারী নয়।

আরো কিছুক্ষণ সেই জঙ্গলে আমি ছিলাম। বস্তুত সেই নিভৃত সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত বা মুগ্ধ করেনি, আমার মনকে শান্ত প্রসন্ন করেনি। সেই সৌন্দর্যের মধ্যে একটা নিঃসঙ্গতা আছে। একটু দূর হেঁটে, বাঁধানো পথের পাশে একটা কালভার্টে বসে দুহাতের মধ্যে মুখ গুঁজে আমার মনে হল, বহুদিন আমি

এত নিঃসঙ্গ থাকিনি। জল যেমন জলকে চায়—মানুষও মানুষ চায়। বাইরে বেড়াতে এলেও আমরা বন্ধুবান্ধব বা প্রিয়জনের মধ্যেই তো থাকি। একা এলেও প্রবাসে কারুর সঙ্গে পরিচয় করার জন্য ব্যগ্রতার শেষ থাকেনা। নিরালা ঘরেও শুধু মানুষের কথাই ভাবি। একা-একা কোন বিখ্যাত সৌন্দর্য দেখলেও মন ভারী হয়ে আসে। মানুষ বাঁচেনা—আমি বাঁচতে পারিনা। এই যে এই অরণ্যের মধ্যে আমি কিছুক্ষণ মগ্ন হয়ে ছিলাম, ঘাসফুলের অপূর্ব বর্ণলীলা আর প্রতিটি গাছের পাতায় বিভিন্ন সবুজ আভা দেখে আমি রূপের জগতে ঢুকে গিয়েছিলাম—তার ফলেই আমার মন খারাপ হয়ে গেল। আমার আজ, এই মুহূর্তে কোন অভাব নেই, মন খারাপের কোন কারণই নেই, কিন্তু ঐ নিভৃত সৌন্দর্য মনকে ভার করে দেবেই। জঙ্গলে এসে কখনো আমি রূপ খুঁজিনা, কিন্তু আজ এই ঘুমন্ত পৃথিবীতে আমাকে একা পেয়ে অরণ্য যেন নির্লজ্জার মতন তার ফ্যাশান প্যারেড দেখিয়ে নিল।

অদূরে কলশব্দ শুনে চমকে তাকালাম। কয়েকটি পাহাড়ি নারী-পুরুষ মাথায় বোঝা চাপিয়ে কোথায় যেন চলেছে। জীবন্ত মানুষের সাড়া পেয়ে হঠাৎ আমার খুবই ভালো লাগল। মনে হল, ওদের মধ্যে একটি পাহাড়ি যুবতীর গ্রীবায় যে লাবণ্য, তার তুলনায় একটু আগে দেখা শ্বেত ফুলের স্তবক কিছুইনা।

৭

ভদ্রতা-অভদ্রতার কতগুলো সূক্ষ্ম প্রশ্ন আছে, আমি সেগুলোর উত্তর কিছুতেই খুঁজে পাইনা। কারুর কাছে তো এসব জিজ্ঞেস করাও যায়না।

প্রথমে ঘটনাটা বলি।

আমরা দুই বেকার বন্ধু দুপুরবেলা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরছিলাম। দুপুরবেলা সারা পাড়া জুড়ে শুধু মেয়েদের রাজত্ব থাকে, মহিলারা এ ছাদ থেকে ও ছাদে গল্প করেন কিংবা পা ছড়িয়ে ডাঁটা চিবোন, অনেকে ব্লাউজ খুলে আদুল গায় থাকেন—কলকাতায় বেশিরভাগ পাড়াই দুপুরে প্রমিলা-রাজত্ব—এসময় আমার মতন পুরুষ মানুষের বাড়িতে বসে থাকা মানায়না, তাই কাজ না-থাকলেও রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি। সুবিমলও বেকার, সুতরাং দুজন সঙ্গী মাঝে-মাঝে কোন-কোন চাকরিঅলা বন্ধুর অফিসে যাই ঠিক টিফিনের একটু আগে। সেদিন সুবিমল আর আমি রণবীরের অফিসে যাব ঠিক করলুম।

রণবীর আমাদের দেখে খুশিই হয়েছিল। নিজের মামার ফার্মে রণবীর অফিসার হয়েছে, কাজকর্ম বিশেষ করতে হয়না, আমাদের পেয়ে আড্ডা দিতে

উৎসুক হয়ে উঠল। আড্ডার মাঝখানে শুধু চা আনতে পাঠাচ্ছিল রণবীর, সুবিমল আমার দিকে চোখ টিপলে আমি তখন বলেই ফেললাম, শুধু চা কী? রণবীর সঙ্গে কিছু খাবার আনতে দে!

রণবীর ব্যস্ত হয়ে বলল, তোদের খিদে পেয়েছে? ক্যান্টিনে ডিমের চপ হয়েছে বোধহয়, দাঁড়া—। রণবীর দুটাকার ডিমের চপ আনতে দিতে আমরা অনেক নিশ্চিন্ত হয়ে আবার আড্ডা শুরু করলুম।

অফিসের বেয়ারাদের একটা স্বভাব এই চা আনতে পাঠালে তারা সোজা চলে যায় দার্জিলিং-এ, ডিম আনতে পাঠালে একেবারে মাদ্রাজ। খাঁটি জিনিশ আনতে হবে তো! সুতরাং, আমাদের আড্ডা ম্যারাথন রেসের মতন চলতেই লাগল, খিদেয় আমার পেট ছিঁড়ে ফেলছে একেবারে। এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলেন, না, বেয়ারা নয়, পরেশবাবু, হাতে ফাইল। বুড়োমতন, নিরীহ এই লোকটিকে আমি আগেও রণবীরের অফিসে দেখেছি, লোকটি রণবীরের থেকে নিচু পোস্টে কাজ করেন। লোকটি একটু বেশি কথা বলেন এবং এক কথা দু-তিনবার না-বললে বোঝেননা। অন্যদিন লোকটি চলে যাবার পর রণবীর বলে, জ্বালাতন! এমন বকবক করে!

সেদিন পরেশবাবু ঢুকতেই রণবীর আমাদের বসতে বলে, তাড়াতাড়ি তাঁকে বিদায় করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। পরেশবাবু ফাইল খুলে বোঝাতে লাগলেন, শুনে মনে হল ব্যাপারটা খুব জরুরি, সেদিনই দিল্লিতে টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে —ইত্যাদি। রণবীর ফাইল দেখছে, এমন সময় বেয়ারা ঢুকল, হাতে কেটলি এবং একটা প্লেটে বেশ বড়বড়, বোধহয় রাজহাঁসের ডিমের চপ পাঁচটা। আমি আর সুবিমল কী নিয়ে যেন ফিসফাস করছিলাম, রণবীর বলল, নে, খা। আমরা দুজনে দুটো তুলে নিলাম, রণবীরও একটা তুলে কামড় বসিয়ে পরেশবাবুর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। এতবড় ডিম একটা খেলেই যথেষ্ট। সুবিমল তবু আর-একটা তুলে নিল। প্লেটে তখনো একটা পড়ে আছে—একটু বাদে রণবীর কথা থামিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে বলল, কি রে ওটা খাবিনা? রণবীরের চোখ একমুহূর্তে থমকে গেল, সেই চোখে আমি কী যেন একটা মারাত্মক বিপদের ইঙ্গিত দেখলাম, আমার আর চিন্তা করার সময় ছিলনা, আমি অতি দ্রুত বলে উঠলাম হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার খুব খিদে পেয়েছে, আমি ওটা খাব। আমি খপ করে তুলে নিলাম।

পরেশবাবু সেইসময় ফাইল বন্ধ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ঠিক আছে, আমার হয়ে গেছে স্যার, আপনাকে বিরক্ত করলুম।—আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম পরেশবাবুর গলাটা একটু-একটু কাঁপছে, যাবার সময় তিনি এক পলক আমার মুখের দিকে তাকিয়ে গেলেন।

পরেশবাবু নিশ্চয়ই সারাজীবন আমাকে একটা বিষম লোভী এবং অতি বদ লোক ভাববেন। অতবড় রাজহাঁসের ডিম দুটো আমি বকরাক্ষসের মতো গপ্‌গপ্ করে গিলছিলাম ওঁর সামনে বসে। কিন্তু, প্রশ্নটা এই, আমার কী করা উচিত ছিল সেদিন ? কোন্ ব্যবহারটাকে ঠিক ভদ্রতা বলা চলে ? সেই সামান্য ঘটনাটা নিয়ে আমি বছরের পর বছর ভাবি।

পরেশবাবুকে প্রথমেই অফার করা উচিত ছিল রণবীরের। সে তা করেনি, যে কোনো কারণেই হোক। হয়তো রণবীরটা এমনই প্রচণ্ড স্নব যে অধঃস্তন কর্মচারীকে খাবার অফার করতে তার মানে বাধে। তাহলে কী আমার বা সুবিমলের উচিত ছিল অফার করা ? সুবিমল পরেশবাবুর পাশে বসে ছিল, আমি ভেবেছিলাম সুবিমলই বলবে—কিন্তু সুবিমল বলেনি। ও হয়তো প্রতীক্ষায় ছিল, আমি বলব। আমি অনেক ভেবেচিন্তেই বলিনি, পাছে সুবিমল মনে করে ওর থেকে আমি বেশি ভদ্র সাজবার চেষ্টা করছি ! (এরকম মনে করার কারণ আছে, একটু পরে সে ঘটনা বলছি।) খাবার অফার করার একটা সময় আছে, সেই সময়টা পেরিয়ে গেলে আর বলা যায়না। ভাবতে-ভাবতে সেই সময়টুকু পেরিয়ে গেল, আমি রণবীর, সুবিমল তিনজনেই চপে কামড় বসিয়েছি—তারপর পরেশবাবুকে খেতে বলা যেন অভদ্রতা। রণবীর আরো মারাত্মক কাণ্ড করতে যাচ্ছিল, যখন একটা পড়ে আছে—তখন রণবীর যে প্রশ্ন করল—সেসময় রণবীরের চোখ দেখে আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি আমি না-খাই—তাহলে ও পরেশবাবুকে অফার করবে ! একজন মধ্যবয়স্ক প্রৌঢ়, বাড়িতে হয়তো তাঁর তিন-চারটি সন্তান আছে, আমার বয়সী কোন ছেলে থাকাও বিচিত্র নয়—শুধু একটা নিচু চাকরি করেন বলেই পড়ে-থাকা ডিমের চপ তাঁকে খেতে বলা হবে—এটা আমার কাছে একটা দারুণ অভদ্রতা মনে হয়েছিল। সেইজন্যই রণবীরকে বাঁচাবার জন্য সেটা আমি তুলে নিয়েছিলাম। অথচ, পরেশবাবু চলে যাবার পর, রণবীর আমাকে বলল, কী পেটুক হয়েছিস রে আজকাল ? অতবড় একটা ডিম ফট করে মুখে পুরে দিলি ? সুবিমল ফ্যাক-ফ্যাক করে হাসতে লাগল ! আমি অপ্রস্তুত হয়ে ব্যাপারটা ওদের বোঝাবার চেষ্টা করলুম, বললুম, তোরাই তো অসভ্যের মতন...। রণবীর বলল, ভ্যাট বাজে বকিস না। অসভ্য আমি না তুই ? লাস্ট চপটা পরেশবাবুকে দিলে উনি কী আবার মনে করতেন ? কিচ্ছু না।

তাহলে আমারই ভুল ? বুঝতে পারিনা। পরেশবাবু সত্যিই তাতে কিছু মনে করতেন না ? কোনদিন এর উত্তর পাবনা। আমি তো ভেবেছিলাম, পরেশবাবু আমাকে লোভী ভাবেন ভাবুন কোন ক্ষতি নেই—আমার সঙ্গে তো আর দেখা হচ্ছেনা। নিজের অফিসের রণবীরকে যাতে অভদ্র বা রূঢ় না-ভাবেন সেজন্যই আমি...।

ভদ্রতা-অভদ্রতার প্রশ্নে আমি দিশাহারা হয়ে যাই! অন্যের সামনে বেশি ভদ্রতা দেখানোও একধরনের অভদ্রতা কিনা বুঝতে পারিনা। এবার আগের ঘটনাটা বলি।

সুবিমল আর আমি একদিন বাসে করে ফিরছিলাম রাত্তিরবেলা। খুব বেশি ভিড় ছিল না, বসার জায়গা পেয়েছিলাম। লেডিস সীটের কাছাকাছি কী যেন একটা বচসা হচ্ছিল— আমরা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালাম। বাসের ঝগড়ায় সাধারণত কান দিইনা, কিন্তু লেডিস সীটের কাছে যখন, হয়তো কোন রসের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে—এই হিশেবে উৎসুক হয়েছিলাম। কিন্তু তাকিয়ে দেখি ব্যাপারটা বড়ই নীরস। একজন প্রৌঢ়া মহিলা ভাড়া দিতে পারছেন না, কণ্ডাকটর তাঁকে নামিয়ে দিতে চায়।

মহিলাটির চুল কদমছাঁটা, পরনের শাড়িটা মূল্যবান কিন্তু বেশ ময়লা, কথা শুনে মনে হল মহিলাটির একটু মাথার গোলমাল আছে। কাচুমাচু মুখে মহিলাটি বলছেন, কাল পয়সা দেব বাবা, আজ নেই বাবা, আমার মেয়ের বাড়িতে গেলেই টাকা পাব—তখন তোমার ডবল পয়সা দেব— । কণ্ডাকটার চেঁচিয়ে বলছে, নামুন, নেমে যান, রোজ-রোজ, নামুন।

—নামব কেন? মেয়ের বাড়িতে যাব, মেয়ে আমার কত যত্ন করবে—

—হাঁ, মেয়ে আপনাকে সিংহাসনে বসাবে! হেঁটে যান, আরো লেডিজ দাড়িয়ে রয়েছে, আর উনি জায়গা জুড়ে...রোজ-রোজ ভাল্লাগেনা...নামুন—

—ইস পয়সা দিইনি বলে বসবনা কেন? ওরা বসবে? ভারী আমার পয়সার গরম!

—ইস, এই পাগলীকে নিয়ে তো মহাঝঞ্ঝাট! ইনসপেকটার এসে আমাকে ধমকাবে—এবার জোর করে নামিয়ে দেব বলছি...

মহিলাটিকে দেখে আমার একটু অন্যরকম লাগছিল। এলাহাবাদে আমার এক পিসিমা থাকতেন, তাঁর মুখের সঙ্গে মহিলাটির খুব মিল। আমার সেই পিসিমা অবশ্য দশ বছর আগে মারা গেছেন। কিন্তু মহিলাটিকে দেখে পিসিমার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়ল, পিসিমা আমাকে একটা নীল সোয়েটার বুনে দিয়েছিলেন, যেবার এলাহাবাদে যাই, সেবার পিসিমা আমাকে...

হঠাৎ দেখলাম কণ্ডাকটর ঘটাং করে বেল বাজিয়ে থামিয়েছে এবং একরকম জেদের মাথাতেই সেই মহিলার হাত ধরে নামিয়ে দিতে যাচ্ছে। আমি আর কিছু ভাবিনি, জোরে চেঁচিয়ে বললুম, এই যে, কণ্ডাকটর ওকে ছেড়ে দিন। ওর কত ভাড়া, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

কণ্ডাকটর আমার দিকে ফিরে বলল আপনি ভাড়া দেবেন কেন? ভাড়ার

জন্য নয়, জানেননা, রোজ এই সময়টাতে এমন ঝঞ্ঝাট করে—

আমার হঠাৎ অকারণেই রাগ হয়ে গেল। ধমকে বললুম, আপনার অত কথা তো আমি শুনতে চাইনি ! ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি চুপ করে থাকুন। ভদ্রমহিলার গায়ে হাত দিয়ে...

কণ্ডাকটর টিকিট কাটল, মহিলাটি আমার উদ্দেশে বললেন, বেঁচে থাকো বাবা, রাজরাজেশ্বর হও...

কয়েকস্টপ পরে নামলাম। সুবিমল আমার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠে বলল, তুই সিনেমায় নেবে যা !

আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। কী ব্যাপার ?

সুবিমল বলল, কীরকম বাসসুদ্ধ লোকের সামনে হীরো সেজে গেলি—সেইটা দেখলাম। একেবারে বাংলা নভেল, উদার যুবক, আদর্শবাদী, আবার লেকচার...সবাই তোর দিকে তাকিয়েছিল, তাই একেবারে গর্বে...

—মোটেই না। ভদ্রমহিলার হাত ধরে টেনে নামাচ্ছিল ও সময় কিছু একটা...

—তা বলে ওরকম অভদ্রের মতন চেঁচাবি ? এই দ্যাখ—

সুবিমল হাত তুলে দেখাল, ওর হাতে একটা সিকি। বলল আমি নিজেই উঠে গিয়ে কণ্ডাক্টরকে টিকিটটা দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই তুই হীরো সাজবার জন্য চেঁচিয়ে সরগরম করলি। আমার কথা ভুলেই গিয়েছিলি...আমার দিকে একবার তাকাসওনি।

আমি লজ্জিত হয়ে পড়লাম। বললাম, তা নয়, সুবিমল বুঝলি না, ভদ্রমহিলার হাত ধরে টানছিল, থাকতে না-পেরে, মানে, একটা ভদ্রতা-সভ্যতার ব্যাপার...

—ওকে ভদ্রতা বলেনা। পাশে বন্ধু বসে আছে, তার তুলনায় নিজে বেশি উদার কিংবা ভদ্র সাজার চেষ্টা এটাও একটা অসভ্যতা।

—অতটা ভাবিনি, জানিস, ওঁকে দেখে হঠাৎ আমার মনে পড়ছিল...সুবিমল আবার মাঝপথে কী ভেবে হেসে উঠল। আমার পিঠে একখানা বিরাট কিল মেরে বলল, হারামজাদা ওর জন্য টাকা ভাঙিয়ে টিকিট কাটলি দেখলাম। তাহলে আগে আমার টিকিট কাটিসনি কেন ? সে বেলা বুঝি একটু উদার হওয়া যায় না, না ?

৮

গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরলাম। গলির মুখে দেখি, পাশের এক ফালি জমিতে এক ঝাঁক শিউলি ফুল ঝরে আছে। দেখেই মনে হল, শরৎকাল আসার আর দেরি

নেই। অন্ধকার রাত, ওই ফালি জমি যেন এক টুকরো আকাশ, ফুটফুটে নক্ষত্রের মতো এক রাশ শিউলি। আমি রিকশাওলাকে বিদায় দিয়ে ওখানেই নেমে পড়লাম।

কুড়িয়ে দু-হাতের মুঠোয় তুলে নিলাম অনেকগুলি। ঘ্রাণ নিলাম। এরা শরতের অগ্রদূতী, পূর্ণ শরতের নয়, কেননা, বোঁটা এখনো সবুজ, জাফরানি রং ধরেনি।

মাঝরাত্রে বাড়ি ফেরার পথে, দ্রুত না বাড়ি ফিরে, আমি শিউলিতলায় দাঁড়িয়ে আছি, কীরকম যেন লজ্জা করতে লাগল। এ যেন বেশি-বেশি কবিত্ব। আশেপাশে তাকিয়ে দেখি, কেউ কোথাও আমাকে দেখছেনা, কেউ কোথাও জেগে নেই। তবু ভালো। কবিত্ব জিনিশটা আজকাল সর্বসমক্ষে আর আস্বাদ করা যায়না, ফোঁড়ার মতো লুকিয়ে রাখতে হয় ব্যাণ্ডেজের নিচে! প্রতিদিন সারাদিন আমিও আর সব আধুনিক মানুষের মতো কবিত্বহীন, স্পষ্ট সপ্রতিভ নৈর্ব্যক্তিক, একজন মানুষের দুঃখের কথা, শুনলে তৎক্ষণাৎ অভিভূত না-হয়ে, সামগ্রিক মানুষের দুঃখদুর্দশার বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় মেতে উঠতে পারি। কিন্তু এখন আমি একা, আমাকে কেউ দেখছেনা—সুতরাং শিউলিফুল হাতে নিয়ে দাঁড়ালে আমার আধুনিকতা নষ্ট হবেনা। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম।

শহরতলির সম্পূর্ণ নিঃশব্দ মধ্যরাতে সেই শিউলিফুল দর্শনে অকস্মাৎ আমার বুকটা মুচড়ে উঠেছিল। আমি শুনতে পেয়েছিলাম, কোথায় যেন একটা সরু রিনরিন শব্দ হচ্ছে। শিউলিফুল তৎক্ষণাৎ আমাকে ফিরিয়ে দিল বাল্যকাল, আমার জন্মস্থানের কথা মনে পড়ল।

রেলে খুলনা পর্যন্ত, তারপর স্টিমার। তখন আমরা স্টিমারকেই জাহাজ ভাবতাম—ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে প্রায়ই মনে হত, নদী পেরিয়ে একদিন এ জাহাজ পথ ভুলে সমুদ্রে চলে যাবে। বর্ষার দিনে পদ্মাকেই মনে হত সমুদ্র—চোখদুটিকে দূরবীনের মতো সরু করে একটি বালক দূরে তাকিয়ে থাকত প্রাণপণে। ওপার দেখা যাবে কী দেখা যাবে না? হে ভগবান, যেন ওপার দেখা না-যায়—তাহলেই সমুদ্র আবার নদী হয়ে যাবে। বাবার পাশে বসে একজন পুরুতশ্রেণীর লোক ভ্যান-ভ্যান করছে—মাস্টারমশাই বেশি করে প্যালুড্রিন এনেছেন তো? গ্রামের চারটি মানুষের উবগার হবে। ওসব কুইনিন টুইনিন কিছু না প্যালুড্রিন যা বেরিয়েছে—ম্যালেরিয়ার গুষ্টির পিণ্ডি করে ছাড়বে এবার। একেবারে মোক্ষম। কম্পাউণ্ডার বিষ্ণু আবার তাক বুঝে দেড়া দাম নেয়। বামুনের ছেলে—চামারের মতো ব্যবহার। আমি তো এক গ্রোস—। স্টিমার থামবে মাদারিপুর, ভোরবেলা। আগের সারাদিন খাওয়া হয়নি—ফলমূল আর রুটি-তরকারি ছাড়া, কিন্তু ভাত ছাড়া আবার খাওয়া নাকি। একটিমাত্র হোটেল খুলেছে

তখন খেসারির ডাল, বেগুন ভাজা আর ইলিশ মাছ—বাবা খেতে-খেতে আমাকে ধমকে বললেন, ইস দেখো, নতুন জামাটায় ঝোল লাগিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে বলবিনা—কোন দোকানে খেয়েছি। এটা কায়স্থদের হোটেল !—মাদারিপুর থেকে আবার নৌকো।

শিউলিফুল হাতে নিয়েই কেন মনে পড়ল বাল্যকালও জন্মস্থান ? প্রত্যেক বছর পুজোর সময় যেতাম, তাই আমার জন্মস্থান শিউলিফুল-চিহ্নিত। প্রত্যেকবার নৌকো থেকে নেমেই দেখেছি, দরদালানের পাশে দু-তিনটি মেয়ে শিউলিতলায় ফুল কুড়িয়ে কোচড়ে তুলছে। আমাদের নৌকো দেখেই উৎসুক ডাগর আঁখি মেলে তাকাত। আমি কলকাতাফেরৎ বালক, সুতরাং বিলেতফেরতের ভঙ্গিতে কিছুটা অহঙ্কারময় গাম্ভীর্যের সঙ্গে বলতাম, কিরে ?—প্রথম দিনটা অন্তত, কলকাতার ছেলেমেয়েদের মতো চেনবসানো হলদে তুলোট গেঞ্জি পরে গর্বভরে সেই গাম্ভীর্য বজায় রাখবার চেষ্টা করতাম প্রাণপণে।

কতদিন যাইনি আর, পনেরো-ষোলোবছর, আর হয়তো কোনদিন যাবওনা, ইহজীবনে হয়তো আর আমার জন্মস্থান দেখার সুযোগই হবেনা। আজকাল আর মনেও পড়েনা। মনে পড়লেই তো ক্রোধ আর অভিমান আর দুঃখ। কে আর হৃদয় খুঁড়ে ওসব জাগাতে চায় ? তার বদলে ভিয়েৎনামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ভালো। বার্লিনের দেওয়াল নিয়ে প্রচুর তর্কাতর্কি করা যায়। আমার ব্যক্তিগত দুঃখ আমারই গোপনে থাকে। জন্মস্থান নিয়ে কথা বলতে গেলেই লোকে বলবে, ওসব খেলো কবিত্ব ! আজকের মানুষ যখন বিশ্বনাগরিক হতে চলেছে—। তাহলে ব্যক্তিগত দুঃখের নামই কবিত্ব ?

নিঃশব্দ রাত্রির শিউলিফুল আমার জগৎ ঢাকের শব্দে ভরিয়ে দিল। আমি শুনতে পাচ্ছি অবিরাম ঢাকের শব্দ, আর কয়েকটি ছাগলের চিৎকার। চক্রধরের নৌকো ঘাটে বাঁধা, তাই দেখতে আমি পায়ের নতুন জুতোর ফোস্কার কথা ভুলে ছুটে গেছি। প্রতিমা দো-মেটে হয়ে গেছে, এবার মুখ বসানো হবে। চক্রধরকে মনে হত ম্যাজিসিয়ান, ওর নৌকোয় হাজারটা নারকোলের খোলে হাজাররকম রং। আর সবার বাড়ির ঠাকুরের ছাঁচের মুখ, শুধু আমাদের বাড়িতেই চক্রধর প্রত্যেকটি মুখ নিজের হাতে মাটি টিপে-টিপে আমাদের চোখের সামনে বানাত। কী অহংকার ছিল চক্রধরের, মূর্তির মুখ বসাবার সময় সে এমন প্রকাশ্যে বিড়ি খেত যে গ্রাহ্যই করতনা কর্তাবাবুরা কাছাকাছি আছেন কি না ! আমরা প্রত্যেকেই ভাবতাম—দেবীর মুখ শুধু আমারই দিকে আলাদাভাবে তাকিয়ে আছেন। আমি ডানদিকে গেলেও তাঁর চোখ আমার দিকে ফেরানো আমি বাঁদিকে গেলেও। চক্রধরের গড়া মূর্তি দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বলেছিলেন, পিটি, ইউ ইমার্স দিস

ওয়ার্ক অব আর্ট !—আরেকবার আমার কলেজে-পড়া মামাদের অনুরোধে বানানো হয়েছিল মিলিটারি—হাতে রাইফেল, আর কার্তিকের মুখখানা হয়েছিল অবিকল সুভাষ বোসের মতন, সেবার সেই ম্যাজিস্ট্রেটই খবর পেয়ে এসে মূর্তি ভেঙে ফেলার হুকুম দিয়েছিলেন। রাতারাতি নতুন মূর্তি গড়া হল, আমার দাদুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন বলেই, সেবার সিডিসনের অভিযোগে কারুকে গ্রেপ্তার করেননি।

একমাস আগে থেকে চারটে কালো পাঁঠা কিনে রাখা হয়েছে। অষ্টমীর দিন দুটো আর সপ্তমী ও নবমীতে একটা করে বলি হবে। আমাদের ওপর ছিল ওদের তদারকির ভার। আমরা ঘাস খাওয়াবার নাম করে মাঠে নিয়ে গিয়ে ওদের সঙ্গে ছুটোছুটি করতাম। ঠাকুরদার বন্ধু বুড়ো নাসিরউদ্দিন মিঞা হেসে বলতেন, পোলাপানের কাণ্ড ! ছাগলের যেন চোট না-লাগে। মায়ের পুজোয় নিখুঁত পাঁঠা লাগে কিন্তু !—ছাগলগুলোর এমন বেয়াড়া স্বভাব, ঘাসের বদলে ধানপাতা খেতেই ওদের লোভ বেশি। কথায়-কথায় ওরা ধানক্ষেতে ঢুকে পড়ত। কচি-নধর ধানপাতায় কী ধার ! আমি একবার ধানগাছ ধরে টান দিতেই ব্লেডের মতো ধানপাতায় আমার বুড়ো আঙুলটা কেটে এত ফাঁক হয়ে গেল যে, সাতদিন ন্যাকড়া বেঁধে রাখতে হল। সেবার পুজোর বলির পাঁঠা নিখুঁতই ছিল, কিন্তু আমি খুঁত ছিলাম !

অমন ধারালো ধানপাতা খেতে ওদের একটুও কষ্ট হতনা দেখে আমার ক্ষীণভাবে মনে হত, রামদার কোপ যখন ওদের গলায় পড়ে—তখনো ওদের কষ্ট হয়না ! ঢাক-ঢোল-কাঁসির প্রবল আওয়াজের মধ্যে ডুবে যেত ওদের চিৎকার। একবার রক্ত ছিটকে লেগেছিল প্রতিমার পায়। তখনো আমি রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' পড়িনি এবং শরীরে প্রথম রিপু জাগ্রত হয়নি—তাই ওসব দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা স্পর্শ করতনা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বলি দেখতাম। আমাদের মধ্যে শুধু একজন, পাশের বাড়ির একটি মেয়ে, শেফালি, ও দৃশ্য সহ্য করতে পারতনা। পুজোর দিন সকালে নতুন শাড়ি-আলতা-পরা পায়ে আনন্দে ছুটোছুটি করত শেফালি। সবসময় আমার পাশে-পাশে থাকত। বলিদানের সময়ের একটু আগে থেকেই ও গম্ভীর ও শান্ত হয়ে উঠত আস্তে-আস্তে। তারপর পাঁঠাটাকে স্নান করাবার সময় থেকেই শেফালি অদৃশ্য হয়ে যেত। লুকিয়ে থাকতো কোন গোপন ঘরে। শেফালির এই দুর্বলতা নিয়ে হাসাহাসি করত অনেকে। কী আশ্চর্য, আমিও এ নিয়ে ঠাট্টা করেছি শেফালিকে। শেফালি সবার বিদ্রূপের মধ্যে ছলছল চোখে তাকিয়ে থাকত—ওর একরাশ কোঁকড়া চুলের মধ্যে প্রস্ফুটিত কচি বিষণ্ণ মুখখানি আজও আমার মনে পড়ে। জগন্নাথ মামা ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও রুক্ষ ধরণের মানুষ, তাঁর রসিকতাজ্ঞান ছিল বিকট। তিনি একবার জোর করে শেফালিকে হিড়হিড় করে

টেনে এনেছিলেন বলিদানের সময়। শেফালি অজ্ঞান হয়ে যায়। সেদিন থেকে ও মহাপ্রসাদ বা অন্য সময়ের পাঁঠার মাংস খাওয়া ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে ও বলির সময়ে চলে যেত—বাঁশবাগানের আড়ালে যেখানে ছিল আমাদের বাড়ির ছোট বাথরুম ও বড় বাথরুম। সেখান থেকে আর কেউ ওকে ধরে আনতে পারতনা। সেই তখন থেকেই শেফালির এমন কোমল মন ছিল যে, কালীপুজোর সময় কুকুরের লেজে ফুলঝুরি বেঁধে আমাদের খেলা ও একেবারে সহ্য করতে পারতনা, ছুটে এসে আমাদের বাধা দিতে চেয়েছে, আঁচড়ে-খিমচে অস্থির করেছে আমাদের।

একি, শিউলিফুল আমাকে মনে পড়াল শেফালির কথা? সেইজন্যই সরু রিনরিন শব্দে আমার বুক মুচড়ে উঠেছিল! কী ভুল করেছি রিকশা থেকে নেমে এসে শিউলিতলায় একা দাঁড়িয়ে! শেফালিকে আমি কিছুদিন আগে দেখেছি হাবড়ার উদ্বাস্তু কলোনিতে। না, না, আমি দেখিনি। তার কথা আমি আর কিছু বলতে পারবনা—অসম্ভব আমার পক্ষে! না, ওসব কথা আর আমি মনে করতে চাইনা।

৯

যেমন কুকুর-বেড়ালের গলায় দড়ি বেঁধে রাখে সেইরকমই বাচ্চা ছেলেটাকে কোমরে দড়ি বেঁধে দড়ির একপ্রান্ত আবার বাঁধা আছে জানালার শিকে! বাচ্চাটা রকের ওপর বসে খেলছে।

বেশ ভালো ব্যবস্থা। আমাদের গলির মোড়ের বড় বাড়িটার রকে আমি বাচ্চাটাকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাই। একটা ঠিকে ঝি চার-পাঁচ বাড়িতে কাজ করে, সে বাচ্চাটাকে সঙ্গে নিয়ে ফেরে। ব্যবস্থাটা সত্যিই ভালো বলতে হবে। ঐ ঝিয়ের পক্ষে হয়তো বাচ্চাটাকে বাড়িতে রেখে আসার অসুবিধে আছে—ঐটুকু বাচ্চাকে একা বাড়িতে ফেলে আসা যায়না। বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে কাজ করাও যায়না। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময়ে একটা বাচ্চা সঙ্গে থাকলে চলবে কেন? তাতে বাড়ির মালিকরা বিরক্ত হবে—তাছাড়া ঝিয়ের বাচ্চা যদি বাড়িময় ঘোরে কিংবা ট্যাঁ-ট্যাঁ করে চ্যাঁচায়—সেটা বাড়ির মালিকদের পছন্দ না-হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং বাচ্চাটাকে বাড়ির বাইরে বসিয়ে রেখে যায়। আর বাচ্চা যাতে রক থেকে গড়িয়ে না-পড়ে কিংবা গাড়ি ঘোড়ার রাস্তায় গিয়ে না-পড়ে, সেইজন্য বেঁধে রাখা। ক্যাঙারুর পেটের থলিতেই বাচ্চা রাখার ব্যবস্থা আছে, মানুষের তো

তা নেই—সুতরাং কী আর করা যাবে। প্রত্যেকদিন সকালে ঝি কাজ করতে এসে বাচ্চাটাকে রকের ওপর বসায়, শক্ত নারকোল দড়ি দিয়ে ওর পেটের সঙ্গে বেঁধে জানালার শিকে আবার বেঁধে দেয়। তারপর বাচ্চাটাকে বলে চুপটি করে বসে থাকবি নড়বিনি বলচি!—বাচ্চাটার অভ্যেস হয়ে গেছে—সে জুলজুলে চোখে পথের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে—মুখ দিয়ে অবিশ্রান্ত লালা গড়ায়। কখনো তার মা খানিকটা মুড়ি ছড়িয়ে দিয়ে যায় বাচ্চাটা খুঁটে-খুঁটে খায়। খুবই যুক্তিসঙ্গত, নিরাপদ ব্যবস্থা বলা যায়।

কিন্তু মানুষের মন তো বড়ই উদ্ভট। সেই জন্যই মাঝে-মাঝে ঐ বাচ্চাটাকে দেখে আমার কষ্ট হয়। গরু-ছাগল-কুকুরের মতন মানুষকেও দড়ি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় দেখা—আমি ঠিক সহ্য করতে পারিনা—অজান্তেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, আহারে! পরক্ষণেই নিজের ওপর আমার রাগ হয়। মনে হয়, আমি দয়ামায়ার ফ্যাশান দেখাচ্ছি! আজকাল দয়ামায়া জিনিসগুলোও বুঝেসুঝে খরচ করা উচিত—তা নিয়ে বিলাসিতা করা মোটেই চলে না। জন্তু জানোয়ারের সঙ্গে মানুষের তুলনা করে হাহুতাশ করাও আমার পক্ষে ন্যাকামি। পৃথিবীতে কত জায়গায় কত মানুষ যে গরু-শুয়োরের খোঁয়াড়ের চেয়েও খারাপ ঘরে থাকে, খারাপ খায়—তা কী আমি জানিনা? কে না জানে? তবে হঠাৎ আমার দরদ উথলে ওঠার কারণটা কী? গোটা পৃথিবীটা সম্পর্কে চিন্তা করার ভার তো আমার ওপরে কেউ দেয়নি! এখন পৃথিবীতে মানুষ গিসগিস করছে—এর মধ্যে আমি কী করে কোনক্রমে একটু ভালো থাকব—সেটাই আমার চিন্তা করা উচিত। আর কোন ভাবালুতার কোন মানে হয়না।

ঠিক। সেকথাই আমি নিজেকে বোঝাই। অতীন আর সুমিত্রাকেও আমি সেই কথা বলি। অতীন আর সুমিত্রা এক অফিসেই চাকরি করে—খেয়ে-দেয়ে দুজনেই পান চিবুতে-চিবুতে এসে মোড় থেকে বাসে ওঠে। ওদের একটি দুবছরের বাচ্চা আছে—বাড়িতে আয়ার কাছে তাকে রেখে যায়। নিজের বাচ্চা আছে বলেই বোধহয় সুমিত্রা হঠাৎ খবু স্নেহপরায়ণ হয়ে যায়। রকটার দিকে তাকিয়ে বলে আহারে, বাচ্চাটাকে কীভাবে বেঁধে রেখেছে। ওর মার একটু দয়ামায়াও নেই!

আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। ক'দিন আগে আমারও এরকম মনে হয়েছিল। আজ সুমিত্রার মুখে একথা শুনে আমি রেগে উঠি। হয়তো একটা মেয়ের চিন্তার সঙ্গে আমার চিন্তা মিলে গেছে—এটাও একটা রাগের কারণ। আমি ঝাঁঝালোভাবে বলি তাতে কী হয়েছে? বেঁধে না-রাখলে তো গড়িয়ে পড়ে যেত।

আমার কথার ঝাঁঝে সুমিত্রা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। তারপর মুচকি হেসে বলে, খুব স্মার্ট আপনি? না। সত্যি!

অতীন আমার দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দেয়। তারপর দেশোদ্ধারকারীর মতন কৃত্রিম মুখ করে বলে, আসল ব্যাপারটা কী জানিস। এই যে ছেলেটাকে এখন বেঁধে রাখছে—এর ফলে ভবিষ্যতে কী হবে? ও যখন বড় হবে—তখনো ওর বন্ধন কাটবে না। স্বাধীনভাবে কোন কাজে ও হাত দিতে পারবেনা, কোন নতুন জায়গায় যেতে সাহস পাবেনা—সব সময় মনে করবে ওর গলায় দড়ি বাঁধা। অবশ্য এই একটা-আধটা কেসের কথা ভেবে লাভ নেই—একটা বিপ্লব না এলে—

আমি বললুম, ওসব ছেঁদো কথা রেখে দে। তোর কাছে বিপ্লব মানে তো অফিসে গিয়ে কাজ না করে স্ট্রাইক বাধানো। এদিকে সকালবেলা টোস্টে মাখন কম হলে তো রোজ সুমিত্রাকে বকুনি দিয়ে—

সুমিত্রা আবার মুচকি হেসে বলে, যা বলেছেন!

অতীন আমার কাঁধে হাত রেখে বলে, কী ব্যাপাব, আজ যে তুই সকাল থেকেই খাপচুরিয়াস?

আমি বললুম, বন্ধনের কথা বলছিস? ঐ ছেলেটার মধ্যে যদি সেরকম মালমশলা থাকে ও ঠিকই বন্ধন ছিঁড়তে পারবে। গোটা জাতটার কারুরই তো বন্ধন ছেঁড়ার আগ্রহ নেই দেখতে পাচ্ছি।

—দুশো বছরের পরাধীনতার জের চলছে। যাই বল এটুকু ছেলেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা আমি আগে কখনো দেখিনি।

—বরাবরই আমাদের দেশে এ জিনিশ চলছে। শ্রীকৃষ্ণকেও তো যশোদা গাছের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। কৃষ্ণ অবশ্য বন্ধন ছিঁড়েছিল। যমলার্জুনের কাহিনী পড়িসনি?

অতীন কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা অদ্ভুত ভঙ্গি করল। যার মানে হয়, যে-লোক বিপ্লবের স্বপ্ন দেখছে সে-কেন রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ পড়ে সময় নষ্ট করতে যাবে! সুমিত্রা বলল, ঐ যে বাস এসেছে!

মনকে এসব বোঝানো সত্ত্বেও আমার ভুল হয়ে যায়। এর কয়েকদিন পর আবার দেখলাম রকের ওপর সেই বাচ্চা ছেলেটাকে—বমি করে তার ওপরেই ঘুমিয়ে আছে। দেখে আমি নড়তে পারলামনা। কী করুণ সেই ঘুমন্ত ভঙ্গি, বিদেশি ফটোগ্রাফাররা এ দৃশ্য পেলে লুফে নিত। ঝিটা সেইসময়েই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল, নির্লিপ্তভাবে দড়ির গিট খুলতে লাগল। আমি তাকে না-বলে পারলামনা, তুমি কী গো! ছেলেটাকে এরকম একা-একা বেঁধে রেখে চলে যাও!

ঝিটা আমার দিকে একবার অবজ্ঞার চোখে তাকাল শুধু। কোন কথা বললনা। ছেলেটা ঘুম ভেঙে চোখ মেলল। অসুস্থ লাল চোখ দেখে আমি বললুম, ইস। ছেলেটা এবার আমাকে দেখল।

হঠাৎ তার সেই অসুস্থ লালচে চোখ আর তার মায়ের নির্লিপ্তভঙ্গি দেখে আমার অসম্ভব ভয় করল। আমি সেখান থেকে সরে গেলাম। কিন্তু ভয় তক্ষুনি কাটলনা। সেই ভয় থেকেই দুঃস্বপ্নের জন্ম।

সে রাত্রে একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে আমি ঘামে ভিজে চিৎকার করে জেগে উঠলাম। স্বপ্ন দেখলাম, চারদিকে খুব গোলমাল হচ্ছে। হঠাৎ যেন অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে। হু-হু করছে বাতাস, দূরে মাঝে-মাঝে আগুনের হলকা দেখা যাচ্ছে। আমি পথ খুঁজে পাচ্ছিনা—ছুটোছুটি করছি এইসময় একটা বিশাল চেহারার মানুষ একটা লম্বা ছুরি নিয়ে আমার সামনে লাফিয়ে পড়ল। লোকটা ছুরি উঁচিয়ে বলল এই যে, তোমাকেই খুঁজছিলাম! আমি ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম, আমাকে?

—হ্যাঁ, তোমাকেই।

লোকটার সবল পেশীবহুল শরীর। কালো কুচকুচে দেহ। প্রায় উলঙ্গ, শুধু একটা কাপড়ের টুকরো কোমরে বাঁধা। পেটের চারপাশে একটা গোল ঘা। লোকটার মুখ আমার একটু যেন চেনা মনে হচ্ছিল। চিনতে পারলাম, এ সেই ঝিয়ের ছেলেটা—এতবড় হয়ে উঠেছে, কিন্তু পেটের কাছে সেই নারকোল দড়ি বাঁধার ঘা-টা রয়ে গেছে।

আমি কাতরভাবে বললুম, আমাকে মারবে কেন? আমি কী দোষ করেছি? লোকটা কর্কশ হুংকারে বলল, তুমি আমাকে একদিন দয়া দেখাতে এসেছিলে। যে-যে আমাকে দয়া দেখিয়েছিল আমি তাদেরই আগে খুন করব।

একথা বলেই সে ছুরিটা আমার বুক লক্ষ করে তুলে ধরল।

১০

মুনা আর বাবুই আমেরিকা যাচ্ছে, এয়ারপোর্টে বহু নারী-পুরুষ এসেছেন ওদের বিদায়ের হাতছানি দিতে।

ডাকনাম শুনলে বোঝা যায় না, আসলে ওরা দুজন আধুনিক যুবক-যুবতী। মেয়েটির বয়েস কুড়ি-একুশ, হালকা ছিপছিপে চেহারা, ফর্সা মুখ জুড়ে আছে টলটলে দুটি চোখ—এখন সেই চোখদুটি একটু অস্থির, সিল্কের শাড়ির আঁচল সামলাতে-সামলাতে বারবার চঞ্চল পায়ে ঘুরছে এয়ারপোর্টের লাউঞ্জের এদিক থেকে ওদিক। ছেলেটিও বেশ রূপবান দীর্ঘ চেহারায় নিখুঁত পোশাক, কোট কাঁধের ওপর রাখা, মুখে একটা সূক্ষ্ম কৌতুকের হাসি। মুনা—অর্থাৎ অনুরাধা, বাবুই অর্থাৎ

সিদ্ধার্থ, খবরের কাগজে প্রায় প্রতিদিনই 'উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশ যাত্রা' উপলক্ষে যেসব ছেলেমেয়েদের ছবি বেরোয়, ওদের ছবি না-দেখলেও বুঝতে পারলাম —ওরাও সেই দলেরই।

আমার এক কাকার বম্বে থেকে আসার কথা, আমি এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম তাঁকে আনতে। আমাদের পরিবারে ঐ একটিই কাকা, যাঁর মাঝে-মাঝে প্লেনে চড়ার সৌভাগ্য হয়, সুতরাং তাকে খাতির দেখাবার জন্য তাঁর আসার দিন কারুকে এয়ারপোর্টে যেতে হয়। বাড়ির মধ্যে আমি ছাড়া বেকার কেউ নেই—সুতরাং আমারই ওপর ভার পড়েছিল। গিয়ে শুনলাম, প্লেন আসবে তিনঘণ্টা পরে—এই দীর্ঘ সময় আমি কী করব, বেরিয়ে খানিকটা ঘুরেও আসতে পারতাম, কিন্তু আমি অপেক্ষাঘরেই গদিমোড়া আসনে বসে রইলাম পাখার নিচে। আমার হাতে একটা বই ছিল, কিন্তু বইতে মন দিতে পারলামনা—আমি এয়ারপোর্টের মানুষদেরই দেখতে লাগলাম, দেখতে আমার ভালো লাগল। এক সঙ্গে এত ভালো পোশাক পরা, সুন্দর চেহারার, আপাতসুখী মানুষ অন্য কোথাও দেখা যায়না। চারিদিকেই চকচকে রূপ, ঝকঝকে কথাবার্তা। আর কী সব চমকপ্রদ কথাবার্তা, রোম-প্যারিস-নিউইয়র্ক-লণ্ডন ইত্যাদি স্বপ্নের শহরের নাম কী অনায়াসে উচ্চারিত হয় মুখে-মুখে!

—লণ্ডনটা অতি বিশ্রী জায়গা—দুদিনের বেশি ওখানে থাকবনা ভাবছি!

—চৌধুরি, তুমি তো প্যারিসে থাকছ? সে হ্যালো টু ইফেল টাওয়ার ফর মি, উইল য়ু?

—গতবছর আমি যখন ফ্রাঙ্কফুর্টে ছিলাম এইসময়, এমন বৃষ্টি!

—রোমে গেলে কিন্তু ভিয়া ভেনেতো যেতে ভুলো না!

—বার্লিনে পৌঁছেই কিন্তু মেজো বউদির সঙ্গে দেখা করবে?

—মুনা, নিউইয়র্ক নামার আগেই কিন্তু এক্স-রে প্লেটদুটো হাতে নিয়ে নিও। আমার বেলায় এমন গণ্ডগোল—

—খোকন, প্রত্যেক সপ্তাহে একটা চিঠি দেবে—

—শোনো, জেনিভার একটা হোটেলের ঠিকানা আমি দিয়ে দিচ্ছি...

—এই নিয়ে আমি চারবার ইংলণ্ড যাচ্ছি, আর ভালো লাগেনা!

আমার হাতে একটা রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা গল্পের বই, কিন্তু তবু সেটায় মন দিতে পারছিনা, আমি অবাক হয়ে এইসব কথাবার্তার টুকরো শুনছি উদগ্রীবভাবে। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিচ্ছি সবার মুখে-মুখে—কী অবলীলাক্রমে ঐসব উপন্যাসে পড়া শহরের নাম উচ্চারিত হচ্ছে এখানে। একটা বুলডগ চেহারার সাহেবের পাশে একটি বিড়ালমুখী মেমসাহেব দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে নিন্দে করছে কলকাতার

পাঁউরুটির, জার্মান বউয়ের সঙ্গে এক ভেতো বাঙালি নাকিসুরে আদুরে গলায় রাজনীতি আলোচনা করছে, একটি গাউন-পরা গুজরাতি মেয়ে হেঁটে গেল শাকচুন্নীর মতো। একপাশে স্ট্রেচারের উপর শুয়ে আছে একটি যুবতী মেয়ে, মেয়েটি সম্ভবত খুবই অসুস্থ, এই অবস্থাতেই প্লেনে যাবে, কিন্তু মেয়েটির মুখে অসহায়তার বদলে আছে অদ্ভুত অহংকারের ছাপ।

আমি এসবই দেখছিলাম, কিন্তু আমার মনোযোগ বেশি আকর্ষণ করল আমার পাশেই দাঁড়ানো দলটি। মুনা আর বাবুই, আর ওদের বিদায় দিতে আসা আত্মীয়-পরিজন। আমি ওদের আগে কখনো দেখিনি, কিন্তু ইতিমধ্যেই ওদের ডাকনাম, ভালোনাম জেনে গেছি। কান পেতে শুনছি ওদের কথা।

আমি একসময় দাবা খেলতে খুব ভালোবাসতাম। এখন আর খেলিনা, এখন অন্য একটা অভ্যেস এসে গেছে। এখন অপরিচিত লোকজন দেখলেই মনে-মনে খেলা করি, কার সঙ্গে কী সম্পর্ক—এই নিয়ে। আমি বইয়ের আড়াল থেকে মাঝে-মাঝে চোরা চোখে তাকিয়ে—এই অনুমানের খেলা শুরু করে দিলাম। আজকের নায়ক-নায়িকা বাবুই আর মুনাকে আমি প্রথমেই চিনে গেছি—অন্য সকলের কথা শুনে। এখন সব কথাবার্তার কেন্দ্র ওরা। মেয়েটির মা কোথায় ? মেয়ের মায়ের চেহারা আজ কী রকম হওয়া উচিৎ ? করুণ, থমথমে, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-ভরা মুখ ? না, সেরকম তো কারুকে দেখছিনা। স্পষ্ট বোঝা যায়, এ পরিবারে বিদেশ যাওয়া নতুন কিছু না। অনেকেই আগে ঘুরে এসেছেন। বিদেশ যাওয়াটা আমাদের একধরনের ছোঁয়াচে রোগ, এক পরিবারের একজনের পক্স হলে যেমন অন্য আর দু-একজনের না-হয়ে ছাড়ে না, বিদেশ যাওয়াটাও সেইরকম। এবং পক্সের মতোই বিদেশ ঘুরে আসার চিহ্নও অনেকের গায়ে-মুখে লেগে থাকে সারাজীবন। এই দলটি অবশ্য স্বাভাবিক, তবু বুঝতে পারলাম—কেউ-কেউ বিদেশফেরৎ।

যে-মহিলা হাসতে-হাসতে মেয়েটিকে বলছেন, ও কি মুনা, তুমি একটু হাসছ না কেন ? বাঃ !—সেই মহিলাই নিশ্চয়ই মেয়েটির মা। ঐ সুন্দরী মেয়েটির রূপের আভাস আছে ঐ মহিলার মুখে, এখন সে রূপ শান্ত। হ্যাঁ, ঐ মহিলাই নিশ্চয় মা। আমি বাজি রাখতে পারি। কারণ মহিলাটি যদিও হাসছেন খুব, মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্নমাত্র নেই—মনে হচ্ছে মেয়ের বিদেশ যাবার জন্য সত্যিই খুশি—ওঁর মুখে একটা সূক্ষ্ম দুঃখের পর্দা আমার চোখ এড়াতে পারেনি।

এবার ছেলেটির মা ? ছেলেটির মাকে আমি ঠিক খুঁজে পেলাম না। মহিলাদের দিকেও বারবার তাকাতেও পারিনা। আরো পাঁচ-ছজন মহিলা ও যুবতী আছেন ! কিন্তু ছেলেটির বাবাকে আমি খুঁজে পেলাম। দীর্ঘ চেহারার প্রৌঢ়, মুখে সবসময় একটি কৌতুকের হাসি। বুঝতে পারলাম, ছেলেটি তাঁর ঐ কৌতুকের হাসি

উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে। তাঁর পাশে আরেকজন সুঠাম চেহারার ভদ্রলোক নিশ্চিত মেয়ের বাবা। মুখের কোন মিল নেই, তবু আমার মনে হল। মেয়েটির বাবার মুখ একটু ক্লান্ত, একটু যেন চিন্তাক্লিষ্ট। সে চিন্তা মেয়ে চলে যাবার জন্যও হতে পারে—বা, যুদ্ধের সাম্প্রতিক খবরের জন্যও। কেননা, শুনলাম, তিনি একবার ভারী গলায় মেয়েটিকে বললেন, তোমার মুখ হাসিখুশি নয় কেন? নতুন দেশ দেখার একটা থ্রিল আছে, আমার এখনো মনে পড়ে—। একটু বাদে, পাশের একজনকে বললেন, ইন্দোনেশিয়া কী সত্যি পাকিস্তানকে সাহায্য করবে?

মুখে অল্প দাড়ি একটি সদ্য যুবক, ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতো চেহারা—এ খুব সম্ভবত মেয়েটির ভাই বা দেওর। যে-কোন একটা হতে পারে! সে বলল, তোমরা দু-বছর থেকে যাও, তারপর আমিও চলে আসছি! আমি গেলে আর ফিরবনা।

পাশে দাঁড়ানো কয়েকজন যুবক-যুবতী, এরা কয়েকজন নিশ্চিত মেয়েটির বন্ধু, কয়েকজন ছেলেটির। এইসময় হন্তদন্ত হয়ে আরেকজন যুবক এল, শার্টপ্যান্টের সঙ্গে চটি পরা, একটু বেমানান, বোকা অথবা লাজুকের মতো মুখ। মেয়েটি বলল, আরেঃ, মাস্টারমশাই? এমন রেগে গিয়েছিলাম—একবারও খোঁজ নিলেননা!

—কী করব, আমি তো কালকেই খবর পেলাম!

—ইচ্ছে করেই খবর দিইনি! আপনি একবার—

মাস্টারমশাই নামের যুবকটি কী বলল যেন, বোঝা গেলনা। মেয়েটি আর-একটি কালো চশমা পরা মেয়েকে ডেকে বলল, ছোটোমাসি, দেখো মাস্টারমশাই এসেছেন শেষপর্যন্ত! মেয়েটির স্বামী এসে বললে, যাক, তবু আপনার সঙ্গে দেখা হল! ছেলেটির বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আলাপ করিয়ে দিই, ইনি মাস্টারমশাই।

যুবকটি মৃদু স্বরে বলল, আমার নাম মাস্টারমশাই নয়, আমার নাম অমুক—।

হঠাৎ কেউ একজন এসে বলল, এবার যেতে হবে, নাম ডেকেছে!

—আমাদের ফ্লাইট তো, ঠিক?

—ক্যারাভেল দিয়েছে, না জেট?

—উঃ, বম্বেতে যে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?

দলটা আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল গেটের দিকে। আকাশ কালো করে মেঘ উঠেছে, প্লেন ছাড়ছে নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে। গেটের মুখে-মুখে বালির বস্তা সাজানো। এসব বালির বস্তা দেখলে সত্যিই যুদ্ধের কথা ভেবে গা ছমছম করে! আমার কাকার প্লেন আসতে এখনো অনেক দেরি। এতক্ষণ ঐ দলটার কথা

শুনতে-শুনতে—যেন আমিও ওদের দলে মিশে গেছি। এত দূর বিদেশে চলে যাচ্ছে—এই দুই নবীন স্বামী-স্ত্রী, ওদের দুজনের জন্য আমারই মন কেমন করতে লাগল। আবার কতদিন পর দেখা হবে বাবা-মার সঙ্গে—ওদের বাবা-মায়ের কী বুক গুরু-গুরু করছে না? কিন্তু কোথাও তো আমি কোন ভয় বা উৎকণ্ঠা বা দুশ্চিন্তার ছায়া দেখছিনা যেন মনে হচ্ছে, বিয়ের পর ওরা দুজন দার্জিলিং যাচ্ছে মধুযামিনীতে—সবাই এমন আনন্দ করে বিদায় জানাচ্ছে—অথচ আমেরিকা, পৃথিবীর উল্টোপিঠে যাচ্ছে ওরা। শেষমুহূর্তে কেউ কী কাঁদবে না? কারুর চোখের জল পড়বে না? শেষপর্যন্তও সকলের এমন মনের জোর থাকবে?

হঠাৎ আমি উঠে পড়ে ঐ দলটাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমার কী দরকার, আমি ওদের কারুকে চিনিনা, জীবনে আর কখনো দেখা হবে না, তবু আমার অসম্ভব কৌতূহল হতে লাগল শেষমুহূর্তে কারুর চোখের জল পড়ে কিনা দেখার জন্য। মানুষ কী আজকাল সত্যিই এমন আধুনিক হয়ে গেছে? জানি, বিমানযাত্রায় আজকাল কোন দুর্ভাবনা নেই, কিন্তু মেয়েরাও কী সেকথা মানবে? অকারণে, দুর্ভাবনা করাই যে মেয়েদের স্বভাব। আমিও ওদের দলের পিছনে দাঁড়িয়ে কৌতূহলী হয়ে সবার চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম, কোথাও একফোঁটা চোখের জল দেখা যায় কি না।

গেট পেরিয়ে প্লেনের দিকে এগিয়ে যাবার আগে ছেলেটি সবার সঙ্গে করমর্দন করল, পিতাকে আলিঙ্গন করে বেশ সপ্রতিভভাবে বেরিয়ে গেল, মুখে তখনো সেই কৌতুকের হাসি। মেয়েটি কারুর সঙ্গে একটিও কথা বললনা, সুন্দর টলটলে চোখ মেলে শুধু তাকাল সবার দিকে, বুঝতে পারলাম একটি কথা বলতে গেলেই কান্না বেরিয়ে আসবে। এরকম আধুনিকা মেয়ে, যাবার আগে কাঁদলে যে ওকে একদম মানাবেনা। ক্রমে ওরা প্লেনের মধ্যে উঠে গেল—কী জানি কোন জানালার পাশে বসেছে, ওদের আর দেখা যায়না। মেয়ের মা একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন প্লেনের দিকে। বাবা তখন সেই মাস্টারমশাই নামের ছোকরাকে জিজ্ঞেস করছেন, কী মনে হয়, চীন সত্যিই আবার আক্রমণ করবে?

কী কারণে প্লেন ছাড়তে দেরি করছে। বালির বস্তার পাশে দাঁড়ানো যায়না —এত ভীড়। অথচ প্লেন ছাড়বার আগে কেউ যাবেনা। এই দলের সকলে, হঠাৎ ওখান থেকে এসে বাইরের ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ালেন! ওখান থেকে প্লেনটা স্পষ্ট দেখা যায়। কী আশ্চর্য, আমিও ওদের সঙ্গে চলে এসেছি, তাকিয়ে আছি প্লেনের দিকে। কী ভাগ্যিস আমাকে কেউ এসে জিজ্ঞেস করবেনা, আপনার তো কোন চেনা লোক নেই এ প্লেনে—তবু আপনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে। আমি কেন দাঁড়িয়ে? আমি কোথাও এক ফোঁটা চোখের জল দেখার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

আমি সঙ্কোচ ভুলে, সমবেত মেয়েদের প্রত্যেকের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। দু-একজনের চোখ যেন চিকচিক করছে, আভাস এসে গেছে, এখন প্লেন ছাড়ার শুধু অপেক্ষা। এই সুন্দরী, সপ্রতিভা মহিলাদের চোখের জল আমি দেখে যাব।

দেখা হলনা। ঝুপঝুপ করে হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেল। আমি সমেত দলের সকলকেই ভিজিয়ে দিল বৃষ্টি। এখন আর চোখের জল বোঝা যাবেনা।

১১

শুনেছিলাম তিনি ঠনঠনে কালীবাড়ির কাছেই কোথাও থাকেন। ঠিক বাড়ির নম্বরটা জানিনা বাড়ি নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে।

বছর তিনেক আগে এক দুপুরবেলা আমি ট্রাম থেকে ঠনঠনের সামনে নেমে পড়েছিলাম। একটু ভয়-ভয় করছিল, কী জানি কেমন লোক, আমি বিরক্ত করতে এসেছি বলে যদি ধমকে ওঠেন। যাইহোক আজ দেখা না-করে আর ফিরছিনা।

কালীবাড়ির রকে একজন লোক বসে আছে, এমন চেহারা যে বয়স বোঝার কোন উপায় নেই। লোকটির মুখে কাচা-পাকা মুড়ি-মিছরি ধরনের দাড়ি কিন্তু মাথার চুল কুচকুচে কালো। আমি একটুক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, এ পাড়ায় শিবরাম চক্রবর্তী কোথায় থাকেন বলতে পারেন?

লোকটি প্রথমেই আমার সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করল। হয়তো আমার লেখা উচিত ছিল, 'করলেন' কিন্তু লোকটির ব্যবহার এমন যাচ্ছেতাই যে এসব লোককে কিছুতেই আপনি বলা যায়না। ওরকম কুটিলভাবে আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখার দরকারটা কী? লোকটির গলার আওয়াজ কাক ডাকার মতন, জিজ্ঞেস করল, কে থাকে? কী নাম?

আমি সম্ভ্রমপূর্ণ গলায় পুনরায় বললুম, আজ্ঞে, শিবরাম চক্রবর্তী। দয়া করে যদি—

দয়া করে যদি—

—বাড়ির নম্বর কত?

—আজ্ঞে বাড়ির ঠিকানাটা ঠিক জানিনা সেইজন্যই তো—

—বাড়ির ঠিকানাটা জানো না, কলকাতা শহরে লোক খুঁজতে এসেছ? কে পাঠিয়েছে তোমায়?

—কেউ না, উনি বিখ্যাত লোক, তাই আমি ভেবেছিলাম—

লোকটি হঠাৎ খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, বিখ্যাত লোক এ পাড়ায়?

তারপর সে ঠোঁটদুটি পুরো ফাঁক করল। অর্থাৎ হাসি। বলল, এ পাড়ায় বিখ্যাত লোক দুজনই আছে, আমি আর কাশীরাম ভট্টাচার্যি। আমায় তো চেনোই দেখছি, কাশীরাম ভট্টচার্যির নাম শুনেছ? প্রখ্যাত জ্যোতিষী সম্পর্কে আমার আপন ভগ্নিপোত, তুমি বোধহয় তাকেই–

আমি বললুম, আমি নাম শুনিনি বটে, কিন্তু উনি নিশ্চয়ই খুব বিখ্যাত। তবে আমি খুঁজছি শিবরাম চক্রবর্তীকে।

—তবে যে বললে বিখ্যাত লোককে খুঁজছ? সে লোকটা কিসে বিখ্যাত?

—উনি একজন লেখক। আমাদের শ্রদ্ধেয়—

—লেখক! কী লেখে?

প্রধানত হাসির গল্পই লেখেন। তাছাড়া আগে—

—হাসির গল্প? চালাকি পেয়েছ?

লোকটি এবার বেশ ক্রুদ্ধ। সোজা হয়ে বসে বলল, হাসির গল্প আবার লেখার কী আছে হে! ওসব মানুষে লেখে? লেখে লোকে ধম্মোকম্ম, সদা সত্য কথা, কী করে স্বাস্থ্য ভালো রাখতে হয়—এইসব নিয়ে। তুমি এসেছ হাসির গপ্পো চালাতে? আমার সঙ্গে ফাজলামি-এয়ার্কি?

ইতিমধ্যে তিন-চারজন কৌতূহলী লোক জমে গেছে! একজন জিজ্ঞেস করল, কী ব্যাপার? পকেটমার না জুতোচোর? আজকাল কালীবাড়িতে এমন জুতোচোরের উপদ্রব হয়েছে। আরেকজন বলল, পকেটমার না তো?

মূল লোকটি খেঁকিয়ে উঠে বলল, ছোকরাকে দেখছি তখন থেকে এখানে ঘুরঘুর করছে। বাবুরাম চক্কোবর্ত্তী না কাকে খোঁজার ছুতো।

আমি ক্ষীণস্বরে প্রতিবাদ জানিয়ে বললুম, বাবুরাম না শিবরাম।

—ও নামে কেউ এ পাড়ায় থাকে? আপনারাই বলুন! আমি তিরিশ বচ্ছর এ পাড়ায় আছি, আমি জানিনা!

জনতা বলল, ঐ তো কাশীরামবাবু আসছেন, ওকেই জিজ্ঞেস করুননা!

বেশ টের পেলাম, লোকে আমায় ঘিরে ধরেছে! দৌড়ে পালাতে গেলে হিতে-বিপরীত হবার সম্ভাবনা। কাশীরামবাবুর চেহারা রোগা-চিমশে ধরনের, কপালে ফোটা-তিলক। দেখে আরো ভয় হল। আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, খুব বেশি রোগা লোকেরা কিছুতেই সরল কথা বোঝেনা। সবসময়েই তাদের জেরা করার টেণ্ডেন্সি। ইনিও এসে শুনে সাহাস্যে বললেন, আগে বলো তো বাপু, এ পাড়ার সেই লোকটির সঙ্গে তোমার কী দরকার?

সর্বনাশ, একথা আগে তো একবারও ভাবিনি। দরকার তো কিছু নেই? আমি আমতা-আমতা করে বললুম, না, মানে, শুধু একবার চোখের দেখা দেখতে—

জনতা গর্জন করে উঠল, অ্যাঁ, দেখতে? শুধু দেখতে? একজন জলজ্যান্ত মানুষকে শুধু চোখের দেখা দেখতে? স্পাই! স্পাই!

কাশীরামবাবুই দয়ালুভাবে বললেন, আহা-হা, আগেই মারধোর শুরু কোরো না! আগে দেখা যাক, সত্যিই ও নামের কোন লোক এ পাড়ায় থাকে কি না! যদি এখান থেকে তিন মাইলের মধ্যেও কোথাও সে থাকে, আমি গুণে বলে দেব!

ফতুয়ার পকেট থেকে খড়ি বার করে তিনি মাটিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগলেন। গোটাকয়েক চৌখুপ্পি আর ঢ্যাড়া। চক্রবর্তী তাহলে তোমার হল গিয়ে অমুখ গোত্র, নামের প্রথমে যদি তালব্য শ থাকে—। আমি তখন দরজা-জানালা-বন্ধ-ঘরের মধ্যে বেড়ালের মতন আটকে পড়েছি। ভাবছি এবার আঁচড়ানো-কামড়ানো শুরু করব কি না। নাকি কেঁদে-কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দেব!

খানিক বাদে চোখ খুলে কাশীরাম জ্যোতিষার্ণব বললেন, তেমনি হাসি-হাসি মুখ, নাঃ ও নামে কোন লোক থাকতে পারেনা। সর্বৈব বাজে কথা। এ পাড়ায় কেন, কোথাও নেই!

আমি বললুম তাহলে মণ্টুর মাস্টার কিংবা বাড়ি থেকে পালিয়ে—এগুলো কে লিখেছে? নাকি আপনি বলতে চান, এরকম কোন বইও নেই?

এমন সময় একটি শৌখিন চেহারার যুবা, ফর্শা, সুদর্শন, একমাথা কোকড়ানো চুল, ধপধপে আদ্দির পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম—ভিড়ের মধ্য থেকে এসে আলতোভাবে আমার কাঁধ ছুয়ে বলল আহা, ওকে ছেড়ে দিন। ও আমাকে খুঁজছে!

আমার চেয়েও কাশীরামের বিস্ময় বেশি। হাঁ করে তাকিয়ে বললেন, আপনিই? তা চক্রবর্তী আপনার উপাধি না খেতাব? রাঢ়ী না বারেন্দ্র? খড়দা মেল না ফুলেল মেল? ওঃ! তাই বলুন, এইজন্য আমার গণনা একটুর জন্যে মেলেনি!

বলেই কাশীরাম ভিড়ের মধ্যে সুট করে মিশে গেলেন। যুবকটি আমার হাত ধরে ফাঁকায় নিয়ে এসে সস্নেহে বললেন, এবার বলো!—আমার বুকের ধড়ফড় তখনো কমেনি। ঢোক গিলে বললাম, আপনার এত বয়স কম? আমি ভেবেছিলাম একেবারে অন্যরকম।

যুবকটি বললেন,

অন্যরকম অন্যবেশি

বুঝলে বেশির কম, কমবয়সী?

অথবা বলতে পারো, বয়সের ভয়েস কখনো বেশি Boyish কখনো বায়সের মতন Raw. কখনো ভঁইসের মতন...

আমি বললুম, সত্যিই যদি আপনার কম বয়েস হয়, তবে আমাকে 'তুমি বলবেন না। আমিও রোজ-রোজ দাড়ি কামাই।

—রোজ রেজারে দাড়ি কামাও, না দাড়ি কামিয়ে রোজের রুজি রোজগার করো, তোমার চেহারাখানা তো দেখলে মনে হয়, চেয়ারহারা, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দাড়ি কামানোই...

একটু আস্তে-আস্তে বললুম, না, আমি লিখে নিই। অত তাড়াতাড়ি বলছেন একটু মাঝে-মাঝে দাড়ি-কমাও না বসালে—

—বেশ-বেশ শিখে গেছো দেখছি। তোমারও হবে। চালিয়ে যাও। পেছন থেকে রুক্ষ গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, এই পল্টু! পল্টু! একঝলক তাকিয়ে দেখি একজন বেঁটে-কালো-গুণ্ডা চেহারার লোক আমাদেরই দিকে তাকিয়ে ডাকছেন। যুবক শিবরাম চক্রবর্তীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার নাম যে পল্টু নয়, সে ই অন্তত আমি ভালোরকমই জানি। আবার পল্টু, পল্টু ডাক শুনে আমি ওঁকে বললুম, আপনাকে ডাকছেন বোধহয়। আপনার ডাকনাম পল্টু বুঝি?

হ্যাঁ।

—তাহলে আপনি শিবরাম নন শিবরামের ডাকনাম কখনো পল্টু হতে পারেনা!

পিছন থেকে সেই লোকটি এসে বলল, ও বুঝি তোমায় বলেছে, ও শিবরাম। ব্যাটা মহাজোচ্চোর! শিবরাম হচ্ছি আসলে আমি, আমার নাম শিবরাম সেন—একথা বলেই লোকটার কী হাসি।

আমি বললুম, কিন্তু আমি তো শিবরাম চক্রবর্তীকে খুঁজছি। সেন তো না!

ঐ হোল। আমিই আস্তে-আস্তে চক্রবর্তী হয়ে উঠব। শুনবে? আমি মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়ির তক্তায় শুয়ে শুক্তো খাই। স্ত্রীকে দিয়ে জামাটা ইস্তিরি করিয়ে নিয়ে মিস্তিরি খুঁজতে যাচ্ছিলুম এমন সময় চটির সঙ্গে চটাচটি হয়ে—

প্রাগুক্ত যুবক বললেন, ধুৎ! বাজে! সব মুখস্ত। কেন ছেলেটাকে শুধু-শুধু ঠকাচ্ছ? আমার মতন বানান নিয়ে বানানোর ক্ষমতা আছে তোমার? এসো না কমপিটিশন হয়ে যাক!

—কমপিটিশনে কে জজ হবে?

—কেন, এই ছেলেটি!

—উঃ, যদি কারুকে কম পিটি কারুকে বেশি পিটি করে?

আচ্ছা, ঐ তো বড়দা আসছেন, বড়দাকে জাজ করা যাক।

একজন সৌম্য চেহারার, প্রৌঢ় আসছিলেন। বিশাল দেহ, মাথাভর্তি চকচকে টাক, সোনার চশমা, গরদের পাঞ্জাবি, হাতে ছড়ি। মনে হয় কোন রিটায়ার করা জমিদার বিকেলের ভ্রমণে বেরিয়েছেন। লোকদুটো ওঁর কাছে গিয়ে বললে, বড়দা, আপনি বিচার করে বলুন তো আমাদের মধ্যে কে সত্যিকারের শিবরাম?

প্রশান্ত হাস্যে সেই প্রৌঢ় আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে দেখে খুশি হলাম। পাঠকদের দেখা পাওয়াই তো আমাদের সৌভাগ্য। এই দুটোর কোন কথায় কান দিওনা। ওরা হচ্ছে রামশিব, আমিই হচ্ছি আসল শিবরাম। শিবরামের Soul! আর কারুর কথায় বিশ্বাস কোরো না, আমার কোন ব্রাঞ্চঅফিস নেই!

লোকদুটো বলল, বড়দা, এ কী হচ্ছে? এ আপনার অন্যায়!

রহস্যময়ভাবে প্রৌঢ় বললেন, আমিই যে আসল শিবরাম, তোরা এতদিন জানতে পেরেছিলি? অবশ্য, এখন আমি প্রমাণ দিতে গেলে তোদের কাছে হেরেও যেতে পারি। জানিস তো, বার্নার্ড শ-এর মতো গদ্য কে লিখতে পারে, এই নিয়ে একবার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। স্বয়ং বার্নার্ড শ-ও তাতে ছদ্মনামে লেখা পাঠিয়ে পেয়েছিলেন মোটে তৃতীয় পুরস্কার। তেমনি তোদের কাছে আমি হেরে গেলেও—

যুবাটি বলল, আপনার চালের ব্যবসা, আপনি লাকি ম্যান তা বলে চালাকি করছেন এখানে? আপনি যদি শিবরাম চক্রবর্তী হন তো, আপনার চুল কোথায়? শৈল চক্রবর্তীর সব ছবিতে আছে, কপালের পাশে একগোছা চুল এসে পড়েছে, এই দেখুন না, আমার মতন—

প্রৌঢ় হঠাৎ চুপসে গিয়ে বললেন, ওসব আগেকার ছবি। আগে যখন আমার চুল ছিল—

—বাজে কথা। কুড়ি বছর ধরে আপনাকে দেখছি এইরকম গোল আলুর মতন মাথা, জন্মো থেকে আপনার টাকালু!

এরপর সেই তিনজন লোক শিবরামত্ব নিয়ে মহা ঝগড়া আরম্ভ করে দিল। আমি কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তারপর দৌড়ে চলন্ত ট্রামে উঠে পড়লাম।

শিবরাম চক্রবর্তীর সঙ্গে তারপরও আমার কোনদিন দেখা হয়নি। দেখা হবেওনা জানি। আমার ধারণা শিবরাম চক্রবর্তী নামে বোধহয় কোন লোক নেই। শিবরাম চক্রবর্তী আসলে অনেকগুলো লোক।

১২

মানুষের মধ্যে আমি মাংসাশী শ্রেণীভুক্ত। চোয়ালের দু' ধারের দিকে যে চ্যাপ্টা, চেরা জোরালো দাঁতগুলি থাকে—আমার সেগুলি অটুট। এবং বারট্রাণ্ড রাসেলের মতে মানুষের এই মাংস-ছেঁড়া কুকুরদাঁতগুলি ক্রমশই নাকি শক্ত ও দীর্ঘ হয়ে উঠছে।

যখনই কলকাতা ছেড়ে তিন-চারজনে মিলে বেড়াতে যাই, স্টেশনে নেমে মালপত্র রাখতে-না-রাখতে খোঁজ শুরু হয়ে যায়, এখানে মুরগি পাওয়া যায় তো? দামে সস্তা তো? বাড়িঘর তুচ্ছ, আকাশে মেঘ জমেছে না ফটফট করছে নীল রং কোন বিখ্যাত ঝর্না আছে না দেবমন্দির—এসবকিছুতেই কিছু যায়-আসেনা, সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, মুরগি আছে তো? মুরগি? আমার এক সমুদ্র-পাগল বন্ধু কোনদিন আর দীঘায় যাবেননা বলেছেন, কারণ সেখানে মুরগি পাওয়া যায়না। বিশাল সমুদ্রও মুরগির তুলনায় কিচ্ছু না! বরং তিনি খানাডোবার পাশে বসেও মুরগি পেয়েও তৃপ্ত। চম্পাহাটিতে আমাদের এক বন্ধু বাড়ি তৈরি করেছেন, একদিন আমাদের বললেন, চল না আমার নতুন বাড়িতে একদিন বেড়িয়ে আসবি, সারাদিন, থাকবি, বেশ চমৎকার—। সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের সমস্বরে প্রশ্ন, মুরগি পাওয়া যায় তো?

কলকাতা শহরে থেকে যে-যুবা কোনদিন বাজার করতে যায়নি সেও রাঁচী-দেওঘর-মধুপুরে বেড়াতে গিয়ে প্রত্যেক সকালে বাজারে ছুটে যায়। বাজারের বাহিরের দিকে বসা সারি-সারি মুরগিওলা, সাদা-কালো-হলুদছিটে জ্যান্ত পাখিগুলো পা-বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছে মুখ থুবড়ে, ডানা ধরে হিঁচড়ে এক-একটাকে তুলে মনে-মনে ওজনটা বুঝে নেবার চেষ্টা, পেটের দিকের ছোট পালকগুলো ফুঁ দিয়ে সরিয়ে দেখে নেওয়া যে চর্বি ঠিক মতো আছে কিনা। তারপর দরদাম, কথা বলার সময় হাতের দামি সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা, কিন্তু সামান্য চারআনা দাম কমাতে পারলেও অভূতপূর্ব আনন্দ!

বছর সাতেক আগে, আমরা চারজন মধুপুর স্টেশনে পা দিয়েছি সকাল এগারোটা আন্দাজ। সারা ট্রেনে হৈ-হল্লা করতে-করতে এসেছি, মাথার ওপর গনগন করছে রোদ, খিদে পেয়েছে সমান পাল্লায়। এক বন্ধুর বাড়ি ছিল মধুপুরে, সেই বাড়ির মালি এসেছে স্টেশনে, প্রথমেই খবর দিল যে আমাদের জন্য রান্না তৈরি। ছুটোছুটি করে স্নান সেরে আমরা খাবার টেবিলে বসেছি তরকারিফরকারি কীসব ছিল—কিন্তু কে সেকথা মনে রাখে? এছাড়া ছিল উত্তম বড় জাতের চিংড়ি ও কনুই-ডোবা বড়-বড় জামবাটিতে উত্তম খাসির মাংস। সে তো খাওয়া নয়

—যেন ব্যালে নাচ, চারজনের হাত সমান-সমান তালে উঠছে-নামছে, কড়মড় শব্দ, তাল রাখার জন্য মাঝে-মাঝে অট্টহাস্য। তখনো খাওয়া শেষ হয়নি, এমন সময় বাগানের গেট ঠেলে দুজন সাঁওতাল স্ত্রীলোক। ওবা খবব পেয়েছে যে, এ বাড়িতে বাবুবা এসেছে, বাবুদের কাছে ওরা মুবগি বিক্রি করতে এসেছে।

মুরগি। মুবগি। এঁটো হাতে আমরা ছুটে এলাম বাইরে—টেবিলে খাসিব মাংস ফেলে রেখে। কই দেখাও মুরগি, ক'টা আছে, দাম কত? গুটিকতক দেশি মুবগি, বোগা, করুণ, জলে-ডোবা মানুষের মতো চোখ। পায়ে দড়ি বেধে সাঁওতাল মেয়েদুটি ওদের কাধে ঝুলিয়ে এনেছে, এবাব মাটিতে নামিয়ে বাখল। সবশুদ্ধ পাঁচটা, তার মধ্যে চাবটেই সমান ছোট—প্রায হাতেব মুঠোর সাইজ; আব একটা একটু বড়ো তেজি, অহংকারী ঘাড়। এক বন্ধু বললেন, এঃ। এত ছোট-ছোট —এগুলো কী খাব—এ তো এক-এক গ্রাসে। অপববন্ধু মুখ ফিরিয়ে বললেন ইংবাজিতে (যাতে বিক্রেতারা না-বুঝতে পারে) না, না, এই দেশি মুরগিরই স্বাদ ভালো—লেগহর্ন, রোড আয়ল্যাণ্ডেব চেয়ে এগুলো অনেক বেশি টেস্টফুল। সাওতাল মেযেদুটো কী বুঝল কে জানে, সারা শরীবময হাসি জাগিয়ে পিজিন বাংলায যা বলল, তার ভাবার্থ, এই কুঁকড়োগুলো দেখতে ছোট হলেও ওজনে ভাবী। দেখতে খাবাপ কিন্তু কাজে ঠিক!— এই বলে হাত দিয়ে ঠোনা মাবল সেই পিট-পিট করে চেয়ে-থাকা কৃষ্ণের জীবগুলিকে। সেগুলো কক-ক-কক করে উঠল। আমাদেব এক বন্ধু সেদিকে তাকিয়ে মুখে ঝোল টানাব মতো শব্দে বললেন, আঃ। এগুলোকে আজবাত্রে আমি নিজেব হাতে বোস্ট কবব। দেখবি, আমাব রান্না একবাব খেলে জীবনে আব ভুলতে পাববিনা।

তখনো আমাদেব এঁটো হাত, এবেলার খাওয়া শেষ হয়নি। আমরা সাঁওতাল মেয়েদুটিকে অবলীলাক্রমে ঠকিয়ে চমকপ্রদ সস্তায মুরগিগুলো কিনে কয়লা বাখার ঘরে বেখে দিলাম। তারপর খাওয়া শেষ কবে ডুবে গেলাম তাস খেলায।

সূর্য ডুবে যাবার পবও আকাশে আলো ছিল, বাগানে চেয়ার পেতে আমরা বসে চা খাচ্ছি। মধুপুব জায়গাটাব একটা সবচেয়ে বড গুণ এই যে—কোন দর্শনীয় স্থান নেই সেখানে। কোন প্রাচীন মন্দিব কিংবা ছোট পাহাড় নেই কাছাকাছি—তাহলে আমবা সেগুলো দেখতে যেতে বাধ্য হতাম। কোথাও বেড়াতে গেলে এইসব দেখতে যাওয়াই নিয়ম, না-যাওয়া পর্যন্ত সারাক্ষণ অস্বস্তি থাকে—একমাত্র মধুপুরেই শুধু বাগানে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকলে কোন আত্মগ্লানি আসেনা। একমাত্র অসুবিধে, ওখানকার আকাশটা বড্ড বড়, বিকটরকমের বিশাল—তার নিচে খুব ছোট হয়ে বসে থাকতে হয়।

অন্ধকাব নামতেই, আমাদের রন্ধনবিদ বন্ধু বললেন, এবার মুরগিগুলো কাটা যাক। ছুরি নিয়ে আয়।

আমি বাড়ি থেকে দুটো বড়ো চকচকে ছুরি নিয়ে এলাম। একটা তাকে দিয়ে আর-একটা নিজের হাতে। কয়লাঘর থেকে মুরগীগুলো বার করে ঝুলিয়ে এনে ছুঁড়ে দিলাম মাটিতে ! তারপর একটার পায়ের দড়ি কেটে দিলাম। বন্ধু বললেন, সাবধান, দেখিস পালায় না যেন। আমি বললুম, না, না, তোকে অত সর্দারি করতে হবেনা ! কিন্তু যা ভুল করার আমি করে ফেলেছি। বন্ধু চেঁচিয়ে ধমকে উঠলেন, এই নীলে, তুই কীরকম উল্লুকের মতো কাজ করলি দেখ তো ? আমি বুঝতেই পারিনি, একটা দড়ি দিয়েই পাকিয়ে-পাকিয়ে সবগুলোকে বাঁধা ছিল, দড়ি কাটতেই সবগুলো একসঙ্গে ছাড়া পেয়েছে। তিনটেকে তক্ষুনি খপখপ করে ধরে ফেলা হল, বাকি দুটো একটু দূরে গিয়ে ডানা ঝাপটাতে লাগল। অবিকল মেয়েদের চুল ঝাপটা দেওয়ার ভঙ্গি ওদেরও। লঘু পায়ে তির-তির করে ঘুরতে লাগল সেই বড়টা আর সবচেয়ে ছোটটা। আমরা গুটি মেরে এগিয়ে ওদের ধরার চেষ্টা করতেই কককক করে উড়ে একটু দূরে চলে গেল। আমাদের দলপতি বললেন, দাঁড়া পালাবি কোথায়, এক্ষুণি তোদের জান নিয়ে নেব। এই, বাগানের গেট বন্ধ কর, টর্চ নিয়ে আয় !

তারপর শুরু হল আমাদের অভিযান। বুক সমান উঁচু দেয়ালঘেরা বাগান তার মধ্যে আমরা চারজন যুবা, হাতে টর্চ ও ছুরি, যেন একটি দস্যুদল—তাড়া করতে লাগলাম সেই দুটো মুরগিকে। মুখে আমাদের হা-হা চিৎকার, টর্চের আলোয় ঝলসে উঠছে ছুরি, আমাদের ছুটোছুটি সারা বাগান জুড়ে, কিছুতেই ওদের ধরতে পারিনা। চারজনে চারদিকে দাঁড়িয়ে, মাঝখানে ওরা দুজন নিরস্ত্র, আমরা আস্তে-আস্তে গোল করে ওদের দিকে এগিয়ে যাই, সাবধানে, আমাদের হাতের মুঠো খোলা, ঠিক ঝাঁপিয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে ওরা পরস্পর চোখের ইশারা করে নিয়ে উড়াল দেয়, আমাদের মাথা ছাড়িয়ে চলে যায় অন্যদিকে। ওরা দুজনে ছিটকে যায় দুদিকে, আবার ওরা কাছাকাছি চলে আসে, হিলতোলা জুতো পায়ে হাঁটার ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক যায়, অন্যপাশে বাঁধা বাকি তিনটে মুরগি চিৎকার করে বোধহয় ওদের সাবধান করে দেয়।

আধঘণ্টা ছুটেও ধরতে পারিনা, আমাদের তখন রক্তচক্ষু মাথায় খুন চেপে গেছে। একবার ছোট মুরগিটা একটু কাছাকাছি আসতে একজন সারা শরীর নিয়ে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। মুরগিটা ওর দেহের ভারে চেপটে গিয়ে মারা পড়লো তখুনি। আমরা উল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। বড়টা তখনো অকুতোভয়, ঘাড় উঁচিয়ে আমাদের খেলাতে লাগল। সে একবার সটান উড়ে আসতে লাগল আমাদের দিকে, যেন চোখ খুবলে নেবে—কিন্তু মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। আমাদের দলপতির মুখ তখন ভয়ংকর হিংস্র, মুরগিটার দিকে দশ গজ দূরে

দাঁড়িয়ে ছুরি তুলে কর্কশ স্বরে বলল, আজ তোরই একদিন কী আমারই একদিন! তারপর ছুরিটা টিপ করে ছুঁড়ে মারল ওর দিকে। সোজা লাগল গিয়ে সেই উঁচু-করা গলায়, মুরগিটা মাত্র দু-তিনবার ছটফট করেছিল। আমাদের বিজয় সম্পূর্ণ হল।

সেই রাত্রে একবন্ধু খাবার সময় বমি করে ফেলে। তারপর থেকে সে আর মাংস খায়না। আমি অবশ্য মাংস ছাড়িনি, মাংস আমার প্রিয় খাদ্য, মুরগি তার মধ্যে পরম প্রিয়। কারণ, এই মাংস আমার ভালো লাগে—আর যা ভালো লাগে, তা পাবার জন্য এরকম ছোটখাটো চক্ষুলজ্জা থাকলে চলেনা।

খেতে ভালো লাগে, এইটাই আমার নিজস্ব যুক্তি। এছাড়া, সভ্যতা আমাকে আরো যুক্তি শিখিয়েছে। প্রোটিন! মুরগির মাংসে যে প্রোটিন আছে, তা আমাদের শরীরের পক্ষে খুবই জরুরি! এমন অনেক রুগী আছে, মুরগির জুস খাওয়াতে না-পারলে তাদের বাঁচানোই নাকি মুস্কিল। একটা কথা আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, মুরগিদেরও তো খুব অসুখ করে! মানবশিশুর পক্ষে গরম দুধ না হলে চলেই না, অথচ গরুর বাচ্চারা দুধ না-খেয়ে কী করে বেঁচে থাকে, কে জানে! আমাদের যুক্তি আছে, পশুদের যুক্তি নেই!

১৩

আমি এখন জীবনের সেই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আছি যেখান থেকে জন্ম এবং মৃত্যু সমান দূর বলে মনে হয়। অথবা মৃত্যুকে মনে হয় খুবই কাছে, মৃত্যু তো জন্মের পর থেকেই খুব বিশ্বস্তভাবে কাছে দাঁড়িয়ে থাকে। যাই হোক, এই সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমি একটি সমস্যায় খুবই পীড়িত বোধ করি, একটি ছেলে কোনদিন থেকে হঠাৎ একজন লোক হয়ে যায়? চঞ্চল লঘুমতি ছেলেটিকে কবে থেকে পৃথিবী বলবে, ঐ লোকটা—

এই প্রথম শীতের রোদ্দুর অপরাহ্নে যখন পথ দিয়ে একা হেঁটে যাই, মন অস্থির হয় নানাকারণে। কোনদিকে যাব, মনে পড়েনা। আমি কোন জায়গা থেকে আসছি, না কোন জায়গায় যাচ্ছি, বুঝতে পারিনা। অর্থাৎ পিছন থেকে কোন মানুষ আমাকে এইমুহূর্তে দেখলে বলবেন, আপনি ঐদিকে যাচ্ছিলেন দেখলাম। আবার সামনে থেকে কেউ এই একই মুহূর্তে আমাকে দেখে বলবেন, আপনি এইদিকেই তো আসছিলেন...। জীবন এখন এইরকম।

এই ভারী সন্ধেবেলা একা হাঁটতে-হাঁটতে আমি অলস নয়নে পৃথিবীর

আটদিকে তাকিয়ে দেখি। যদি কোন চেনামুখ চোখে পড়ে। না, কারুকে দেখিনা, এইসময় কেউ তো একা থাকেনা, যে অপর একটি একলা মানুষকে চিনতে পারবে! কারুকে না পেয়ে, আমি নিজের সঙ্গেই দেখা করার চেষ্টা করি। কিন্তু নিজের সঙ্গে দেখা করা খুব কঠিন, অধিকাংশ সময়েই শুনতে হয়, উনি বাড়িতে নেই, বেরিয়ে গেছেন। কিংবা রূঢ়ভাবে, এখন খুব ব্যস্ত, দেখা হবেনা। বস্তুত, নিজেকে আমি কোনদিনই দেখিনি, কোনদিনই নিজের নাম ধরে ডাকিনি। আমি কী করে জানব, আমি ক্রমশ ছেলে থেকে লোক হয়ে যাচ্ছি কি না! ভবিষ্যৎ তো জানিনা, নিজের কথা ভাবলেই মনে পড়ে ছেলেবেলার কথা,—তেঁতুলের আচার, ঘুড়ি-মাঞ্জা, শিবরাম-হেমেন্দ্রকুমারঘটিত উত্তেজনা, একমাইল পথ বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে কোন এক কিশোরী মেয়ের সামনে দুরু-দুরু বুকে দাঁড়ানো, ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি থেকে ফেরার পথে একটি চশমা-পরা যুবতীকে কিছুই বলতে না-পারার লজ্জা। আর কিছুই মনে পড়েনা। এসব কী কোন ছেলেমানুষী কাজ, না, কোন লোকের উচিত ব্যবহার, বুঝিনা। পথের লোক আমাকে দেখে কী বলছে, ঐ ছেলেটা, না, ঐ লোকটা? ও আসছে, না, ও যাচ্ছে?

লোক হবার কী কী চিহ্ন আমি খোঁজার চেষ্টা করি। বয়েসের কথা ভেবে কোন সুবিধে হবেনা, কারণ আমি আমার ছোটভাইয়ের চেয়ে বয়েসে বড়, কিন্তু আমার দাদার চেয়ে নিশ্চয়ই বয়েসে ছোট। আমার জুলপিতে দু'-তিনটে পাকা চুল। এই কী লোক হবার চিহ্ন? কিন্তু অমুকবাবু আমার চেয়ে অন্তত আঠারো বছরের জ্যেষ্ঠ, কিন্তু তাঁর মুখমণ্ডলের প্রতিটি কেশ-রোম ভ্রমরকৃষ্ণ। একটিও আধ-সাদা পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু অমুকবাবু যদি লোক না হন, তবে পৃথিবীটাই ছেলেমানুষীতে ভরা বলতে হবে। অপরপক্ষে, আমার সেজো পিসিমার ছোট ছেলে (সংক্ষেপে, আমার পিসতুতো ভাই বলাই উচিত ছিল বোধহয়)—যার বয়েস আমার চেয়ে অন্তত দেড়যুগ কম, তার মাথার অধিকাংশ চুলই পাকা—লিভার না কিডনি না হৃদয়ঘটিত কী দোষে যেন, সেও নিশ্চয়ই এই পক্ককেশ গুণে লোক হয়ে ওঠেনি। ক্রিকেটের বল লোফালুফি করতে করতে সে এখনো পিসেমশাইয়ের ভাতের থালায় ফেলে দিয়ে খাওয়া নষ্ট করে—এটাকে নিশ্চয়ই ভদ্রলোকোচিত কাজ বলা যায়না।

তুমি-আপনি সম্বোধন থেকেও কিছুই বোঝা যায়না। যেমন কোন অপরিচিত ভদ্রলোক যদি প্রথম আলাপেই আমাকে তুমি বলে কথা বলেন, আমি বিরক্ত হয়ে উঠি,—আবার, কোন অচেনা ছেলে বা মেয়ে যদি প্রথমেই এসে আমাকে অমুকদা বলে ডাকে, তাহলেও রাগে আমার গা জ্বলে যায়। এও সেই, যাচ্ছি না আসছি —সেই সমস্যা! মেয়েরাও ঠিক কবে থেকে একটি মেয়ে থেকে হঠাৎ মহিলা

হয়ে ওঠেন, তাও বোধহয় একটা সমস্যা। ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরার দিনই কী সেই সীমান্ত? কিন্তু, এ সম্পর্কে আমার কিছু জানার কথা নয়!

তবে কী অভিজ্ঞতাই একটি ছেলেকে লোক করে তোলে? জীবনের কোন-কোন ঘটনাকে ঠিক অভিজ্ঞতা বলে আমি বুঝতে পারিনা। জীবনে যা কিছু ঘটে সবই কী অভিজ্ঞতা, নাকি কোন-কোন বিশেষ ঘটনা? আমি বেছে নিতে পারিনা। এক হিসেবে জীবনের সব ঘটনাই মূল্যবান, আবার সব ঘটনাই অর্থহীন। জীবনের কোন-কোন ঘটনাকে অভিজ্ঞতা বলে, তা-ই যদি বুঝতে পারতাম, তাহলে আর জীবন এত দুর্বোধ্য কেন?

নিজেকে দেখতে পাইনা, তাহলে ছেলেবেলা থেকেই যারা আমার বন্ধু তাদের দিকে তাকিয়ে দেখা যাক। তারা কী সবাই লোক হয়ে গেছে? এক বন্ধু বিদেশ থেকে ফরাসি বউ নিয়ে এসেছে, এক বন্ধু বিদেশে গিয়ে থেকেই গেল, আর ফিরবেনা। চম্পাহাটিতে জমি কিনে কলোনি বানাচ্ছে এক বন্ধু। মানুষ খুন করে আর-একজনের যাবজ্জীবন জেল হয়ে গেল। একজন তার সদ্য জন্মানো মেয়ের গল্প করে সবসময়, আর-একজন তার সদ্য কেনা মোটরগাড়ির। একজন দুহাজার টাকা মাইনের চাকরি পেয়েছে, আর-একজন আজন্ম বেকার, কেউ ঠিকসময় খায় ঠিকসময় বাড়ি ফেরে, কেউ কখনো ফেরে কখনো ফেরেনা—অখাদ্য-কুখাদ্য খায়, কেউ ছেলেবেলার হাসিখুশি মুখ এখন দুঃখিত করেছে, কেউ শৈশবের নির্বোধ জড় খোলশ থেকে বেরিয়ে এসে হতে পেরেছে সরকারি অফিসার। যে-মেয়েটিকে ভাবতাম রোগা হতে-হতে একদিন বাতাসে উড়ে যাবে, সে এখন স্কুলের হেডমিস্ট্রেস হয়ে, হেডমিস্ট্রেস সুলভ বিশাল বপু। (খুন করে যে যাবজ্জীবন জেল খেটেছে, তার কথা এমন সহজভাবে উল্লেখ করা আমার উচিত হয়নি। আমি এত নির্লিপ্ত নই। সেই সবচেয়ে আশ্চর্য? প্রত্যেক লোকেরই এমন বন্ধু থাকেনা। কলেজের গোড়া থেকে কুশলের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তাম। সে ছিল একটু রাগী বা একগুঁয়ে, যাকে বলা যায় আদর্শবান। তার মনের জোর ও ক্রোধ দেখে আমরা ভাবতাম, কুশল একদিন সত্যিই বড় হবে—আমরা সবাই কে কোথায় হারিয়ে যাব, মিশে যাব জনতায়, কিন্তু কুশল আমাদের সকলকে ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যাবে। কলেজের শেষ পরীক্ষা দেবার আগেই কুশল ফিরে গেল কলকাতা থেকে ৩০ মাইল দূরে নিজের গ্রামে, সেখানে হাস-মুরগি প্রতিপালন এবং সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। আমাদের সাংবাদিক বন্ধুর কাছে কুশল প্রায় আসত ওর গ্রামের নানারকম খবর ছাপাতে। কুশলের নাম আলাদাভাবে দুবার কাগজে বেরিয়েছিল। মাঝরাত্রে দুটো চোরকে তাড়া করে প্রাণ বিপন্ন করে কুশল তাদের ধরেছিল। ম্যাজিস্ট্রেট সভা করে কুশলকে তার অসমসাহসিকতার জন্য সাধুবাদ

জানান এবং গ্রাম রক্ষার জন্য কুশলের নামে একটি বন্দুকের লাইসেন্স মঞ্জুর করেন। সেই প্রথমবার। আবার। সেই কুশলই পাশেব বাড়ির একটি ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করতে-করতে হঠাৎ রাগের মাথায় বন্দুক দিয়ে তাকে গুলি করে। আদালতে দোষ স্বীকার করেছিল বলে, তার ফাঁসী হয়নি, যাবজ্জীবন জেল হয়েছে। কোথায় কোন অন্ধকার জেলের ঘরে কুশল বসে আছে, তার সেই নির্ভীক মুখ এখন কুঁচকে গেছে কিনা কে জানে! তার কথা আমার মনে আনা ঠিক হয়নি!)

আমার মনে হচ্ছে, এই যেসব মিশ্রিত স্বভাব বন্ধুবান্ধব, এদের ক্রিয়াকলাপের উল্লেখ করলে মনে হয়, এরা প্রত্যেকেই লোক। এসব ছেলেমানুষের কাণ্ড নয়। কিন্তু যখনই মুখ মনে করি যে-কোন একজনের, কিছুতেই সেই মুখের মধ্যে লোক-লোক ভাব খুঁজে পাইনা। সেদিন একটি আটবছরের ছেলে আমাকে 'কাকাবাবু' ডাকছে শুনে আঁতকে উঠেছিলাম প্রায়। কী সর্বনাশের কথা! যে-ছেলেটি ডাকছে, পাশে দাঁড়ানো তার পিতৃদেব আমারই আবাল্যের বন্ধু। কিছুতেই আমার চেয়ে বয়েস বেশি হতে পারেনা। তাহলে, আমার এই বন্ধু নিশ্চয়ই লোক হয়ে গেছে। কারণ, ছেলের বাবা, কখনো নিজেও ছেলে হতে পারেনা। লোকেরই ছেলে হয়, কোন ছেলের ছেলে হওয়া একটি অভূতপূর্ব ঘটনা! হু, এতক্ষণে বুঝলাম, বিয়ে করলেই একটা ছেলে হঠাৎ একটা লোক হয়ে যায়!

নাঃ, এতেও কিন্তু সমস্যা মিটলনা। আবার ভেবে দেখলাম, ঐ আট বছরের ছেলেটির পিতা সমেত অন্যান্য বিবাহিত বন্ধুদের সম্বন্ধে যখন আড়ালে আলোচনা বা নিন্দে করি (বলা বাহুল্য, আড়ালে হলে নিন্দেই বেশি)—তখন তো কখনো বলিনা, আমার বন্ধু অমুক লোকটা..., বরং বলি, অমুক ছেলেটা একটা হাড়হারামজাদা...ইত্যাদি। ছেলেবেলা থেকেই যাকে ছেলে বলে ভেবে আসছি, তাকে কোনদিনই হঠাৎ লোক বলতে পারবনা। তাহলে কী, এইবকমই চলবে চিরকাল? শৈশব থেকে একই সঙ্গে পাশাপাশি বাড়িতে পঞ্চাশ-যাট-বছব ধরে আছেন, এমন দুই বৃদ্ধ কী পরস্পরের সম্বন্ধে আডালে উল্লেখ কবেন ছেলেটা বলে? এক পক্ককেশ বৃদ্ধ, তাঁর অপর সমবয়সী বন্ধু সম্পর্কে কী বলেন, আমাব বন্ধু ঐ ছেলেটা ভাবী ..। এই দৃশ্যটা ভেবে আমি নিজেই একা-একা খুক-খুক করে হাসতে থাকি? এতো ভারী গোলমেলে ব্যাপার দেখছি। হঠাৎ এ সমস্যায কেন জড়িয়ে পড়লাম?

এরকমভাবে একা-একা হাঁটতে-হাঁটতে আমি বহুদূর চলে যাই। সন্ধে অনেক গাঢ় হয়ে এসেছে, মনে হয় যেন আমি পৃথিবীর আটদিকই ঘুরে এলাম। এখন আমি বাকি দুদিক—অর্থাৎ উপরে বা নিচেও ঘুরে আসা যায় কিনা যখন ভাবছি, সেইসময়েই একজনের সঙ্গে ধাক্কা খেলাম। মুখ তুলে দেখি, আমারই এক বন্ধু।

সে বলে, কী রে, কোথায় যাচ্ছিস? আমি তো তোর ওখানেই আসছিলাম।

আমি অপ্রসন্ন মুখে বললুম, আমি আবার যাচ্ছি কোথায়? আমিই তো এদিকটায় আসছিলাম, তুই যেতে-যেতে ধাক্কা দিলি!

সে অবাক হয়ে বলল, সে কী! তুই-ই তো আনমনে এদিকে কোথায় যেন যাচ্ছিলি, আমিই বরং হন্তদন্ত হয়ে আসছি তোর সঙ্গে দেখা করার জন্য!

আমি মুখ কালো করে বললুম মোটেই না, আমিই আসছি, তুই যাচ্ছিস। বন্ধুটি আমার কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে হো-হো করে হেসে বলল, তোর হয়েছে কী আজ? আচ্ছা, এখন তো আমরা কেউই আসছি বা যাচ্ছিনা। এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, সেই ভালো, আয় এখানেই দাঁড়িয়ে থাকি মাঝপথে। অনেকক্ষণ—অন্তত যতক্ষণ পারা যায়।

১৪

বন্ধু আর বন্ধুপত্নী রেস্তরায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন। আমার সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। আরেঃ, কী খবর! কতদিন পর দেখা...এসো একসঙ্গে চা খাই!

চায়ের আগে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য, পরে নানান কথাবার্তা। এতদিন অন্ধকারের পর রাস্তার ইলেকট্রিকের আলো এখন দ্বিগুণ উজ্জ্বল। বন্ধুপত্নী প্রশ্ন করলেন, পুজোয় কোথাও বাইরে যাচ্ছেন?

উত্তর দেবার বদলে আমি ইহুদীদের কায়দায় পাল্টা প্রশ্ন করি, আপনারা?

শরৎকালে সব মেয়েরাই সুন্দরী হয়ে ওঠে। পুজোর ঠিক আগের কয়েকটা দিন এত সুন্দরী মেয়ে যে কলকাতার রাস্তায় কোথা থেকে আসে ভেবে পাইনা। কলকাতা শহরের পথ আমার কোনদিন একটুও সুন্দর লাগেনি, অথচ এই সময়টা সারা শহর উজ্জ্বল, ঝাঁকে ঝাঁকে মেয়ে হঠাৎ সুন্দরী হয়ে উঠে পথ আলো করছে। প্রত্যেকের মুখে অস্পষ্ট নীল ছায়া। চোখে চকচক করে কৌতুক। পথের যে-কোন নারীর দিকেই তাকিয়ে আমি তাঁকে 'বিশ্বসুন্দরী' আখ্যা দিয়ে বসি মনে-মনে। এই বন্ধুপত্নীকে আমি কোনদিন উল্লেখযোগ্য ভাবিনি, অথচ আজ ওঁকে এমন রূপসী দেখাচ্ছে যে, অনেকক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। তিনি অভূতপূর্ব মধুর হাস্যে বললেন, আগে ঠিক ছিল কাশ্মীর যাব...। কিন্তু, জব্বলপুর যাচ্ছি!

—জব্বলপুর! কোথায় থাকবেন?

—বাঃ, আপনি জানেননা, আমার ছোট ননদের বিয়ে হয়েছে ওখানে...

বন্ধু বললেন, তুই তো চিনতিস আমার বোন ললিতাকে?

আমি অস্পষ্ট স্বরে বললাম, হুঁ! ওর বিয়ে হয়ে গেছে জানতামনা!

—ওর স্বামী ওখানকার গান-শেল ফ্যাক্টরির বিরাট অফিসার। চমৎকার কোয়ার্টার আছে, খাবার-দাবার এখনো ভালো পাওয়া যায় শুনেছি। মাংস আড়াই টাকা কিলো, আর নর্মদার মাছ—

বাঃ চমৎকার! আমি তাহলে আজ চলি!

আপনিও চলুন না আমাদের সঙ্গে জব্বলপুরে। জ্যোৎস্নায় মার্বেল রক দেখবেন। ললিতা খুব খুশি হবে।

—নাঃ! গেলে খুব ভালো লাগত নিশ্চয়ই, কিন্তু আমার অন্য জায়গায় যাবার কথা আছে। দুমকায় আমার এক বন্ধুর কাছে। হরিণের মাংস খাওয়াবে বলেছে!

—হরিণের মাংস এমন কিছু সুখাদ্য নয়।

দুমকায় আমার কোন বন্ধু নেই। হরিণের মাংস খাবার ইচ্ছে আমার সারাজীবনে হয়নি। যে-প্রাণী দ্রুত দৌড়োয় তার মাংস খেতে ভালো হয়না জানি। কিন্তু মেয়েদের সামনে আমি অনায়াসে অভাবনীয় মিথ্যে চট করে বানিয়ে বলতে পারি। দেখলাম, জব্বলপুরের তুলনায় আমার দুমকা ও হরিণের মাংসের সম্ভাবনা খুব খারাপ হয়নি, ওঁদের দুজনের মুখই আলতোভাবে ঈর্ষাকাতর।

ছোট মাসিমার ছেলের অসুখ, তাই নিয়মরক্ষার জন্য দেখতে গিয়েছিলাম। বিয়ে কিংবা অসুখ না-থাকলে আত্মীয়স্বজনদের মুখ দেখার সুযোগ হয়না। নিমকি ভাজা ও চা খেতে-খেতে মাসিমার ছেলের রোগ বিষয়ে খুবই দুশ্চিন্তা দেখালাম। ওঁরা কিন্তু সবাই পরশুদিন গোপালপুর যাবার বিষয়ে আলোচনা করছেন। গোপালপুর-অন-সী। মাসিমা বললেন, তুইও আয় না আমাদের সঙ্গে! সমুদ্রের ওপরেই খুব বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছি, রান্না করার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে যাচ্ছি —চল, তোরও হাওয়া বদল হয়ে যাবে!

—নাঃ, গোপালপুরে কী যাব! বাজে জায়গা—কিছু দেখার নেই! খালি সমুদ্র আর সমুদ্র আর আঁশটে গন্ধ!

—সে কিরে! গোপালপুর চমৎকার জায়গা, ভিড় হয় না! পমফ্রেট আর গলদা চিংড়ি মাছ যা পাওয়া যায়!

—না ছোটমাসি। আমি জব্বলপুর যাচ্ছি। ওখানে জ্যোৎস্নায় মার্বেল রক দেখা, তার তুলনা হয় নাকি!

—জব্বলপুর যাচ্ছিস? থাকবি কোথায়?

—আমার বন্ধু ওখানে গান-শেল ফ্যাক্টরির বড় অফিসার। চমৎকার কোয়ার্টার আছে—ওর স্ত্রীকেও আমি আগে থেকে চিনতাম—খুব করে যেতে লিখেছে, না গেলে...

তিনজন লেখকবন্ধু যাচ্ছেন কোনারক। রেলের একটা কী কনসেশন জোগাড় করেছে চারজনের—সুতরাং আর-একজন সঙ্গী খুঁজছেন তাঁরা। দুদিন ভুবনেশ্বরে থেকে কোনারকেই ওঁরা থাকবেন আরো পাঁচদিন। সকলেই অবিবাহিত! আমি বললুম, যত পাগলের কাণ্ড! কোনারকে কেউ থাকে নাকি? ওখানে লোকে সকালে দেখতে যায়, বিকালে ফিরে আসে। থাকার জায়গা পাবি কোথায়? ডাকবাংলোয় জায়গা পাওয়া যায়না, গভর্নমেন্টের একটা হোটেল আছে, তার একদিনের চার্জ পঁচিশ টাকা। আর কিচ্ছু নেই! মাঠে শুতে হবে, দেখিস।

—অত কাঁচা কাজ করি নাকি? ওখানকার মিউজিয়মে কাজ করে আমাদের বন্ধু অমুক। তার বাড়ি আছে। পুজোর সময় সে ফ্যামিলি নিয়ে কলকাতায় আসছে, তাকে আমাদের একজনের বাড়িতে থাকতে দেব। আর ওর ওখানে থাকব আমরা। ঐ সমস্ত বিখ্যাত মূর্তি বারবার দেখা হবে—সকাল, দুপুরবেলা, এমনকী রাত্তিরে, প্রত্যেকদিন—ভেবে দ্যাখ।

—না, ভাই, আমি যাচ্ছি গোপালপুর। সব ঠিকঠাক।

—গোপালপুর-অন-সী?

—হ্যাঁ! বাড়িভাড়া নেওয়া আছে। একা থাকব। তোমাদের ঐসব পাথরের মূর্তি সারাদিন দেখা আমার সহ্য হবেনা। আমি গোপালপুরে সারাদিন সমুদ্রে গা ডুবিয়ে পড়ে থাকব—পমফ্রেট আর চিংড়িমাছ খুব সস্তা—

কিন্তু কোনারকের পরিকল্পনাই আমার বেশি পছন্দ হল। না গিয়েই আমি কল্পনায় নিজেকে দেখতে পেলাম কোনারকের ভগ্ন মন্দিরের সামনে দাঁড়ানো, একজোড়া নরনারীর মূর্তির দিকে চেয়ে আছি। রাত্তিবেলা আবছা অন্ধকারে আমি যেন ঘুরছি মন্দিরের চত্বরে।...বাসে দেখা হল চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে, পুজোর বাজার সেরে সপরিবারে ফিরছেন। আমাকে দেখে বললেন, কী হে, তুমি তো সেই বইটা নিতে আর এলে না? আমি তো আবার কালকেই চলে যাচ্ছি—

—কোথায়?

—মধুপুর। বাড়িসুদ্ধ সব। একমাস থাকব।

আমি মুখে একটা সূক্ষ্ম ব্যাঙ্গের হাসি ফুটিয়ে বললুম, মধুপুর! ওঃ!—চন্দ্রনাথবাবুর দুই মেয়ে মণিমালা আর রত্নাও বাবার সঙ্গে রয়েছে—আমি ওদের দিকেই চোখ ফেলে ওরকমভাবে মধুপুর কথাটা উচ্চারণ করি। অর্থাৎ আমার মুখে ফুটে ওঠে, ওঃ, মধুপুর, সেই কলকাতার ভিড়, সেই চেনা মুখ, যেখানেই যাও ঘুরে-ফিরে স্টেশনের কাছে হাজির হওয়া, দুধের সর-পড়া চা—ওখানে আবার মানুষে যায়!

—তুমি কোথাও যাচ্ছ নাকি!

—হ্যাঁ, কোনারক।

—কোনারক ? থাকার জায়গা আছে ?

—হ্যাঁ। বন্ধুর বাড়ি আছে—টানা সাতদিন থাকব—মন্দিরটা খুব ভালো করে দেখব এবার, প্রত্যেকটা মূর্তি দেখে-দেখে নোট করে আনার ইচ্ছে আছে !

চন্দ্রনাথবাবু একজন শিল্পবিশারদ। কিন্তু মেয়েদের সামনে কোনারক বিষয়ে আর আলোচনা করতে চাইলেননা। শুধু বললেন, ইন্টারেস্টিং ! আচ্ছা, ফিরে এসে দেখা ক'রো। শুনব !

বাস থেকে নেমে বাড়ির গলিটা অন্ধকার। কেউ নিশ্চয়ই বালব চুরি করেছে। ঐটুকু পথ হাঁটতে-হাঁটতে আমি চকিতে বহু জাগয়া ঘুরে এলাম। হরিণভরা দুমকার জঙ্গল। জব্বলপুরের মার্বেল পাহাড়ে জ্যোৎস্না। গোপালপুরের সমুদ্র—রাত্রে ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস জ্বলে। কোনারকের বিস্ময়কর মন্দির। এমনকী মধুপুরের লাল রাস্তায়ও একপলক হেঁটে এলাম।

আমি কোথাও যাবনা। আমি এই গলিতেই থাকব।

আমিও চলে গেলে, কলকাতা ছেড়ে যারা গেলনা, সেই সব সাময়িক বিশ্বসুন্দরীদের রূপের তারিফ করবে কে ?

১৫

সকালবেলা কোকিলের ডাকে আমার ঘুম ভাঙে এবং রাত্রে ঝিল্লিরব আমায় ঘুম পাড়ায়। এই লাইনটা পড়েই পাঠক হয়তো ভাবছেন, আমার মতন অকবিও শেষপর্যন্ত কাচা কবিত্ব করতে শুরু করেছে। কিংবা আমি বোধহয় গজদন্তমিনারে বাস করছি। কিন্তু ঘটনাটা সত্যিই।

নোংরা শহরতলীর যে ফ্ল্যাটবাড়িতে আমি থাকি—তার চারপাশে অনেকখানি খোলা জায়গা। সেখানে অযত্নে বর্ধিত অনেকগুলো আম, নিম, বেল, নারকেল ইত্যাদি গাছ রয়েছে। আর সেই গাছে-গাছে অসংখ্য পাখি। পাখির মধ্যে অবশ্য কাকই বেশি আর যেখানে কাকের বাসা—তার কাছাকাছি কোকিলও থাকবে। এছাড়া শালিক আর ছাতারে আর চড়ুইয়ের পাল, মাঝে-মাঝে উড়ন্ত টিয়ার ঝাঁক, ক্বচিৎ কখনো ইস্টুকুটুম, দোয়েল, বুলবুলি, মুনিয়া আর দুর্গা টুনটুনিও দেখতে পাই। পাখির ডাক না-শুনে আমার একটি মুহূর্তও কাটার উপায় নেই।

কিন্তু পাখিরা বিষম অকৃতজ্ঞ। তাঁদের দয়ামায়া কিছুই নেই, আমি লক্ষ করেছি।

যেমন কাকের কথাই ধরা যাক। কাক কেউ পছন্দ করেনা। বনফুলের উপন্যাসের করালী ছাড়া আর কেউ কোনদিন কাক ভালোবেসেছে—এমন কখনো দেখিনি, শুনিনি। কাক অলক্ষ্মী, অশুভ। নির্জন দুপুরবেলা কাকের ডাক শুনলে গা ছমছম করে, মনে হয় পৃথিবীর কোথাও সেই মুহূর্তে মহাবিপদ ঘটে যাচ্ছে। তবু কাকেদের ওপর আমার মায়া পড়েছিল।

আজকাল ভাত কেউ ফেলে দেয়না, মাছও যেটুকু বাজার থেকে আসে—রান্নার পর তা প্রায় কাঁটাশুদ্ধুই চিবিয়ে খাওয়া হয়। তাহলে কাকেরা খাবে কী? এই নিয়ে মাঝখানে আমি চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের বাগানে গোটা তিরিশেক কাক আছে—তাদেব বাঁচিয়ে রাখা তো দরকার। জীব দিয়েছেন যিনি, তিনি আজকাল আর আহার জুটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেননা। কাকেদের জন্য চিন্তা করেও আমি কোন সুরাহা করতে পারছিলামনা। কিন্তু আকস্মিক সুযোগ এসে গেল। মাঝখানে কিছুদিন কলকাতা থেকে পাঁউরুটি উধাও হয়ে গেল। তখন সকালবেলা জলখাবারের জন্যও ববাদ্দ হল হাতে-গড়া রুটি। দুপুরে রুটি, রাত্রিরে রুটি আবার সকালের জলখাবারেও রুটি—ভূতপূর্ব বাঙালের পক্ষে এতখানি সহ্য করা সম্ভব নয়। আমি সকালবেলার জলখাবারের রুটিগুলো ছিঁড়ে-ছিঁড়ে কাকদের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিতে লাগলাম। তিরিশটা কাক তাদের আত্মীয়স্বজন জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাইকে ডেকে এনে জড়ো করল—সেই দৃশ্য দেখবার মতন, শূন্যে একটুকরো রুটি ছুঁড়ে দিই, আর শূন্যপথেই সেটা লুফে নেবার জন্য একপাল কাক ঝটাপটি করে শেষ পর্যন্ত যে-পায়-তার চোখে-ঠোঁটে কী গর্ব। সবগুলোর মধ্যে একটা কাক ভারী চালাক আর সবচেয়ে শক্তিশালী—বেশিরভাগ টুকরো সে একাই পায় —দু-একটা আবার অন্যদের বিলিয়ে দেয়।

সকালবেলা কাক-ভোজন করিয়ে বেশ মজা পাচ্ছিলাম—কিন্তু ক্রমশ ঐ কাকগুলো আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত করে তুলল। গাছ ছেড়ে ওরা বারান্দার রেলিং-এ বসা শুরু করল, ক্রমশ বারান্দা ছেড়ে ঘরে। আমাকে মানুষসমাজের সবচেয়ে বোকা লোক মনে করে ওরা আমার ঘরবারান্দা সবকিছু নিজেদের অধিকারে নিয়ে নিল। আমার খাটের নিচে, আলমারির মাথায় সব জায়গায় ওদের উপদ্রব। যে-কোন খাবারে ওরা মুখ দেবে, দুধের ঢাকনা উল্টে ফেলে তাতে ঠোঁট ডোবাবে, এমন কী খোলাসুদ্ধ আস্ত ডিমও মুখে করে নিয়ে যায়। অসহ্য হওয়ায় শেষপর্যন্ত আমি গুলতি কিনলাম। সবাই বললে, খবর্দার, কাক মেরো না, একটা কাক মারলে বাকিরা তোমার চুল খুবলে নেবে, চোখ অন্ধ করে দেবে। কাকেদের ওপর আমার মহাক্রোধ জেগেছিল। আমি ইঁদুর-মারা-বিষ মেশানো খাবার ছড়িয়ে তিনটে কাককে মারলাম—তাতে ওরা বুঝতেও পারলনা কে ওদের হত্যাকারী—আর জাল

দিয়ে বারান্দা থেকে শুরু করে ঘরের সবক'টা জানলা ঘিরে দিয়েছি।

তারপর কোকিল। কোকিল মানুষের কাছাকাছি আসেনা। পাতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙল কোকিলের ডাক শুনে! আমগাছটার ঘন পাতার আড়াল থেকে একটা কোকিল বাহার রাগে কুহুতান ধরেছে! মনটা খুশি হয়ে গেল। আমি সেই নরম আলোময় ভোরবেলায় স্নিগ্ধ বাতাস মুখে মেখে জানলা দিয়ে তাকালাম। আমগাছের ডগায় সেই কোকিলটাকে দেখা গেল, আমি তার উদ্দেশ্যে বললুম, বাঃ বেশ চমৎকার। আর-একখানা গান কবো তো হে! সে আবার কুহুরব তুলল, আর সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের পাশের ফ্ল্যাট থেকে খাঁচার কোকিলটাও ডেকে উঠল। পাশের ফ্ল্যাটের ভদ্রলোকরা দুমাস আগে এসেছেন, সঙ্গে এনেছেন ঐ কোকিলটা—সেটা কেমন নির্জীব হয়ে পড়ে থাকত, কোনদিন একটু সাড়া-শব্দ করেনি—এই প্রথম তার ডাক শুনলাম। বনের পাখি আর খাঁচার পাখি এক সুরে ডাকছে—এই ব্যাপারটায় আমার কীরকম যেন একধরনের সেন্টিমেন্টাল কষ্ট হল। আমি পাশের ফ্ল্যাটের লোকদের অনেক অনুরোধ করে সেই কোকিলটার মুক্তি দেওয়ালাম। তারপব থেকে শুরু হল দুই কোকিলের পাল্লা দিয়ে ডাকাডাকি সেই আমগাছের মাথায়। কখনো উড়ে যায়, আবার ফের এসে বসে। প্রথম-প্রথম আমাদের খুব মজা লাগত। বাড়িতে লোকজন বেড়াতে এলে আমরা তাঁদের সেই খাঁচার কোকিল আর বনের কোকিলের কাহিনী বলে সেই কোকিলের ডাক শোনাতাম। তারপব ক্রমশ কান ঝালাপালা হয়ে এল। সকাল-দুপুর-সন্ধে জুড়ে অনবরত কোকিলের ডাক শুনতে কারুর ভালো লাগেনা। নানান সময় নানারকম মুড থাকে—সব সময় চোখ বুঁজে কোকিলের দিকে কান ফেরানো যায়না! পুরুষ কোকিল কুহু স্বরে ডাকেনা, তাদের রংও কালো হয়না। সুতরাং ঐ দুটিই মেয়ে কোকিল ওদের অত ভাব কিসের? ওরা যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে ডেকে গলা ফাটাতে লাগল। আমি একদিন জানলা দিয়ে মুখ বার করে ওদের বললাম, গান যে ঠিক সময়ে থামাতে জানেনা—সে মোটেই ভালো গাইয়ে নয়। এবার বাপু গান থামাও। ওরা কথা শুনলনা। বসন্তকাল ফুরিয়ে প্রখর গ্রীষ্ম তখন সেই একঘেয়ে বিরক্তিকর কোকিলের ডাক এমনকী তারপর বর্ষাকাল, সেসময় কোকিলের ডাকার কথা কোন শাস্ত্রে লেখা নেই। একটা সুন্দর শ্লোক পড়েছিলাম ছেলেবেলায়—বর্ষাকালে কোকিল ডাকে না কেন? কারণ, বর্ষাকালে ব্যাঙেরা সমস্বরে ডাকতে শুরু করে—তখন কোকিলের চুপ করে থাকাই উচিত। 'মূর্খেরা যখন বক্তা বুদ্ধিমানের পক্ষে তখন নীরব থাকাই যেন শ্রেয়।' কিন্তু ঐ কোকিলদুটো সেই শ্লোকের কথা জানেনা—একেবারে গোমুখ্যু যাকে বলে—সারা বছর ধরে ডেকে-ডেকে আমাকে কোকিলের ডাক সম্পর্কে বীতস্পৃহ করে তুলল।

শালিকঘটিত ব্যাপারটা অন্যরকম। শালিকগুলিকে দেখতে বেশ সুন্দর, বুদ্ধিমানও খুব। আমাদের বাগানের শালিকগুলোর ভয়ডর নেই, নির্ভয়ে ঘুরে বেড়ায়—মাঝে-মাঝে দল বেঁধে কাকদের সঙ্গে ঝগড়া করে, গাছে বিড়াল উঠলে তাদের ল্যাজে ঠোক্কর মেরে তাড়ায়। শালিকগুলোর মধ্যে দুটি শালিক আমার খুব প্রিয়। একটি শালিকের মাথায় কালো রঙের ছোপটি এমন, যেন মনে হয় খুব কায়দায় চুল আঁচড়ানো। আমি ওর নাম দিয়েছি শালিক উত্তমকুমার। আর-একটির চোখদুটো খুব টানাটানা—আমি ওর নাম সুচিত্রা সেন কিংবা সুপ্রিয়া চৌধুরী রাখব এখনো ঠিক করতে পারিনি। বারান্দা জাল দিয়ে ঘেরা সত্ত্বেও ওরা ঘুলঘুলির কাচ দিয়ে বাথরুমের জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকে ঘরের মধ্যে এসে ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ওদের উপদ্রব বেশি নয় বলে আমি অপছন্দ করিনি।

একদিন দেখলাম, বাগানে কতকগুলো বাচ্ছা ছেলে একটা শালিকের পায়ে দড়ি বেঁধে খেলছে। আমি চমকে উঠলাম, আরেঃ এতো সেই উত্তমকুমার। আহা, অমন শৌখিন পাখিটার এই দৃশ্য! ছেলেগুলো আম পাড়তে গাছে উঠেছিল—সেখানে শালিকের বাসা দেখে ভাঙতে যায়, তখন এই উত্তমকুমার শালিক এসেছিল ওদের ঠোকরাতে। সুতরাং ছেলেরা ওকে ধরে ফেলে পায়ে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে। আমি ছেলেগুলোর কান মুলে দিয়ে হাত থেকে দড়িটা কেড়ে নিয়ে শালিকটাকে মুক্তি দিলাম। শালিকটা পিড়িং করে ডানার শব্দ করে উড়ে গেল। অন্য একঝাঁক শালিক সমস্বরে কোচাটু পিসাটু বলে আমায় কৃতজ্ঞতা জানাল।

এর ফলাফল কিন্তু করুণ। একদিন আমাদের দোতলার বাথরুমে একটা সাপের খোলস দেখতে পাওয়া গেল। বাড়িসুদ্ধ সবাই আঁতকে উঠলাম। দোতলায় সাপ! খোলস ছেড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে কোথায় লুকিয়ে আছে? বাড়ির সকলে চিন্তায় অস্থির, অবিলম্বে এ বাড়ি বদলাতে হবে। তাহলে সব ঝামেলা আমারই। আবার বাড়ি খোঁজ মালপত্তর টানা! সুতরাং আমি তন্ন-তন্ন করে সাপ খুঁজতে লাগলাম। বেশ কয়েক ঘণ্টা বাদে রহস্যটা পরিষ্কার হল। চৌবাচ্চার জলে আর-এক টুকরো সাপের খোলস। বাথরুমের ঘুলঘুলিতে একজোড়া শালিক এসে বাসা বাঁধছে—সেই উত্তমকুমার তার সুচিত্রা বা সুপ্রিয়া! নানান নোংরা জিনিশ—নারকেল দড়ি, ঝাঁটার কাঠি, ময়লা কাগজ ইত্যাদি মুখে করে আনছে শালিকদুটো বাসা বাঁধবার জন্য। সাপের খোলসও ওরাই এনেছিল—সেটাই উড়ে পড়েছে। উপকারের প্রতিদান! ক্রমশ বিচিত্র সব নোংরা পদার্থ বাথরুমে উড়ে পড়তে লাগল—কখনো জলের মধ্যে, কখনো আমার মাথায়। বাড়িতে শালিক পাখির বাসা—অসম্ভব, আমি উপকার করেছি কিনা—তাই আমার ওপর যা খুশি অত্যাচার করা যায়। কিন্তু স্নানের জলে সাপের খোলস কে সহ্য করবে? আমি প্রথমে হাততালি দিয়ে হুস-হুস

শব্দ করে ওদের ওড়াবার চেষ্টা করলাম। যাবে না। তারপর ঝুলঝাড়া দিয়ে ওদের তাড়া করলাম—কিন্তু এমনই আবদার তখন-তখন উড়ে যাচ্ছে—কিন্তু একটু বাদেই আবার ফিরে আসছে। শেষপর্যন্ত যখন একটা থ্যাংলানো ইঁদুর ওরা মুখে করে এনে জলে ফেলল—তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি হল। সন্ধেবেলা ওরা ঘুলঘুলিতে এসে আশ্রয় নেবার পর, আমি মই লাগিয়ে চুপি-চুপি উঠে ক্যাঁক করে ওদের ধরে ফেললাম এবং সঙ্গে-সঙ্গে—

শালিকের রোস্ট বেশ সুস্বাদু। মাংসটায় একটু ছিবড়ে হয়। কিন্তু চিলি সস দিয়ে মাখিয়ে নিলে চমৎকার। এখনো জিভে লেগে আছে।